সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন নৈরাজ্য অপসংস্কৃতির দাপাদাপি, তখন সময়ের ভাবনায় উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির জীবনবাদী কবিদের কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থ। কবিতা পাঠকের পক্ষে অমোঘ, অনিবার্য

কৃষ্ণ ধরের

কালের নিসর্গ দৃশ্য ২,

গণেশ বসুর

রক্তের ভিতরে রৌদ্র ২,

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের

বৃষ্টিপাত ৫,

প্রাপ্তিস্থান :

সিনেট বুকশপ ও মনীষা গ্রন্থালয়

কলিকাতা ১২

১৯ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৬

১ম সংখ্যা
মূল্য
দুই টাকা

Friday, 9th MAY, 1969, শুক্রবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৬ Rs. 2.00

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১০	২৫শে বৈশাখ	
১১	সম্পাদকীয়	
১২	রবীন্দ্রনাথ ও গ্রিসের একটি গল্প	—শ্রীসুকুমার সেন
১৪	বাংলা ছোটগল্প	(গল্প) —জগদীশ গুপ্ত
১৫	কলঙ্কিত সম্পর্ক	—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
২২	জগদীশ গুপ্ত	
২৫	পুঁইমাচা	(গল্প) —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	—শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫	বোদিনী	(গল্প) —শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIV

চুলের এত জৌলুষ একমাত্র বেস্‌কো শ্যাম্পুই আনতে পারে

কৃত্রিম নয়, আসল ডিম থেকে তৈরী লানোলিন মিশ্রিত "বেসকো" এগ শ্যাম্পু চুলের খোড়া পরিষ্কার ও খুস্কি দূর করে এবং চুলকে রেশমের মত মসৃণ রাখে। বেসকো মিল্ক শ্যাম্পুতে মেশানো আছে ক্যালসিয়াম, যা চুলের গোড়ায় গ্রন্থি জুগিয়ে চুলের জৌলুষ বাড়িয়ে তোলে।

সাবান বিহীন

বেস্‌কো এগ ও মিল্ক শ্যাম্পু

'বলডেক্স'-প্রস্তুতকারকের তৈরী

বেস্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন : ২০৭বি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

বিদ্যোদয়ের বই

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

যোগিজনাথ মজুমদারের কবি শ্রীমধুসূদন ১০·৫০ সাহেবা-বিবির ১·৫০ বাংলার নবযুগ ৮·০০ সাহিত্য-বিহার ৮·৫০ বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০ অমলেন্দু বসুর সরস্বতী সিন্দুর-সাহিত্য ১০·০০ সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণ-বাঙ্ময় সংগ্রাম। প্রথম খণ্ড ১৬·০০ টা হুমায়ুন কবীরের বাঙ্ময় সাহিত্যের ৮·০০ টা বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৯·০০ জগদানন্দ বাজপেয়ীর ভট্টাচার্যের নাটোরকুমারীবাংলা ১৬·০০ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের ঔপনিবেশিকের ইতিকথা ২৪·০০ অজয় মুখোপাধ্যায়ের চিরবসন্ত ২৯·০০ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র শিল্প-দর্শন ১০·৫০ টা সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ইংরেজী সাহিত্যের সাঙ্কেতিক ইতিহাস ৭·০০ যোগেশচন্দ্র পুরকায়স্থের ভারত মহিমা ৩·৮০ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্কুল ও কলেজের পুস্তকাগার পরিচালনা ৩·৭৫ নেপাল মজুমদারের ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড ১০·০০ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের [সংকলন ও সম্পাদনা] বিপ্লবী কবি জগদীশচন্দ্র ৬·০০ নারায়ণ চৌধুরীর সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০ হরিপদ ভট্টাচার্যের বাংলা মেঘের রূপ-রীতি ও পরিচিতি ৪·৫০ হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্ময় ৩·০০ আনা হুইটম্যান স্মরণে স্বামীজির মুখ [অনুবাদ] ৩·২৫ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোটদের ভোজ ৪·০০ সংকলন [সম্পাদনা ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুখেন্দু বসু] অর্থ-শতাব্দী ৪·০০ অমলীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীমধুসূদনবক্তৃতা ৩·৫০ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [এম. পি]-এর ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৭·৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ১·০০ ঃ

উপন্যাস-কথা-স্মৃতিচিত্রণ

অমল মিত্রের চট্টগ্রাম-বিপ্লবের কাহিনী অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ঃ প্রথম খণ্ড ১১·০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্ধশতাব্দীর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা বিপ্লবের সন্ধানে ১৫·০০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের যোগেন্দ্রা উপন্যাস যোগেন্দ্রা হৃদয় পরাণের কথা ৪·৫০ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস মন্বন্তর ৬·০০ জীবনীর প্রথম প্রেম ৪·০০ মনোজ বসুর ৪·০০ পুরুষমোহিনী ৩·০০ সোমলতা ৪·০০ প্রেমেন্দ্রের উপন্যাস ও স্মৃতিচিত্রণ বেকর মুহূর্তে ভালোবাসা ৩·৫০ অন্নদাশঙ্কর রায় ৩·০০ পথে-প্রবাসে প্রথম পর্ব ৩·৫০ দ্বিতীয় পর্ব ৪·৫০ মনীষ ঘটকের উপন্যাস অমরেশ ৭·০০ শ্রীমতের উপন্যাস আমি আর সুখদা ৩·০০ কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পুরুষিকা ৩·২৫ শচীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে মীর আলমের অন্তর কাহিনী চায়ের ঘরানা ৩·৫০ সুধীর করণের বেদেতন্ত্রের অনুসন্ধানের কাহিনীসূত্রে ভরদ্বাজপুরের ৪·০০ সুশীল জানার উপন্যাস বেদাঙ্গরাগ গান ৬·০০ সুধাংশু ৩·৭৫ গুপ্তের গল্পের উপন্যাস অবাঙ্মনস বিষাদ ৫·০০ হুমায়ুন ভট্টাচার্যের উপন্যাস মন্ত্রণা ৩·৫০ কে. এস. সাধুখাঁর উপন্যাস কেরল সিংহল [অনুবাদ] ৬·০০ সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস দুই অশ্ব ৩·৭৫ শিশির সরকারের উপন্যাস বিভিন্নমত ২·৫০ পান্থ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্রণ চলমান জীবন ঃ প্রথম খণ্ড ৫·০০ আনা হুইটম্যান স্মরণের উপন্যাস মৃত্যুঞ্জয়ী নদী [অনুবাদ] ৪·০০ ঃ

কিশোর ও কিশোরী সাহিত্য

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুরূপদেবী ৬·০০ মনোজ বসু ৬·০০ পুজো বায় সিরাজিয়ম ৩·০০ শ্রীরামের নিবাসন ২·২৫ কল্প আর কল্প ২·২৫ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের জীবন-কথা ২·২৫ শিবরাম চক্রবর্তীর প্রেমের পরকার চলচ্চিত্রটি ৩·০০ কুমার ভালকে বিশ্বস ৩·০০ অপরাজেয়ের অপরাজেয়ের কৌতুক কাহিনী ২·৮০ সরল ভট্টাচার্যের নাবিক রাজপুত্র ও আরও রাজকন্যা ২·০০ সুবলতা রাওয়ের আমি ভূপি মেম ৩·০০ সুশীল জানার গল্পসমগ্র ভারত শ্রেষ্ঠ খণ্ড ৩·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩·০০ অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানের মুক্তকথা ২·০০ সোমেন্দ্র বসুর স্বর্ণমুকুট ২·৫০ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরিয়ান মেম বসন্ত ২·০০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলমগীর [ছোটদের] ২·০০ হুমায়ুন কবীরের বন্ধুকুটীর ছড়া ১·৫২ সোমেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থের মুখোমুখির চিঠি ১·৫২ শৈল চক্রবর্তীর চিত্রে খুদে-জীবন-কথা ১·০৫ ছোটদের ছোট বই ১·০০ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিদেশীর ছোবে ছোটদের অমর ১·২৫ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিলায় বিবিধাল ১·০০ সুবোধ ঘোষের ছোট্ট জীব কল্প ০·৭৫ সুশোভি ০·৭৫ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধ্যা মেকে সিংহল ০·৭৫ ঃ

• অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর আয়োজন-সৃষ্টিকারী নববর্ষ সংখ্যা •

বিরাট কলেবরে

প্রকাশিত হয়েছে

কিশোর ও তরুণ জগতের সচিত্র

অভিনব মাসিক মুখপত্র

কিশোর ভারতী

দাম ঃ ২·৫০

ঝরঝরে লাইনো টাইপে ছাপা

মনোরম জ্যাকেটে মোড়া

বহুরঙা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ॥

বাংলার অর্ধশতাধিক বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীর বিভিন্ন স্বাদের অপূর্ব সব লেখায় ও ছবিতে পূর্ণ এই প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৭৬/ মে ১৯৬৯) ॥

এই সংখ্যার আরও আকর্ষণ

অভিনব শব্দ-হেঁয়ালি প্রতিযোগিতা

প্রত্যেক নির্ভুল উত্তরদাতাকে ১০·০০ (দশ টাকা) পুরস্কার

কার্যালয় ঃ ৮/৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অমৃত

শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৬

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬১	বরোদাসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	—শ্রীমতী সুলতা সিংহরায়
৬২	আড়াই	(গল্প) —শ্রীবরেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	—শ্রীউদয়ন রহমান
৫১	কমাই	(গল্প) —শ্রীসেবক
৫৪	কলকল	—শ্রীসর্বানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৫	রাজু	(গল্প) —শ্রীমনোজ বসু
৬২	মনোজ বসু	—শ্রীমানব সান্যাল
৬৩	যন্ত্রের আবির্ভাব	(গল্প) —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৭৩	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	—শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়
৭৭	হেমেন্দ্রলালের জাবিষ্কার	(গল্প) —শ্রীহেমেন্দ্র মিত্র
৮২	হেমেন্দ্র মিত্র	—শ্রীবনোবাজীবন ভট্টাচার্য
৮৫	নিবারণের ভুল	(গল্প) —শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
৯১	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৯২	লক্ষের কাঠী	(গল্প) —শ্রীনারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়
৯৯	নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়	—শ্রীমতী মুখ ভট্টাচার্য
৯৯	বৈরাগ্যের	(গল্প) —শ্রীমতী [illegible]
১০৬	সরীনাথ ভাদুড়ী	—শ্রীমতী দেবী
১০৭	পদ্মরাগ	(গল্প) —শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১১১	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	—শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়
১১৫	বর্ষার পদ্মরাগ	(গল্প) —শ্রীবিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়
১২০	বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়	—শ্রীমতী দেবী
১২১	পুরুষ	(গল্প) —শ্রীপ্রফুল্লকুমার সান্যাল
১২৮	প্রফুল্লকুমার সান্যাল	—শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
১৩১	ফেরিওলা	(গল্প) —শ্রীমতী বসু
১৩৪	বুদ্ধদেব বসু	—শ্রীপ্রবাসী মুখোপাধ্যায়
১৩৯	প্রবাস	(গল্প) —শ্রীমতী [illegible]

সদ্য প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ভ্রমণাণ বীক্ষা : অন্ধ্র পর্ব ১·০০
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

খ্যাতি যাদের জগৎ-জোড়া ৭·৫০
নির্মলেন্দু চৌধুরী

ভারতের শিল্প ও আমার কথা ১৫·০০
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(ও. সি. গাঙ্গুলী)

* * *

রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যান্য বই

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস ৭·৫০
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৬·০০
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ৮·০০
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

রবিরশ্মি ১ম : ১০·০০
রবিরশ্মি ২য় : ৭·৫০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্য-সমীক্ষা ৫·০০
শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ৬·০০
শ্রীঅশোক সেন

রবীন্দ্র বিজ্ঞান ৫·০০
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মনীষী রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০
ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য ৪·৫০
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যালোক ৩·০০
অধ্যাপিকা অমিতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ ৪·০০
শ্রীঅজয়কুমার রায়

চারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ৪·০০
শ্রীঅনিল সেন

পঞ্চাব্দীর সূর্য ৫·০০
(রবীন্দ্র প্রতিভা ও অনুভূতি চরিত্রের আলোচনা)
শ্রীবিশ্বরঞ্জন বসু

প্রকাশক
এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

পি. ব্যানার্জীর
নিত্য বিশ্বাসে
একজামিন
চাঁদ, চুলকানি, ঘোস, পাচড়ার
মূল্য — ১০ শিশি — ১·২০
অন্যান্য ৩০ গ্রাম — ০·৮০
১০ শিশি ঔষধ — ৪·৫০
বিনামূল্যে বিবরণী চেয়ে ১৪
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

আমার সময় জনসাধারণের নিকট বিনামূল্যে
ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার
ঔষধ এবং রোগী দেখিবার
সময়সূচীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।
নিয়মিত চক্ষুপরীক্ষার এবং অফিস—
আধুনিক চিকিৎসা
প্রসব বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত পারিবারিক চিকিৎসায় সর্বদেশের ও সমাজের সেবায় রত।
ফোন : ৪৭৩০৮১ এবং ৪৭২০১৮
ঔষধালয়ের বিবরণী পুস্তিকা আইনে-অনুযায়ী বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

সম্পাদক • সাহিত্য • সমালোচনা

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ● বাংলা সাহিত্য ॥ বিজেন্দ্রলাল রায় ৮·০০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা ॥ নারায়ণ চৌধুরী ৩·৫০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ● কবিতা ॥ বঙ্কিম রচনা ॥ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বসু সম্পাদিত ১০·০০ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পত্রিকা ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৮·০০ কবিতার জন্ম ● বাংলা কবিতার পটভূমিকা ॥ অমূল্য ভট্টাচার্য ৪·০০ আধুনিক বাংলা গদ্য ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ২·৫০ আধুনিক ইংরেজি ॥ নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত ১০·০০ রাজা পাঁচকড়ি/২য় সংস্করণ ॥ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩·০০ আধুনিকী ॥ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বসু ১০·০০ আলিবাবা ● চল্লিশ চোর ॥ বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য ৮·০০ শরীরের সঙ্গে ॥ হিরণ্ময়বন্দ্যোপাধ্যায় সেন সম্পাদিত ৪·০০ ঐতিহাসিক পরিচয় ॥ সরোজ দে ৩·০০ ডিটেকটিভ বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বসু ৮·০০ অন্ধ পরিচয় ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ৪·০০ অভ্রভেদী ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ১·৫০ ফেরারী ফৌজ/২য় সংস্করণ ॥ সুনীল রায় ১০·০০ দুই রাজধানী ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬·০০ ধরাচাঁদ ● কুমারেশ ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ১·২৫ সাহিত্য ও সাহিত্যিক ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১·৫০ সাহিত্য বিচার মুকুন্দ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৫·০০ বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা ॥ হরেকৃষ্ণমুখোপাধ্যায় ৪·০০ পদাবলীর ভূমিকা ● কবি জয়দেব ॥ ডঃ বিমলপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ পাঁচ পর বন্দরের পদাবলী ॥ ডঃ বিমলবিহারী মজুমদার ৬·০০ শিবায়ন ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪·০০ শব্দসঞ্চয়ন ॥ সীতা দেবী ১০·০০ পুণ্যশ্লোকা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ৪·০০ প্রবন্ধ সংগ্রহ। অমলেন্দুনাথ ঠাকুর ॥ ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ৭·৫০/১০·০০ কথিকা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ১·৫০ বঙ্গ ঐতিহাসিকের ঐতিহাসিকতা ॥ অমিয়ভূষণ ভট্টাচার্য ১০·০০ বাসর্ঘ ॥ ডঃ বিমলবিহারী ভট্টাচার্য ৪·০০ বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ॥ আবদুল ওদুদ খান ৫·০০ বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস ॥ অজিত দত্ত ১২·০০ বাংলার পটভূমিকা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ৮·০০ মুখোশ ॥ সুকুমারবন্ধন বসুরায় ৬·০০ ফেরেশ্তা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ১·০০/১·৫০ ভারত জিজ্ঞাসা ॥ হিরণ্ময়-বন্দ্যোপাধ্যায় সেন সম্পাদিত ৩·০০ রাজাধিরাজ পরিচয় ॥ সুকুমার বিশ্বাস ৭·৫০ গল্প। বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ৫·০০ মুক্তধারা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ২·৫০ প্রেমবন্ধে। অমিয়ভূষণ ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ৫·০০ মুক্তাঙ্গন ॥ বিমলেন্দু সরকার ৮·০০ রবীন্দ্র সঙ্গীত ॥ প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ৪·০০ রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ (১ম/২য়) ॥ প্রফুল্লকুমার সেন ৪·০০/৫·০০ রাজাদের রাজনীতি ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ২·৫০ রাজাবদল ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ২·৫০ রাজাসুর ॥ প্রফুল্লকুমার দাস ১০·০০ রাজায় ও রাজা সংস্কৃতি ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ৩·০০ রাজাধিরাজ কথা ॥ হিরণ্ময়বন্দ্যোপাধ্যায় সেন সম্পাদিত ১·২৫ রাজাবলী কথা ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ২·৫০/৩·০০ ঐতিহাসিকী ॥ অমিয়ভূষণ বিশ্বাস ॥ ডঃ বিমলবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ১২·০০ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ॥ ডঃ বিমলবিহারী মজুমদার ১৫·০০ শব্দসঞ্চয়ন ॥ বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর সাহিত্য বিচিত্রা ॥ ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় ৮·৫০ হিজেন্দ্রলাল ঐতিহ্যের ॥ শচীন্দ্রনাথ সেন ৮·০০

জীবনী গ্রন্থ

র বি বা র চি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৫·০০ কেশবচন্দ্র ৪·৫০ বঙ্কিমচন্দ্র ৬·০০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪·৫০ মাইকেল ৭·০০ রমেশচন্দ্র ৫·০০ রামমোহন ৭·০০ রাজর্ষি সুরেন্দ্রনাথ ৪·০০ বিদ্যাসাগর আত্মচরিত ৫·০০ বিবেকানন্দ ● যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১০·০০ সমাজী বিবেকানন্দ ৫·০০

বিবেকানন্দ ॥ নবিতা ভবতারী ৪·০০ রামকৃষ্ণদেব ॥ স্বামী সারদানন্দ ১৫·০০ জীবনী নির্দেশিকা ● রামের বিবেকানন্দ ॥ বিভিন্নজনের রচনাবলী ৬·০০ শেষনী ॥ নগেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২·৫০ ঐতিহাসিক ● অন্ধ অন্তরঙ্গের অন্তরঙ্গ-প্রবন্ধ ॥ বিভিন্নজনের রচনাবলী ৫·০০ সমসাময়িকের চোখে ঐতিহাসিক ॥ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০·০০

নতুন বই ! রবি গুহ মজুমদারের
সূক্ষ্ম কটাক্ষপাত !!!

চারাগল্প

সমাজ-১ ৩·৫০

ঝরে ঝরে

আধুনিক কবিতা ৩·০০

খুঁজি খুঁজি নারি

আধুনিক ছাঁদের (বহুরঙ) ছবি ২·৫০
প্রাপ্তিস্থান। বীক্ষণ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
জেং ৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলি-১ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

ডাক পাবলিশার্স
১।১।১ হাজরা রোড কলিকাতা-২৬

অমৃত
নবকুম্ভ সংখ্যা
১৩৭৬

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১৩৮	প্রফেসরকুমার মিত্র	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫৩	কালিন্দ	(গল্প) — শ্রীমতী সুচরিতা দেবী
১৬৯	আলাপচারী দেবী	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৭১	প্রাইভেটরাসিক	(গল্প) — শ্রীমতী বাসবী মুখোপাধ্যায়
১৭৫	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৮৬	ছায়ালি	(গল্প) — শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৮৮	সুবোধ ঘোষ	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৯১	ধরণী	(গল্প) — শ্রীবিমল মিত্র
১৯৭	বিমল মিত্র	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৯৯	গল্প	(গল্প) — শ্রীসুবোধ মিত্র
১৯৩	সরোজকুমার মিত্র	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
১৯৮	চৌপদ	(গল্প) — শ্রীসমরেশ মজুমদার
১৮৭	সমরেশ মজুমদার	— শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৮৬	অমাবস্যারী	(গল্প) — শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী
২১০	সমরেশ মজুমদার	— শ্রীসুবোধ ঘোষ
২১৩	ঘোড়া ডাকবাবু	(গল্প) — শ্রীসমরেশ বসু
২১১	সমরেশ বসু	— শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী
২০১	পাশের বাড়ীর মেয়ে	(গল্প) — শ্রীনীহার গুপ্ত
২০৫	লীলা মজুমদার	— শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
২০৩	ছোটগল্প : বিচিত্র চিত্রা	

অলঙ্করণ : শ্রীনিতাই ঘোষ

অন্য সকলের থেকে
আলাদা হয়ে থাকব,
নিজেদের চারপাশে
বেড়া তুলে রাখব,
এমন কথা
আমি স্বপ্নেও
ভাবতে পারি না

— এম. কে. গান্ধী

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

শ্রেষ্ঠ লেখক । শ্রেষ্ঠ রচনা

ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের
রচনা সমৃদ্ধ

গান্ধী পরিক্রমা

সর্বশ্রী রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন, ভক্তপ্রকাশ নারায়ণ, রাজাগোপালাচারী, কৃপালনী প্রমুখ

চল্লিশজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

*

পনেরো টাকা

নীলা মজুমদারের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

আরকোনোখানে ৫৲

মাত্র কয়েক সপ্তাহে দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত

কালিদাসরঞ্জন কানুনগোর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

রাজস্থান কাহিনী

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ সাড়ে ছয় টাকা ॥

বিমল মিত্রের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

আমি কান পেতে রই

মাত্র দুই মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

॥ চৌদ্দ টাকা ॥

বিমল মুখোপাধ্যায়
নবতম রম্যরচনা

রাজা উজীর ৮৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সর্বশেষ উপন্যাস

দ্বিধা ৭৲

ভবিতোষকুমার সেনগুপ্তের
নবতম জীবনকথা

গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম জীবনকথা

স্বয়ম্বরতা ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

এক চামচ গঙ্গা ৪৲

শচীন্দ্রলাল রায় অনূদিত

জাহাঙ্গীরনামা ৮৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ৭॥

॥ চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥

সুধাময় সাহার

বনরাজিনীলা ৭৲

নীলাঞ্জনা ৭॥

তারাশঙ্করের

রাধা ৮৲

যোগভ্রষ্ট ৭৲

প্রমথনাথ বিশীর

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

লালকেল্লা ১৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙ্গালী জীবনে রমণী ১০৲

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ॥

বিশ্ব ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অমৃত

সম্পাদকীয়

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

আমাদের এই সংকলনের কাজ যখন প্রায় সমাপ্তির দিকে তখনি আকস্মিক বজ্রপাতের মতো খবর এল, আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মতো রাষ্ট্রনায়কের মনীষা ও সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বেদনাবোধের কোনো সীমা নেই আমাদের, কিন্তু পরলোকগত রাষ্ট্রপতির আদর্শই যে আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপথে নতুন প্রেরণা জোগাবে তাতেও আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ জাকির হোসেনের চরিত্র ছিল কর্ম জ্ঞান ও প্রীতির ত্রিবেণীসংগম। তাঁর সাহসে ও চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বহু জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ভারতরাষ্ট্রে একতার প্রতীক এই মহান নেতা অগণিত নর-নারীর হৃদয়ে অমরতা লাভ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কবিপ্রণাম

অমৃতের নববর্ষে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভকামনা ও সাদর সম্ভাষণ জানাই।

বাংলাদেশে বৈশাখ হল কবির মাস। কবিপক্ষ উদযাপিত হচ্ছে সর্বত্র। বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল অঙ্গ হল কবি-প্রণামের এই বিনম্র ভঙ্গিমা। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যেন বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে আরও আপন করে নেয় তাঁর কবিতায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যের উত্তরাধিকারে। কবি নিজে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে গেছেন যে, তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি যেন বেঁচে থাকেন মানুষের মনে। আজ কবির গান জনজীবনের গভীরে, বাঙালীর ধমনীতে মিশে গেছে একাকার হয়ে। যেমন করে রামপ্রসাদের গান, বাউলের গান এই দেশের আকাশে বাতাসে, ধুলোমাটিতে, নদীজলে ভেসে বেড়ায়, রবীন্দ্রনাথের গানও তেমনি আমাদের নিশ্বাসের মতো অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে।

এ হল আমাদের গৌরবের দিক। পঁচিশে বৈশাখ বাংলাভাষী সকল মানুষকে ঘরে ফেরার ডাক দিয়ে যায়। আপনজনকে আপন করে চিনে নেবার এক শুভ মুহূর্ত হল এই দিনটি। সীমান্তের ওপারে যে বাংলাদেশ, সেখানে কবির জীবনের বহু শ্রেষ্ঠ দিন কেটেছে। পদ্মার বোটে, শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে, সাজাদপুরে, রামপুর-বোয়ালিয়ার নদীপথে, পতিসরের জমায়েত পল্লীজীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে, ছিন্নপত্রে, গল্পগুচ্ছের উজ্জ্বল পাতিতে, অজস্র কবিতার ছত্রে সেই দিনগুলোর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথকে জনতার থেকে দূরে রাখার জন্য সেখানে শাসককুল কম চেষ্টা করেনি। ইংরেজভাষা বাঙালী প্রাণ, পাকিস্তানের সেই নবজাগ্রত বাঙালীরা সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে রবীন্দ্রনাথকে আবার হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলার চোখের মণি। তিনি সর্বজনের কবি।

রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করার সময় এসেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণার প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁকে আমরা কতটুকু নতুন করে পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের পুঁথিগত পদ্ধতিতে এই স্কুল-পালানো কবিকে আমরা কতটুকু জানতে পারি? বিশেষত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিচিত্র জগাখিচুড়ি আমদানি হয়েছে, আমদানি-করা নানা উদ্ভট চিন্তার বলয়জমে তা ক্রমশই দুষ্পাচ্য হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও যেন আমরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। জীবনের সঙ্গে জীবনকে জিইয়ে গড়ে ওঠে যে-সাহিত্য, যার সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের অস্তিত্বের বাঁধিবন্ধন, সেই মহৎ সৃষ্টির জন্য আমরা আর কত দিন প্রতীক্ষা করব? মানুষ তো শুধু ভাতের জন্য বাঁচে না। ভাতের পরেও তাকে জন্য কিছুর জন্য বাঁচতে হয়। কারণ সে চিন্তাশীল জীব। তার আবেগও আছে, বুদ্ধিও আছে। সেই মোটা মানুষের জন্যই তো মহৎ সাহিত্যের উত্তরাধিকার যা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তাকে নতুন সমৃদ্ধির দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সাহিত্যিকদের এ-বিষয়ে এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন-সত্য প্রতিফলিত হয়। আজও সেই আলোকেরই প্রার্থনা করি আমরা কবির জন্মদিনে। তিনি আমাদের কাছে জ্যোতির্ভূতোরা। তাঁকে স্মরণ করেই আমরা নববর্ষের এই সাহিত্যসংখ্যার ছোটগল্পের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম। গল্প লেখাও তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন।

আশীর্বাদ

কোথা থাক সে কি আমার কুঁড়ে ?
সেথা সন্ধ্যে হয় কেবলে।
ওরে দিনের আলো
তখন তুমি ঘুমাও,
পরদেশী পাখির মতন।
সাঝিনার ডাঁসা সমীরণ
ডাকি তব লাগি সেখানে।
নিশি ভোরে নদী
কূলে কূলিবে জলে
ঘাটেঘাটে নাবালার ঘরে।
তুমি তুমি তুমি
তুমি তুমি ফিরাবে
পরদেশী চলে তুমি যেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ
১৩১৮

রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রিমের একটি গল্প

সোনার তরীর দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্য. যতীর কণ্ঠে যে রূপকথা শোনা তা তিনি নিজেই নির্দেশ করেছেন। এখন জানা হল, কোন্ রূপকথা, কোথাকার রূপকথা। এ প্রশ্ন উঠেছিল এবং সে প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১৯২৪) যে গল্পটি তিনি তাঁর এক ভাইঝির মুখে শুনেছিলেন (সোনার তরী ১৯৪৫ সংস্করণ 'কথা প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)। অতএব, গল্পটি বাংলাদেশের অথবা ভারত-বর্ষের অন্য কোন অঞ্চলেরই নয়, গ্রাজোঁ ও গ্রিমভ্রাতৃদ্বয় কিম্বা কর্তৃক সংগৃহীত জার্মান রূপকথা (প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজী অনুবাদ—বাচ্চাই জন্য গল্পের—প্রথম প্রকাশ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি কীভাবে শুনেছিলেন জানি না তবে গ্রিমের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি কাহিনীকে নিজের মনের মতো ছাঁটকাট করে নিয়েছিলেন। সেইটুকু দেখানো আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। বিশ্বভারতী সকলেরই পড়া আছে তবে নিতে পারি। গ্রিমের গল্পটি অনেকের পড়া নেই বলে অনুবাদ করি। তাই গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

শীতের দেশের এক রূপসী রাণী জানালার ধারে বসে সেলাই করছিল আর বাইরে বরফ পড়া দেখছিল। হঠাৎ তার আঙুলে ছুঁচ বিঁধে গিয়ে তিন ফোঁটা রক্ত পড়ল জানালার আবলুস কাঠের ফ্রেমের ওপর। তা দেখে রাণীর মনে হল, তেমনি মেয়ে একটি হয়—বরফের মতো সাদা, রক্তের মতো লাল, আবলুসের মতো কালো। সত্যি সত্যি একটি মেয়ে জন্মালো—বরফের মতো সাদা, রক্তের মতো লাল, আবলুসের মতো কালো। তার নাম রাখা হল তুষারবতী।

(গল্পটির এখানে কিছু কিছু রূপান্তর প্রচলিত ছিল প্রথা ও উত্তর ইউরোপে। তার একটি অন্যত্রের রাণীর একটি মেয়ে হয়েছিল ঐ রকম। তার পরে রাণী মারা গেলে রাজা আবার বিয়ে করলেন। এ রাণীর মুখে গর্ব যে তার মতো সুন্দরী আর নেই। এই রূপান্তর ইউরোপী সংস্করণে আছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্পটিতেও তাই।)

রাণীর কাছে মায়মুকুর ছিল। তুষারই তাতে নিজের মুখ দেখত, আর প্রশ্ন করত।

বলত মুকুর দেয়াল ঘেঁষে ধাতু,
এ চরাচরে কোন্ মেয়ে সুন্দরী বড়?
মায়মুকুর দেখে উত্তর করত।
তুমি রাণী, এ চরাচরে সুন্দরী বাড়া।

এদিকে তুষারবতী যেমন বড় হচ্ছে তত রূপও তার দিন দিন বাড়ছে। বখন তার বয়স সাত হল তখন একদিন মুকুর থেকে জবাব এল।

রাণী তুমি সবার বাড়া সুন্দরী জানি
তবে তুষারবতী হাজার গুণে সুন্দরী তুমি

শুনে রাণী হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তখন ভৃত্যদের হাতে তুষারবতীকে দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে তাকে সে মেরেটাকে মেরে ফেলে তার ফুসফুস আর যকৃত এনে দেবে। ভৃত্যরা মেয়েটিকে বনে নিয়ে গেল কিন্তু মারা পড়ার চেয়ে সে মারতে পারলে না। এক শূয়োরের বাচ্চা মেরে তার ফুসফুস আর যকৃত রাণীকে এনে

সুকুমার সেন

দিলে। রাণী তা নুন দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে নিলে। এদিকে তুষারবতী অসহায় হয়ে বনে ঘুরতে লাগল। সন্ধ্যা হবার একটু আগে সে সাত পাহাড়ের পারে একটি ছোট বাড়ী দেখতে পেল। দরজা খোলা দেখে সে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখে যে ছোট একটি টেবিলে ছোট ছোট সাতটি ডিসে ও গেলাসে খাবার ও পানীয় সাজানো আছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে এত কাতর যে থাকতে না পেরে প্রত্যেক ডিস থেকে একটু করে খাবার খেল আর প্রত্যেক গেলাস থেকে এক ঢোক করে জল খেল। তারপর পাশের ঘরে ঢুকে সাতটি ছোট ছোট খাটে সাতটি বিছানা পাতা দেখে শয়নমাত্রেই একটিতে শুয়ে পড়ে তখনি ঘুমিয়ে গেল।

বাড়ীটি ছিল সাতভাই বামনের। তারা পাহাড়ের গায়ে খনি খুঁড়ে সোনা তোলে। সকালে কাজ আর সন্ধ্যায় ফেরে। সেদিন ঘরে ফিরে ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। দেখে তাদের মায়া হল। তার ঘুম ভাঙালে না। পরদিন তারা তুষার-বতীর বৃত্তান্ত সব শুনে নিয়ে বললে, তুমি যদি এখানে থাক আর আমাদের ঘরকন্না দেখ তোমার কোনই ভাবনা নেই। জানাদের বাড়ীর মতো তোমার মা (সৎ-মা) আসতে পারবে না। তুষারবতী রাজি হল। তাদের কাছে থাকার সময় বামনেরা তাকে সাবধান করে দিয়ে বাইরেই যেন সে বাড়ীর ভেতরে না যায়।

তুষারবতী মনের সুখে ঘরের কাজ করে দিনগুলি কাটাতে লাগল। সে আর প্রত্যহ মুকুরকে সে প্রশ্ন করে না। একদিন কী খেয়াল হল সে মুকুরকে জিজ্ঞাসা করলে :

বলত মুকুর দেয়াল ঘেঁষে ধাতু
এ চরাচরে কোন্ মেয়ে সুন্দরী বাড়া?
মুকুর সাদা কালো উত্তর দিলে :
রাণী তুমি সবার বাড়া সুন্দরী জানি,
সাত পাহাড় পার তুষারবতী
হাজার গুণে সুন্দরী জানি।

তবে তো মেরেটা মরেনি। ছেলে রাণীর রাগে রাগান জ্বলে পড়ল। রাগে-দুখে সে বুড়ীর ছদ্মবেশ ধরে সাত-পাহাড়ের পারে তুষারবতীর খোঁজে গেল। সেদিন সাত বামনের বাড়ীতে। দরজা বন্ধ দেখে টোকা মারলে আর হাঁকলে—ভাল-জিনিস বেচে গো। ভালো ভালো লেস-ফিতে। মেয়েটি জানালার এসে জিজ্ঞাসা করলে, কী জিনিস? বুড়ী বললে ভালো ভালো লেস-ফিতে আছে। তুষারবতী ভাবলে একে ঢুকতে দিতে দোষ কী? সে দরজা খুলে দিলে বুড়ী এসে ফিতেগুলি দেখালে। মেয়েটির পছন্দ হল লেস। ফেরিওয়ালী লেস পরিয়ে দেবার ছলে তার গলায় ফাঁস দিয়ে মরার মতো করে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সন্ধ্যা বেলায় বামনেরা ঘরে ফিরে দেখে মেয়েটি যেন মরে পড়ে আছে। তারা তার গলার ফাঁস খুলে দিলে সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করলে। সব কথা শুনে তারা বললে, এ কাজ রাণীর। এর পর আজ তুমি ঘরে সাবধানে থাকবে, কিছুতে কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।

ফিরে যখন রানী তাড়াতাড়ি রাজা-হুকুমকে খবরটা নিবেদন করে গেল।
বলত হুকুম মেহেরে খাড়া

ও চতুরালি কোন্ দেশে সুন্দরী বাড়া?
হুকুম বললে।

রানী তোমারে সবার চেয়ে সুন্দরী জানি।
তবে সাত পাহাড়ের ওপরে দুয়ারবতী
রাজা। সুখ সুন্দরী জানি।

শুনে রানী হিংসায় মাটি কাটে আর জ্বলতে লাগল। সে জানত, এখানে যেমন করে হোক মেয়েটিকে নিকেশ করতেই হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা প্রস্তাবকে মনঃপুত বিবেচনা করল। তার মনে বিষটা ভাবল, লাল বিষটা গলায় দিয়ে পূর্ণ। দুয়ারবতী সে চারা বউ মেরে সেই আপেল নিয়ে সাত পাহাড়ের ওপারে সাত রাজার ঘরে গেল। তারপর আপেল তাকে দেখে গেল। বলে তাক দিলে। এবারে দুয়ারবতী রাজার কথা বললে, সে কিছুতেই ধরজা খুলবে না। তখন রানী জানলার ধারে থেকে আবখানা আপেল নিচে ফেলে দাঁত আবখানা জানলা গলিয়ে দুয়ারবতীকে খেতে দিলে। আবখানা চারা বউকে খেতে দেখে দুয়ারবতী বাক্যটিও করতে পারে না। সেই বিষটাই ছিল আপেল বিষ খোসা। কাজও দিলেই সে চলে পড়ল। রানী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলে, অবশেষে তার মনের মতন হয়ে ফুলে গেল। রানী ফিরে এসেই রানী হুকুমকে প্রশ্ন করে মনোমত উত্তর পেলে।

বলত হুকুম মেহেরে খাড়া
কোন মেয়ে এ দেশে সুন্দরী বাড়া?

হুকুম বললে—

তুমি তো এলেলে সুন্দরী জানি,
তবে রাজপুরের ঘরে রাজারানি
সুন্দরী জানি।

হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে রানী ছুটল নিমন্ত্রণ সভায়। সেখানে দুয়ারবতীকে রাজার ছেলের বউ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু এখন সে আর করে কি। ভোজ খেতে হল। নাচেও যোগ দিতে হল। নাচের জন্যে রাজকন্যা জুতো তৈরি দিয়েছিল তার জন্যে। তাতে ছিল বন্দুকগুলি। সেই জুতো পরে নাচতে নাচতে রানীর দু পা পুড়ে গেল, অমনি সে মরে গেল।

জসীমউদ্দীনের কবিতার গল্পটির মেজাজটুকে ধরাই হয়েছে। ছোবড়া—অর্থাৎ সাত পাহাড়ের ওপারে সাত রাজার আস্তরণ—যা পড়েছে। আছে শাঁসালো বীজটুকু। সে

জসীম মোহন সম্পাদিত
চলচ্চিত্রকথা
অতীত ও আধুনিক কালের দেশি-বিদেশী বহু ছবির সিনেরচিত্রসমৃদ্ধ সরস আলোচনা গ্রন্থ। ছবিতে ও আলোকে শোভিত। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। ১৫·০০
— — — — — সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস — — — — —
নগশৃঙ্গার
আনন্দের মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০
বাঘবন্দী
অলিন্দ ॥ ৮·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত
দেশ জন্ম-এর ঘুমিয়া-জার-করা রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী
ডোরাকাটার অভিসারে ১·০০
অস্থিরসঞ্চক আদিগঙ্গা রাতের কুয়াশা
নরেন্দ্র ॥ ১·০০ আনন্দের মরুদ্যান ৮·০০ বাঁধিবারাজ ভট্টাচার্যের ৫·০০
অপরিচিতা দুজনার ঘর মাঠ থেকে বলছি
সৌরীন্দ্র সেন ৭·০০ আনন্দের মুখোপাধ্যায়ের ৪·৫০ অমর মিত্র ৪·৫০
অ্যাঙ্গোলা—আফ্রিকার ভিয়েতনাম
নরেন্দ্র রায় ॥ ১·০০
সুপ্রকাশ ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

হল সৌন্দর্যের গর্ব ও ঈর্ষা আর সে ঈর্ষার জ্বালায় নিজেই মালতীকে বার বার হত্যার চেষ্টা। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন। মূল কাহিনীতে রাণী মেয়েকে (অবশ্য সম্বন্ধেরেকে) মেরে ফেলবার চারবার চেষ্টা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই। তবে সামান্য পরিবর্তন আছে। ছিতের গল্পে প্রথম বারে মেয়েটিকে বনে পাঠানো হয়েছিল মেরে ফেলার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে হল দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টা। বনে পাঠানোর আগে কবির বর্ণনা। দ্বিতীয় বারে ছিতের গল্পে লোল পরাবার মতো অবসরসুন্দর নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধতার ভাষা পরিবর্তে সে কাজ করে। 'পরানের তারে আমি বিষমন্ত্রজ্বালাময়'। ছিতের গল্পে তৃতীয় বারে বিষমাখা চিরুনি পরানো, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে হল শেষ চেষ্টা, বলিও চিরুনির উল্লেখ নেই। কাঁচুলি দেখেছি তারে আপন সম্মুখে। ছিতের গল্পে শেষ বারে বিষ-জারানো খাওয়ানো, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা তৃতীয় প্রচেষ্টা। 'বিষফল খাওয়ালেম তারারে ছলিয়া'।

কবিতায় অচেতন দেহ দুজনেরই। ও রাজার ছেলের প্রেমের কোন উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ 'বিম্ববতী' কবিতায় করেন নাই। শেষে অবশ্য দুজনের বিবাহের ইঙ্গিত আছে। কনকচম্পকে দুটি হাসিমুখ হাসে'।

ছিতের গল্পে শুকুর প্রতিবিম্ব পড়ার ব্যাপার নেই, শুকুর কোন কথা বলত। (গল্পটির এক রূপান্তরে শুকুর হল রাণীর পোষা তুকুরের নাম। তার কথা বলা অসম্ভব নয়।) রবীন্দ্রনাথ শুকুরকে কথা না বলিয়ে কাহিনীকে আরও সুসঙ্গত করেছেন। সেই সূত্রে বিম্ববতী—এই নামকরণ নামটিও পেয়েছেন। নামটি—দুজনকেই খাটে। মেয়েটির পক্ষে 'বিম্ব' মানে প্রতিবিম্ব, রাণীর পক্ষে 'বিম্ব' মানে শুকুর। অর্থাৎ মেয়েটির পক্ষে যার প্রতিবিম্ব পড়ে, রাণীর পক্ষে সে শুকুরের অধিকারিণী। ছিতের গল্পে নাম তুমারের সাদা এক টুকরো (Schneewittchen, ইং Schneewitchen)।

ছিতের গল্পের পরিসমাপ্তি টিউটনিক রূপকথায় অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিসমাপ্তি অত্যন্ত সুসঙ্গত। আছাড়ি ফেলিল ভূমে রাজপুত্র বলে, তাহলে না ছিল রাজ-বংশে। ভূমিতলে চাহিতে পড়িল রাণী, টুটি গেল প্রাণ— সর্বনাশে হীরকমণি আঁধির সমান লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তার পাশে কনকচম্পকে দুটি হাসিমুখ হাসে। বিম্ববতী রাজিকার সতীনের ছেলে ধরাতলে দুজনারি সে সকলের ছেলে।।

শেষে দুয়ো-রাণীর মৃত্যু দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মূল গল্পের সমাপ্তির কথা-বলার ইঙ্গিত করেছেন।

মনমধুচন্দ্রিকা ৬·৫০ ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কথা চরিত মানস ৬·০০ ॥ বিমল মিত্র

কাশীনাথ ৬·০০ মেজদিদি ৬·০০ ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লৌহকপাট ৫ম ৬·০০ ॥ জরাসন্ধ

সমুদ্রের চূড়া ৭·০০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র

জেনানা ফাটক ৬·৫০ ॥ রাণী চন্দ

প্রথম কদম ফুল ১২·০০ ॥ নীলকণ্ঠ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা ১৫·০০

দিগ্‌ভ্রান্ত ১·০০ সতীনাথ-বিচিত্রা ৮·৫০ ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী

অগ্নিসাক্ষী ৪·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল

যে কথা বলা হয়নি ৬·০০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বলাকার মন ৬·০০ ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাদেবতা ৬·০০ বিচারক ৩·০০ ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অযাত্রার জয়যাত্রা ৪·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গল্প লেখা হল না ২·০০ নায়ক্ষেত্র ৭·০০ ॥ জরাসন্ধ

শ্রীমতী কাফে ৭·০০ আলোর ঘন্টা ৩·৫০ ॥ সমরেশ বসু

কম্পতি ৫·০০ জয়জয়ন্তী ৪·০০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী

মনুরকণ্ঠী ৪·০০ চতুরঙ্গ ৫·০০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

পুতুল নাচের ইতিকথা ৭·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২য় খণ্ড ৫·০০ সে ও আমি ৩·০০ ॥ বনফুল

তারার আলোয় প্রদীপখানি ৬·৫০ ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তী

॥ সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ॥ নবপর্যায় সংখ্যা

কালিওবলম

সম্পাদক—গোপাল ভৌমিক

এই সংখ্যায় লেখকসূচী ॥ ডঃ অমিয় বিহারী মজুমদার ॥ প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ সুভাষচন্দ্র সরকার ॥ পরিমল গোস্বামী ॥ পুলিনবিহারী সেন ॥ অমলেন্দু ॥ নেপালরায় গুপ্ত ॥ বিমল মিত্র ॥ প্রফুল্ল গুপ্ত ॥ প্রভাকর মাঝি ॥ গোপাল ভৌমিক ॥ রবী মুখোপাধ্যায় ॥ সুবোধ-কুমার চিরন্তনী ইত্যাদি।

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

বাংলা ছোটগল্প

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস কতোদিনের, পণ্ডিতেরা তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক করুন। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, ছোটগল্প ওরোপিয়ের পরনো কতোদিন আগে তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা, দোষ দেওয়া শক্ত। কারণ মনে করে দেখুন, ভরতমুনিপ্রণীত সেই শ্লোক, এভারেস্ট বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়—ওরেরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, সন্দেশ খাবে, মৌরলা মাছ, খিরভোগ দিচ্ছে, পুণ্যবান যাচ্ছে—এই নেহাতেই বাঙালী পরিবেশের মধ্যেই একটি গল্পের রীতি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। কিন্তু এভাবে কষ্টকল্পনার পথে না গিয়েও বলা যায়, বাংলার নিজস্ব ভিন্নিস রূপকথা আর লোককাহিনীগুলি সুস্পষ্টভাবেই এক-একটি ছোটগল্প।

যে যাই হোক, আধুনিককালে বাংলা ছোটগল্পের গোড়াপত্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। আর শুধু তাই নয়, ছোটগল্পকে তিনি সিদ্ধির পথেও বহুদূর পর্যন্তই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে ছোটগল্পের আঙিনায় পরবর্তীকালে একে একে দেখা দেন শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী এবং আরো কতো দিকপাল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পর ছোটগল্পের রাজ্যে দেখা দেয় একটা হাওয়া-বদলের লক্ষণ। তাতে একদিকে ঘটল যেমন বিষয়বস্তুর বিস্তার, অন্যদিকে দেখা দিল আঙ্গিকের পরিবর্তন। আর মনোভাবের দিক থেকেও দেখা দিল রুক্ষতা-মাধুর্য, হতাশা-আশাবাদ, রোমান্টিকতা-বাস্তবতার বহু বিচিত্র বিন্যাস। বাংলা গল্প চলে ত্রিরিঙের ঘুরে এসে হয়ে উঠল পৃথিবীর আজ যে কোনো দেশের গল্পসাহিত্যের সমকক্ষ।

ছোটাবুটি বাংলা ছোটগল্পের সেই ঐশ্বর্যকেই সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ সংকলনে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর্যন্ত সময়টিই আমাদের গল্পনির্বাচনের সীমারেখা। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে সংকলনের আয়তন যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হয়েছে। আর তাই পঁচিশটি গল্পের মধ্যেই শেষ করতে হয়েছে আমাদের নির্বাচনের কাজ। বলাই বাহুল্য, এ সংকলনে যাঁদের গল্প স্থান-ভাবের জন্যে সংগ্রহ করা গেল না তাঁদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে অক্ষুণ্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের দ্বিতীয় একটি সংকলন প্রকাশের সুযোগ ঘটলে তাঁদের এবং বিশেষ করে নতুন কালের কথাশিল্পীদের ছোটগল্প সংগ্রহ করাই হবে আমাদের আনন্দজনক দায়িত্ব।

বর্তমান সংকলনে গল্পকারদের জন্মকাল ধরে সময়ানুক্রমিকভাবেই গল্পগুলি সাজাবার চেষ্টা করেছি আমরা। কিন্তু সময়মতো লেখা সংগ্রহ না করতে পারায় কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে।

বাংলা ছোটগল্পের মান প্রতিদিন নতুন দিগন্তের অভিমুখে উন্নীত হোক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগোষ্ঠী হিসেবে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

কলঙ্কিত সম্পর্ক

জগদীশ গুপ্ত

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর পরে কাজ সন্ধানে আবার কাঁচড়া ফিরলো।

মাস্টারটি এতদিন কোথায় ছিল তাহার হিসাব দিতে হইলে মহাভারতের মতো একটা বিরাট ব্যাপার হইয়া পড়ে।

কোন দূরে বার অঞ্চলে কি কোন রাজার সঙ্গে বহুদিন ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় কাটাইয়াছিল, তাহা লইয়া কৌতূহল প্রকাশ করিবার কাহারো তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। বহু বিচিত্র ছিল কি মনোরম ছিল তাহার কোন কথা—কোথায় কখনো টাকাই দেয় নাই, বেতনের দুই একটি মাস, বড়জোর এক বছরের বেশী এক স্থানে থাকে নাই। স্কুলের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে ছিল কবিরাজী, তাহার পর বহুদিন নানা রকম ব্যবসা করিয়াছে। এখন এই কাঁচড়াবেড়ুতে আসিয়া সবাই বলে মাস্টারমশাই।

কিন্তু কিসের ইংরাজীর শিক্ষক এই আশ্চর্য কোথায় নাকি বহুদিন ছিল তাহাকে—সরকারী কোন স্কুলে, সেই স্কুল এবং বহুদিনের ব্যবধানে কোনটির খুঁজিয়া পায় নাই।

বহু ছেলে কিন্তু বহুভাগ্য মাস্টার এখন পঞ্চপ্রাহরণধারী কৃষ্ণ এই বহুভাগ্য গ্রামে অন্তত দুইজনের চিন্ত এক করে। কিন্তু বহুভাগ্যের এই ছেলে নাম ছেলে—তেমন কিছু নয়। যার মন-বোঝাবুঝি কোনদিন হবে, বলিয়া কহিয়া প্রস্তুত করিতে সময়ের প্রয়োজন হবে একজনের ছেলেরা, আর্থিক-সামাজিক হিসাবে কোন কাহের ছিদামী কাহের ছেলে কিনে, মুদির, মুচি, মুদ্রা, পাশির ছেলে, মুসলমান কৃষক, নিরক্ষরের আর মানের ব্যবসায়ের সামান্য সাহেব বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আর নানান গড়নের বিচিত্র ছিন্নভিন্ন—বালক-বালিকার আর গার্হস্থ্যের লোভনীয়। এরা ছেলে যা তাহারই ছেলে পরের পাড়িতে, ছেলে নিজের জামায় কি পিঠে চাপড়াইয়া লইয়া আসে, আর দুই টানাইয়া বসিয়া যায়। কিন্তু সমাবেশটা ভিতরে বেশী।

রোজাদারের বিদ্রূপের প্রকৃত অর্থ উচ্চ-শিক্ষা বলিয়া, তার সম্বন্ধেই নাস্তিকের ভার থাকিতে চায়, চরমের লক্ষিত অভিব্যক্তিশালা—গান্ধী-বৈষ্ণবের বিদ্রূপ আর ছোকরার স্বপ্ন।

সারা দুপুরটাই মস্ত বড় আমের আলাইয়ের পাইয়ে মুদু, হইয়া গেল। অসাধ্য কেন কাঁচড়াবেড়ু ছোট বাজারে বসিয়া গেছে কিন্তু ছাপের বিদ্যুতের সহিত এর কিনাকী আজ্ঞাস্থান—কাঁচড়াবেড় বহুদিন এর প্রাণ বৃদ্ধিতে ঘোরের পরিবর্ত ছোকরে এরোপ্লেনে সম্প্রতি বেড়ে দিয়া সেছে সম্পূর্ণ সাহেবের ছো বহুই নাই।

কাঁচড়াবেড়ুর আসল জমের ছোট ঘরিয়েছে ছেলেদেরই সবাই নাই বাইরে গাছের ছায়ার স্কুলে স্থানে বৈকেলিকালের একটা বাঁধা আড্ডা—চাঁদাতে ফোনো কাজ নাই সবল চাঁদাতের ছেলেন। চাঁদাকে সেই চে কাঁচড়া আসল বাঁধিয়া বড়ভাইয়ে চাক দিয়ে কাঁধে পড়িয়েছে—গাছাড়াবার প্রথম পাইবে এর পূর্ণ ছাড়ার হয় নাই। ছেলে এইবারে বৈকেলিকালের ঐ আড্ডাটি সাহায্য মুদুরে আলাদী বহু অনাবিষ্কার হইয়া উঠিবে। আসল হয়ে ন পাইবে আছে চাঁদাবা সবাই ছেলে চুলের সে ফোটোগ্রাফের কে যে মুদুরে, বেড়াইবেড়ে। দু পাঁচজন আসে সে আর দুটিজন ছাড়া বসিয়া আসে দুই কাঁচড়া কিছুই কাঁচড়াইবে চাঁদাবে আসে চাঁদাবা আছে। এরপর ছেলে ছেলে আসে। এরপর ছেলে ছেলে আসে। এরপর ছেলে ছেলে আস

সেদিনের দৃশ্য কেবল দুঃখের, আজ এই সন্ধ্যা—

রাখালের মনে হইতে লাগিল, রাজেখানে কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সে দুঃখ কাঁদিয়াছে, নিঃশব্দটি সেদ করিয়া ফেলা হয় নাই, বুকে ফেন নিঃশব্দের ভারে দুঃখই হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে কেন বয়স আসিয়া গেল। সাঁঝের আগে ফেন আছে—সবাই রাতের আগম, কেহ আছে, কেহ যা, কেহ আছে কিন্তু। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাকালীন সাঁঝেরও রাখালের মধ্যে হইয়াছে, সবার অপেক্ষার সঙ্গে তাহারই নিজস্বতা সেন সকলের চেয়ে বেশী—সেই বোধ করিয়া কল্পনা সে সহ্য: সাঁঝের হইতে আসিয়া আমার ফেন কেহটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অন্ধকার করিয়াছে কেহ সন্ধ্যা ঘোর হয় আর দুঃখিনী বলে নাই, শুধু একটা তাহার আবিষ্কারের সম্বন্ধটা চলিতে ফেন তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছে; একটি স্থানে সে সর্বস্ব, সর্বত্রগামী, সমস্ত আছে; সে তাহার সারা দুঃখিত মাঝার, একটি শুধু পরিমাণ আসার জন্য উদাস, আর বাকি সকল সন্ধ্যা না করিয়া আছে পরিত্যক্তা সমস্তুকার মতো এক হইতে করিয়া টানিয়া দিনাইয়া আসার করিয়া আইবে—ইহা ফেন রাত্রের চৈতন্যের মতো ফেন সমস্ত ফেমনি অকৃষ্ট মাত্রার।

কিন্তু সে আজো সে দেখাইতে পারে নাই; সকলের অনেকটি লোকের কাছে এই অন্ধকার লক্ষার তাহার মধ্যে ছোট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ী ননদের আড়ালে-ইশিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধু সে-ই, জীবনের সুখদা সে-ই, সৌভাগ্য স্ত্রী-সৌভাগ্য সন্ধান একমাত্র তাহারই হাতে, সবাই সেই মত; সাঁঝের বাঁহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জানে, আছে ভিন্নমতের, একটি অন্তর দুইটি অন্তরকে আসিয়া করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অন্তরঙ্গ স্থানটি একপক্ষে আসিয়া নিয়া নিশ্চিন্ত হইতে আরো যায় নাই; কেহ ইতস্তত সন্দেহ করে নাই; শাশুড়ী যেন পরিষ্কার পাইয়াছিলেন: তাহার আশিতেই যেন একটা অপরাজের অপরিহার্য আসবাবনী—তাহাকে লক্ষন করিবার উপায় নাই। কিন্তু আজ সে পরাস্ত—আসল মনে দুঃখের সুযোগ হইয়াছে: সে ভাবে এত তুচ্ছ অপরাধ পুরুষদের যে, তাহার থাকা না-থাকার একই মূল্য। সুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সে ত সাঁঝের সকলে হইয়া বাঁচিয়াছে পারিতেছে না। তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র: স্বামীর সন্তার মধ্যে যে জীবন্ত পৃথিবী চলিতেছে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের তাহার স্বামীকেই বন্ধন করিয়া, স্বামীকেই বন্ধনমুক্ত পাইয়া সে চারিদিকের আকাশতলে ঝুলিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই এই।

এই পরিচয় চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন ঐ হইয়া গেল—পৃথিবী তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে দুঁড়িল, সেখানে সে কখনো অন্তিত্বের ছিল বলিয়াই সে মনে ছিল, অস্তিত্বের ছিল, একটি বর চৈতন্যের পরশ না পাইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া ছিলাম বিশ্বের একাকার হইয়া তাহার সেই পৃথিবী হয়ছাড়া মনের সমস্ত দুঃখসঞ্চিত হইয়া গেল.....

স্বামী ফেলে ফেলেন—

সে কুল রাত্রিকার রাত্রিজাগরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড আঘাতে সে একাইয়া পড়িল, যে আকাশ আলোর জ্বালা, সেখানে রেই, বাহুর কল্পনা দিয়া সন্ধানে ছিল, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল; আকাশ ঘন শব্দ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্মিত যে নীড় আশা ছিল তাহার চিহ্নও রহিল না; রাত্রিদের নিত্য আলোকময় বন্ধ হইয়া গেল, আলোর বুকের মধ্যের ভিত্র হইয়া উঠিল; যে পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে পথে সুধা করিত, সকল বিশ্বের সমস্ত পথ মুখ হইয়া আলোর শূন্যে তাহার আর কোন সম্পর্ক রহিল না.....

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির আগে লইতে কেহ বুক বড়াইয়া আসিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা বি-বি যব তাহাদেরই পুরুষেন্দ্র হইতে উঁচিত হইয়া ঘরাইতে ঘরাইতে যেখানে সত্য সত্যই আকাশ স্পর্শ করিতেছে, সেই মেঘতল প্রান্তরেরা সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গেছে—জীব-জগৎ নিহারিয়া আনে আলোড়ন দিয়া বসিয়া আছে.....এই পৃথিবীর সমস্ত অন্তর পুরুষের আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুকে ঝুঁকিয়া অন্ধ হইয়া রহিল—আজিও তেমনি সঙ্গে আছি বলিয়া আর স্পষ্ট করিয়া লইতে কেহ আসিল না।

স্বামীর অপরাধ পুরুষের, এত যে, তাহার কিন্তুতেই সহ্য হয় না; মনুষ্য কোনকিছু তাহা সহ্য করিতে পারে না—অন্তরের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই; ওপাশের রাত যায় বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই—এ জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই। স্বামী এমনি অভিশপ্তকালীন অপরাধ করিয়া ফেলে নিয়াছিলেন; ঘরিয়া পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। কাল ৭ই। সুরের অন্ত সবাই উৎকণ্ঠিত, ফুরাইটি পরস্ত: বিশ্বের আসিয়া থাকিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।—সেই ক্লান্তির মধ্যেই যেন তাহাদের সন্ধ্যাবোধের সুবাধি হইয়াছে: তাহাদের মনে নাই, কি কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই। কিন্তু কেমনিন এমনভাবে না থাকিলেই যেন ভাল হইত

রাত্রি তখন গভীর।

রাত্রে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার তাকাইল সে আকিল.....এত বড় আকাশের মেঘলে যে জোড়ে-ঝিলমিলি ছিল, মেঘের মাত্র তাহাদের তাহা একেবারে ঝিলমিল হইয়া গেছে: আই আই অন্তহীন বিশ্বের নুয়ের পৃথিবী ঘুমিয়া গেছে; তাহার আর বাঁহিরেরা না—কাহারো আর কাঁদিবে লাগিল.....

কালের অন্ধকারের এমনভাবে কাঁদিয়া কাহারা যেন সন্ধানে হয় হইয়াছে—তাহার তাহাদের হারানো হয়; পৃথিবীতে: তাহাদের হাতের সঙ্গ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মনে শব্দ নাই—কেবল হয় শুধু হারানো কাঁদিতেছে.....

রাত্রাদের নিশ্চয় অবিশ্রান্ত সন্ধ্যাবায়ে আবর্ত-কেন্দ্র হইতে ঘেরে ছুটিতেছে—এমন মৌন তাহার পর অন্তহীনমুখী হলাহল উদ্ঘাটিত হইতেছে...সেই অন্তহীনের হলাহলের পর হাতে লইয়া কে যেন অন্তর হইতে লাগিল; কালোর মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ তেমনি বড় তেমনি সুন্দর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। অন্তরে হইতে কালোর স্তরে স্তরে ঢেউগুলি ঢেউগুলি ছুটে অগ্রসর হইতেছে—তাহার পরিত্রাণ বিরাম নাই; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিতেই— শেষের শেষ নাই.....

তবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তাহার হাতে দিবে। বুক তা দোলাল সর্বাঙ্গ উঠিয়াছিল—সে উঠিলে নাস্তিনাই ভিতরকার কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই ভিতরের মুখ'আসিয়া সমস্তমন্ত্র আসিয়া আসিয়া দিয়ে দেখিল, মাথা মুছিয়া হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ী ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। আজ একটি ছেলে আসিয়ে যে। আজ ৭ই। দোলাল দু' মিনিটে ভিজে মাথার জল তুলিয়া ফেলিল; কিন্তু মাথার মুখে হাত দিয়া আঁকড়ে লাগিল, কালীরা? কালীরা?

শাশুড়ীর মনে সন্ধীন সন্ধ্যার আকাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া কিরিয়া গেল। সে নাম কিন্তুকে সকাইয়া দিয়া রাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল, বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই রাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে পড়িতে পারিল না যে, যে কুমারটি মনে পড়িতেছে সে কুমারটি সত্যই দেখিয়াছিল, কি সত্যই কল্পিয়াছিল! বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা কেমন আছ? কিন্তু রাখনের মন ছিল কুমারীমনস্কান্ত—সব পরিষ্কার করিয়া উত্তর দিতে তাহার দেরি হইল। বিরাজ আবার ঐ প্রশ্নই করিলেন, কিন্তু রাখন কিন্তু বলিবার পূর্বেই সন্ধীন আসিয়া আসিল—

বিরাজ বলিলেন—তোমার মাথায়?

শাশুড়ী জানতে পারি না.....

—না।

সন্ধীন জিজ্ঞাসা করিল,—বউমা উঠে কে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কি করে?

'—মাই ও ওকে পড়েছিল। খুবই আশ্চর্যের, ভুলই আছে। তখন সাতকড়িকে আসিতে দেখিয়া পূর্বে বউমাকের জন্য উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

—বউ বলিয়া সন্ধীন পাশির হইয়া গেল। বউকে আসিবার সময়ের সাথে ছিল কিনা কে জানে; কিন্তু এখন এখন, যেন

অমিতাভের মতো, দূরে তাকিয়ে কাকিমা সে সংকোচ রেখে কাকিমা সাধারণ-তাহারই নিবারণকরণে বিরাজ এবং তাহার বড় ছেলে সতীন সমরেশকে সতীনের ডাকিয়া এই, ছেলে। কাকিমা—সতীন আসিয়া এইরা তাহাকে আনিতে গেল। ডাকিয়া ও বড় বউ তখন মাকালকে লইয়া পড়িলেন—

—তখন করেছে? মাকাল নিজীবের মতো বসিয়াছিল; বলিল, না।

—তবে, তবে পেরেছিলে?

—না।

—তবে?

মাকাল বলিল—চাকরির কথা হল না; বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন কেউ কয়েক জন সাড়ে দেখি—জানিনে। বলিল মাকাল উঠিল। কিন্তু তখন ঘরের আলো ধরিয়া প্রবেশে লাফাইতে লাগিল। অনেক বেলায় সতীন ফিরিল, কিন্তু একা। ছোটবউকে দেখিতে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ ফেলিতে দিবিধা হইয়া পড়িতে অমন প্রতীক্ষায় করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীনকে এবং ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—বউ কই?

সতীন ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—সে এল না।

—এল না? কেন? কেন? এতদিন পরেও প্রাপ্তি আসল হয় নাই—অনিবার্য বিলম্ব সহিতেছিলেন; কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতে হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা চোখের জলে চাহে। বিরাজের মুখ কালিমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

সতীন বলিল—চলো ভিতরে, বলছি। ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাকে আনতে পাঠালিনে কেন? কোথায় গেল সে?

—কি জানি কোথায় গেল! ছেলেরা বাইরে এসে সে বলল, একটু দাঁড়াও, আসি আসছি। কিন্তু সে কি কাজে গেল জানিনে। পর্যন্ত বসিয়া অপেক্ষা করিয়া অবশেষে—

সতীন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কি দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা সতীন বলিল না; বোধ হয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে একটা, বিরাট বোঝা করিবার পাছে কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন সে হয়তো শুনিতে এসে আবার না দেখতে পেয়ে আমাদের চলে গেছে!

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সতীনের নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিল সে জল নিঃশেষ হইল না। তিনি চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিশ্বাসও বাহিরে লাগিল...কিন্তু মনের সকল দুঃখ আর অভিমানের উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল এই বেলাটাই যে, যে পরে সন্ধের পরিবর্তে প্রভাত মুহূর্তের সম্মুখে তাহাকে সমাধের এমন করিয়া পাকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় ভরাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কোথায়? এই ছোটর জন্য সর্বকর্মের এবং সর্বপ্রেমের অন্বেষণের অন্তরালে — জননীর মনের অতল কালিমা লেপন। চায়, অন্ধ।

বিরাজের একবার ছোট দুঃখিতার মতো মনে হইল,—পথ চেয়ে আছে, কথাই না, দিনের আলোয় মানুষের সমক্ষে কিছু প্রকাশ উপায় তাহি নাই। তিনি আসনের সন্ধান পড়।

সুনিতা বিরাজের সেও ভাবিল। তিনিও ঘরে আগন্তুক লক্ষ্য করিতেছিলেন, ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীক্ষ্ণতর চক্ষে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন ইহা তোমার মনে-গোড়ামি, আর কারো আসা আসতে হবে না। তোমার দুঃখ নিয়ে পড়বে। • প্রথম বিয়ে-দুঃখ করে ছেলে না তুমি, দুঃখ তখন বিয়ে করে ছেলের সময়ে হেড়ে পারে না মুখে চাহে তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, আমরা তোমাকে সুখেরেন। সন্ধানের সাহসে—

কিন্তু সকল হইতে পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বিরাজ বাহ, বলিতেছিলেন তাহার বাহি আসিতে ফিরে ইয়া লইলেন—সেই কথাটাই অন্তরে শুনিলেন এবং অন্তরে সহসাই বলিয়া ফিলেন,—হাও, কিন্তু সাবধান।

একটা মিনিট হইতেই সতীন কথা বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—কি মা?

শ্রেষ্ঠেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

মধ্যযুগের নতুন আবিষ্কারগুলির মধ্যে রহস্য বিস্ময়ে রূপকথাকেও হার মানিয়েছে উত্তুঙ্গ পার্বত্য মালভূমির বিচিত্র এক রাজ্য, বর্তমান কালে পেরু যার নাম। এই পেরু-বিজয়ের প্রায় অবিশ্বাস্য ইতিহাসকে আশ্রয় করে ত্রিভুবন-বিমোহন শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে

সূর্য কাঁদলে সোনা

ঘনশ্যাম রসাল রঙীন উদাও কল্পনা এমন এক পরমাশ্চর্য মহা-গদ্যগাথা রচনা করেছে—বিচিত্র বিরল স্বাদের অভিনবত্বে দেশ-বিদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে যা তুলনা রহিত।

ইতিহাসের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়—সাতরঙা কাহিনীর মহোৎসব হয়ে উঠেছে। সামনের থেকে পিছনের মলাট পর্যন্ত এক অফুরন্ত আহারনিদ্রা-ভোলানো আনন্দ-ভোজ। রবীন্দ্র জন্মদিনে বেরুল। ১৫·০০।

বনফুল বসুর রাজনৈতিক সর্বকালের উপন্যাস

একালের কথা—তবু এ উপন্যাস ঐতিহাসিকও বটে। এক-ভারতবর্ষ এবং এক-বাংলা দুটো দেশ হয়ে গেল, তারই তাজ্জব কাহিনী। দুই বাংলার বর্ডার-লাইনের দুই দিকে ঘুরে পারাপারের জন্য যাত্রীরা সব জজরেত হয়েছেন। পরিবেশ : ১৯৬৬-এর

ঈশ্বর কে রুখবে?

খাদ্য আন্দোলন এবং নকশাল নর-মুগয়া। তুলনার আসছে নানা দেশের জ্বলন্ত বিপ্লব-কথা। মাতৃভাষা মুখ থেকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত —পূর্ববাংলার এবং ভারতের শিলচরে বঙ্গভাষার জন্য প্রাণদান। ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব বাংলাকে সর্বনাশের প্রান্তে এনে দাঁড় করাল। কিন্তু উত্তরণের আত্মিক সৌহার্দ্য অক্ষিয়—পথ আমাদের কে রুখবে? সদ্য বেরুল ॥ ১২·০০ ॥

॥ গ্রন্থপ্রকাশ, C/o. বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥

—কই, কলকাতা নিয়ে। [illegible] ছোট বউয়ের আচরণ অর্থাৎ তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করার কথা, বড় ছেলের কথা টানিতে বলিয়া গেলেন, কিন্তু মুখ তুলিয়া মুখে কিছুই পাইলেন না। এই ঘটনাবলীতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল, বলিল, বড়বউকে বলো সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন। [illegible] মুখ নাড়িলেন। বাহির বিষয়ক চোখের জল অতে সবার মুখের গুমোটকে অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁচাইতে বাহির হইল। কিন্তু গদা—অন্যদা ইতর-ভদ্র কোন স্থানেই নিরুপদ্রবের সাক্ষাৎ মিলিল না—কোনরূপে সেদিন সন্ধ্যার মিলিয়ে সে সন্ধানও মিলিল না। এই সুযোগ বিরাজ পাইয়া মইয়া পড়িলেন এবং ধার্মিক মহাশয়ই রহিলেন, তবুও তিনি মুহুর্মুহু ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, মাঝের দরজা দেখিয়া উঁকিঝুঁকির উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিতে লাগিল—তখনি তাঁহার মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার মুখে আজ ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাঝেরই বরাদ্দই।

সন্ধ্যার পর বাহ্য-প্রস্রাবের ছোঁয়াচে ঠকুমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে ঠকুমা? তোমার সিঙ্গেরা কাকা?

বিরাজ বসিয়া যেন নিজের মেয়ে কিম ইতেছিলেন, বলিলেন। তা জানিবে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। নিতু বলিতে লাগিল,—কাকা অনেকদিন বাড়িতে আসেনি, না ঠকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিল এতদিন? আমার জন্যে কি আনবে?

সরল স্নেহান্ধ বালক সোহাগে কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠকুমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বালকের এমনি ধারা লক্ষ্য করিয়া যে নিবৃত্তি আর সে আদর দেখা যায়, বিরাজের প্রসন্নের আনন্দপূর্ণ অন্তরস্তরে তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাহার অন্তরেই মুহূর্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল মাত্র, কিন্তু মনে পড়িল না যে সত্যই বিলুপ্ত। নিতু চুপ করিবার পর খানিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বিরাজ আনমনা হইয়া রহিলেন—

বিরাজ আনমনাই ছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আলমারীর কাছে ঢাকা একটি লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না—সাধু? বসিতে তিনি প্রকৃত সতীশ বাবুর জন্য লাফাইয়া উঠিলেন, সাধু সারে-ধীরে আস্তানা গুটিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই ছোট হইয়া বসিয়া রহিল। নিতু চিৎকার করিয়া সবাকে ডাকি করিতে লাগিল, মা, মা, কাকা এসেছে, মা, কাকা এসেছে, জলদিদা কাকা এসেছে' বলিতে বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল.....

আর বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার শিরায় শিরায় সাধু বাবুর [illegible] তার সবাই একত্র হইয়া সোরগোলে বাড়াইয়া তুলিলেন। সকলকে সে প্রণাম করিল, বউ-দিদিকে প্রণাম করিল, সবার ছোট ছেলেমেয়েকে সে দেখিয়া যায় নাই—এটা আলাপ করে নিল। জিজ্ঞাসা করিয়া সাধু তার হাতের মুঠি আঙুলে তাহার ধরে স্পর্শ করিল।

বালকের বিলেষ কিছু বলিবার ছিল না। "আমার পাঁচু কাঁঠিয়ে রেখে তোমার পালিয়েছিলি?" বিলিতে এই প্রশ্নটি জলদ সম্বন্ধের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঁকিঝুঁকি দিল, কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া করিতে পারিবে বোধ হয় চক্ষুলজ্জায় সেদিন সে নিরুপায় বলিয়া গেল, যাকে সম্মুখে দেখিতে সে কোনো সম্ভাষণও মুখে ফুটাইতে পারিল না।

বউদি তোলাল কেবল জিজ্ঞাসা করিল—ভাল আছ?

সাধু বলিল,—তোমাদের আশীর্বাদে। বলিয়া হাসিল। হাসিটা চকিত ভরা, মনে হইয়া তোলপাড়ের মত আরো খারাপ হইয়া গেল। তাহার ছেলেমেয়ে ছিল—অনেকগুলা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেল।

বিরাজ ছেলেদের অবলোকন করিতেছিলেন; তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, ছেলেদের নাই, ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বড় রোগা হয়ে গেছিস। হেডমাস্টার মেরে ছ?

সাধু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া হাসিল। হাসিয়া বলিল, —না। কিন্তু সে কথা বিলবার, না!

দুনিয়া দারের চোখে জল আসিল—বলিলেন, —তাকে সারাদিন খেটেছিস?

সাধু তাহাদের আসার আজ যা যাইবার সে বিষয়ে এ-বাড়িতে কথা হওয়া সুখের কথা, প্রয়োজনই করে না। কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলিল, কিছুই বাকিমি না।

—কিছুই খাসনি? আ-হা-হা.....আর্তনাদ করিয়া বিরাজ হাসিলেন,—ছোট বউমা, জানো? বলিয়া উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই সাধুর তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি চৌকিতে পাইলেন, ছোট বউ মাঝিবারের দুর্বল বাক্সির মতো জড়সড় হইয়া এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠেকিয়া বসিয়া আছে...

খুবই লজ্জা কথা—এ ঘনাগারটা মুহূর্তে অনুভব করিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন—কত বউমা, রান্না হল? সাধু সারাদিন কিছু খায় নি।

'এই হল মা'—বলিয়া সকলই রাঁধা আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবশেষে রান্নাঘরের আশিষ কাঠি তুলিয়াও রাখেন না, কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল, মুহূর্তকাল ঘনাগারটার নিঃসঙ্গতা কাটিতে তিনি আশিষ কাঠির উপর বিরাজই ছোট বউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন করে বসে থাকো যে? ইতস্তত তাহার বিরাজী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরাজিনী বউয়ের উঁচুর ছিল বলিয়া বিরাজের মনে হইল।

মানুষ কথা কহিল না, হাত ও মাথা মাটির দিকে আরো, ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের সতীশের দিকে ছেড়ে আরাম-সুখ তুমি নেই, বউমা। এখন সময় তুমি আমার জানিও না বলছি। ওঠো।

মানুষ মুখ তুলিল না, বলিল—উঠে কি করব?

—করবে আবার কি? মেজে ধেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের মানুষ তুমি মুখে অমন ঝিম করে থাকতে পারে না —বলিয়া মহা ব্যস্ততার সাধার মতো একটা কাঁচি নিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন।

সাধু ইতোমধ্যে তাহার ছেঁড়া বস্ত্রাদির পরিত্যক্ত পরিত্যাগ করিয়া লইয়াছে। ছেলে তাহার নিত্য ব্যবহারের [illegible] প্রস্তুত করিতে বহুক্ষণ হইতে কাজেই বিরাজ কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাধুর প্রাতঃহারী এবং সুখকর সৌখিন তামাক সাজিয়া তাহার উঁকেও আনাইয়া ঢাকরটুকে কি কারণে কে জানে সে বিদায় করিয়া, তাহাই তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সাধু চাঁদনী তামাক লইয়া টানিতে বসিল। নিতু তার হুঁকার পাশের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ছিলে কাকা এতদিন?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তাহার উত্তরের আশা মিটিল না, খুঁতখুঁতে বালকের সন্তোষ সাধু একটা অসম্পূর্ণ উত্তর পাইয়া না ঠুঁকিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—তোর যে কথার যাদুই কাজ কিনে লক্ষ্মীছাড়া? পালা এখন থেকে। বলিয়া নিতুর মোহাগ মুখ ভালিয়া দিয়া তাহাকে তিনি বাহির করাইয়া দিলেন।

সাধু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্ন এবং তাহার দিয়া মায়ের এই চাপা বিরাজ তাহার মনে মুখাকরের একটা, কিন্তু উপস্থিত হইল না, বলিল—আছা বসুন মা। বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল, কিন্তু নিতুর তখন আর মনে জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাধুকে দেখার ঘরে, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্য ঘরে বিরাজের জন্য সুলোচিতে লাগিলেন, সাধু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল।

আড়ালের ঠাঁই হইল দুই ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সমস্তে বেশী এবং প্রবল। সাধু সতীশের সঙ্গে এস ঘরের সঙ্গেও সাধু আসিয়ে বসিয়া অনেকই নিস্তব্ধতার সঙ্গে সে আলোচনা করিল এবং অকুণ্ঠিতভাবে আর কাঁহা তাহার অভিযোগ করিল যে, কম যাহা হইয়াছে তাহার আরও সে-ই।

সতীশ তাহার বালার দিকে এবং বিরাজ সাধুর মুখের দিকে তাকাইয়া কম সময়ের

তাহার বক্তব্য দুর্নিরেশ—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

রোজনে সাদু হুক-তুলা—কিন্তু আজ তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন—কই, খেলিলে তুমি?

—স্টেটে খেলে তুলসে খেয়ে যা, আ খেয়ে। খেকো না, জ্বলন। আবার বক হবে বলিয়া সাদু অভুক্তদেরকে অন্তর দিয়া খেতে বসিতে লাগিল।

অনেকের মাঝেই আহার সমাপ্ত হইল। সাদু তামাক সাজিয়া লইয়া অন্ধ-কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিল।

মাথায় হাতের মাথা সামনে লইয়া নিস্তেজভাবে বসিয়া রহিল।

সোলাপ ভাতের স্বরে বলিল,—মা.....

মা হাত তাড় মুখে তুলিয়াই মাথা হইতে টানিয়া লইল। সোলাপ সে দিকে একবার বিদ্ধ চক্ষে চাহিয়া দেখিল—আর বলিল না কিছুই।

বহু রোজন করে অত উঠিলে নাকি সদ্যুক্তের নিবাস ওঠে ও তাহার চেষ্টা আসিয়া লাগে। মাথনের মনের কথা সোলাপের অজানা নাই, মাথনের বুকের কোন্ গোপন নিঃশ্বাস বন্ধু চালিত হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিল, ভাই, আমার মাথা খাস.....

মাথন বলিল,—মিনি, আমার বিষ দাও। বড় বড় ছলছল চক্ষে বার দুয়েক তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

ছোট বোনটি কথা কহে না—কাঁদিতে চাহিয়া নিজেকে সংযত করিয়া রহিয়াছে—একবারেই ছোট হইতে বড় হইতে চলা ছোট-বউ ইতিমধ্যে বিদায় নিতেছে।

বড় বউ বলিল—চলো।

ছোট বউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিল,—তুমি বসে রইলে কেন?

রোজনের পর বউমা সারদে আসে, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে। —বলিতে বলিতে তাহার নজরে পড়িয়া গেল সাদুর খাওয়া থালা-বাসন। থালাবাসন তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট তে জলপাত্রে ছোটবউ তাড় নয় আছে দেখিয়া, অর্থাৎ আজীর প্রতি বহুর এই শুদ্ধ প্রকাশে, বহুর প্রতি মাতৃর অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে ক্রোধ ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা তিনি ছোটবউ তুলিলেন না; কঠিনতে কাঁপিতে বলিলেন,—কথা বলছ না যে?

কি কথা তিনি বহুর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু বিরাজ বেন ছিল—তাহাকে নিবিড় করিতেই তিনি তাঁহার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, বহুর মুখের কথায় যদি তাই একটু পায়, কিন্তু মুখোমুখি এই যে, এই কথা লইয়া গলা চড়াইবার উপায় নাই।

॥ প্রেমেন্দ্র ॥ অগ্নিসম্ভব অগ্নিময় ৬·০০

মানিক অগ্নিময় ৬·০০, অগ্নিময় বন্ধু ৫·০০

বিভূতির অগ্নিময় ৫·০০, অগ্নিময় বন্ধু ৮·০০

অগ্নিময় প্রেম ৫·০০, বিজয় বন্ধু ৭·৫০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র ॥ হুতোশী অগ্নিময় ৭·০০

॥ অগ্নিময় চক্রবর্তী ॥ উইচেস ৪·০০ অগ্নিময় অগ্নিময় ৪·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময়ন্ত্র ॥ অগ্নিময় ৬·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র ॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময় ৭·০০

॥ অগ্নিময় অগ্নিময় ॥ অগ্নিময় অগ্নিময় ৪·০০

॥ অগ্নিময় ॥ অগ্নিময়ন্ত্র ১ম ৭·০০ ২য় ৫·৫০ অগ্নিময়ী ৪·৫০ অগ্নিময়ী ৩·০০ ৪র্থ ২·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ ইন্দ্রি-পাতা ৪·৫০ অগ্নিময় ৩·৫০ বিদ্যোৎসব ২·০০ অগ্নিময়ন্ত্রী ২·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রী ৩·৫০ নিমন্ত্রণ ২·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রী ৩·০০

॥ প্রিয়োগালয় অগ্নিময় প্রকাশক ॥ অগ্নিময়-অগ্নি ৫·০০

॥ বিদেশিনী অগ্নিময়ন্ত্র ॥ অগ্নিময় প্রেমে অগ্নিময় ৩·৫০

॥ প্রেমের অগ্নি ॥ অগ্নিময়ন্ত্রী অগ্নিময় ৪·০০ অগ্নিময়ী ৫·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ॥ উপন্যাস ৭·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ কুরুক্ষেত্র ৬·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রী ২·৭৫ অগ্নিময়ন্ত্র ৩·৫০ নিমন্ত্রণ নিশ্চয় ৭·০০

॥ নিমাই অগ্নিময় ॥ অগ্নিময়ন্ত্রীর প্রেমের ৭·৫০ প্রেমের-নিমন্ত্রণ ৪·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ॥ অগ্নি ৩·৫০ বিদ্যুৎ ৪·৫০ নিশ্চিন্ত ৩·৫০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ॥ অগ্নিময়ী ৭·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ॥ অগ্নিময়ের অগ্নিময়ী ২০·০০ অগ্নিময়ী ৪·৫০ প্রেমের-অগ্নি ৩·০০ অগ্নিময় ২য় খণ্ড ১০·০০ অগ্নি-সংসার ৪·০০

॥ প্রেমেন্দ্র অগ্নি ॥ এলো অগ্নিময়ী ৪·৫০

॥ অগ্নিময় বাস ॥ অগ্নিময় ৪·০০

॥ অগ্নিময় ॥ অগ্নিময় ১ম ৭·০০ অগ্নিময় ৩য় ১১·০০ অগ্নিময়ের অগ্নিময়ন্ত্রি ৬·৫০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রাল বাস ॥ অগ্নিময় উইল ৪·৫০ অগ্নিময়ী ৩·৫০

॥ বিভূতিভূষণ অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ উই-অগ্নিময়ন ৭·০০ উপন্যাস ৪·০০ ৩য় ২·৫০ বাসর ৩·৫০

॥ অগ্নিময়ী অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ অগ্নি অগ্নিময় ৭ ১০·০০

॥ অগ্নিময় অগ্নিময় ॥ অগ্নিময় ও অগ্নিময়ী ৪·০০ ইউন অগ্নিময়ের অগ্নিময়ন ২·৫০

॥ অগ্নিময় বাস ॥ অগ্নিময় প্রীতিময় ৫·৫০

॥ অগ্নিময় প্রীতিময় বাস ॥ সমস্ত অগ্নিময়ে ১ম ৭·০০ ২য় ১০·০০

॥ অগ্নিময় বন্ধু ॥ অগ্নিময় অগ্নিময় অগ্নিময় ৫·৫০ অগ্নিময় অগ্নিময় অগ্নিময় ৪·০০ ৫ম বিদ্যুৎপী ৪·০০ ৬ষ্ঠ প্রেমে এলায় ১ম ৪·৫০ ২য় ৩·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রাল ৫৭·০০ অগ্নিময় ২·২৫ অগ্নিময় অগ্নিময় ৮·০০ অগ্নিময় নয় ২·৫০ অগ্নি-অগ্নিময় প্রেমে ৪·৫০ অগ্নিময় ঠিকি ৩·০০ অগ্নি ১ম ৩·০০ অগ্নিময়ন্ত্রের প্রেমে প্রেমে ৮·০০ অগ্নিময় ইউনিয়ন অগ্নিময় অগ্নিময় ৫·০০ অগ্নিময়ে ২·০০ ইউন অগ্নিময় ৪·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রি ৫·০০ অগ্নিময় ৩·৫০

॥ অগ্নিময় অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ অগ্নিময়ন্ত্রীয় অগ্নি ৩·০০ অগ্নিময় প্রেমে অগ্নিময় অগ্নিময়ন্ত্রী অগ্নিময় ৩·৫০ প্রাথমিকিয়ন্ত্রিক ৩·০০

॥ অগ্নিময় অগ্নিময়ী ॥ অগ্নিময়ন ৩·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময় ॥ প্রেমে ৮·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ বিদ্যুৎ প্রেমে ৪·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময়ী ॥ অগ্নি-অগ্নিময় অগ্নিময়ী ৩·৫০ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ২·০০ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময় ৪·০০ অগ্নিময় ৩·৫০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের প্রেমে ॥ অগ্নিময়ে অগ্নিময় ৪·০০

॥ অগ্নিময় বন্ধু ॥ অগ্নিময়ী ১০·০০ অগ্নিময়ন্ত্র ৪·০০ অগ্নিময়ন ৪·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের অগ্নিময়ী ॥ অগ্নিময়ন্ত্র ৪·০০ একজন নিয়া ও অগ্নিময়ন্ত্রের ৩·৫০

॥ অগ্নিময়ন অগ্নিময়ন্ত্রালয় ॥ অগ্নিময়ন্ত্রের ৩·০০ অগ্নিময় ৪·০০

॥ অগ্নিময়ন্ত্রের প্রেমে ॥ অগ্নিময়ন্ত্রী ১ম অগ্নি ৭·০০ ২য় অগ্নি ৬·০০ ৩য় ৬·০০

॥ প্রেমের অগ্নিময়ন্ত্রা অগ্নিময় ॥ অগ্নিময়ন্ত্র ১ম অগ্নি ৩·৫০ ২য় অগ্নি ৪·৫০ অগ্নি-অগ্নিময় ৩·৫০

॥ নৈরেয় অগ্নিময়ন্ত্রা নিয়োগ ॥ অগ্নিময় ৮·৫০

॥ অগ্নিময়ন্ত্র বিদ্যু ॥ বিদ্যোৎসাহের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অমরা মহুর্ত মাত্র অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের আজ যেন পলিয়া পলিয়া মধু ঝিরু হইয়া পড়িতে লাগিল। পরক্ষণে আবার এ যে তাহার হাতে তুমি পড়িয়া তা জানো? আমার হাতে। আমার বাড়িতে কেউ বিপদের পড়বি।'

বলিবার কিছুই ছিল না বলিয়াই মাথন তখনি কিছু বলিল না। পরে বড় অসহায় হইয়া আসিল, বলিল—তুমি যাও মা। আমি একে নিয়ে আসছি।

মাতঙ্গিনী যাইতে বিরাজের আর দ্বিধা ছিল না। পাগলে আমাদের কে কত ক্ষতি করিতে পারে! মনে মনে সেই ক্ষতির একটা হিসাব হিসাবের তিনি চলিয়া আসিলেন।

মধু ধরা পড়িয়া মাখনের হাতে ধরিল। বিরাজের বলিয়া তাহার চীনিতে চীনিতে সারাক্ষণ মনোযোগের মেলার ঘটনাই ছিল। করিতেছিল—সেখানকার ছিল চুরিটারের, আর বুদ্ধিপাশের ঘরের আসিতে ছিল, দৈব বিপাকেই বিদ্ধে, মধুকে ধরা পড়িবার ও কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। সন্দীরা থাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনো দিকেই ত্রুটি হয় নাই—মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পাছ পাছ তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল—ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

চোরাকারবারী দল দুইয়ে মেলার স্থানটা ক্রমে নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কীর্তনের উরুম সুরে চলিতেছে, অধিকারে দেখা কীর্তনওয়ালা আসিয়া দাঁড়িয়া উঠিতেছে—তবু তার বলিবার মতোটি নাই, খোল-বাদকগণ মেলার ভাঙিয়া উঠিতেছে ..

নাই-মন্দিরের ভিতরে একটা ছিটের চালার তলায় মেয়েটি ঢুকিয়াছিল। ইহার প্রবেশ একটা হরিধ্বনিতে চমকিয়া সজাগ হইয়া সে ভেবে করে যাবে হাওয়া আসাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চোরাকারের অবস্থান ভাল বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে ধীরে পথিক মুখে আসিয়া দাঁড়াইল.....

তারপর যা ঘটিল, তা চক্ষের পলকে—মেয়েটির মুখের উপর আপাত চপল পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা লুটাইয়া উঠিয়াবেগে চলিতে লাগিল।

অমৃতে বিস্তৃত বাহিরে—

ভেজা অকেজো ছোট-বড় গাছে আর ছোপ-জঙ্গলে বাঁধিয়া নিস্তব্ধ। কিন্তু বিরাজ এমনি অসহায় যে, গভীর রাতে

ডাঃ ননীগোপাল বসু, এম.বি.,ডি.টি.এম.
এডিনবরা, এম, আর, এস, লণ্ডন এম.আর.এস.
প্রণীত
যৌবনের রহস্য
• যৌন বিজ্ঞানের নূতন ও সরলতম
• যৌন শক্তি অটুট রাখিবার উপায়
• বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন
• সন্তান নিয়ন্ত্রণ
মূল্য—১৫ টাকা

একাকিনীর বাহির হইতে সাহস করিল না। সে ভাবিতেছিল, মাখন ফিরিয়া আসিবে, তাহার সঙ্গে মধুকে লইয়া বাড়ি ফিরিবে। কিন্তু মাখন ফিরিল না। তাহার পরিবর্তে আসিল একটা ভয়ানক সংবাদ।

সংবাদ আসিল; অবশ্য চোখেকোই, অনেকে মাতঙ্গিনী, অবশ্য অর্থবোধ, কত কি বিশৃঙ্খলা কিন্তু চেতনাক ঘটনা সবটুকু এবং স্পষ্ট.....

তারপর সুদীর্ঘ সময় অকারণ; দেহের শক্তি যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিঃসাড়ের মতো পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে।

সুদীর্ঘ পরিক্রম সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতু কিন্তু নিঃশ্বাস পরিল না—মেয়েটির মধ্যে-খানা তাহার মনে পড়িল—মন্দিরাভ্যন্তর, কপালের উপর ঊর্ণাকর ফোটা, শ্যামলা অতি সুন্দর, ছোট দুটি সোনা হাত—সেখানেই তা দেখা যায়। বেলায় একা আসিয়াছিল, না সঙ্গী-সাথী কেহ ছিল কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন আছে কি বলা, তাই বা কে জানে!

সাতু উঠাই ভাবিয়া বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মাখন আসিয়াছে—সে আসে দেখিল বহু, তবু মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর.....

বলিল—এতক্ষণে দেখা দিলে। এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষ-মানা কি মনোমুগ্ধ মেয়েটির মতো সে সাড় সহজে না হইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইয়া দাঁড়াইল আর সোহাগপূর্ণ সম্ভাষণ সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সুর না থাকিয়া পারে নাই; কিন্তু প্রাণের ভাবে ভাবে যোগের ছোঁয়া প্রবেশ করিয়াছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসক্ত স্থিতিস্থি একটা কোমলতা ভঙ্গিয়াছিল—মাঝে মাঝে তাহা ফুটিত, তার উপর, কোথায় ওরাছে সন্তপানি এজন লালক বলিয়া আছেন—টানিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ একটা স্থানে ছোঁয়া মিলাইয়া দিয়া-ছিলেন—মাখন তা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে চিনিবার দিকে এমন ঊর্ণ আর সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা বেশ কঠিন, চিনিতে পারিবার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের ছোঁয়া, দুঃখের ছোঁয়া, তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিলিত হইলেও এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেমের ছিল, অভিমান বোধ ছিল, তবে তার আছি বলিয়া নিজের একটা অনুভূতি ছিল—

সব সত্ত্বে হইয়া মেয়ে—মহুর্তের উত্তপ্ত সুরের উপর নিশীতের জলবিন্দুর মতো সে এত বড় ইতিহাসের ঘোলার ঘটিয়া আছে ঘটে অনুপা হইয়া গেছে, তাহার চৈতন্য নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া থাকিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না—সে বুঝিল না যে, দু জনেই মানুষ হইলেও তাহাদের জন্য বিভিন্ন ছোঁয়া অপরিচিত জগতের অন-ভাস্ত আত্মা যেন এই জগতের অন্ধকার ক'রে বন্দী হইয়া আসিয়াছে—দুয়ারের দিকে দৃষ্টি এই দৃষ্টি বিহঙ্গীবিকার সন্ধানে দৃষ্টিহীনের বিহ্বল দৃষ্টি—নিরাশ আর্ত-নাদ.....

সাতু হাসিতে চাহিল, বলিল—বড়ই অভিমান যে! জানি, তা আসা হচ্ছে না। তা দেখলাম বিস্তর। সেও হয়েছে, এস এখন, না আমাদেই উঠতে হবে।'

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার চোখ গিলিল—তাহার মুখে মতলব করিয়া সবাপ্ত রহস্য ঘন হইয়া ঘনাইতেছে.....

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ। বলিয়া বিরক্তি আর ক্লেশ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল।

মাখন কেবল নড়িয়া নড়িয়া বসিতে লাগিল—কোথাও সে যাইতে চায় সে জন তাহার নাই, যাইবার স্থানও নাই, তবু নিজেকে আকৃষ্ট নড়িয়া তুলিয়া সে যেমন নড়িয়া চোখের আড়িবে যে জগৎ উপরে পড়িয়াছে, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়াছে—তাহার মূলে অবাধ কেবল হুকের উপর পদক্ষেপের কঠিন ধ্বনি অনুভব করিতেছে। বেড়ালের লাফে ঘরের ভিতর চাবড়া কাটিয়া গেল।

সাতু অবাক হইয়া আসিয়াছে—তাহার কথাটা আসিয়া মাখনের সর্বশরীরে যেন বিষাক্ত ছুরির মতো বিদ্ধ হইতে লাগিল...

কিন্তু দেহ সংকোচনের অবকাশ তার নাই—পর মুহূর্তেই তার সঙ্কুচিত আকৃষ্ট সর্বাঙ্গের দেহ মুখ বাহু বাহিরের দিকে নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিল—সর্বজ্ঞেকরণ বিদ্যুতের আঘাতে জড়ীভূত হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল.....

সাতু তাহা দেখিল—এমন ব্যাপার সে দেখিবে ঊনার নাই; কিন্তু সাতু তাহা গ্রহ্য করিল না; তা করিবার মতো মন তাহার হইলে সে ফেলে যাইত না। বলিল, মুখে আসতে তুলে নিলেম, এখনো কথা আছে না? আমি করে চাইলে কি হবে। আসুক—

বলিতে বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থামিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসহায়—তাহার উপমা যেন খুঁজে আকাশে নয়, তাহার উপরে সবাপ্তকেই ছিন্নু। সাতু বড়ই লজ্জিত হইল, আর এখানে-সেখানে সে বড়ই ভুল করেছে, এবারে সে ভুল করিল না, আর তর পাইল; হাসিয়া আসিয়া বলিল, রাগের নাকি?

মাখন বলিল,—আমার ছুঁও না।'

—যদি ছুঁই?

মুনিয়া সাতুর মুখ ভাসিয়া উঠিল—নিজের হাতে হাতেখাই খড়ে বলিয়াই

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, চৌদ্দ এক-খানা ছোট চাহার ছবি বা হাতে আছে—অউলে ২ টাকা আছে।

সাধু জিজ্ঞেস: তাকওয়ে সালাইবার মতো কাগজ ছুটিয়া কইয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল,—মা?

বিরাজ অবশ্য তখন আসিয়াই ছিলেন—এক মাথেই সাড়া দিয়া ছেলের আকুল কণ্ঠ কানে যাইতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"কি রে? কি হল রে?" বলিয়া উৎকণ্ঠার প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাধু বলিল,—বউকে বের করে আনো ও-ঘরে আমি যাব না। মারবে বলছে।

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন। মারবে বলেছে?

—তা পারে। ওর জামাপড়-চোপড় ফেড়ে দেখ—ছুরি ছোরা বোধ হয় ওর কাছে আছে।

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বহু কষ্টে দীর্ঘদিন তাঁহার অভিযানে, উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া পড়িয়া আবহাম কর কর করিয়া কাঁপিতেছে, হাত পা হিম হইয়া গেছে। ছেলের কুশল লাভ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই ভাল লাগে নাই, তাহার উপর এই বন্ধুটি স্নিগ্ধের ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরাজিতে আর বন্ধুর অস্বাভাবিক একদৃষ্টে আচরণে ছেলের ছেলে তাঁহার বহু তখনো কাটিতেছিল...

একটি ছুরি লইয়া সেই বন্ধু তাহার পেটের ভুঁড়ি করিতে উঠিতেছে, আত্মরক্ষা এই অবস্থা পাইয়া তাঁর মাথার হয়ে পর্যন্ত আসুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল—

"কই?" বলিয়াই যখন তিনি বন্ধুর উদ্দেশে যাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ —হিতাহিত জ্ঞান-জ্ঞানের বুদ্ধিবার হুঁশ পেয়ে পাইয়া গেছে.....

ছেলে পড়িল, বন্ধু কোলে দাঁড়াইয়া আছে। কোলে করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাহার চোখে পড়িল না, চোর-দুটির ভয়ও তিনি করিলেন না, লাফাইয়া বাইরে তাহার সম্মুখে পড়িলেন, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে ঘর হইতে আনিলেন, উঠানে আনাইলেন, উঠান পার করিলেন, বন্ধুর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার দিকে ঠেলিয়া দিলেন—

বলিলেন—যা চলে যা! বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তারপর পর দিল খটিটা দিয়া পাঁচাইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উঠানে সতীশের কানে সেল ছিলের ঝগড়া, জিজ্ঞাসা করিল—সদর দরজা কে বন্ধ করেছে?

সাধু উত্তর করিল,—মা, তারপর অত্যন্ত সংকোচভরে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিল, ছেলেই আমার ছিল ভালো।

১। অতীন বন্দ্যো ২ বহুমাসন্দরী ফাদার বন্দনায় ৪·০০, লোকরহস্যের ফাদার ফাদার ৪·০০

৩। অমিতাভ চৌধুরী ১ বর্ষানিকা কল্পনায় ৮·০০, অন্তরা শহর কলকাতা ৩·০০

৪। অমিয় ভট্টোপাধ্যায় ১ নীল পরিবার ৬·০০

৫। অমলেন্দু ১ পাপ ৪·৫০

৬। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১ ছুপদের ৬·৫০, চলো জলসায় যাই ৫·০০

৭। আশাপূর্ণা দেবী ১ জীবনসন্ধ্যা ৪·৫০, দুই মেয়ে ৩·৫০

৮। আদিত্য ১ কেরানী সেলাই ৭·০০

৯। কৃত্তিবাস ওঝা ১ নকসালবাড়ী ও রাজনৈতিক ভাবধা ৫·৫০

১০। অমলেন্দুকুমার মিত্র ১ নীলকণ্ঠ ৭·৫০

১১। চিরঞ্জীব সেন ১ এ্যাটমবোমার অপরাজেয় ৪·৫০, ঘুণপোকার ৪·০০

১২। উমানন্দ ১ একুশ বছর ৫·০০

১৩। কলমিউদ্দিন ১ ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায় ৪·০০

১৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১ কালো ৭·০০, জলসাঘর ৪·০০, হাসুলীবাঁকের উপকথা ১০·০০

১৫। নজরুল ১ সুরেরে সুরেরাদার ৭·৫০

১৬। বিমল মিত্র ১ অসংখ্য থেকে মাত্রিক ৫·৫০

১৭। বাঁশরেন্দ্র ১ বৈজ্ঞানিকের ভালোবাসা ৫·৫০

১৮। বেবীরানী চট্টোপাধ্যায় ১ বিদেহ প্রবেশিকা বোর্ডবিজ্ঞান ১২·০০

১৯। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ১ নেতাজী সুভাষ ও ভারতের ১ম খণ্ড ১২·৫০ ২য় ৬·০০, ৩য় ৭·০০

২০। শ্রীজাতা চক্রবর্তী ১ দ্বিতীয় বরণ ৩·৫০

২১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ তিন প্রহর ৩·৫০, অন্ধকারে ৪·০০, চিত্রলেখা ৩·৫০

২২। নীহাররঞ্জন গুপ্ত ১ অশ্বিনমাধব ৭·০০, লিপিকা ৫·৫০, শবরী ৫·০০, অমরপ্রদীপ ৫·০০, ছদ্মবেশী কিরীটি ১০·০০

২৩। অমলেন্দু মিত্র ১ পরশপাথর (২য় সং) ৪·০০, মুখোমুখি (২য় মুঃ) ৩·৫০

২৪। বনফুল ১ সপ্তমীর ৩·০০, ভুবনসোম ৪·০০

২৫। বিমল কর ১ দুখানি ৫·৫০, আকাশ কুসুম ১·০০

২৬। বিমল ১ কলকাতাবাসী ১·০০, নীলিমার নীল ৫·০০, পথের মহাপ্রস্থান ৪·০০

২৭। জরাসন্ধ ১ সাবাস বাঁসিনী ৫·০০

২৮। মনোজ বসু ১ রাজকুমার সমাবর্তন ৪·৫০, ছবি আর ছবি ১·০০, নিশি-যাপন (১ম/২য়) ৮·০০/৮·৫০ আমার ফাঁসী হল ৪·৫০, পথ কে রুখবে ১২·০০, মাতৃকন্যা ৪·০০

২৯। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১ অসমাপ্ত চরিত্র ৫·০০, পুরোদস্তুর ৫ ৮·০০

৩০। মৈত্রেয়ীদেবী মুখোপাধ্যায় ১ মুখর মৌমি বনং মৌমি ৩·৫৫

৩১। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ১ সমিধান লিমিটেড ৮·০০

৩২। শিবরাম চক্রবর্তী ১ বিবাহ রোগ ৩·০০, স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী ৩·০০

৩৩। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ঘনশ্যাম নিবাস ৪·০০

৩৪। শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ ১ অন্ধকার চিঠি ৪·০০

৩৫। শৈলজা বন্দ্যোপাধ্যায় ১ সোনালী রোদ্দুর ৭·০০, আমি সেই ভদ্র নেই ৩·৫০, এই মুখের নিচে ৪·৫০

৩৬। সজনীকান্ত দাস ১ নেতাজী রহস্য, ৩·৫০

৩৭। সমরেশ বসু ১ দেব দেবতার (১ম মুঃ) ৪·০০, স্বর্গ নরক ৩·৫০, মিছিমিছি ৩·৫০

৩৮। সন্তোষকুমার ঘোষ ১ বন্ধু নদী ৩·০০, অন্ধকারের ৪·০০

৩৯। সুকুমার সেন ১ বাংলার সাহিত্য ইতিহাস ১২·০০, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ১৩·০০

৪০। সুজাতা ১ নারী রূপে ফুলে ৪·০০

৪১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ পথ চলতি ২য় খণ্ড ৬·০০

৪২। সৈয়দ মুজতবা আলী ১ দেশে বিদেশে ৩·০০

৪৩। প্রভাত চৌধুরী ১ মেহেদী বিবাহ ৩·৫৫

৪৪। সোমনাথ ভট্টাচার্য ১ মুহূর্তেই ঘর, মুহূর্তেই পর ৮·০০

মুদ্রণপ্রকাশ·
C/o. কেশব পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯

2,75,371

জগদীশ গুপ্ত

অরুণকুমার বসুমল্লিক

সাধারণ পাঠকদের ইচ্ছা পূরণের আশায় জগদীশ, নিরক্ষরদের জগতে লোকশিক্ষার আদর্শবস্তুকে প্রকাশে কুণ্ঠা করার ফলেই তাদের সৃষ্টির দুর্নিবার্যতাই যে পরবর্তন তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টির সার্থকতার নিরিখ বলে অনেকে, তাঁর নিজের উক্তিতেও তার প্রমাণ মেলে। 'লঘু দোষ ঘরে বসি এ পাঠকের বসে হয় আমা হেন।' তবে আমার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলিনি।...হেমন্তের রাত্রিবাসরঘরে যত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রাজের সুমেটিক লাভাকণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে। এই সমালোচনাটি সকলের চেয়ে সমালোচনা।' সহজ জবাবদিহির, একদিকে পত্নিতা নারীর কথা রহিয়ার মনোরম বর্ণনা আবার অন্যদিকে আদিরসের চড়ুর চমক পরিবেশনে তথা পাঠকচিত্তকে মোহাবিষ্ট করার কৌশলপূর্ণ আয়োজনে শরৎচন্দ্র যে কিভাবে চাঁছা ও আচরণের বাস্তবানুগতিক নয়নে, কথাকারসমন্বয়সূত্রে মন্তব্য করেছেন, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁর লেখার পরিচয়-এর সমালোচনায় তীক্ষ্ণভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। 'রমণী যেন গল্পে সবিস্তারে বুঝাই বেলে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষের পাতিরে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াও তার পাত্তা পাওয়া যায় না' আসল যৌক্তিকতা সরলসাহিত্যে সুলভ হইলেও জগদীশের লেখিকায়, অর্থাৎ সবিস্তার গল্প-আসরের বিস্তার, মুখে বিস্তারে জগতের অথবা অন্যান্যে মানা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করে নাই, 'অন্তরী পুরুষকে প্রকৃতির হালকা সুরে ভর্ৎসনা আর নিরন্ত করা শরৎচন্দ্রের চৈতন্যের গভীর অনুরোধের সমান', মনে মনে যৌক্তিকতার প্রসঙ্গকুণ্ঠিত বাটিতে বাটিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রসঙ্গালাপ, সমস্যাকে লঘু করিয়া সুচতুর মন্তব্য প্রকাশ, ইন্দিত এবং ভলাভলা প্রকৃতির বিশ্লেষণে সমাজ চৈতন্যে তাহে ঘটিলেই পাঠকের অনুসন্ধানে ঐ সম্পর্কিত অবলম্বন করিয়াছেন, সমস্যাজিতা অনুচ্চারিতা নারী চৈতন্যে এক সময়ে একেবারে মনের মতন নিজেই নিটোল প্রেমের পাত্রটি পাইয়া গেলে তাহার অকস্মাদারিণী হইয়া স্বামী ছেলের মধ্যাহ্ন সব করিতে এক পুরুষটির আবার অযোগাত্ত ঘটাইতে অর্থাৎ কলুষ সৃষ্টি করিতে পারাও যায়ে, আর, সেই নারী পুরুষটিকে উদ্বেগবাসে সমাধান করিতে দেখা করে, ইহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব আবিষ্কার না হইলেও তিনি খুব আকৃষ্টের কবিতা যৌবনের ঐ যৌনতাগকে খুব প্রধান্য দিয়াছেন। এই তাদের মাঝখান যোগেন তিনি সুখে সুখে ভাসিয়াছেন এবং বহুদূরে একটিকে টেনিয়া লইয়া যাওয়ায়...ঐ যৌবন যোগায় আবেদন অন্তর্হিত হইয়া কবিত্ব আর আসিয়া যেন—যেখের পরিচয়ের 'বহুপক্ষীয়' সমালোচনার এই সমস্ত বিশিষ্ট উপাদানেতেই বোঝা যায়, জগদীশ প্রাকৃতিকিনী কালের প্রতি কতখানি বিশিষ্ট নিজস্ব জগদীশচন্দ্রের আন্তরিক 'বিচক্ষা' ছিল।

শরৎচন্দ্রের সকল উপন্যাসে পরিচয়ের কিংবা সমাজনিকির প্রেমের বাহাদা যেকোনো থাকুক, তিনি নিজের সৃষ্টিতে সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপে চেনার চেহারার মুখোমুখি হতে চাননি, তার প্রতিষ্ঠিত ঘরে আঘাত করেননি। অন্যান্য কুণ্ঠের অন্যান্য নিজস্বীদের মত জগদীশচন্দ্রের বর্ণনাতেও সাধারণত্বের বাস্তবানুগতি চেনি। এই কারণে পারিপার্শ্বিক বিন্যাসও আকৃষ্ট হইয়া। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর লেখক-লেখিকাদের জগদারণপূর্ণ কাহিনীর গতানুগতিক সরল ওঠানো তিনি বর্জন করেছেন। গল্পরস পরিবেশনে নিজস্বী নিজস্ব আয়ত্তী ছিলেন না। আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের সুখ আনন্দ চেতনার অন্তর্নিহিত চেতনার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর বাস্তব এবং নিস্পৃহতার সুখ ও নৈরাশ্যের নিষ্ঠুরতা মনোস্তাত্ত্বিক অন্বেষণে তিনি কাহিনীর মূল সরল বিন্যাসে ন্যূ, জটিল সংঘোটকতার নকশায়ই মুগ্ধ নিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের অনেকের জগতে প্রকৃতে নিজস্ব জগৎ নির্মাণের নিয়ম (রীতি ও বিরতি), কখনও বা মানুষের প্রতিভা ও ইচ্ছেরা অন্বেষণে বিশিষ্ট ধরেই জগৎ-গাছতে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিটিকে ধ্বসে করে (পাথর, পতিহারা জাহ্নবী), রোমান্টিক স্বপ্ন বাস্তবরাজু সংঘর্ষে ভেঙ্গে যায় (দুখাক্ষ বসিয়াছের স্ত্রী, প্রসাদাস), সামান্য ঘটনায়, একটি মুহূর্তে জীবনের সুখের ঘর পড়ে (মাঝির সর্বাঙ্গীকারীর ঘর, ঘুপছুত আকাশকুসুম), মানুষের আন্তরপ্রবৃত্তিসমূহ আত্মপ্রকাশ জীবনে দুঃসহ আঘাত হয়ে বাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, কোনও কোনও লেখকের মত বিদেশী উপন্যাসের অনুষ্ঠানে এই জগৎ 'চেনে জগদীশচন্দ্র বাইরের শিক্ষিত সমাজ, কিংবা আর নাঁচু তলার অন্ধকার জীবন, অথবা ভিখারী, দাগিল ভবঘুরে মুখ্য প্রকৃতির মত কোহেলিকার চর্চাতে নয়, গ্রামীণ, মফঃস্বলীয় বাস্তবের সাধারণ জীবনযাত্রাকেই উপজীব্য করেছেন।

রীতি ও বিরতি, 'পরোক্ষম ভুক্তা, 'ভেরা সুখে', নিষ্ঠুর পরশী', আমার স্বপ্ন, 'নিশাত ডাকে', 'যাদু বাঁশি' প্রভৃতি সভা ইত্যাদি গল্পে জগদীশচন্দ্র মানুষের আনন্দ সুখ ইত্যাদির প্রত্যাশাকে ইন্দ্রিয়চেতনা, আত্মসুখ প্রবৃত্তিবৃত্তে উপস্থাপিত করেছেন, এবং এই বাস্তবানুগ উপস্থাপনায়ই নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বক্তব্য আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। রীতি ও বিরতিতে নির্মাতির চরম আঘাতের ঘনঘটা ঘনায়মানা। 'রামের কাঁপতে কাঁপতে বলিলেন ভেলা হাতটিকে দেখলাই এবং তাঁর সব কথা, সেটার জন্যে ওঠা এবং তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে গিয়ে যাওয়া, এগুলি নিস্পৃহের আলোকেই সুখের জন্য দেখা, বিস্তৃত হইয়া আসে। এই সাক্ষিত্ত বর্ণনার পরই মুহূর্তের উত্তেজনা—নিষ্ঠুর বিস্তার

সর্দার, সেলফাইয়ের বিশ্বস্ত কাউটির না জানা, তবুও কাউটির আলোকে সর্বজনের চোখে অনেকটা পরিমাণে লক্ষ্যসাধন হওয়া, অবশেষে কুপীর প্রচুর আলোকে মুখরা তথা নিষ্কৃতির নিশ্চয় জোরদের পূর্ণ সুযোগের উদ্ঘাটন—ছেলের মুখে সন্তাষাতে স্থির হইয়া স্থির দিয়া বিচারিত করিয়া ছত্র পড়িতেছে (কুপীর আলোর 'প্রচুর' বিশ্লেষণটির মন্তব্যের)—এইভাবেই পর পর অনেকগুলো চিত্রের সুসংলগ্নের সমাধানের ধারা দিয়ে আমাদের মাথা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে তার ক্রমস্ফুরণ মুহূর্তটার চূড়ান্তে, তীক্ষ্ণতম বিন্দুটিতে এসে পৌঁছোয়। 'যাহাই বাহিন তাহাই সত্য'-তে নিরাশ্রয় আমাদের বালাদাহক চিত্তেও উন্মেষবোধ। ভাবাবাবেবের বড়ো ছেলে বন্টুর মত ছোটছেলের সম্বন্ধের তার কেন্দ্রী দেখে জ্যোতিষী চাঁদকাটা ও অন্যে সুখ-সোভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তবে তার সঙ্গেরে সুখ-আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। বাবামাকে পত্রের ভয়, যা ছোটবেলার জন্য সাদা কাপড়ের ওপর কালো সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরেই একদিন সন্ধিবারের নিষ্কৃতির নিমেষে আমাদের কুপাটি খুলতে হয়। ছোটবেলার শত্রুর নিরন্তর—'তার মুখের উপর যে সাদা কাঁথা ছড়িয়েছে, তার উপর ছোট ছোট পায়ের দাগ—ঠিক বন্টুর পায়ের মাপের।' এই বন্টুর জ্যেষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষী তার নিরীক্ষণেন, 'মহাত্মাবেবের ছবিটা তার বাঁচিয়া লইয়া মনোদরঞ্জন ভঙ্গ প্রদান করিয়াছে সমস্ত বিশ্ব বিশ্বাস হইলেন করিয়া সিনা ভরটা উঠেই যে মেয়ে পরমত উঠিবে, জ্যোতিষা-পুরের জ্যেষ্ঠী সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ, বন্টু বড়ো ছোট জোড়ার মিলনে এই 'উঠিবে' যে কী অসীমের পরিমাণ ধরে নাড়ায় শেষ অংশের ঘনশ্যাম ইঙ্গিতে তা প্রকাশিত। পরের মুহূর্তটার কারণে, মুখেই পক্ষ ঘটিল না—কাপে পুনিয়ে জাগিলেন সিঁড়িতে বন্টুর পায়ের শব্দ উঠিয়া আসিতেছে'—উঠিবের ভবিষ্যৎ উঠিয়া আসিতেছে'-এ নিশ্চয়ে বর্তমানে শেষ হয়।

'রমাদাস' গল্পের রেখি, কুলহাঁপরী এবং এক ব্যবসায়ীর কুতুবপুর রক্ষিতা সুখ-সুখীর সঙ্গে মুখর মুহূরনাথ তার সংশ মিশ্রিত 'মনের সঙ্গে বিবেকের দ্বন্দ্ব : সিদ্ধান্তে তাহারা—এই অধ্যায়ের পরম নিষ্কৃতিই করিবে বিশ্লেষণ, সমস্ত 'অবিমৃষ্টকারিতা, নিরানন্দ পূর্ণচন্দ্র, আলিঙ্গনে মিলনিন্দ্য আন্তরিকতার উজ্জ্বল—তাহাদের কণ্ঠকে করিবে অনুচ্চারিত অন্ধ মুখর, মনকে করিবে অনিলের অর্থে পূর্ণ অর্থকে করিবে প্রতিচেতনীয়। মনে এমন হয়ে যে, তাহাদের আলো অন্ধের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া এক সময় মুহূর্তে মত একটা প্রকৃষ্টপ্রভ আলোকপাতে মনে তাহারা বিলীন হইয়া যাইবে—একটি মনেরই এই বিচ্ছেদ পলের এবং মনেরই চূড়ান্তে অন্ধের বিশ্লেষণ পলের ছোটোকে কুড়াইতে তাহার জন্য একজন স্থানীয়ের সঙ্গে সুখেন্দুকে একাসন্ন হয়ে যেতে হয়েছে। মুহূরনাথকে বোঝাতে যে হয়, ঐ যে বন্ধু ইঙ্গিতে ছড়েছে, যা যা দিয়ে যায়; তাই বন্ধা তাহাই হোক। মুহূরনাথের মোহভঙ্গের সঙ্গেই বাসনাক্ষয় বন্ধনা লাভ করে। এই বাসনা-ক্ষয়ের ইতিহাস অবশ্য আরও বিস্তৃত। সুখেন্দুর মাতৃকা সিরিজা তার প্রতীনপত্রের বন্ধু স্বামীকে নিয়েই খুশি। স্বামী বন্ধু, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সেখানে মোহে বিবাহ-বন্ধন মোহিতা বাহারা ভঙ্গ করে, ইহাই সত্য, ইহাই সুখ, ইহাই প্রেম আর ইহাই সার্থকতা, তাহারা কৃপায় পাত্র। অপরাধের সুখ কি সুখ নয়? এই বিশেষ সম্ভাবনার এবং সকলের 'কৃপার' প্রভেদে সিরিজা অন্যায়ের অনুশোচনার পর নিজেই মেয়াদে নিশ্চয়ে আমাদের সম্মুখীন হয়েছে, তা তীক্ষ্ণভাবে ধরা হয়েছে, এই পাপানুশোচনের মৌলিক তার নিজের অবস্থানেই পরিচিতি হয়ে উঠেছে। ক্ষমার সম্পত্তা সম্বন্ধের ক্ষমাবহ সুখেন্দুর উদ্ঘাটিত হতে দেখি। তাদের ছেলে চন্দনকে নিয়ে ঝগড়ার সময় সিরিজা আর তার স্বামী বন্ধু একটি ছেলেকে সম্বন্ধে সুমন—চন্দনকে দেখে। মুড়ার মেটা। চন্দন তার বাবার মতি, জানিস তোরা? এই সময় ছেলে ঘরে ঢুকলে—বন্ধু তখন কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীবন্তার সঙ্গে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে...সিরিজা তার স্বামিবর্গাতিবন্ধের একটি অতি সাধারণ সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ক্ষিপ্র মুহূর্তগুলি...।

'কপালের পাপের পরম ও আমরণ বন্ধন চন্দনের কুমার কপালের বিপদ মেয়ে মেয়ে-মানুষ তার প্রেমিকের সঙ্গে পলায়ন করে, সমস্ত সাধী পুরুষদের ধ্রুবা মুখর হয়ে ওঠে। কপালেও তাই আছে। কিছুদিন পর তার পরিবারে ফিরেও এক রাতের তার কাপড়ানীরূপ মেয়েকে আসে, সেই কাপড়ানী মেয়েমানুষ জানতে পেরে নারীরা ছেলের মুখের উত্তেজিত হয়। গ্রামের মুরুব্বি বিশিষ্ট মাতা মেয়েদলকে তাকে ঘর থেকে পাঁচ টাকা ছাড় চলতী দান পর্যায় দিয়ে চরিত্র একটা অপরিচ্ছন্নতার ছিন্ন হয়ে পারিবে এবং একটা অপরিচ্ছন্নতার ছোটো সাধারণের মনে জাগিয়া উঠিবার মন গাঢ়োহ অনিবেচ্ছিন্ন—টাকা পাঁচটি প্রচলী পাইয়া সন্তুষ্ট মন মুরুব্বির নিশ্চিন্ত লাভ করিল—তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ধূর্তি লাগিয়া নিজের উত্তরাধিকারের একটা প্রতিষ্ঠার ও লাভ করিল—এই দীর্ঘ রাতের বিশ্বের চলেই সংকোচ ও কুণ্ঠার পর্যায়ের অনেকটা অসমাধিকা ছিন্নের মেয়ের পর নিশ্চিন্ত লাভ করিল, 'প্রতিষ্ঠতা লাভ করিল সমাধিকা ছিন্নের প্রয়োগে গ্রামীণ সমাজের প্রতীক এই মতীনের ধর্মিতা মুরুব্বির মুখেই মুখাপিত। চার পরমার

সাংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

কালিকট থেকে পলাশী	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত পর্তুগীজদের ভারত-অভিযানের কাহিনী। ১০টি মূল্যবান মানচিত্র [৬·০০]
ঠাকুরবাড়ীর কথা	শ্রীইন্দ্রমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্ব-পুরুষ ও উত্তরপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা। [১২·০০]
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি	ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১৩·০০]
রবীন্দ্র-দর্শনে উপনিষদের দর্শন	শ্রীইন্দ্রমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২·৫০]
বাঁকুড়ার মন্দির	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার ও তথা রাঢ়দেশের মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]
বৈষ্ণব পদাবলী	সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত প্রায় চার হাজার পদের অপূর্ব গ্রন্থ। [১৫·০০]
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]
জেটিনিউ	আহলেদ্ সালগাদো রচিত। শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার ভূমিকা। [৩·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা—৯

এক আনার হইয়ে দাঁড়াইল পাওনা একটি প্রাণীকে ঘিরে একটি জীবন পরিবারের লেখকের বিভিন্ন বয়সের ভাবনার আলোড়ন জাগে। ফারখানার নতুন আনি—এখনও বলা হয় নাই। আসা ভিন্নি নয়। ফুল হয় নাই—একেবারে বাঁটি আমেরিকা। অবশ্যই, 'ভানিস—অতন্ত এখন ভিনিস—ভুলা চাই সহজ। ইহার বিনিময়ে অনেক দূরে পড়িয়া যাইতে পারে, এত যে, তার বিদেশ কল্পিত বসাই ভুল—স্যারিসিনিসে আনিব এক একটি বিশিষ্টের উদ্দেশ্যে 'ভিনিস'-এর পুনরুদ্ধারিতের জাদুতীর লাবিত্য এবং আর্শিটিকে ঘিরে আমের স্বপ্নের উত্তেজনার নিশ্চলতা কঠিন বিস্ময়ে আছিত। সহজে দুরু একটা আনিই এই বাঁধন পরিবারের পক্ষে 'নথুর লোভনীয় ফলদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আভিয়ান্স আহ্বানী' এবং 'ফলাশিত সম্পর্ক' এই দুটি সহজ জগদীশচন্দ্র সম্পত্তা সম্বন্ধের জটিল সংস্কারকে আঘাত করেছেন। হুসেনদের অনুরাগীর বিদেশীয় আত্মবন্ধনা ও সম্ভবনার সুদূরচারী স্বদেশীর নিয়োগ ইতিহাস আহত হলে সে বাপের বাড়ী চলে যায়, স্বদেশীর চরিত্র দোষিত হয়, হলে স্বপ্নবেষ্টনীতে আর ফিরে আসে না স্বপ্নকে জমিয়ে দেয়। স্ত্রী তার স্বামী পরিবারের এই অভাবনীয় ঘটনার মনের লোকেরা উত্তেজিত হয়। 'ফলাশী হৌসি আবিষ্কার করে সে সম্ভাসি-সম্ভবা মেয়েদের আসন ও সৌন্দর্য সুন্দরের ভবার পরিবেশে তার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা থাকে না ; স্বামী যাহা প্রকাশতেই 'ভান করিবা করিয়া ইহকাল ও পরকালজয়ী কণ্ঠে মনে আমার পুরোহিত করিয়াছিল, এই সম্ভান সেই অলেখ বন্ধুত্বেরাত—ইহা সুত্ত নাই, সার্থক নহে, হীনসত নহে ইহা অর্থাহিত এবং অর্জনীয় বন্ধুত্ব। সম্পর্ক মেয়ে বিকাশ থাকে, ঐ সম্পর্কটির অন্তরে কোথাও একটি অন্ধকারময় তমসাচ্ছন্ন আছে—এই সন্তান তার সেই প্রবাহিত পরিচ্ছন্নতা ছিন্নমস্ত — বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে দুলা লোকে দিয়া থাকে ইহার সে দুলা নাই'...। এই অংশে লেখকের নিরপেক্ষ কথনের একটু ফোঁ স্পষ্ট হওয়ায় এবং ঘটনা ও ভাষা কাহিনীর বিস্তারের অনুটি সম্পূর্ণভাবে সার্থক হতে পারেনি। কলাশিক্ষের সম্পর্ক ভীক্ষা এবং সার্থক গল্প। একটি অসহায় মেয়েকে ধর্ষণ করার অপরাধে আজীবন জেল করে সাতুর বাড়ী ফেরার আগের দিনটিতে তার স্ত্রী মাজনবালা খুলা অপরাধী স্বামীর সংসর্গে আসার আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়। স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না। মনুষ্য কেন যে তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, আরী হইয়া ক্ষমা করে নাই—এই দীর্ঘ জটিল রাতে অসহায়িকা হইবার সঙ্গে নারীর বিভিন্ন পরিচয়গুলো মুছে হয়ে সাতুর অপরাধের গুরুত্বে এবং সে সম্বন্ধে মাজনের 'বিচলন ইরিতাবেই প্রকাশিত হতে দেখি। সাতুর মা বিরাজ পুত্রের অপরাধ বেমালুম ভুলে গিয়ে স্নেহাতিশয্যে উঠলে ওঠে তা মাজনের অসহ্য লাগে। পুত্রবধূর কঠিন নিরপেক্ষতায় তিনি ক্রোধে ঠোকর করে ফুটতে থাকেন। অবশেষে আবেগের পাত্রের আবির্ভাব ঘটে। তার চাইপো নিতু কাকা এতদিন কোথায় ছিল, এ প্রশ্ন যার যার করেও উত্তর পায়নি, তাকে আসার পরও সে প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলে কাকা এতদিন? ঐখানের ঐ একই প্রশ্ন। বিরাজ এসে ফলাশ সময়ে সময় বাড়ীতে বিরোধের প্রতীক এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়। স্তব্ধ সে কথায় বন্দরবারই কাজ করে লক্ষ্মীছাড়া? আসা এখন থেকে।' এইতেই সাতুর কলাশিত অতীত সম্বন্ধের নিতুর সারকতা প্রশ্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। জননী বিরাজের বোধহীনতায় কালো প্রবাহ-পুথে হয়ে ওঠে। তাঁর কোলা পুত্র সাতুর নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচিতন্য। তার ধারণা ছিল, এত দূরে অপরাধের পরও যে তার সন্তানের নিজের স্বজনটিতেই ফিরে এসেছে, দীর্ঘ প্রবাসের পর যেমন লোক ফিরে আসে। সোনার ঘরে নতীর মুখোমোলমুখে তোর চোখে পড়ল, বাঁধনহা মেয়েটির চেয়ে মাজন সুন্দর। সাতুর লোকে চমকটাই মাজনের দৃঢ় কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখে সাতু ধরণা ভুলে বাইরে এসে তার মাকে ডেকে বলে, ছাই তাকে মারতে চাইছে। বিরজা ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রবাসের মাজন-জ্বালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চোখে পড়িল, বধূ কোলে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তাহার চোখে পড়িল না।...লাফাইয়া বাইয়া কন্যার সম্মুখে পড়িলেন, ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া সিঁড়ি তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠান নামাইলেন, উঠান পার করিলেন, বধূর হাত হইতে হাত নামাইয়া দরজার খিল খুলিলেন—বলিলেন, যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড় দেখ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—এই ঠীক বাক্যপূর্ণ ঘনিষ্ঠ বিরাজের আঘাতের প্রতিটি ক্রিয়া-বিশ্লেষণে ও অন্তর্দ্ব উত্তরণে বিরাজ তথা এই সমাজের বিশেষ নিতান্ত পটে মাজনের ভাষনা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

'অপরাধ পাপের গল্প ও অনুশোচনা', 'প্রতিহারা আহ্বানী', 'বিশেষত্ব স্বীকৃতিক সম্পর্ক'-এর মত দু একটি গল্প ছাড়া বেশীর ভাগ গল্পেই সমাজ-পরিবর্তনে ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে কোনও গভীর প্রশ্ন দেখা যায় না। মানুষের জীবন নির্ভরে নিত্যর এ ব্যাপারটি জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মতই। কখনও কখনও মাজাবে হৈলিয়ে সমাজিক প্রশ্ন ও সমস্যেরেখা-মূলক বাক্য এলেও তার অধিকাংশে গল্পেই দেখা যায়, তিনি জীবনকে নিয়তির অন্ধ ক্রিয়া অসংলগ্নতাই গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর গল্পগুলির নির্বিচারিত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রটিতে স্থির থাকে, চেতনার অন্ধ আলোড়িত হয় না। এই নিয়তিসর্বস্বতায় ও সমাজিক পটভূমির কোনও যোগই অসাধক। যে বিশেষ জীবন নৈরাজিক, সমস্ত চেতনা সত্ত্বেও তাকে খুব তাৎপর্য-গভীর বলে মনে হয় না ; কেমন করে বাঁচা যায়, এই বোধেই যে বিশেষ প্রতীকী মূল্য পায়, যাহির কল্পনা নিষ্ক্রিয়তা জীবনের অপরি-হার্যতায় অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে।

তবু, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ছোট-গল্পের ক্ষুদ্রতর শিল্পী জগদীশচন্দ্র মুখ্য প্রশ্নের সন্ধেই সংলগ্ন, অন্তরীয় তাঁর মিষ্টা ও সততার জন্য, ভাবালুতার অনুপ্রেরণায় বাঙলা সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক লেখকদিগের শিল্পমাধ্যমের সচেতনতার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পমেধাকে, তাঁর অসমাপ্তিতে যাওয়ার দিকের চালে জগদীশচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট, মানিকবন্দুর পূর্বসূরীদের তিনি আমাদের অন্যতম। তাঁর সুদীর্ঘ পরিক্রমাণী শিল্পীর সম্বন্ধে উপন্যাস 'পাইকেরা উপন্যাস, অসমাপ্তিত, এমন কি তাঁর কোন পণ্ডিত সমালোচকের অসমাপ্তিতের ইতিহাসের তিনি স্থান অর্জন, এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয়।

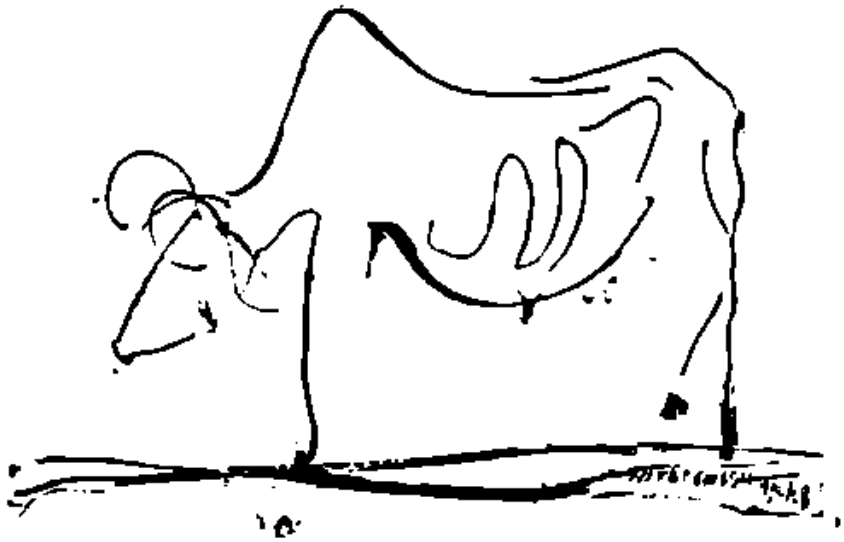

পুঁইমাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহাধ্যায়ীর চাউনিতে ও হাসিতে কি ছিলো স্থানীয় বলিলেন—একটা বড় ঘটে কি ঘটে যা হয় কিছু খাও তো. তোমার ঘরের গাছ কোটায় একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা ঘরের জানালার ধারে বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে কাঁটার-কাঁটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে কাঁটার কালিলিপ্ত জমানো তেলটুকু সযত্নে করিয়া তুলে রাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু ঘটি কি ঘটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমনকি ছেলের কোনো খবরও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সহাধ্যায়ী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে বসে বইলে যে?.....পাও না একটা ঘটি? তা ছেলেকে দুটো সব কোথায় গেল এরা? তুমি ছেলে মেয়ে দুটি রোবে না?

অন্নপূর্ণা ছেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহাধ্যায়ীর মনে কাঁটার সন্ধার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের থম থমে ভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি একটা ঢোক গিলিয়া চাহিয়া রহিলেন। একটু ঢোকা-ঢাকা করিয়া কহিলেন—কেন.....কি আবার.....কি.....

অন্নপূর্ণা পূর্ববৎশান্ত সুরে কহিলেন—দেখ, ভুল কোরো না বলছি—কোরো না। ভুল করতে হয় অন্য সময় করো। তুমি কিছু জানো না, কি বোঝ বল না? অত বড় ঘরে যার ঘর, সে মায় ঘরে আর রস খেয়ে ফেলেছে কি করে তা বলতে পার? গাছের গুণের ছেলে জানো?

সহাধ্যায়ী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?...কি গুণের?

—কি গুণের, জিজ্ঞেস করো গিয়ে চাটুয্যেদের বাড়ির কেরুন বামনী বুনো গোঁয়ো ঘরের ঘরে জন্ম কাটালে ওদের-কেমন লাগে বাস করা যায় না। সমাজে মিশতে গেলে সেই রকম চালে চলতে হয়।

সহাধ্যায়ী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া "কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই কহিলেন—একঘরে করবে না তোমাকে একঘরে করবে. কাল চৌধুরী-দের ঠাকুরঝিকে এ সব কথা বলবে। আমাদের ঘরের ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আসীকাল হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না—ও নাকি উজবুক-মত কথা মেয়ে—লোকের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ ডাকবে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে চুলো-বাড়ি, বাসনী-বাড়ি উঠে বসে ভিক্ষে আনাও।

সহাধ্যায়ী হাজিরের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই। আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করে—তেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর। ওঃ!.....

অন্নপূর্ণা হেসে-বেগমে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি সমাজের মাথা না একজন আতঙ্কর লোক? গাল দেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, ছোঁড়ারা তোমার একঘরে করবে তা আর এখন কঠিন কথা?—আর সাহাই তো এদিকে ঘটী মেয়ে হয়ে উঠল.....হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—ভুল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?—পুনরায় গলা উঁচাইয়া বলিলেন—যা বিয়ে দেবার যা, না কিছু। আমি কি আর পাত্তর কিনে করতে?

সহাধ্যায়ী বহুক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বহুক্ষণ থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুরে কতক্ষণ কথিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহাধ্যায়ীর যাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা এসব তোরা কোথা থেকে আনলি? ওঃ এ যে...

ঢোল পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে শিয়রে বাঁধা বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, চাঁটাপেঁচি মোটা ও লম্বাটে, হলদে ছোপ ধরিয়া দেখিয়া মনে হয় কাহারো পাকা পুঁই মাচা উপড়াইয়া ফেলিয়া উঁহাদের জন্যাল তুলিয়া দিয়াছিল; মেয়েটি তাহাদের উঁহাদের জঞ্জাল প্রসঙ্গে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে এক-জনের হাতে খানি, অন্যটির হাতে মোটা দুই তিন পাকা পুঁইমাচা জড়ানো যেন ছবা।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো, রুক্ষ ও অযত্ন-জাতো—মাতালে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটা ভাসা ভাসা ও শান্ত সমু সমু কাজল টানিলো হয় পরনে ডুরিদার একটি লেপটাইপিন দিয়া এলো করিয়া জড়াইয়াছে। শিমাটির ধরন খুঁজিতে যাইলে ঐতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিয়ানে কিনিয়া তাহার সঙ্গিনীদিগের হাত হইতে পুঁইশাকা জড়ানো দুখানি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—কিনিছি মাল, খাবা। গায়ে খুড়ির কাছ থেকে ছাস্তার নিলাম, কিনে চাস না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার পরে পুরো পয়সা বাকি আছে. আমি বললাম—যাও গায়ে পিসী, আমরে ঘরো কি তোমার ছুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো—ঘাসের ঘাড়ে হাত-কাটা বললে, নিয়ে যা.....কেমন মোটা মোটা.....

অন্নপূর্ণা বাকী হইতেই অত্যন্ত কঠিনের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আরো কি অমনিই তোমাকে ভাগ্য দিয়েছে...পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দুদিন পরে ফেলে দিত.....নিয়ে যা...আর উঁহি তাদের আমাদা উঁহার নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে তাদের নিজেদের জন্যে আর কাটতে হলো না.....ঘর পাড়ুরে বোকা সব ঘরতে আসে আমার ঘাড়ে...বাকী মেয়ে, বলে নিয়েছি না তোমার বাড়ির বাইরে কে যাও না দিও না? লজ্জা করে না এলাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে? বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? তোমার পাকে, তোমার বেলুন আর-একজন বেড়াচ্ছেন তোমার বর, তোমার যাই, ছোঁড়া আর-একটা বেশ ওদের যাবে।

মেয়েটি লজ্জা ও ভয়-মিশ্রিত কাতরতার সহিত বার বার চাহিয়া ঘরের ভিতর অন্নপূর্ণা

করিয়া দিল, পুইলাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা হাঁকিয়া চলিলেন—যা ছো বাদী, ও আপদগুলো ফেলে দিয়ে বিজলীর পুতুলের হাঁড়িকুঁড়িগুলো নিয়ে আয় ছো—যা, ফের যদি বাড়ির ধার মাড়াবি, দেখেছি, তবে ঝাঁটা দিয়ে তোদের পা ভাঙ্গে ছো.....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন হেলিয়া দুলিয়া বিজলীর অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা তুলিতে পারিল না; অন্যেরগুলো ছাঁটা একিক-ওদিক কুড়াইতে কুড়াইতে চলিল।...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে লেগেছেন—তা এনেছে ছেলে-মানুষে খাবে বলে.....তুমি আবার.....বরং.....

পুইলাকের বোঝা লইয়া বাহির হইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আর মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, ফেলে হবে না—ফেলাছড়ার জন্যে অত সোনা কিসের? একলাড়া থেকে আর একলাড়া নিয়ে আসাই হবে পাতা পুইলাক কিনে করে যা, যা.....দুই মা, দুই করে বসে নিয়ে আয়.....

সহায়হরি ঘর মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহাদের চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর নিজের বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের ঘর সাধ্যে কিনিয়া ছোক, পুইলাকের সওদাগরদের এখানে মুখুয্যেদের মুখের চৌহদ্দি ডিঙি, তাহা সাহসী হইলেন না—বিজলীকে বিজলী-মেয়ে দিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

বসিয়া বসিতে কাঁদিতে বড় মেয়ের কাঁদার শব্দে পড়িবার জন্যে সকলে অন্নপূর্ণার ঘরে সমবেত হইল—তত অবসরে পূর্বদিন বাড়িতেই পুইলাক কিনার সময় কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল—মা, আধকাঁচাগুলো কিন্তু এনো আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের।.....

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি ফিরিয়া চাহিলেন ও বিজলীর মেয়ের আশপাশে যে ছাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—আঁকাগুলো কুড়ানো যায় না, ছোবার যায়ের হাত-কাটা কেলিয়া দিয়াছে। কুড়ো চিংড়ি দিয়া একমুঠ চুনো-চুনো পুইলাকের তরকারী রাঁধিলেন।

মুখুয্যেদের ছেলে পাতে পুইলাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ভাবে ছোট মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উহা পুই-শাকের এক টুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নেই। পুইলাকের ওপর তাহার এই মেয়েটির বিদ্বেষ লোভ, তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ছোঁড়া, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ছেলে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাবে সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উল্টু করিয়া চালের বাতার দোষ্টা জল হইতে লুকানো লম্বা পাড়িতে লাগিলেন।

আসীমারের চক্রবর্তীদলের সেদিন বৈকালবেলা সমাজপতির অঙ্ক পড়িল। লাটিকল্প ভূমিকা করিবার পর জলধির উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেশ মুখুয্যে—সাতের মেলে পার দেব না, আড়াই মেলে পার দেব না কি করে কি জানতাই করলে—অবশেষে কিনা দুঁইর ছেলেটাকে ঘরে পরে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে ছেড়ে। তারা কি আজকের? রাম কহ, হুঁহাত পুরুষের তলা, পচা গোঁড়ায়। পরে সুরে সুর ভরিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেজোটি ছোলো বছরের.....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে লেগেছেন—এই তাবনে ছেলের.....

—আহা-হা, ছেলের আর ছোলোর তফাৎ কিসের দাদা? ছোলোর আর ছেলের তফাৎ কিসের? আর সে ছেলেই হোক, চাই ছোলোই হোক, চাই সওদাই হোক—তাতে আমার দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাকা আসীবাদ হয়ে গেলে, তুমি বেঁকে বসলে কি ভালো দাদা? ও ছো একলাড় উজুগুণ্ড করা মেয়েই আসীবাদ হওয়াও যা, আর হওয়াও তা, সাতপাকের বা বাকী এইটুকু? সমাজে বলে এসব কাজগুলো দুদিন যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখবো, এ তুমি বলে কেও না। সমাজে বসুমতের যদি আর চলবার ইচ্ছে না থাকে, নেজের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলা। ...পরের পারব, রাজপুত্তুর না হলে, কি পরের ছেলে না? .....গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে কিনে করে নিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলো? অন্ত-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? তিনি বাড়ি, বাগান, পুকুর, লুকলক এসব নাকি কুড়ির জমিতে গাঁটি আমন ধানও করেছে, বস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, বালিয়াড়ির উত্তর মজুমদার মহাশয়ের পূর্বেই কালীঘরই ঠিক করে ফেল। কেশ কালীর মাথা বাঁধা করিয়া সহায়হরির মেয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে লেগেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীঘর বাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা খাবেন, আসল নিজের সুদে এখনও বাকী — শতকরা নাকি দুইবেলা ইত্যাদি। এ সকলের মূলে অবশ্যই তাহাই সত্য, ইহার কেহ কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না। ইহা মুখুয্যের ঘটক সত্য। যাহাই হোক পাত্র-পক্ষ আসীবাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি বছর দেড়ক মাস পূর্বে নিজের হাতে কি একটা করিবার জন্যে ক্লাসের এক কৃষ্ণকায়-বন্ধুর আত্মীয়জনের হাতে বেশ প্রহার খাইয়া কিছুদিন বাকি সওদাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব হওয়াতে না হওয়াতে [illegible] সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাহিরেলেন, সারের ঢাকা দিয়া রেখেছে, নিতান্ত কচি আলা ছোট আসিয়াছিল, তাহারাই আজপে হাসিয়া আপন মনে আমাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ফোঁপাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, মাকে না? মা কাঁদে ছেলে.....

সহায়হরি একবার বাড়ির পথের দিকে কি আশা কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্ন স্বরে বলিলেন—যা, পাঁচুদির সাবল-খানা নিয়ে আয় দিকি। বলা শেষ করিয়া তিনি উচ্চ-স্বরে সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড তার একটা লোহার সাবল দুই হাতে দিয়া আঙ্কটাইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতাপুত্রীতে সতর্কভাবে সন্তর্পণে সদরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহারা ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল [illegible] ভাহারা ঘরে নিশ্চয় কিছু উপেক্ষ চলিয়াছে।.....

অন্নপূর্ণা আল সারিয়া সবে ঘরে ঢুকিয়া উনুনে ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে-বাড়ির ছোট খুকী [illegible] আসিয়া বলিল—খুকীমা, বা বলে কি খুড়িমাকে গিয়ে বল; মা ছোবে না, বুঝি আমাদের নবাবটা ছোঁয় আর ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ি ও-পাড়ায় যাইবার পথে বাঁ ধারে এক জায়গায় [illegible] রাশিচয়ে ওলাউঠা গাছের জন্য ঝাঁ। পাঁচের সকালে এক প্রকার লাল্পাড়ার ঘর গুলি হইতে বাহির হইতেছিল। একটা ছোঁ ছোলো হলদে পাখী আমরা গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

খুকী আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুকীমা, খুকীমা, ঐ যে কেমন পাখী পাখী দেখিতে পিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন ঘন ঘরো কোথায় একটা [illegible] একটা আওয়াজ হইতেছিল.....কে কেন বি খুড়িকেছে.....খুকীর কথার পরেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। অন্নপূর্ণা সেদিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, খুকী চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা বাইরে বাইতে ঘরের মধ্যে পুনরায় খুব খুব ঘর আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার [illegible] কিছু হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন ফোঁপাইয়া ওঠায়ের ছোট্ট বসিয়া ছেলের [illegible] সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। [illegible] দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিয়া উনুন ধরাইতে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ও ভয়ে বলিলেন এখনও নষ্টিতে যাওনি যে কোথায় গিছি এতক্ষণ?

ফোঁপাইয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যাই মা, একটুনি বাদ আসব।

ফোঁপাই স্নান করিতে যাইবার একটু খানি পরেই সহায়হরি সোজাসুজি [illegible]

তাজ মহল সিগারেটের তামাক এমনভাবে মিশ্রিত করা হয়েছে যাতে তিনগুণ তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেরা তামাক যা প্রচুর পরিমাণে থাকে, তেমনি থাকে, তেমনি তাজা ও তেমনি আপনারি পাবেন। ওই তিনগুণ তৃপ্তি পেতে হলে তাজ মহল চাওয়া চাই।

গন্ধ * তাজা * স্বাদ

তিনগুণ তৃপ্তি

তাজ মহল

সিগারেট

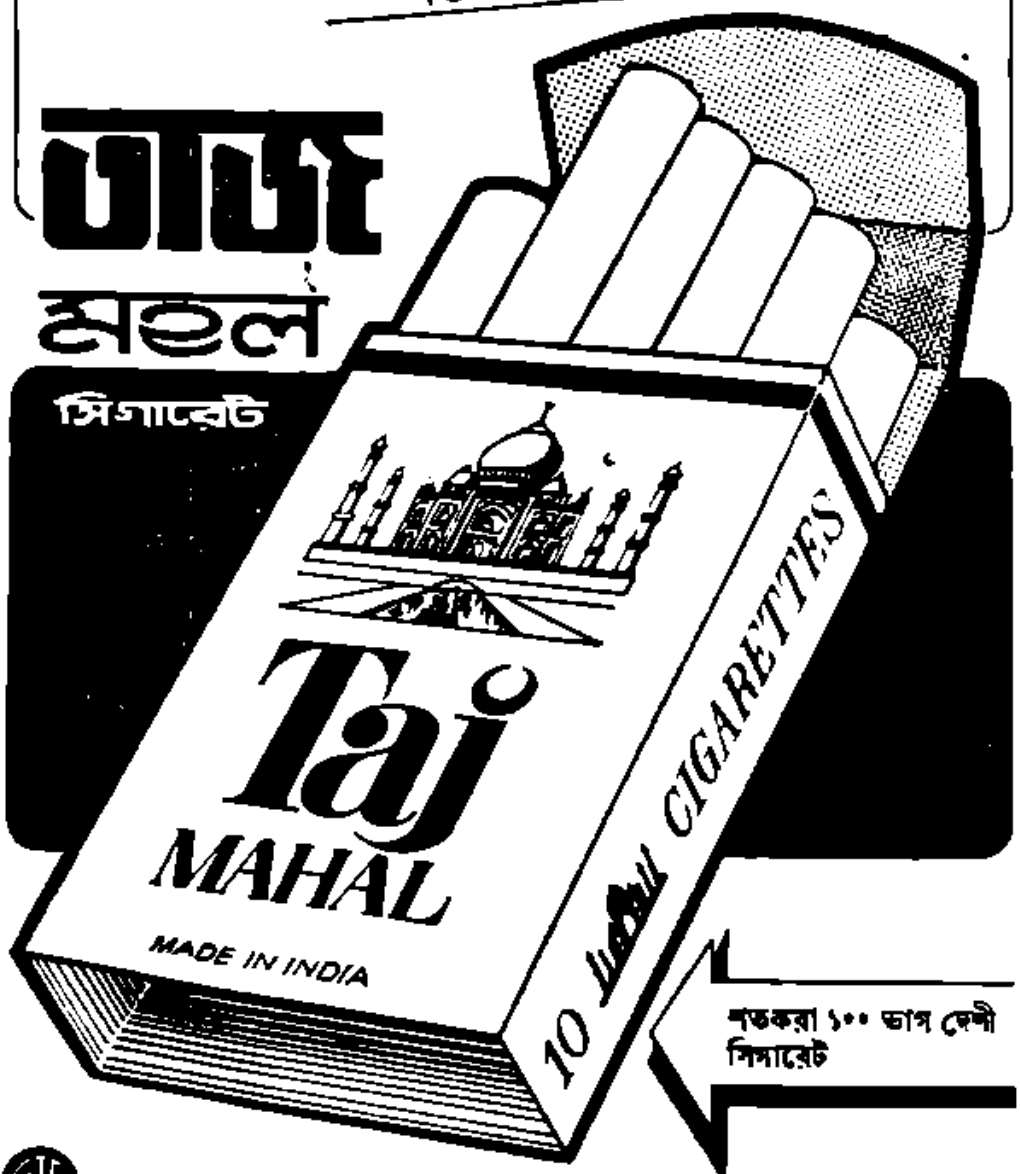

শতকরা ১০০ ভাগ দেশী সিগারেট

গোল্ডেন টোবাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম ভারতীয় উদ্যম

GT (TPL) 754-BEN-Grams' Advt.

খোল দেব ছাড়ী একটা ছোট আলু ঘাড় কাত্রিয়া তোলা হইবে আশ্চর্য্য টুনিস্থত হইলেন এবং সম্মুখে দাঁড়ান রমিয়া ভৈরিকরের প্রতিভার সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ওপাড়ার এলো ছোঁড়াদের রোজই বলে—কতো চাঁদকুল, ছেলের কাল থাকতে তবু মাসে মাসে এদের ছেলেদের পাদের খুসী পড়ত, তা আজকাল তো ছেলেরা আর আসে না এই বেড়ান পাশে ছোট আলু ঘাড় ভেঙেছি, তা আমার ঠাকুর বরং .....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আচ্ছা সেদিন কাল কি করিতে হবে?

সন্তোষ্টি ভয়ের ভাব দেখিয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখনই করতে না, এই ও আমি..... সন্তোষ্টির ভাব দেখিয়া হাসি হইয়াছিল তিনি এইবার আকাশ হইতে পড়িলেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন - তুমি তো করবেই, তিনজন ভিখেরে একজন আসে, তিনটা বেলফুলের মালা এনো যেন না। আমি সব জানি, তবে তোমার ইচ্ছে আমি পূরণ করিয়াছি, আর কি করতে হবে বলে দিচ্ছি, শুনলাম বরেন্দ্রপোরার বাবার সঙ্গে তিনটে ঘুড়ি এনেছিস—না?

ছোট্ট ভাই মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া এবার কুণ্ঠিতে আসে আলুটের দিকে চাহিল, পরে শুনলার মার মুখের দিকে চাহিল এবং শেষে সন্তোষ্টির একবার বাবার দিকেও চাহিয়া বলিল; তাহার কথার কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে মিল কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস না যে বড়ো? এই ছোট আলু ঘুড়ি এনেছিস কি না?

সন্তোষ্টি বিনয় ভাবে মাথা নাড়িয়া ইংরেজী চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল না।

অন্নপূর্ণা ছেলে মেয়েদের কুণ্ঠিতা বলিলেন—পাজী, আজ তোমার দিয়ে কাজ কাজের ঢেলা ভাদের ওরে কাজে, বাজোপোরার বসে বিশেষ ছোট আলু ঘুড়ি ওড়াবে? সেজন্য নয়, বিশেষ ঘুড়ির মধ্যে ছেলে কাল, সেই এক-গলা বিষের ... তোর মাথা বিষ-পুতুলের বাবে লুকিয়ে আছে, তার মাথা খেতে পারবে অমন নিয়ে এসে ছুটে? যদি সেইরকম চেষ্টাকিয়ে ছেলে ফেলায় করিবে তবে তোমার কোন কথা এসে যেমার কাছাতে উচিত ছোট আল, না ছোট না হয় তা বলে আমার কিনিসে ... এ ভাবে নিয়ে আমি কি করব, ...

সন্তোষ্টি দিনিস ভাবে এবার হৈরোপ্যে... মুখখানা ঢাকা হাতে ফেলে ভাবে কাঁদিয়া বলিল—যা যা, বেরিয়ে এস

অন্নপূর্ণা বিনা ভৈরিকরে আলো পাচিলের ধারে যে ছোট ঘোড়া তাহাতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কাঁচকরকীর জলল হইয়াছিল ছোট্ট ছোট ... ...

আমার ইতিহাসে নিম্নলিখিত ঘটনা বহু বৎসর অতীত হইল, হরিদুয়ের কাছের মেলা হইতে সহরবাসি আলো সাজাইবে এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটা ক্রয় করিয়া আনেন। ছাড়িয়া বাইবার পর তাহাতে কতবার সিল্ক ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির শ্বাসকষ্টের প্রকোপে জামাটা গায়ে হয় না। সংসারের এসব ক্ষেত্রে সহৃদয়তার কথনোও ত্রুটি হইবেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অমপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব জানা। টিনের তোরঙ্গের মধ্যে উহা থাকিত।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অমপূর্ণা একটা কাঁসিতে তালের গুড়, মুড়কি ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে এক বাটি তেল। ক্ষেন্তি দুধুনীর নিচে একটা কলার পাত পাতিয়া এক থাল নাড়িবেলা তুলিতেছে। অমপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হন নাই, জানে, সে যেখানে-সেখানে বসে, যেন-তেন-প্রকারেণ ঘুরিয়া বেড়ে; তাহার কাপড়-চোপড় পাদ-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মহাদেব গোলা বাঁধা শেষ হইলে অমপূর্ণা উনানে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন; ছোট মেয়ে লক্ষ্মীটি হইবে তার হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, খই একটু...

অমপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটু-খানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল দাঁচাই আরো বিশেষ সূক্ষ্ম রচনা করিয়া সেটুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি তার হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমার একটু...

ক্ষেন্তি দুধুনীর নারিকেল কুরিতে কুরিতে সুবাসনের মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় ঘরটে চাওয়ার মা পাছে বঞ্চিত হয়, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অমপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি, ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।...ক্ষেন্তি কিন্তু হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে কুরা নাই, সেখানে নামাইয়া দিল, অমপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

ছোট মেয়ে পুঁটি বলিল—আমাদেরটা অনেকখানি দুধ দিয়েছে, রান্না-দিদি কাঁর চৈরী করছিল, ওদের অনেক হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ-বেলা হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা জামাই নেমন্তন্ন করেছিল, সুরেন-ডাক্তারে আর ওপাড়ার ছিনুরে যাবাকে। এ-বেলা ও পাড়ের, ও-বেলা এ-পাড়ার, এইরম হচ্ছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা, কাঁর মিশে নাকি পাটিসাপ্টা হয় না? ক্ষেন্তি বলিয়াছিল, কাঁরের গুড় না হলে কি আর পাটিসাপ্টা হয়? আমি বলেছি, যেন ওদের মা তো শুদ্ধ মাকড়ের বাই দিয়ে ওরে, সে তো জানে না।

অমপূর্ণা হেসেছেন মেয়েটির মুখে একটুখানি মেহ লইয়া ছোটোর মাথাটিতে চাপাটির উপরের সন্দেশটি রাখিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—দেখিস ওইরম ওদের মা তো আবি মিঠে হবে কিনা? কাঁরের গুড় যি মিশে ওতোলেই কি আর পিঠে হয়? সেদিন জামাই এসে ওদের বাড়ি খেতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা খুব্বা পাটিসাপ্টা খেতে দিলে, ওমা, যেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর মিষ্টিতে তখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়। পাটিসাপ্টার কাঁর দিলে তাই খেতে হয়।

বেপারোজারে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি তার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, সাহেবরাকেরা একটু দেয়।

অমপূর্ণা বলিলেন—দেয়, কিন্তু এসব ঘরে খায় না। দুধ ছেড়ে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিয়ে যা।

ক্ষেন্তি সাহেবদের ভালবাসা এক ঘটকা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু গুড়ে দিয়া খাইতে লাগিল। দুধ যদি গুড়ের ঘনত্ব-সম্পন্ন হয়, তবে ক্ষেন্তির দুধ খেঁকিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে কাজ করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অমপূর্ণা বলিলেন—ওরে তোর সব এক-একটা পাতা পেতে বোস দেখি, পরম পরম দিই। ক্ষেন্তি, ভাঙার কাছে ও-বেলার, যার জন্যে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিজেই অমপূর্ণার এ-প্রস্তাবে যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি সিঠেই থাক। জামাইয়ে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

ঘনঘোরক ঘাইবার পরেই মেজো মেয়ে ছাড় আর ঘাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকালের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি উনানের ধারে বসিয়া কাঁসার বাটি হইতে গুড় মাখিয়া মুখে পুরিতেছে আর মুখ বুঁজিয়া কাজ করিতেছে, সে মুখ খুলিলে আর রক্ষা নাই। অমপূর্ণা সেদিকে যে বড় একটা কথা কহে না

ছেলে, বেড়ার ধারের নটে শা-এর ডোঁস-ডুমোর পুচ্ছগুলি বেখাপ্পা রকম বড় হইয়া আসে, ফেলিক্স তার পরের বছরটের মাঝা ঢেলাটি খাঁচিলখানা চালাকীর বাহির হইয়া সেখানে ঘুরাঘুরিতেছে!...তাই এই অতদূর আসিয়াছে! বিভাস নিরীহ এক একটি, অধিক মায়ার জোরদস্তি, ফেরোটিকে পরের ঘরে অপরিচিত রহিলে ,পাঠাইতে তাঁর বুক উথলে হইয়া উঠিতেছিলেন। ফেলিক্সকে কি আপনি ঠিক বুঝিবে?

যাইবার সময় ফেলিক্স চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—আ, আমার মনেই আমাকে এনো... ঘরোয়ে পাখিরে দিও—বুড়ো বাপ তো...

এ-প্যাকার ঠাকুরপিসী বলিলেন—ছেলে মানা তোর বাড়ি ঘরে কেন যে, আগে আসি ছোক—ঘরে তো...

ফেলিক্সের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা চোখের উপর একটি ঘনি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একদৃষ্টিতে সুরে বলিল—না, মানে না বৌদি?...দেখো তো কেমন না হলে!...

জানুয়ারি-চৈত্র মাসে বৈকাল বেলা উঠানের রোদ্দুর দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অমপূর্ণার মন হু-হু করিত—তাঁর অনেকগুলি ছেলেপিলে ঘর ভরিয়া আছে, কেহ দুইটে হেড়াইটে আসিয়া লক্ষ্মীছাড়ীদের মতন হাতখানি নাড়িয়া মিনতির সুরে ওমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা, ঐ কেন্দুরী ছিপ্পে একটুখানি?

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় আসে। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী কিছু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতেছেন—ও তুমি ঘরে যাও, এরকম দুবেলা লগা! আমাদের অবস্থায় লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিনু সরকার হুলসাতার চাউনিবের উপর উঠু হইয়া বসিয়াছিলেন, ঘর হইতে বেরিয়াসে মানু হইবার জন্য। তিনি মুটি করিবার জন্য মরা চেষ্টা করিতেছিলেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—না, সব ভো ভাল...তাছাড়া আমি যা দেব সবই দেব।... তোমার মেয়েটির বয়েসটি কি?

সহায়হরি হুকাটার পাচ-ছাটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বয়স তুবোধিল মুখলায়। আসার কি বাড়িল মুখলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। তাড়াইলো আসলে টাকা বাকি ছিল, বললে, ও-টাকা আমে যাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার...

—তাছাড়া বললায় কৈফাটা আরা ছুয়ে ছুয়ে দিছি। পুজোর তত্ত্ব তো করেও ছিলাম টিকের জন্য হুবে না, ছেলে দেখলাম ভিন্না? মেয়ের মামা নিজে ওঁসেল...ছোট-লোকের মেয়ের যতন চল, হাতকে ঘরের ঘর ঘর ,আমও কত কি? পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারবার না বুঝলে?...

সহায়হরি হুকার কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে তিনটি-চারটে করিয়া হুকার টান দিতে লাগিলেন। কিন্তুক্ষণ হুকলের গোলো কথা শুনা গেল না।

অনেকক্ষণ পরে বিনু সরকার বলিলেন —তারপর?

—আমার স্ত্রী অতদূর আমাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! পালকীটা নামিয়ে নামিয়ে চলতে লাগল, না ফেলে-দুনে ছোটলোকদের,কুলন নুটি,স্থিরে করলেই এরকম হয়, যেমনি চেহারা, তেমনি বাস, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুদ্ধ হতে:...তবে বিনু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাঁশ আমরা ছোটলোক কি বড়-লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বাঁশ পরমেশ্বর চাটুয্যের মামে নীলকুঠির জামলে এ-অঞ্চলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে—আজই যা হয়ে আসি —প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরির মুখ সুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাসা করিলেন।

বিনু সরকার সহানুভূতিসূচক একটা চলন্তি শব্দ করিয়া বক্তব্যের খড় নাড়িলেন।

—তবপর জানুন মাসেই তার বেলত হল। এমন চামার—বেলত গরে বেহুতেই টেলায় আমাই এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার তালাইহাটি পুজো দিতে এসে তাঁর সেই মেয়েটিকে—তাকেই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমার না একটা সংসার, না কিছু। তারা আমার সংসার দেখে। যা আছি বেশ...

—দেখতে শুনতে?

—না! একদিন চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টেলায় পাঠিয়ে দিয়েছে।...থাক, তা চল যাওয়া যাক, দেখা হলে।...চেহারা কি ঠিক বলে?...শিশুদের চোখে মুখের চার দেখে সুবিধে হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আষাঢ় পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বুদ্ধলোকেরাও স্বীকার করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জন্মে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া অমপূর্ণা সযত্নে চালের গুঁড়ার খোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুটি ও রাণী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাণী বলিতেছে—আজ একটু জল দিতে হবে না, খুব ঘন করে ফেলেছ তো?

পুটি কহিল—আচ্ছা, ওতে একটু গুড় দিলে হয় না?

—ওমা, তুমি যা, রাণীর সেলাই কোথায় তুললে, এখুনি খুঁজে উঠবে...

অমপূর্ণা হাসিয়া উঠিলেন—সবে এসে বোস না, আগুনের ধারে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

সোনা তৈয়ারী হইয়া গেল...ফেলা আগুনে চড়াইয়া অমপূর্ণা খোলা ঢালিয়া খুন্তি দিয়া চাঁপড়া করিলেন...চৌকিতে চৌকনে দিয়ে আঁচে পিঠে ফোলবের মত ফুলিয়া উঠিল।...

পুটি বলিল—মা, ও-ও, প্রথম পিঠে-খানা কলাচ বাঁড়া-বর্ষাইকে ফেলে দিয়ে আসি।

অমপূর্ণা বলিলেন—এখন আসনে, রাধীকে দিয়ে যা।

খুব জোছনা উঠিয়াছিল, বাড়ির পিছনে বাঁড়া-গাছের জোপের মাথায় ফেলা-কুড়া লতার ঝোপে ঝোপে সাদা জুলের মতো জোছনা জড়াইয়া রহিয়াছে...

পুটি ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতে একটা শিয়াল খুড়লো পাতার খুড়মুড় শব্দ করিতে করিতে ঝাঁ জোপের মতো ছুটিয়া পলাইল। পুটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুড়িয়া জোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নিঝুম স্তব্ধতার নিস্তব্ধতার ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ দিদু হাঁটিয়া আসিয়া খিড়কী দরজার অর্ধেক দুটিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি আগ বন্ধ করিয়া দিল।...

পুটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অমপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুটি বলিল—হাঁ মা, তুমি আর বড় বেখানে থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে, সেখানে ফেলে দিলাম।...

তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ আটিয়া বসিল। পিঠে গড়া শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশী। জোছনার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে একটা বাঁড়-চোকরা পাখি ঐক্য-বু-বু-বু শব্দ করিতে-ছিল, তাহার শব্দটাও যেন ক্রমে তন্দ্রাদু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের যাইবার জন্য জলের পাড়া ঠিকিতে ঠিকিতে পুটি অন্য-মনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় জলবাসত...

কিছুক্ষণই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের দিদি-জনেরই দৃষ্টি জোর করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল... যেখানে বাড়ির সেই লোকী মেয়েটির লোকের স্মৃতি পাতায় পাতায় মিয়রে-মিয়ায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুটীমাছটি মরা জড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...অথচ জল এঁভাতিক মাসের শিশির লইয়া কচি কাঁচ সবুজ ডগাগুলি মাথাতে সব ঘরে নাই। রান্না হইতে আছির হইয়া ঘুমিয়াছে...সুপ্তিতে, নবম জ্যোৎস্নার ছবিতায় সাধের জলপুর।...

এভারেস্ট তার নতুন ধারা আপনি গড়ে তোলে

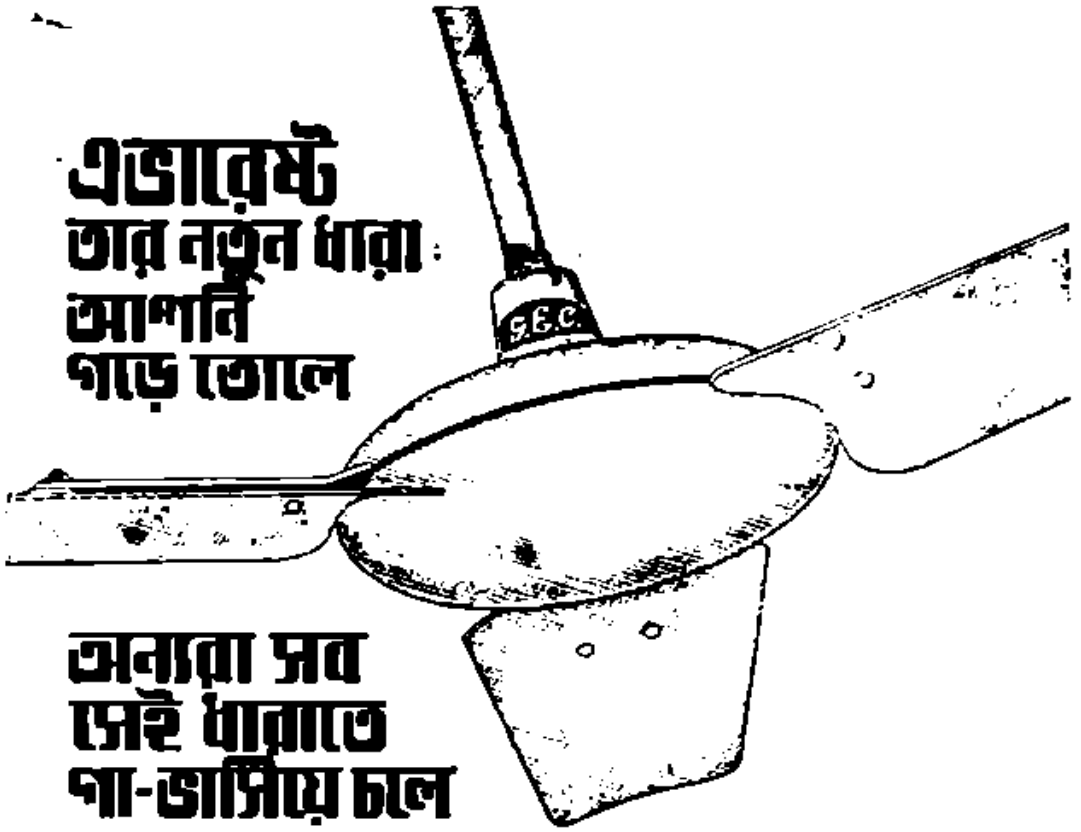

অন্যরা সব সেই ধারাতে পা-ডাসিয়ে চলে

GEC

জিইসি-র গর্বের সীমা নেই—

এভারেস্ট

এক নতুন ধারা গড়ে তুলছে বৈদ্যুতিক পাখায়।

GEC

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণকে আমি দেখিনি। দেখার বড়ো বাসনা ছিল। সব ইচ্ছা মানুষের পূরণ হয় না। আফশোস নেই। তবে আমি ওঁর একটা বড়ো ফটো দেখেছি। ফটোটা আমার এক বন্ধুর সাহিত্যিকদের বসার ঘরে টাঙানো। তিনি দীর্ঘদিন বিভূতিভূষণের খুব ভক্তকোটি ছিলেন। তাঁকে মাঝে মাঝে বিভূতিভূষণের গল্প বলতে শুনেছি। গল্প শুনবার আর ফটোর দিকে তাকাতাম। বিভূতিভূষণ তাঁর বড়ো বড়ো চোখ ফটো থেকে আমাকে দেখতেন, আমি সে চোখ সামাতে পারতাম না। তাকালেই চোখদুটো জীবন্ত হয়ে উঠত, সরল অকপট চাউনি আমার মনে হত বিভূ এমন এক চোখ মনের কিছুই গোপন করে দেখেছেন যার সঙ্গে আমার মত মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতে দেখা কঠিন। মনে মনে আমি নিচু স্বরে কথা বলতাম শুধু, আপনাকে আমি দেখিনি বিভূতিভূষণ। বড়ো ইচ্ছা হয় জানতে আপনি কিভাবে কথা বলতেন, কিভাবে হেঁটে যেতেন। নির্জন নিঃসঙ্গ বনভূমির নিঃশব্দ শোভা দেখতে দেখতে আপনার চোখ সবুজ-ঘাসফুলের মতো নিস্পলক উৎফুল্ল হয়ে। অথবা একটা ঘরে যেন বন্ধিদের গোরাতে বসে আপনি যখন গল্পকথকদের ভাক শুনতে শুনতে চুপচাপ হয়ে যেতেন, তখন যদি আমরা সবাই আপনার সামনে বসে সেই ভরপুর আমার গল্প শুনতে শোনাতে আমার ছিন্ন ছোটাছুটির বাত মিটে পারতাম কি ভালোই না লাগত।

আমরা এতাদের মানুষ বিভূতিভূষণ। আপনি জানেন না এখন আমাদের অবস্থার চাকের অবস্থান হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমারা যদি বাঁচার ভিতর থাকতে চাই তবে ইচ্ছা হয়। বিভূতিভূষণ আমার খুব ছোটো আবাদিক, জমা এবং সাহিত্য নিয়ে [illegible] পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, আমা [illegible] চেয়ে বড়ো হয়ে বলছে, গল্পে কাহিনী খুঁজলে চলবে না। নৈরাকার, বহুছন্দি, অলৌকিক এসব গল্পের কাঠামো হবে। বিষয়বস্তু ছুনো। এমন একটা অবস্থায় আমি কি যদি বলতে পারি আপনার মতন যে কাহিনী আমি আপনার গল্প লিখেছেন। অন্ধকার বনভূমির ভিতরে একটিমাত্র কেরোসিন জ্বালা সহসা যেমন অন্ধকারকে বিদ্ধ করে তোলে, গল্পকার গল্পের তেমন বিদ্ধতায় কেবল গল্প করে। আমি পড়তে পড়তে হারিয়ে হয়ে পড়ি। জলের ভেতরে প্রায় যেমন করে ডুবিয়ে দিয়ে আমার খোঁজ আমি যেমন আপনার গল্পের ভুব দিয়ে রহিস্যাদিকের সন্ধান করি। আপনার গল্পের মানুষেরা বড় বেশী রহস্যময়ের। বিভূতিভূষণ, আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে আমার সময় কেটেছে। এখন কিন্তু সে গ্রাম আপনার নেই—হয়, আপনার চলিয়ে। যেমনি আছে। মনে মনে ইচ্ছা হয় সহসা যেন আপনার গল্পের হাতে সহসার অন্ধকার পালিপথে ঢুকি দিয়ে। হাতে লণ্ঠনকে গ্রামের সকলের কি [illegible] ঘুরি, যেমনই চোর। যা সামনে [illegible] তাই ছুঁয়ে করবে। ফেলে আই যাই। ওই হাসির খোলক ফেলে দে শেষে মুখোমোমা ছাড়িয়ে নিয়েছে। হাতে এখন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে। তার পর এক পৌষের দিনে বাড়িয়া পড়বে আমিক উৎসব উপলক্ষে নিয়েছেন—যেন শীত পড়েছে, ফেলবার পথে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছেন, যে যেন তাকে আসতে আসতে, আপনি আপনাকে ডাকছে, আহ্বান করছেন। আপনি [illegible] বলছেন, তোমরা এই [illegible] অন্ধকার পথিপথ থেকে গল্প তো আসছে। একটা মেয়ে ঘোমটা পরা [illegible] পড়িয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের আলোয় সে [illegible] পড়িয়ে যাবার সময় [illegible] আলোয়াইকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে এখন আর হয়তো সে দিন নেই। সে [illegible] ঘরে ঘরে বন্ধ হয়ে আসে। হাতে [illegible] করে আপনাকে তার ঘরে নিয়ে। সে কাপড়িয়ে চা খাচ্ছে। আপনিও দিয়ে এবং অন্ধকার জীবন আপনার জীবনেরই সে দেখে তার আপনাকে দেখালো সহ। [illegible] গল্প গ্রামে সেই ছিল না, গ্রামের [illegible] [illegible] ছুঁয়ে করে [illegible] ঘোমটার [illegible] [illegible] ছুঁয়ে [illegible] নিয়ে যায়, [illegible] হাতে যে এই [illegible] সে এখন নিজের এই [illegible] দেখাতে পেরে কি আনন্দ! বিভূতিভূষণ, [illegible] ছোটো ছোটো মেয়েটির মতো তার চোখ [illegible] বারবনিতার জীবন আপনি [illegible] সেই তার এবং সে এখন আ [illegible] স্থির। এই পৃথিবীতে তারও কিছু [illegible] অবসর আছে। গল্প পড়তে পড়তে [illegible] বাসনা হয়ে আসে। আমি [illegible] বন্ধুরা—গল্পের কাহিনী খুঁজলে চলে [illegible] বড়ো এই বেশী যে কেউ দেখে ফেলে [illegible] তার তাড়াতাড়ি চুরি করে চোখ [illegible] চলতে থাকলাম আমরা এখন [illegible] সময় হাসতে জানি না কাঁদবার সময় [illegible] কাঁদতে পারি না—বড় [illegible] তিন ভাইয়ে বিভূতিভূষণ।

এই যেমন [illegible] কথা। ও প্রকাশকের [illegible] ভালো [illegible] সম্পাদনা সংকলন করা। [illegible] সে যদি আমার আশ্রিক হয়ে তবে [illegible]

সব কাজ সেরে তবে সে নিজের কিছু দেখে করবে। সেই রোগীর এক সময় কিন্তু, মানসিকভাবেই-পুরুষ ডাক্তার ডেকেছিল। কিন্তু তাঁর ভিতরে কোনো ভিজিট ছিল না। অথচ সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে নিজের জীবন দিয়ে একজনের দিন যাপন করিয়েছে একজনই। একজনের দেখা হয়। ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় চলে যেতে চান। এর অবস্থা কতদূর এই বন্ধুবান্ধবের একবার শেষ পরীক্ষা দিতে চায়। ডাক্তারবাবু বলেছিল অসুস্থ ছিল। কিন্তু তিনটে সে বাড়িতে এক সমান সাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে—আসলে সাধারণ এক হাসিখুশি সন্ধ্যাবেলা। ডাক্তারবাবু নদীর ধারে এই মহাবিদ্যালয়ে হয়ে সকল মানুষ কথা ছেড়া একটা ভয়ের ভাঁজ ভাঁজিয়ে পড়ে যায়, যেমন মধ্যরাত কাপড়চোপড়ের পরনে ভেজাল ভাঁজ তার ওঠানামানো চুল। ডাক্তারবাবুকে দেখেই সে ভোর হয়ে ওঠে। তখন, ছেড়া একদম ছেড়ে। ডাক্তারবাবু ভাবছিলেন ছেড়ে — সে সাধারণকে ছিন্নভিন্নই ছেড়ে এল না। একদিন নদীর ধারে সেই মহাবিদ্যালয়ে অন্ধকারের ভিতর একটিকে সব ভিজ-কাপড়—যা আগাতে চোখে ভিজছে কথা যায়নি, চমকে একাকার মানুষের বিজনসন্ধ্যায় উপায় ছেড়ে যখন ভাঁজির তখন কিন্তু আসলার পাগলী এমন সব ছোটিক জন্ত করে বেড়াচ্ছে, এমন ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটাচ্ছে—যেটা হয় না তাকে অভিনয়ের—মানুষের ভিন আসল ডাক্তারের সেই জন্তুর নিয়ে গেলেন। সব ছোটিক বহুমা, ডাক্তারবাবু মুখে একেবারে সব এক ছুটে ঠিকে থাকল। অন্তত, আসলার এইসব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে খুব বুদ্ধি বিশ্বাস ছিল। যদিও কোথাও একটি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। তবে সকল বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপরে এই বেলা একটা খড়। যখন তার ডাক্তারের চোখকে ভাবতে একজন মানুষের পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারি না। ডাক্তারবাবু যেন ইচ্ছা করলে আমাদের সহজে আসতে চক্ষুলজ্জা আসতে পারে।

সুশীলার আর তার ভয়ে [illegible] সব লিখেছেন, ভুলে যাবার কথা। সরল মুখ। মেয়েটি খুব ঠাণ্ডা ভয়ে আমাদের দেখত। আমাদের মুখে মুখে কথা শুনতে চাইত। তবে সুশীলার কি বিশ্বাস পাগলাই, সুশীলাকে মুখরা করতে আমার বড় কষ্ট হয়। মুখরা লক্ষণ বলে সকলের সকলে তাকে ঘৃণা করে। আমাদের আমা মেয়ের প্রতি টান আমি ভেবে ঠাকুরের ধন ছেড়ে সেকেন্ড তুলে আনে সে ভেবে এমন ভুলে যাওয়াতে পারলেই আমি আর প্রয়োজনে হবে না—ভুলে পড়বে না আমাদের। সে ভরসাও আমার, কোন কথাই খুঁজিয়ে আনতে পারে না, সত্য কিছুতেই মানুষ নিজের থেকে এটা-ওটার বলবার, যত পরিবেশে একমাত্র কাছ নিজে সাজী হেসেছে হবে, আপনার ভয়ে পড়ছে না, সাধুভাব একমাত্র কাছ পুরোহিত খুশি উঠবার কথা—একটি ও বোমা ফুটো আর চড়িয়ে পাও, ওখো যা হয় ফুটো কিছু যাব, হাতে পায়ে বলতে কেবল বাকি থেকেছি। আর আমা যে মেয়ে? এই বেলা পুরুষের সময় বলা একেবারে নেবে। অবোধ সুশীলা এক ছেলে সমানে জবান 'পাঁজলা' মাইনে আমা সাধী ত নই। আমি যখন সাধে তখন বলা চলবে। আপাতত খুশি হাতে ছেড়ে আসছিলাম আর তখন ছোট এক বছরের বলত, মোটা বস্তা কাপড়ে, জায়গা-জিনের সবার আমিনাদি, সবার আমি মনে একটা গল্পের, প্রচণ্ড গাঁয়ে তার গায়ে ছিল, নেই। সে ছোট একটা বাঁধাবাঁধি চাঁদ নিয়ে কড়ার ভিতর ঢুকল। আলবাট সাহেব পাঁচের প্রভাত আমির ভাবাবিষ্ট ছেলে। সে উঠানে দাঁড়িয়ে যখন যাত্রাভিনয় এবং নানাকর্মের সুরে তাপ্পু গান গাইছিল। সমস্ত বাহাদুর, বলে, আর মজা। এখন তখন দেখবার সময় নেই। আপনার সুখে চিন্তে সেই গ্রামে বলা সুশীলা অবাক হয়ে তাপ্পু গাওয়া দেখছিল। ছেলেটি গান থামিয়ে যাইবের ঘরে চলে গেলে সুশীলা সংসারের হাত আছে চলে গেল। বলল ছেলে কড়া কেমনে যে —ইন্দিরা

না উঠলেন। দুই হাঁটু হাত দিয়ে ধরে চুপ করে বসে রইলেন। ধীরেনের ব্যবহার তাঁকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছিল। সুনীলাকে ওদের ভিতর স্বচ্ছন্দভাবে মিশে যেতে তিনি দেখেছেন। তাই ওঁকে এ-ভাবে চলে যেতে দেখে—তাঁর কষ্ট হচ্ছিল সবচেয়ে—এই ভেবে তিনি উঠলেন না। সুনীলা ঝিয়ের হাতে চিঠি দিয়ে বলল, চাঁদা আমি আনছি। ঘরটা ঘুরে ওদের কাছে যেতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। জানলা থেকে একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। ভাবলেন, নিজে ওদের না দেখে... একজনকে তো পড়তে হবে। 'মেজিকুপে' সকাল সুনীলার মুখে তিনি শুনেছিলেন, আজ ওরা আসবে। আজ কি তারা, এত তাড়া থাকলে, খাওয়ার সময়টুকু নষ্ট করবে? তাঁর মনে হচ্ছিল, ওদের ফিরে যাওয়ার পথে ওঁর কাছে একবার আসবে। তিনি ওদের কাছে ডাকবেন। ওদের সঙ্গে কথা বলবেন। ওদের ভালবাসবেন। ওদের ভালবাসা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে দেবেন। ওদের ভালবাসা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে দেবেন। ওদের ভালবাসা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে দেবেন।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
খ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

বেদেনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বছর আসে। তাহার বাঁসিবার স্থানটা মা কালীর এস্টেটের অনুগ্রহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, 'জোকবাজি—হাতকরা'। ছোট ছাউনির প্রবেশ পথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটি সাইন-বোর্ডেও লেখা আছে 'জোকবাজি সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বহরের ছবি অন্যপাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে চল্লিশ ডেসিমার, অপর হাতে একটা ছিপ-মুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। জোক-বাজি অর্থে 'মোলকখানে'র খেলা। ভিতরে পাঁচ টাকাইয়া কাপড়ের পর্দার শম্ভু ফোটা লেপ লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিস্ময়ে বিস্ফারে সেই লেপের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের বুক', 'সিপাহীর বন্দুক', 'বাঘুলের পাহাড়', 'ডাকবিবির কবর', তারপর শম্ভু মোহনে ফিং দইয়া বেদেনী বেঁধার, সর্বশেষে একটা লম্বা ঠেলিকা দেখায় খাঁচার বন্দী একটা চিতাবাঘ, ঘণ্টাখানেক বাহিরে আনিয়া তাহার উপর শম্ভুর স্ত্রী রহিমা বেদেনী চর্পলা বলে, বাঘের সম্মুখে রহিমা দুইটি বহিমা টানিয়া তুলিয়া আপন বক্ষের উপর চাপ দিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটা চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপা পুরিয়া দেয়। সরল পল্লীবাসিনী স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রোধ করে দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া ওঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, বন্যজন্তুর দল বাহির হইয়া যায়, সর্বশেষে বন্যজন্তুটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাবুর দরজায় জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম, দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রহিমা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া করতাল বাজায়, ঝন-ঝিন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বড়? বড় বা—ঘ।

বেদেনী তখন জন্তুর বড় বাঘ কি করে? —পকেটমার ধরে। হয়, মানুষের চুমা খায়, জান্তব মানুষের আদা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতর দিয়া লম্বাটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়া ছোটা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ধীর আওয়াজ করিতে থাকে। তাবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিদৃপ্ত কৌতূহলে স্পন্দিত বক্ষে তাঁবুর ভিতরে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি রহিমা সরাইয়া লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এধারে বেদেনীর নিজের খেলা আরম্ভ হয়। তাহার সামনে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর মোটা অজগর সাপ। সকাল হইতেই সে অজগরটার ঝাঁপি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর খেলায় অবতীর্ণ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে অবশ্য একটা মানুষ হাড় আনিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেকটা বড় এবং কারণকরণেও অনেক জাঁকজমক আছে। বাহিরে দুইটা ঢোলা, একটা লোহার পাতির উপর প্রকাণ্ড একটা খাঁড়া বাঁধিয়াছে, নিম্নে উহাতে রক্ত আছে।

শম্ভুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে সন্তর্পিত ঘুরাইয়া দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তারপর আক্ষেপ-ভরা বিস্ময়কণ্ঠে বলিল, সালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমস্ত আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাব যেন জাগিয়া আছে। তবে নিষ্ঠুরতা-পরিব্যঞ্জক একমাত্রার উগ্র তামাটে রং আছে— শম্ভুর দেহবর্ণে সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন রুক্ষতা, মুখে কপালের নিচেই নাকে একটা বাঁক, সরুর মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সম্মুখের দুইটা দাঁত কোন্ শৈশব হইতে ঠোঁট ছিন্ন করিয়া অহরহ বাহিরে জাগিয়া আছে। ছিন্ন ঠোঁটে সে অহরহ ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রহিমাও ছিপছিপে, কালো ছুরি যেন আলোকের স্পর্শে চক্-চক করিয়া উঠে তেমনই ঝক-ঝক করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া, বহের খাঁচায় দিব সোকরের ছোকা ছেড়া!

বাঘের উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে বলিল, কে বটে, মালিক কে বটে?

কি চাই? তাঁবুর ভিতরে আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, হয় ফিটারও অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সুগঠ ও সরু, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হইয়া দেয়, স্বাস্থ্যই বোধহয় যেন একটা বলিষ্ঠের লাবণ্য অবশ্য অবে—লোকটির হইয়া, অথচ সরল মজবুত শরীরে যেমনি একটা লাবণ্য আছে। হয় বলিলেই, মানুষটি ঠিকলো লম্বা, চোখ দুটি সাধারণ, পরনে সাদা ধুতির ওপরে তুলি আঁকা গোঞ্জের মত এক ছেড়া গেঞ্জি সুচোল করিয়া গায়ে দেওয়া, মাথার বাবরি চুল, গলায় ঝুলানো একটা সোনার ছোট ঠোঁকা দুলি। সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল; দুইজনেই দুই-জনকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কি চাই? —নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কণ্ঠের সংযত সুগভীর স্বরের মধ্যে শম্ভুর নাকের নিম্নের ঘনস্পন্দন ফুস ফুস করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া তান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বছর এখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া রহিমার মতোই হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মল খাও টুকুস।

শম্ভুর শিরায় শিরায় রক্তস্রোত বাহিরের দ্রুত-তর গতিতে যেন গর্জিয়া উঠিল, রাহিকা। কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কাঁটা যেতল আছে তুহার মাগর—তল খাওগাইয়া?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রহিমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে ভরা হইয়া নির্বাক হইয়া চলে।

কলা সাপিনীর মতো আদিমতম রহস্যময়ী মেয়েদের সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার অঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া চুলের ঝাপটে মাথা মুছিতে মুছিতে, ঠোঁটে টিপ বঙ্কিম করিতে, টানা ধনু-নিক্ষিপ্ত কাঁপন ভ্রূবিলাসটি সৃষ্টি করিতে, সুডৌল দ্বিধাকুণ্ঠিত—সর্বাঙ্গের ব্যস্ততা। সে যেন রাত্রির সমস্ত সময় আর কাটিতে চাহিল; মাঝখানে তাহার সকলের বাহিরে কাটিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেন নিঃশ্বাসে টানিয়া সে মাদকতা, মেয়েদের অঙ্গের ঘুমও যেমনই ঢালে ঘনাইয়া দেয় যেন। শুধু রাত্রিকালই নয়, যেন আদিম মেয়েদের এই একটা রাত্রিজাত-ঘুম-বিশ্লিষ্ট নারিকার ঘুমের মধ্যে একটা ভয়ানকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ভয়ের মত বস্তুর ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র ভীতি, ঔষধের অন্ধকার, মোহকে পুরোপুরি অধিকার পাঠাইতে হয়। ভয়ের ঝুরুনি জাগাইয়া ফেলে, মুখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরস্পর বিজড়িত হইতে থাকে।

রাত্রিকার ঝিকা ঝিকা হাসি আজ নাই, সে নূতন রাত্রিকাকে বিস্ময়াভিভূত নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল,—কাল হয়ো ফেলা যে সারাদিন?

রাত্রিকা এবার হাসিয়া বলিল, ফেলেন কাছা যো আছি। ফেলে কাল ঘুমে ঘুমে ঘুমাব। এস।

তবু সন্তু, এই অদ্ভুত আগন্তুক যে কিসিয়া কখনো যায় না। উহারা অনুকরণে ফেলেই করে, ধরেও পড়ে, ফেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব অমন ছাড়ে না।

শালের বিছানার নিকট পর্যন্ত হাতের এ অপরাধটা আর সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্তুর বুকখানা নিঃশব্দে কাঁপিয়া এরফানি হইয়া উঠিল। আত্মসম্ভ্রমও তাহার সজাগ; মহুয়া—। সে রাত্রিকার কিছু কিছিয়া কাঁপন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেন এখানে?

রাত্রিকা এবারও ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বলে তুমার! আমি কব যাবে নাই?

তাহার কিছুতে ছোট একটা ধাক্কা খাইয়া সন্তু বলিল। রাত্রিকার পরণের লালের টুকরা টুকরা যত্নের কুচি এ এক রাশি ছাড়ি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; একটা পাতায় একগুচ্ছ ঘুনিসুতা আছে, আর একটা পাতায় অজস্রকুলা ঘুনি, সোনার, লাল, ঘুনিসুতা নয়; দুইটি আলি যোতন পড়িয়াছে, একটা যোজা অসমাপ্ত। বিছানাখানা একটি মেয়ের ভোরে পরেই মেয়ের আচরণ হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল বন্যার মুক্ত, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া উদ্ধৃতভঙ্গিতে বালিশে আশ্রিত, মুখে তখনও অমন মেয়ে ঘুমঘুমের রঙ লাগিয়া আছে। ঘুমেঘুমে আলস্যশিথিল মেয়েমানুষ।

রাত্রিকা তাহাদের দেখিয়া আবার ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমার মেয়েমানুষ ই কি কাটা একখানের নাকি পড়ছে গেল।

নূতন রাত্রিকার হাসির তরঙ্গের সে ঘনিষ্ঠতা শুধু রাত্রিকাটা অনেক দূরের হইয়া একটা আবার ঘোমটা মাটি সরাইয়া মুখটা মেলিয়া ধরিয়া ভাসিল।

তার মাইতে মাইতে কথা আরো বলিবার রাত্রিকাটির নূতন রাত্রিকার আর বাকি।

সন্তু চঞ্চলতায় অনেক পরাস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। তবুও শত্রু আর রাত্রিকাই রাত্রিকা বলিল, কি এমন সে তুমার রাত্রিকার?

নূতন রাত্রিকার কাঁচা দিনের কাটিকাটা প্রশ্ন কাটিয়া বলিল, এমন মুখপোড়া রাত্রি তুমাকে যেমনটা।

যেমন?

এমন মাটি কিছুটা যেমন।

তা আমি কিসে যেমন?

তুমার নাক যে রাত্রিকা যেমনটা, তাই মুখপোড়া।

রাত্রিকা ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, অনেকক্ষণে সে তাহার কাকলীর ঝিলিক হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কি ভাবিয়া নূতন রাত্রিকাকে পাশে ঘুমন্ত ঝিল বলিল, এই আলিয়া নাম তোর কি ছোটো যেন?

সন্তু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিসিয়া যেন কিসু হইতে আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো ফেউটের বাচ্চা তাহার সর্বাঙ্গে ছিল ঘিরে পরপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুনিসুতার ঘুনিয়া ঘুনিয়া ঘুনিয়া উঠিল; সন্তু ঘিরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আ—কারা। অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিন্তু কিসু মুহূর্তে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া ঘুনিসুতে আনন্দও করিয়া দিয়াছে। ঘুনিসুতে ঘুনিসুতে সে ডান হাতে ঘোঁচ হইতে ছোট একটা ঘুরি বাহির করিয়া ফণি দিয়া ঘুনিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুইটি কাটিয়া ফেলিয়া রাত্রিকার পাশে তাহার ঘুনিসুতা দিল। রাত্রিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু হাসে সে মুহূর্তে পূর্বের ওই মাসটা। মরাই ঘুনিয়া উঠিল, বলিল, তুমার সাপ তুমি কামাইলা ফেলে?

কিসিয়া বলিল, তুমি যে তখনো সো সময় করতে। —বলিয়া সে এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাত্রিকা মুহূর্তে অন্য মানুষ হইয়া ঘুনিসু হইতে ঘাটির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন ঘুনিসুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। মাঝিরে আজ মাঝিরা স্টোর ওপর বাজনা আজিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা সোরগোলময় অথচ অনুনিময় ঘুনিসুতা হইতেছে। রাত্রিকা আপনাদের ছোট ঘুনিসুতে মাঝিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের খেলার ঘুনিসু এখনো আসিয়া পড়ে নাই।

রাত্রিকা মুহূর্তে কিসিয়া ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমার মেয়েমানুষ ই কি কাটা একখানের নাকি পড়ছে গেল।

নূতন রাত্রিকার হাসির তরঙ্গের সে ঘনিষ্ঠতা শুধু রাত্রিকাটির নূতন রাত্রিকার আর বাকি।

সন্তু চঞ্চলতায় অনেক পরাস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। তবুও শত্রু আর রাত্রিকাই রাত্রিকা বলিল, কি এমন সে তুমার রাত্রিকার?

নূতন রাত্রিকার কাঁচা দিনের কাটিকাটা প্রশ্ন কাটিয়া বলিল, এমন মুখপোড়া রাত্রি তুমাকে যেমনটা।

যেমন?

এমন মাটি কিছুটা যেমন।

তা আমি কিসে যেমন?

তুমার নাক যে রাত্রিকা যেমনটা, তাই মুখপোড়া।

রাত্রিকা ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, অনেকক্ষণে সে তাহার কাকলীর ঝিলিক হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কি ভাবিয়া নূতন রাত্রিকাকে পাশে ঘুমন্ত ঝিল বলিল, এই আলিয়া নাম তোর কি ছোটো যেন?

সন্তু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিসিয়া যেন কিসু হইতে আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো ফেউটের বাচ্চা তাহার সর্বাঙ্গে ছিল ঘিরে পরপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুনিসুতার ঘুনিয়া ঘুনিয়া ঘুনিয়া উঠিল; সন্তু ঘিরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আ—কারা। অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিন্তু কিসু মুহূর্তে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া ঘুনিসুতে আনন্দও করিয়া দিয়াছে। ঘুনিসুতে ঘুনিসুতে সে ডান হাতে ঘোঁচ হইতে ছোট একটা ঘুরি বাহির করিয়া ফণি দিয়া ঘুনিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুইটি কাটিয়া ফেলিয়া রাত্রিকার পাশে তাহার ঘুনিসুতা দিল। রাত্রিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু হাসে সে মুহূর্তে পূর্বের ওই মাসটা। মরাই ঘুনিয়া উঠিল, বলিল, তুমার সাপ তুমি কামাইলা ফেলে?

কিসিয়া বলিল, তুমি যে তখনো সো সময় করতে। —বলিয়া সে এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাত্রিকা মুহূর্তে অন্য মানুষ হইয়া ঘুনিসু হইতে ঘাটির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন ঘুনিসুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। মাঝিরে আজ মাঝিরা স্টোর ওপর বাজনা আজিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা সোরগোলময় অথচ অনুনিময় ঘুনিসুতা হইতেছে। রাত্রিকা আপনাদের ছোট ঘুনিসুতে মাঝিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের খেলার ঘুনিসু এখনো আসিয়া পড়ে নাই।

সন্তু মিনিটেই একটা পরাজয়ের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আরও একটু দূরে আর একটা পরাজয় নিজে নিজের পরিচয়ের কিসিয়া। নিজে আর বেশিক্ষণ। তাহার ভিতরকার কাঁপন থেমে। তাহার ঝিমুনি ভাব। ভয়ে। ভয়ে ঘুমে উঠিলাম। তাহার ঘুমে ঘুমে। ঘুমে ঘুমে ঘুমে

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অন্ধকারের মধ্যে চক্ষু ঢালিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘোরে আচ্ছন্নের মত রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেহায়া তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের নগণ্যতাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পরেও, তুই তো বুড়ো। রাধিকার বয়সের কুলনায় তুই বুড়ো মাত্র আর কি? রাধিকা এই সবে যৌবনে পা দিয়াছে। সে কি আর পড়িয়া শম্ভুকে বলে, পরিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সহজ কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেচুর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল দৃষ্টি, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঘ, ভালুক এ সবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ঝাঁপা বুনিত, চেয়ার-পালঙ্কের বাঁকারী করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারী করিত; তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশী। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া হইত; সে কাজে ছায় বসিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস; রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঘের, ভালুক। শিবপদের সঙ্গে আরও একটি বস্তু থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা। থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদের আরও কতকগুলি গুণ ছিল: তাহাদের সামাজিক মজলিসে লোকের অসুখেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এক ফোঁটা পরও কিন্তু কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এই কথা তাহার মুখেই শুনিয়াছে রাধিকা। মুখে করিত। মায়ের কথা [illegible] তাহার। আর শিবপদ ছিল [illegible] মত। উকারচন্দ্র সাহা [illegible] বাড়ির কাছে। তাহার ছেলে [illegible] ছবির ওপর সাদা সুতোয় [illegible] ফোঁড়াইয়া দিবে। শিবপদ যাবে মাস সেই কাজটি [illegible] পাঠাইয়াছে।

এই সময় [illegible] হইতে কল বছরের নিরুদ্দেশ থাকার পর [illegible] এই শম্ভু। সঙ্গে এই বাচ্চা, একটি ছোকরা বাবু আর এক কিশোর বোষ্টমী। বাবু ও বাবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যৌবন শম্ভুকে দেখিয়াছে, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই ছয় শিবপদের, ঈশ্বরদত্তি শম্ভুর বাল্যবন্ধুর মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিয়াছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত; সে-ই প্রথম জিজ্ঞাসা বলিল, এই মেয়েটী, চোখ কুল সাপ খেলে?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে খিল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, নামারের পর দেখি যে খেলে? পরলা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পরলা দিব না; দু মাস দেখানে আমি বাস করব।

সমস্ত রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনি অদ্ভুত কথা; হাসে যখন দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সাঁচা বলছ?

কেন, কেন, আগে আমার বাত দেখ? সে তাহাকে হাতে ভিতর লইয়া নিজে সবই বাত দেখাইয়াছিল। রাধিকা সন্দিগ্ধস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ঐ বাত নিয়া তুমি কি কর?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ?

হাঁ, দেখবি তু? বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা ধরিয়া দুলিয়া বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইসব সাপ দেখা আছে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, ওটা তুমার পেছে মেরেছে?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঠকাইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, হাথিটী দোস জানোয়ারে আমিও ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, একবিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মনের ধরণ যদি বা একটু ঘুরে থাক, লজ্জা ধরণ ঘুরে যায়, দুনিয়ার কাউকেই তাহার অন্তর দিয়া দিয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ধিক্কার করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার জীবনে শিবপদের অভাবই শম্ভুর এই বাড়ি ও খেলার জন্য অসময়ে খেলা বন্ধ করিয়াছিল। সে সব এখন অতীত বিস্মৃতির অন্তরালে। শুধুমাত্র দিন চলে আজকাল; শম্ভু যায়া রোজগার করে, সবই খেলায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি বিষয়ে কখনো দুঃখ করে নাই। তার যৌবনের বিনা, এই কথা বলিল? সে একটা মনের বোতল বাহির করিয়া বলিল।

সহসা তাহাদের বাড়ির বাঁধানো শম্ভুর দুঃখ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ঘরটার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিশোরী। তাহার পরনে ঘাগরা-সেমিজ, চোখে কাজল, সেই তখন বলিতেছিল, কেবে, ইবে বোষ্টমি কি হলো? তুমার মনে নাই, আমলোর খেলা হচ্ছে। খেলা দেখবার সেওয়া কিনার, তা দেখেছ কি হলো?

শম্ভু চিনিতে পারিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার। অপমান করতে আসিছিস তু।

কিশোরী কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বে উত্তেজিত হইয়া রাধিকা একটা ছুট ছুড়াইয়া দিয়া সজোরে ঘরকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়া বলিল। অকস্মাৎ লক্ষ্য কিন্তু কিশোরী অদ্ভুত, সে কলের মত সেটাকে লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ছুটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল; কিশোরে রাধিকা সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ষিত উত্তেজনায় আরও একটা ছুট ছুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিরস্ত্র করিল, সে সময়ে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। রাধিকা কিশোরে আবেগে শম্ভুর বুকে ঝরঝর করিয়া খোপায়া খোপায়া করিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই খেলায় আলো জ্বাল নিয়ে আসব।

ওদিকে তাহাদের কিশোরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভিড় জমিয়া গিয়াছে, খেল বন্ধের, খেলে যে পড়েছে।

ভিড়ের একটা মেয়ে কণ্ঠে দিয়া রাধিকা খোঁপা, ভিড়ের অনেক পুরুষ ভিতরে, অর্থাৎ ভিতরে যা খেলেও তাহারা কেন দেখিতে পায় না। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, বিষ আনে ধরাইয়া ভাবছে!

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিশোরী চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিন্তু, তার কল তুমি, নইলে

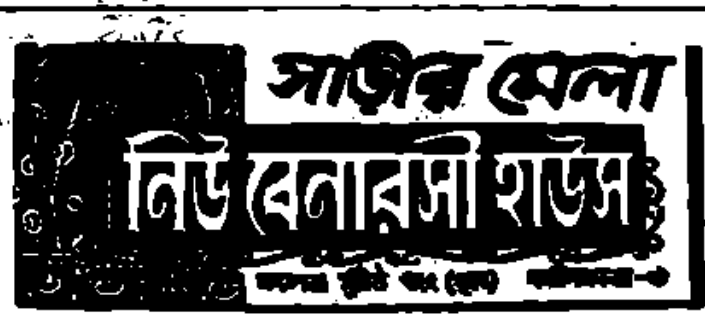

চটপট দাড়ি কামানোর জন্য

কন্সুলেট

ব্লেড

[illegible]

আজই "কন্সুলেট"এর সহিত পরিচিত হন।

জি. এবারহার্ড এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

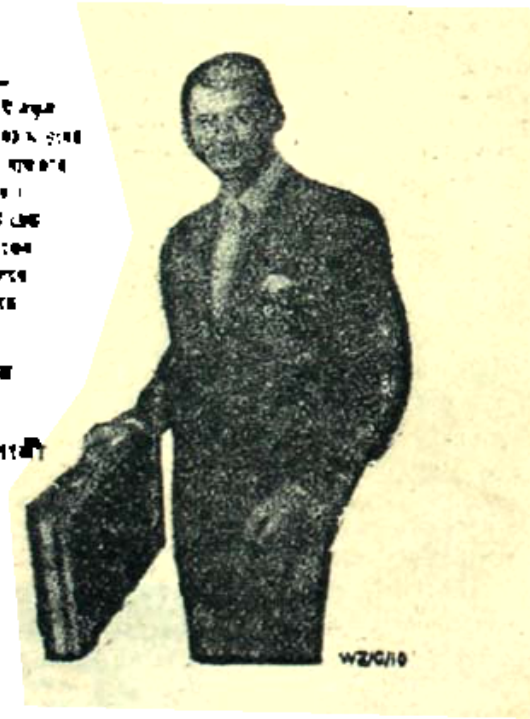

বন্ধুটী হবে, সেই দেখবে না খেয়ে আমাদের !

বন্ধু সাহেব মাঠ ছাপিয়া বলিল, আমি পুলিসে খবরটা দিয়ে আসছে। মনের সন্ধান দিয়ে।

ওদিকে ঝিয়া পাখিদের আনন্দ কাকলি, সেই মেয়েটী তাদের উপর ছাড়া বাদাম দিয়া আসিল, আবার সাহিত কিসেরী লড়াই করিল, হা—একটা খাবা বসাইতে মিস যাবটী।

রাখিকা আনন্দালয়ের খেলার টেবিলের কথা ভাবিয়া মন মন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! সঙ্গে সঙ্গে আনন্দালয়ের দুর্দিনের ছবি ভাসিয়া উঠিল। তাহাদের আনন্দে বাঁধিয়া দুঃ করিয়া জলিয়া যায়। কেমনেসির ছেলে গালিয়া আনন্দে বসাইয়া দিলে কেমন হয় ?

পরদিন প্রভাতে উঠিতে রাখিকার একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, বন্ধু নাই, সে বোধ হয় পুই অবাক্ষণ মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিসেরীর বাড়ির চারপাশে পুলিস বাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা দাঁড়িয়া আছেন। একি ? সে সভয় চিত্ত দারোগার সামনে গেলায় করিয়া দাঁড়াইল, দারোগা তাহার আপাদ মস্তক বেঁধিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা বাড়ি দেখব।

আমার গেলায় করিয়া মেহেরী বলিল, কি বন্ধুর করলায় হুজুর?

মন আমে কিনা দেখব আমরা, ডাক মেয়েছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাখিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই বাড়িতেই লোক ডাকিতেছেন, কিন্তু সে তাহার মূল তাৎপর্য না। সে বলিল, ভিতরে আমার কাঁচ ছেলে রইয়া—হুজুর—

আচ্ছা ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর কেউ পাও পুরুষদের।

রাখিকা মুখ বাঁধুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা তারস্বরের আলনা খাঁটি খুলিয়া দেখিল, কিসেরী যোদ্ধার ড্রেসটা নাই। সে একজন সঙ্গে লইয়া তাই করিয়া যোদ্ধার ড্রেসটিকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া রাখিল যে, পাঁচের দিনে সমস্ত বন্ধুরের অবাক তাই নিয়ে তাড়া আর হেরিকেনের দরকার হয় না। বাঁধুর মধ্যেই কিসেরী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছিল, পায়ের চোট দিয়া তাহাকে জানাইয়া দিয়া রাখিকা বলিল, পুলিস আসবে, ওরে ছইয়া দুয়ারে, উঠে যাও।

সে অবশিষ্ট সমস্ত পদক্ষেপে পলায়নের রাস্তার ছক কিসেরে যেন বুকে বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল। আহার কিসেরে কিসেরী আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা গর্জন করিলেন, এই তাঁবু তোমার ? তোমার তাঁবুর কিসেরী বলিল, জী, হুজুর !

দেখব তাঁবু আমরা, মন আছে কিনা দেখব।

তোমার কিসেরে মতো কিসেরে খুঁজে তাঁবুর কোথাও তন্নতন্ন করিয়া কিছুই পাওয়া গেল না।

বন্ধু খুব হইয়া বলিয়াছিল, রাখিকা উপরে হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। বন্ধু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। বন্ধু কিসেরী আসিলে কিসেরে কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে তাহাদের অবাক্ষণ-বাহিনী আসার আগে ধরিয়া পুলিসকে দিতে পারেনি—এই তোমার সমস্তে বিধি পরোয়ানা-পাঠাবে।

বন্ধু কর্তিন আনন্দালয়ের দুর্দিনে রাখিকার দিকে চাহিল কাঁদিল, রাখিকার সে-দিকে ভ্রুক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাও, ছেলে খাও ?

বন্ধুর আচ্ছাদিতে তাহার মুখের দুটি করিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া-করিয়া, শুধু মারি করে নিষিদ্ধ খুঁ। উহাকে লাথি মেরেছে নিবার লাথি পুলিসে ধরে এলাম, আর তুমি কাঁদিলি এই জন্য!

রাখিকা প্রথমটায় ভীষণ ভয় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বন্ধুর—[illegible] পুলিসই তাহার মাই পড়িয়া—মেরে খুব বাহির করা। সুতরাং একজন বন্ধু তো বলিয়াছিল ! সে আর ভয় করিল না, নীরবে বন্ধুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ রবিবার। হইতে এ তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে। বন্ধু, রাখিকা, মাঁই পুরোহিত গোলাকৃতি দুইটি করিয়া, এ ছাড়া একটী আলো ব্যাঙ্ক, ছাড়ার ঘড় সব্ সাজানোগুছে আর একটি আসে, হয়ত ঘণ্টা-হাত ফোঁ। রাখিকার সমস্ত পুরোহিতো বাজনা আর অভ্যাস পুরোহিত একটি-দুটো হাত ধরিল। আর সমস্ত বাজনা ফুল সে-খেলী বাঁধিয়া ফুলাইয়া দিত; কিন্তু আজ সে খেলাই বাঁধিল না, আনন্দালয়ের সকল প্রকার বীরত্ব ও ভীরুতার প্রতি অবজ্ঞার কোতে তাহার যেন বন্ধুর বাঁধিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে, বিশেষ সেই বিকলাঙ্গ মহ, খাল-খোঁড়া, অন্ধিয়ার, মত সুলোকী খেলোয়াড়দের পুরিয়াছে সেখানে পুরিয়াছে পায়ানা, আনা, বাজার উপর বাঁধিয়াছে, সমস্ত সার্কাসের একটা আনিয়াছে, [illegible] ভয়ের বাঁধিল, পুলিস মেরেছে, সে সুখী মেরেছে। উহাদের উপরওয়ালার বাহনের মতো ভাঙা-পিঞ্জরের বাঘের আক্রোশের মত একটা রেল মেরেছে, ভয়ার দিয়ে চড়ে। আর এই কয়জনের পুরোনো চারপাশে আনাচ, ছি—!

কিন্তু তবুও সে চারপাশে চেষ্টা করে, আরো জোরে পলায়ন করে।

বন্ধু হাসনা খামাইল হইল, ও-হো-হো-হা-হা!

রাখিকা মুখ তার কেন আরো নাক করিয়া লইল চুপ করিল, বড় বাধ কি করে?

বন্ধু খুব উৎসাহ ভরেই ফুলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে খুব করে, মানুষের মাথা খুব ভয় চিবেও খা।

সে এবার নাক দিয়া নাসিকাগর্জনের দিয়া বাঘটাকে খোঁড়া দিল, ভীষণ বন্ধু ঘন-ঘন সিংহে আক্রোশের মত গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও তাঁবুর ভিতর হইতে সকল পশুর ভয়ে দিয়ে চুপ মারিয়া গুলিত হইয়া উঠিল, বাঘার উপরে রাখিকা পড়িয়াছিল, তাহার শরীর যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়া উঠিল। চুপ হিংসাকায় বন্দিতে সে এই বাঘের আচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিসেরী হাসিতেছে, রাখিকার সহিত চোখা-চোখি হইতে সে হাসিল, কিন্তু একেবারে।

তাঁবুর ভিতর হইতে সৈরভীর বাঘ খোঁড়া খাইয়া উঠিলে বাঘটা একবার চারপাশের পরিবেশে চুপ করিয়া উঠিল, রাখিকার চোখে জলবিন্দু উঠিল জমিয়া। ভয়ের শিহরের মত কিসেরে তাঁবুতে চুকিল।

বন্ধুর তাঁবুতে অনেক অচেনা লোক সমস্বরে আক্রোশ করিবার জন্য চুকিল, বেলা শেষ করিয়া মস্ত অনেক আসা গিয়া গেল। বন্ধু ফিরে খুব ভীষণ করিয়া বলিয়া রহিল। রাখিকা চুপচাপে খেলার মতো বাহির হইয়া গেল। কিন্তুক্ষণ সবাই সে কিসের একটা কিসের চিন লইয়া।

বন্ধু বিরাট সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি হৈ?

কেমাচিন। জানবে আসবে ফিরে ঐখানে-তাঁবুতে। পুরা খেলা নাই, পুরুষের ভয় ভাঙ্গে, তারপর ঠোক জমিবেছে।

বন্ধুর চোখ ফিরে লাঁচিতে জমিয়া উঠিল। সে বলিল, ফিরে আর চল।

সব যাইতে যাইতে রাখিকা বলিল, বাঘটা আরো ভয়ে ভয়ে ভয়ের মতো।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে উৎসবের মতো বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, এই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ফোঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিসেরী সকিতে ঝুলানো ফুটের মতিতে খেল খাইতে খাইতে ফলার দেখাইতেছে, উঃ, একটা রাখিকা আর একটা বাঘিনী চুলিতে লাগিল। মনুষ্যেরা ভয়ানক দিতেছে।

ছোটদের বিয়াল য়

বন্ধু হাসিয়া অবশেষে কহিল, এখনো লজ্জা যায় নি দেখছি।

যাহোক আসরে জমে গেছিল বলিল।

সমস্ত মেয়েরা খানা খাইয়া, অন্ধকারে সব ভাঙিয়া উঠিল। মেয়েরা উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য ও হরু চোখে ঘুম আসে নাই। বুকের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ, মনের একটা পূর্ণতায় ছলছল সে অহরহ যেন পরিপ্লুত হইতেছে। সে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল, পড়ে অন্ধকার ঘনঘন করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে বাহিরে এসিড হইতে রক্ষা পাবার ছাউনি আসিল, কেহ কোথাও নাই। সে ভাবিল ঢুকিবে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালাইল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর বন্ধুকে ডাকিতে লাগিল, সে পাশে ঘুমুরের মত কৃষ্ণচূড়া সাজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ঝোরে ঘুমন্ত বাহিরের ঘর ঝিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল, জমাট ঝুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে। সে বন্ধুকে ডাকিল না, দেশলাইটা ঘুমের খোঁপায় গুঁজিয়া টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহিরে বাহির হইয়া গেল।

এই নিস্তব্ধ নিশি হইতে নিতে হইবে। গলিটা পার হইয়া হাতে এসিডের টেলাটার লোকে আলোয় দিখা দেখিতে পাইবে। ঘুরে ফিরে সাবিত্রীর ঘরেই সে অন্ধকারের ছায়া মিশিয়া এক হয়ে করিবে ঢালিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে দুহাতে আরও করিল।

চুল করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিস্ময় করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাতের ভিতর একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কাপড়টা সন্তর্পণে ঠোঁলিয়া বুক পাকিয়া মাথাটা নামাইয়া দিল, সমস্ত হাতটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া মেয়েরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, দেশলাই ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া এক করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তারার কাছেই এই যে কিসেটা একটা অসুরের মতো পড়িয়া আছে তাহার খবর কি? সাবিত্রীর হাতের কাঠিটা জ্বলিতেছে লাগিল, কিসেটার কঠিন সৃষ্টি মধ্যে কী সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া! হাতের দেশলাইয়ে কি নিটোল। তাহার আশেপাশে ছোড়ার ফুলের লাল—ফুলন্ত ছোড়ার পিঠে কিসেটা মাথিয়া রেখে। ঐ যে কাঁধে লম্বা ফুটচিহ্নটা—ওই সুগন্ধি সবল বাহুটার কথের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

সাবিত্রীর বুকের মধ্যেটা হোলপাড় করিয়া উঠিল, যেন কাঁপিয়াছিল বন্ধুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উলঙ্গ যেমনী মুহূর্তে ধারা করিয়া বসিল তাহা স্বপ্নের মতোই, সে উলঙ্গ আবেগে কিসেটার সবল বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িল।

কিসেটা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু চকমাইল না ক্ষণি মাথাটিকুখানি সবল আলিঙ্গনে বুকে করিয়া বসিল, কেহ নাই—

হাতের মুখ চাপিয়া ধরিয়া সাবিত্রী বলিল, চুপ।

কিসেটা চুমায় চুমায় তাহার মুখ ভরিয়া দিল, দাঁড়াও, মুখ আসি।

না, চল, ঐ একলাই ইখান থেকে পালাই চল।

সাবিত্রী অন্ধকারের মতো চমকাইয়াছিল।

কিসেটা বলিল, কুথা?

দুজনে কলকাতায়।

কলকাতায়? ই বাবুটোকে—

হক সত্য। ঐ ওই বন্ধু নিবে। তুমি উহার সাথিকে লিখে, উহাকে লক্ষ দিয়ো না।

সে নিমেষের খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উলঙ্গ যেমনী—তাহার উলঙ্গ মুখের—কিসেটা নিয়া কাঁদল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া সাবিত্রী থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা বন্ধুর বাবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মজুক বুড়া পুড়ুক।

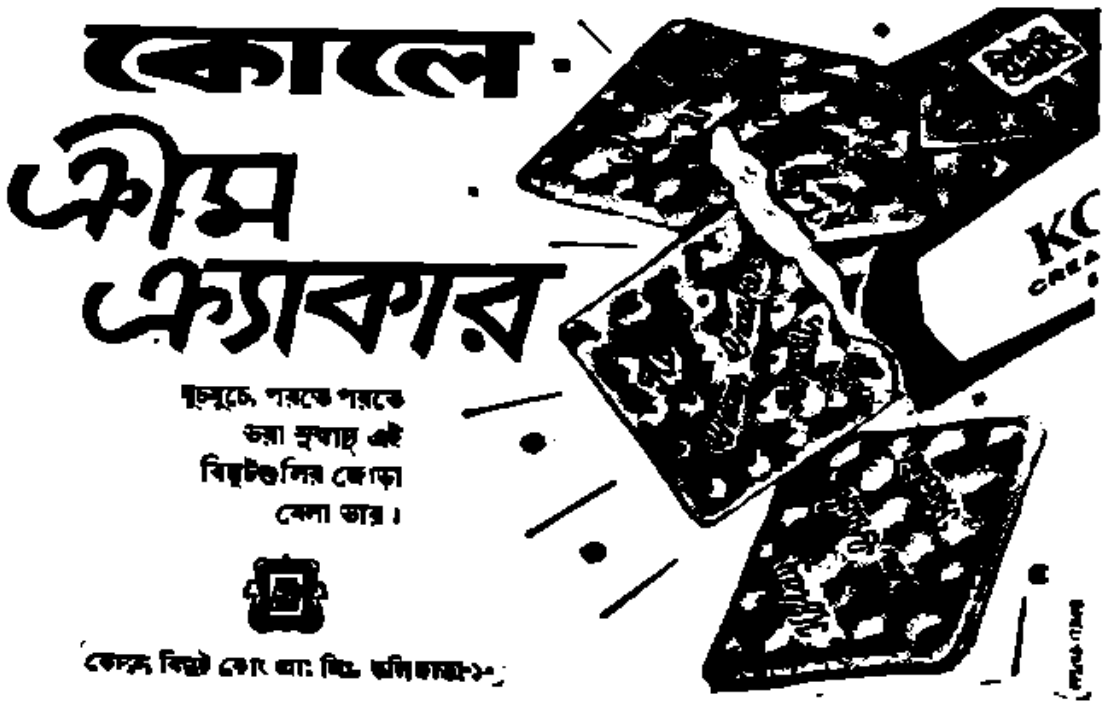

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছেন, তারাশঙ্কর সম্পর্কে লিখবে কী? একটা বিরাট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন—সুবৃহদাকার ভয়ংকর; পায়ের নীচে দাঁড়ালে তো কিছুই দেখতে না। পিসির জেনসে দেখাবে নাকি?...উনি হেসে উঠলেন হো হো করে। কথাটা ওর পায়ে দেবার নয়। কিন্তু ধরে গড়লাম না। সস্নেহিত জবাব দিলাম, বাইরে থেকে এগোলে যাই বটে—তবে সে পথে আমি যাচ্ছিনে। প্রতিমূর্তির বাইরে যে-তারাশঙ্কর, তাঁকে নিয়েই আমার যত বড়াই। কবিয়ালের চেনা মানুষ!

এইরকমই ভেবেছি বরাবর। আজও তাই ভাবি। কবিয়ালের চেনা মানুষ। আর সেই মানুষ আমার কবিয়ালের চেনা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন—জলন্ত কাশেহাতে, মুঠোয় ধানের শীষ, সারা গায়ে সোঁদা মাটির ঘ্রাণ, ঘামের ফুটো, অক্ষর কুড়ো, সামনে শ্যামলে সবুজে বিস্তীর্ণ মাঠ—শিয়রে যাদুকর কুয়াশার নীল যবনিকা, কখনও কোন অজয়ালয়ে খেয়ানৌকোর বিরহ পাটনী, কখনও সাপের ফণীপর সামনে হটিগেড়ে বসা বেদে, আবার কখনও শান্ত সন্ন্যাসী—রক্তলাল চক্ষু, গায়ে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, শিবলিঙ্গ কেশে জটা ...কত রূপই না মনে ভেসেছে! তবে গণ্ডগ্রামের বাউলপুরুষ বলেছেন, এই মানুষেই মানুষে আছে বসে। সেই আসল মানুষটি বড় রহস্যময়। বড় বিচিত্র তার আবরণ। সেই আমায় ঘুরিয়ে মেরেছিল—অস্থির করেছিল। খেলা করছিল আমায় নিয়ে।

একে যদি তার জীবনরহস্য বলি, সব খোল মিটে যায়। এ রহস্যের যে স্বাদ—তা রোমহরসের। মানুষের মাটির গন্ধে সে স্বাদ আজীবন প্রাণভরে নিয়েছি। এতে যেটুকু বা বিরক্তির আছে, তাও একসময় হঠাৎ কেটে পড়ে। মাটি মাটি জলে ওঠে। আলমারীর বিরক্ত সন্ন্যাসীকে পরিষ্কার দেখলাম 'কুয়াশার' মজোরে ভালবাসা করে বিপুলবেগে দিক-খুলে ছুটছেন ছুটছেন। চরম বিস্ফোরণ! আর নিশ্চিহ্ন যে—আর নিশ্চিহ্ন যে—একাকারের সত্তায় মগ্ন হয়ে...আর কথা শোনা গেল না। হাতের মুঠোকে খুলে সবকে আসিয়া একসাথের প্রত্যয় আছড়াইয়া পড়িল।'

তারাশংকর ছাড়া জীবনের এ 'অবক্ষয়, অন্যায় মহের দিকে, ইতিহাসের গতিহরণ বাস্তবতার দিকে, আর কার সাধ্য ছিল হাত ধরে এনে পৌঁছে দিতে? আমার মনের ভিতর, কে জানে কেন, চিরকাল পাশুপতি রাজের এক ঘাঁটিবেদী উপর কাঁচিল মুখ-ছিলকে সন্ন্যাসী লালচোখে অবাক চেয়ে বলেন—কী দেখছিস বলটা? ফলল, ভাল করে লাভ। আমার হাত ধরে সন্ন্যাসী এগিয়ে করে জীবনকে দেখতে বলেন। সমস্ত ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য সুখের-অসুখেরকে একাকার করে, অন্তর্লক্ষ্যহীন ছুটে করে, উল্লাসের মত সমানে এসে দাঁড়ায় জীবনের বিস্তৃত। ফলল ফিরে আসি, কপালে আমার মানুষ মানে বিস্ময়ের চক্রবর্তিত কিন্তু সিদ্ধহস্তেরা। পৌত্তলিক হয়ে ফিরি।

সাহিত্য আলোচনার আজকালকার বলে একটা কথা আছে। ও নিয়ে মাথাব্যথা কিন্তু নেই না। এক অর্থে ওটা সত্যও হতে পারে। সব সাহিত্যিকই আজকাল-ভিত্তিতে লেখেন। কিন্তু কখন কোন সমা-লোচক পুরুষপরীক্ষা করতে বলেন, অমা-মানুষ প্রকৃতিপরী আলোচনা মাটি ও মানুষকে সাহিত্যে অবিলম্বন করেছেন—আমার কোন কোন মনে হয়। ভূত, পরী, মাটি, ইতিহাস বা বিশ্লেষণের মানুষ.....এইসব শব্দ আমার কাছে অভিজ্ঞতার আলো ফেলে। আমার এগুলোর কোন নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত। জীবন পুরোপুরি না, মানুষ অন্তত চেষ্টা এই; যার মাথার ওপর যেমন আকাশ আছে, পায়ের তলায় তেমন মাটি। মানুষটিকে দেখতে হবে পরিপ্রেক্ষিতটিও দেখতে হবে—দুই, কিন্তু কোন—একক্ষেত্রে এ বাংলাটা অভিনব শুধু নয়—অনন্য-সিদ্ধ। মন্বন্তরীমাটের হাতিবোমাকি—কাঁকন বা ডানা—কিংবা হাড় হো সুখী—এর সব একেকটি উপন্যাস। এটা গল্প নয়। গল্প হচ্ছে জনার—যেখানে প্রকৃতি ও জীবনের প্রবাহের মুখে শিরদাঁড়া নারীকেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। এ বাংলাটা অন্য কোথাও আমা রূপেও ঘটতে পারত। পাঠক হিসেবে আমরা এটুকুর জন্যেই ব্যগ্র থাকি। মন্বন্তরী কোথায়, তারিণী মাঝি কী ডায়ালেকটে কথা বলে, ইত্যাদি নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, তাদের পক্ষে অবশ্য জেলা গেজেটিয়ার পড়া বা সামর্থে কুলোলে সেখানে গিয়ে সরেজমিন দেখাশুনোই প্রশস্ত। আমার শুধু আশ্চর্য লাগে, যে-অস্তিবাদী চিন্তাভাবনা নিয়ে হইচই চলে, কতদিন আগে তারিণীমাঝিতে তার নিঃসঙ্গ অবস্থান!

আমি এখানে তারাশংকরের ছোটগল্প নিয়েই স্বল্প আলোচনায় উৎসুক হয়েছি। আমার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'আঞ্চলিকতা'র উল্লেখ আমার প্রচণ্ড অসন্তোষ। প্রকৃতি ও মানুষ, আর মানুষ ও ইতিহাস—আপাতদৃষ্টে এই সম্পর্কগুলো যাদের কাছে এইরকম সাজানো যার ও প্রকৃতি মানুষ ইতিহাস। যদিও প্রথমত এই ভূমিকাটি উপন্যাসের জন্যেই খেলে ভালো, ছোটগল্পেও যে একে ব্যবহার করা যায়—সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তারাশংকরই দেখিয়েছেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথের হাতেই একরকম বাংলা ছোট-গল্পের দরজা খুলে গিয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতি-মানুষ' নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিলেন, 'মানুষ-ইতিহাস' নিয়ে তত নয়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্বও তাঁর

অনেক চোখে পড়ে। কিন্তু তারাশঙ্করে এসে ছোটগল্পরীতির নতুন বাঁক এসে অনুভব উপস্থিত হই। ইতিহাসচেতনা অর্থাৎ যা আসলে মহাকালচেতনাই বাহিরঙ্গ, তারাশঙ্কর তার সন্ধানে ছোটগল্পের অন্তর্নিহিত বাস্তবতায়, তার প্রতিপাদ্যে, নতুন আলো ফেললেন। আমার মনুনা, আঙ্গিকগতার মধ্যে মূলে নৈরাত্ম্যবোধ সর্বস্বত্বের স্বপ্ন নয়, তারাশঙ্করের এই নতুন আলোর ঝলকানিতেই আমরা সেই অগ্নি বিস্ফুরণ দেখতে পেলাম। জীবনকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখিনি। এই ইতিহাসচেতনার অপূর্ণতা বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ক্লান্তিকর বিশেষত্বের অভাবও প্রধান স্বপ্ন।

এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করা ভালো যে তারাশঙ্করের ছোটগল্পের ত্রুটি দূরুলা-নির্দেশ করার সাহস বা সদিচ্ছা আমার নেই। সে-কাজ বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ। আমি নিতান্ত এক ৮৪ পাঠক হিসেবে অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে শুধু আমার বক্তব্যটাই বিনয়ের করতে চেয়েছি। সমগ্রভাবে কেন অনুভব করে কোন ভুল করেননি।

... প্রাবন্ধ—ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের জীবন সম্পর্কে একটি কথা বিশেষ করি যা হচ্ছে : জীবন অতি-মুখর। এবং সেইহেতু প্রকাশের ধারণা : জীবন এক পরম প্রজ্ঞাই নিহিত হয়। পরমপ্রজ্ঞা হয় বলেই সর্বত্রই—তারই সৃষ্টিতে ও পরিণামে তার অস্তিত্ব। প্রকাশের আপাতিক ঐতিহ্যে জীবনের নির্দিষ্টার্থে সর্বত্র অভিব্যক্তিমান হয়ে ওঠাই প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষের কথা—সেই যখন রামকৃষ্ণদেবের মত মহাসমাধিতে সমাধি পড়তে পারেন কিংবা শ্রীচৈতন্যের মত—কিংবা গান্ধীজীর মত মহাসত্যকে কেন্দ্র করে মানুষ সমবিত হয়েন—তাদের বিশ্বাস হই। এবং একই কারণে তারাশঙ্কর সম্পর্কে সন্দেহপোষক হলাম, তিনি জীবনের বিশেষ দেবার বিশেষ ইতিহাসধারণাকে চিহ্নিত করেছেন—আমরা বিশ্বমানবিহীনের মুক্তির ধারণা : সাধু, সাধু—কিন্তু কথা বলতে কী, এর মধ্যে আমাদের বিশেষত্বের কিছু, নেই। এই তো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিক্ষা : কল্পনার তারাশঙ্করের তত্ত্বকথাটুকু ছোটগল্পে স্পষ্ট হয়ে যান নি—তিনি স্বয়ং মহাকালের কোলে বসে থাকবার জন্যআসা উপাসনেন বলেই, শুধু চারপাশে তাকিয়ে দেখেছেন। জন্মুর আর মানুষ শুকাই আর মানুষ। ইতিহাস আর মানুষ : যখন যেই যা অসাধারণের নিজস্ব সাধনার যেই যা মাটির চাষা অনুকূল পাশ—তারিখের ফেরারী আর অজস্রের বাস্তবাদু একাকার। কাউন-পুতুলের সেই আসল মানুষটি নিয়েই তো সৃষ্টিরী হয়েছে। আসলের ভিতর প্রাণ, দুঃখের নীচ দুঃখ তাই নিয়েই মনি বিশ্বপ্রকৃতির কারবার হয়, নীচ নায়কের হবার হয় না—তাই সুখ একেবারে লাগে চক্ষু।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প তুলে লালিত-চক্ষুর দর্শন। আমরা লালিতী ডাকাত, কবিরী, বেদে, রাজাবিদ্যী, চাষা, ডাইনী নিয়ে যাদের দেখেছি চমৎকৃত হবার কম করেছি। কিন্তু এই তো অধিকাংশ ভুল বলেছেন। ইতিহাসকে যদি বিশ্বাস না হই -বাংলাদেশের প্রাণপ্রকাশধারাটি ছোটগল্পে দুঃখদুঃখ অবহিত তারাশঙ্কর তাঁর দেখা-ছিলেন। আবহমান অনুভব বড়াই দুর্মার করে জীবনের মহাকালের হাতে ধরে প্রবল কারিগরিতে এক নিবিড়তার লাভ সমাধানী—উপমা তাঁর কীমাত্রৈরবী মহাকালী, চমৎকৃতকুটে ধুব ধর বেমন ধরা, তেমনি মহাকাল—বেমন সংহারের রুদ্রবিন্দু, তেমনি সৃজনের বীজাধিকা। অনুভবের মধ্য দিয়ে সুন্দর অধিকারের যে জীবনদর্শন, তারাশঙ্করের সৃষ্টিটি ছোটগল্পের ছাড়া নেই। সেখানকার অনুভব জীবনের পরিবর্তিত পাশাপাশি যখন দেখি চাষী মুকুন্দ সাধুকে লক্ষ্য করে পরের পাশে ফেলে তার ফসলের পাঁচ গ্রামে চুকে আছে আর বন্ধুর হাতে তার একমুঠো ফসলের জন্য চাষীকে অনুভব করি না, না—এই পাহা' আমার সুখের ফসল আজার বুকে ছড়িয়ে দিয়ে যায় যবে, আমার ঘরে ফেলা হয় না। তাকে অনেক চমকে সেখানে ফেলে দেখানে আমার ফসল যায়, আমি যেতে পারি না। এরো সেই 'সোনার তরী' কবিতা' না—তবুও বিমান তেমন নয়। এর পরও ওই সমাধানের আছে -আমার ফসল অনুভবের আছেই চলে গেছে। সমাধানে বাস্তবিকের জীবনদর্শন জীবন নিয়ে ইতিহাসের গৌরব।

তাঁর ইতিহাসচেতনার ফলেই তারাশঙ্কর সমাজের সম্পর্কে সজাগ আছেন। সমকালের প্রতিটি ঘটনা তাঁকে উত্তেজিত করেছে। 'তিমলেনা' পরিণাম ফলা তারপর আজও আমার মনের চাঙা হয়ে আছে। জীবন নিয়ত জাতির অন্তর্নিহিত সাকের বিরুদ্ধ বলে মানলে এ ফলের ব্যবস্থা চিরন্তন হতে পারে। কিন্তু 'তিমলেনার' ঐতিহাসিকতা আমাদের দেশীয় দেশ দুঃখ-দুঃখাবস্থার প্রধান এক জীবনবোধে। ইতিহাসের নিয়তিকে আবিষ্কার করে সমাজের জন্যে জুড়োই। অবশ্য নিয়ত শ্রেণীবিশেষের নিয়ে এ সৃষ্টি সম্ভব নয়—ইতিহাসে জীবনের ভূমিকা এবং সমাজ জীবনের প্রধানার গুরুত্বের এক পাঁচ নিয়ে তারাশঙ্কর আজীবন রূপ।

যেহেতু তারাশঙ্করের চোখে জীবনের দুঃখ চরমের লীলা ধরা পড়েছে, তাই অনিবার্যভাবে তিনি বেদে-বেদেনীদের দেখেছেন। উপন্যাস জীবনের একটা পরিণত প্রজ্ঞা আমরা করেছে- উপন্যাসে সেরকম সব নয়, গল্পের মধ্যেও তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। তার সাপ-সাপিনীরা চরিত্র হয়ে ওঠেনি, তবুও তাদের 'ভোর' একত্ব। বস্তুত সাপ নিয়ে এত ভাবাত্মক খেলার সাধ আর কোন কিশোরীর মধ্যে আমি দেখিনি। শুধু কি সাপ! কালাপাহাড়ের মত কালোবাজারকেও তারাশঙ্কর চরিত্র করেছেন। আসলে সবই তো জীবন সমাধানেরই প্রকৃতি, আর এ ক্ষেত্রে, প্রয়োজন ও সৌন্দর্যচেতনার চরম সমন্বয়—তারাশঙ্কর বেরিয়ে পড়ে জীবনসত্য। একেই বলি জীবনরস। তারাশঙ্কর মুখার জীবনরসের লেখক রসিক। তাই একদিকে তিনি পড়ে অন্যদিকে সন্ধান। একারণে তাঁর সোজা পারো, অন্ধকারে নিকারী যান।

কোথাও যেন পড়েছিলাম তারাশঙ্করের ছোটগল্প একটু অসাধারণ—কিন্তু প্র. প্রত্নতাত্ত্বিক দেহে যা ঘটে এমন প্রবলের চরিত্রের বিষম প্রাদুর্ভাব। এ অভিযোগের জবাবটা যে মূলত ভিত্তিহীন তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেই বোঝা যায়। তবু এ মনের বিকৃতিতে তারাশঙ্করের পক্ষপাত এ ধারণা অবাস্তব। যেমন একটা কথা বোধ করি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। জীবন নদীর স্রোতের মত। কোথাও কখন্ যারা পড়লেই সে হতাশায় সোজায় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়—তার প্রবণতা—যার গতি ও বেগের নানান সত্য মুহূর্তে স্পষ্টতর হয়। শান্ত নিস্তরঙ্গ স্রোতে জীবন প্রকৃতির পরিচয়ে অনুভবমূলে উপন্যাসিক হতে পারে—সেটা তার গভীর বা আসল সত্য নয়। বুকের আড়ালে যে সত্য তা একদিন প্রকাশ হতে পারে তখন, যখন বিপরীত কোন বিরোধী শক্তির আঘাত আসে। হয়ত জীবনের এই বিপরীত শক্তিই প্রতিবাদ সৃষ্টি করে জীবনকে সচেতন ও সোচ্চার রাখে। তারাশঙ্কর তাই যেন সবার আগে ওই বিরোধের জায়গা-গুলোতেই চোখ রেখেছেন। দুঃখ ও বৃদ্ধি দুঃখের সহযোগিতার জীবনকে বাংলা সাহিত্যে এমন করে অনেকেই না দেখেছেন!

দু বছর আগে মহাবোধি সোসাইটির সাহিত্য সভায় তারাশঙ্করকে প্রথম চাক্ষুষ দর্শন করেছিলাম। মুহূর্তে আমার মন ফেমন করে উঠল। এ আবে কেথায়? কই, কোথায় আমার সেই চিরচেনা রূপের রাজপুত্র! —দীর্ঘ বিশাল কেশ, গলায় রুদ্রাক্ষ মহা-বাসলবাহী বাহুর সন্ন্যাসী—হাতে ধরে যিনি বলেছিলেন, তুমি লেখাপড়া ভালো, ভালো করে লেখ—এছে তার পাবার কিছু নেই? এই রহস্য মহাপুরুষী ঔদাসীন্য সন্ন্যাসীর হাতে ধরেই না দেখে এসেছিলাম জগন্নাথদেবের বিশেষ সন্ন্যাসীকে? আজও রাজপুত্র তারা-শঙ্করের কাছে ফেতে আমার পা ওঠে না জানি, সে আমে মনে, তাকে দেখেই আমি সুখী।

দি
সুপরিচিত
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
বেঙ্গল ডেকরেটর

আঙটি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরার আঙটির হীরাটা যখন আলগা হইয়া যায়, তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। সাবধান।

ক্ষেত্রমোহনের আঙটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল; লোকটা সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং কুটা পাথর দিয়া কাজ চলাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়তো হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন চতুরশ্রেণী মিথ্যাচারী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে—সদ্ভাবাদি হয় নাই। তাহার রূপ-যৌবনের জন্য একটা তীব্র ক্ষুধা ছিল—চোখধাঁধানো উগ্র ঝলমলে। বাইশ বছর বয়সে বাঙালী মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পরিণত বিলম্বের অবসাদ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণে যৌবন টিকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ চলিয়াছিল, তাহারই ফলে হয়তো এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সদ্ভাব দৃষ্টি ও সাধ্বাগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়, তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে তাহা দেবতারও অসাধ্য। ডুয়েড সাহেব এই অজ্ঞান সম্বন্ধে চাইয়েরে খানিকটা হত 'পুলো' ফেলিয়েছেন বটে—কিন্তু বাদ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরক্ষর বলাবাহুল্য। মোক্ষদেবী কন্যা ছিল তাহার পেশা। বড়-লোকের সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপরা-লোকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের শরীরকে ভালবাসিত। বেহুঁশ মাতালের পকেট হইতে মনি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য দোষ সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপরাহ্নলোকের দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র!

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে, তখন তীব্র বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সন্দেহে বহু; বাঁহারা চপলাকে নিজের চাকরিনীটি লুকাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

রেল-বর্ডারের সরু রাস্তার উপর একটি সরু, বাঁকা তক্তোপোষ পেতে দুই ধার লইয়া ক্ষেত্রের বাসা। পাশে ছোট একটা জানালা সরু বারান্দার উপরই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের লোক দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উমেশ ক্ষেত্র-মোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রের বয়স ছিল—দুষ্টু চপলার ভাষায় 'পটল'। সে চপলাকে হাসিতে দেখিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সব ঠিক করে ফেলেছি। ডক দাঁড়িয়েই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল এস্তুপাত।'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—কুলটাদের চোখ-ধাঁধানো হাসি। তাহার পাঁচমিশালী মনে একবার হাঁরা আলোর ঝলক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রের এ হাসি অজানা রহিয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন আঁকিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কি হল?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রের কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং ক্ষেত্রের কাঁধের ঝাঁকের নিকট হইতে টাকা টকাইয়া লইত, অন্যকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিত, এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে ভালবাসিত, বলে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে কানদের ঘরাণা হাঁরার সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিল, 'কেমনকে আসিল বলি না। এক নতুন আসামী পাকড়াছি; বেশ, পয়সাওলা জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফুর্তি করতে এসেছে। নতুন চৌধুরী বার। ফড়েপুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। ওকে মাসখানেক ধরে খেলাচ্ছি।

ছোকরার বয়স বেশি নয়—তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু হলে কি হবে, এই বয়সে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কম ঠেকে শিখে থাকে। একেবারে একটি হতেল ঘুঘু। এই দেখ না, এক মাস ধরে রোজ বিস্তর এখানে একটি সিকি পয়সা বার করতে পারিনি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়তো চাকরকে পাঠাবে। তার থেকে দু পয়সা বাঁচাবে, সেদুরে বাঁদি। পাঁড় মাতাল; কিন্তু মদের ঝোঁকে ড্রাইবের জন্যে কি করে জান? টাকা-কড়ি, যার হাতের আঙটি পর্যন্ত সেরাজে বন্ধ করে চাবিটি ঐ শালা চাকরটার হাতে দিয়ে বলে, রও, ছোঁড় কর। এই বলে তাকে একেবারে বাড়ির বার করে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চপলা ঘাটোক্কেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উল্লাসে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া, তবে যে বলেছ সব ঠিক করে ফেলেছ?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তি-সূচক ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'দেখবে, ও-শালা পয়সা বার করবেই—সহজে হয়তো না করা যাবে না, একটু ঘুরে ঘাটাতে হবে। আমারও দেখ চড়ে গেছে— আজ যাই ঠিক করেছি যাটার সেরাজ ভাঙ্গি করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে একটা চকচকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

'ভাঙি করবে?'

'হ্যাঁ। তের খেলানো হয়েছি, আর নয়, এবার একহাত ভালমতোর খেলা খেলিয়ে নেব। টাকা-কড়ি যাতা সেরাজে বেশি রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন; কিন্তু একটা হাতের আঙটি আছে, রাত্রে বেহুঁশ হবার সময় সেটা সেরাজে বন্ধ করে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাক করেছি। উঃ! কী হাঁরেটা

হয়েছি, চপলা, তবি চেখ চোখ রাখতে পারে। দশ হাজার টাকার এক তাড়াতাড়ি আর নয়। যদি পাই তো টাকাটাকে ঘাড়ি, সেন্ট সমেত দুরে ফেলে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'সে ভয় নেই। অনেকদিন ধরে পাকা করে ফেলেছি। আজ এগারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বাড়ী বেরুবে, সমস্ত হাত বাড়ি ফিরবে না।' বিলাসভরে ঈষৎ ঝিলন ঝিলিয়া বলিল, একেবারে আমে কিন্তু কিছুই জানে না, দুইয়ে একটিকে বিয়েটারের সোর্সেসীর সঙ্গে—কিন্তু সৌভাগ্যবশী চেনে জেনা ডিটেকটিভ; আর সে, যে দুজনের খুনি জন্ম। আসল কথা, এগারোটার পর আর বাড়ি থাকবে না। সন্দেহজনক বেরুবে—কার ব্যবস্থা করেছি। হাস, গলির মোড়ে ওর সোনার গাড়ি, কর্তাকেও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর বাড়িও সুটে করে নিয়ে চলবে। তারপরেই খুলব সাবান—আর ভয়পাই। সাবান সুটে নিয়ে—আর সুটে নিয়ে—' আনন্দের দিকে তাকাইয়া সেন্ট উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লম্ফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চপলা আনন্দ বলিল, 'আস্তে এই—সরে এস, ও পাশের জানালা দিয়ে যাচ্ছে।'

চপলা সরিয়া না, বলিল, 'কে?'

অমল চৌধুরী—আসে এস।

'কি সর্বনাশ? আমাকে তো আর চেনে না।'

'না বটে!' তাহাদের ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্ছ, জানালা বরাবর চেয়ারে, পিছনে আলো আসছে পশ্চাতে, হাতে ছবির বিজ্ঞাপন ছবি: উঁচুনী অমল্য চৌধুরী। হাতের আঙুলটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল: পড়তে বিদেশ আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল, যেন একজন হাঁয়া বলিয়া পড়িল—হাইকোর্ট বন্ধ কত হলে?'

'হাজার টাকা,' সেন্ট বিলাস উঁ দিয়া বলিল—যৌবন ধরে পারে। এখন কোনো অসুবিধে পড়িয়ে দেবো, বুঝেছ? ঐ যেন সাক্ষাতে বিয়েই পড়িয়ে দেব—সন্ধ্যার হবে। অনেকদিন ধরে দেখবার মনে ভেবেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা 'হাঁ' বলিল, 'হুঁ।'

সেন্ট জিজ্ঞাসা করিল, চলে গেছে, না, এখনো আছে?'

চপলার ঠোঁটের কোণে একটা কঠিন হাসি খেলিয়া গেল, সেন্ট তাহা দেখিতে পাইল না।

চপলা বলিল, 'মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?' সেন্টের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার প্রচ্ছন্নটি ফোটা উঠে। 'তাই তো, আমার আসার সময়ে দেখেছে নাকি? আমি তো বলেছিলাম তুমি বড় এস। যে ভাবে—'

চপলা ভালো করে পিছন ঘাড়াইয়া চাহিল। পথিক পরেশ্বীরা আসিয়া বলিল, 'চলে গেছে।'

'যাক, তা হলে বোধহয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া সেন্ট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অত্যন্ত সহজভাবে সেন্টের মুখের পানে তাকাইয়া [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, না?'

সেন্ট একগাল হাসিল—পারে না! টাকার জন্যে পরে না এমন একটা মানুষ দেখাও তো দেখি। খুন-জখম জাল থেকে-আজি—দুনিয়াটা চলছে তো ঐ টাকার দেবতার। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হলে মানুষ একদণ্ড চলে? আমি যে বাড়ীটা ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি, তার জন্যে আমার আমা আমার অনেক আছে। লক্ষ্য আমাকে বড় হবেছে ভেবেছে। যেমন করে হোক ওর ঐ অন্তত লাখ কমাবই।'

আনন্দে ভরে মুই হাত মাথার উপর তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল, 'যাই, চুল বাঁধি গে।'

* * *

রাত সাড়ে দশটার সময় সেন্ট গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সম্মুখে অন্ধকার। দূরে-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখে কেবলে দিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা আলোর আভাস রহিয়াছে—সেই আলোর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। সন্দেহের পাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে অমল চৌধুরীর বাসার সমস্ত বেশ দেখা যায়—বন্ধুরের দিক পর্দা। সন্ধ্যার উপরেই বন্ধ। সরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দুই ধারে দুইটি বন্ধ দরজার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

সেন্ট দেখিল, পাশে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, সেই টেবিলের ড্রয়ারগুলির সেরাজে—

সেন্ট পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল, আজ সেব করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট সাতেকের বেশি সময় লাগিবে না। তারপর হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা সায়ুবিক অধীরতা তাহার সর্বাঙ্গকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে?

সেন্ট সিঁড়ি ও দেখলাই বাহির করিল। সিগারেট ধরাইয়া ছোট ধোঁয়া ছাড়িয়া দেখলাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল যে যাহা হোক। না, আজ নাই। পরীক্ষক [illegible] সময় হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দুই ধারে বাড়ি। যে কোনো, যদি কেহ দেখলাইয়ের আলোয় দেখিতে পায়। [illegible] সন্ধ্যার সেন্ট [illegible] পড়িয়া ছিল। হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের ঘড়ে কাজ আরম্ভ করিল চলিয়াছে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় অমল চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়া গেল। সেন্ট নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর-দরজার পানে তাকাইয়া রহিল। একপল আসে আসে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার।

সদর-দরজা খুলিয়া অমল চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। সেন্ট কাঠবেড়ালির মতো একেবারে বিদ্যুদ্বেগে পোস্টারের মত সাঁটিয়া গেল। অমল ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। সেন্ট সতর্ক চক্ষু দুইয়া দেখিল, তাহার হাতে আড়াটি আছে কিনা। না, নাই। আরাম সে ধীরে ধীরে ঘাড় তাপা নিশ্বাস ফেলিল। অমল ঘড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার সেন্ট আনন্দে হাত মাথার করিয়া হাসিল। অমলের পরিপাটি সাজ-সজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এই সব বিলাসী প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'অফিসারে বেরুলেন!' কোনো একজন স্থানীয়ক ইহাকে দেখিলে কলিয়া অন্তত লাথি-ঘুসি কাঁধা খেয়ে ফোর্টে হত ঘুরে ফেলিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। অমল, অমল, তোমার চাঁদকে একেবারে লাস্টটা করিয়া ছাড়িয়া দিব।

কিন্তু এদিকে অমলবাবুটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোঁটাটার আবার কি হইল? তার যাইবা ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো?

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সেন্ট ঘড়ি দেখিল, সওয়া এগারোটা। তাই তো। কি হইল? মতলবান আগে বাহির হইয়া যায় নাই তো? না তাহা হইলে অমল দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দরজাটা কি সবাই খুলিয়া পড়িল? তাহাকে সাবধান করিবার জন্য সেন্ট এত মিনতি করিয়াছে—সাবধানের সেন্ট ছাড়া-জলের বন্ধিতে তাহার আক্রোশ সমান হইয়া দিয়াছে, তার সেন্ট—এই সময় খোলা দরজার বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া সিঁড়ি নামিতে নামিতে চাবি-চাবি করিয়া তালাবন্ধ করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দরজার তালাবন্ধ শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, সেন্ট কাঠবেড়ালির ছায়াসঞ্চার দুইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জন—যারা বিপদের ভেবা ভয় নাই। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া সেন্ট আবার ফিরিয়া আসিল। আজ নাই, আর একটা, অন্তত। যদি দরোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে, হয়তো আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, অমলবাবু ফিরিল না। তখন সেন্ট অন্ধকার হইতে বাহির হইল। যেন চারদিক ছুটে পড়ে, এমনি নিশ্চিন্ত বাহিরে বাহিরের এক-কোণে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া যেন মন্ত্র পড়িয়া দরজা খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ক্ষেত্রের সঙ্গেও একটা বৈদ্যুতিক তার ছিল, সেটা এবার সে কর্তনিকে—একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর খাঁচিলের পরদার উপর ফেলিল।

অন্ধকার ভাঙা লাগানো। কিন্তু একটা চাবি বাহির করিয়া তালায় লাগাইল, খুলি করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভালো খুলিয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল। সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া দরজার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ জ্বালিল।

টর্চের আলো একটা টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। টেবিলের উপর বিশেষ কিছুই নাই—কাগজ চাপা, ব্লটার প্যাড, দোয়াত, কলম। টেবিলের অপেক্ষাকৃত দুই-তিনটা ড্রয়ার অল্পস্বল্পভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল, টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। জানবাজের দেরাজগুলো খোলা, কিন্তু যা যাদের দেরাজের সম্মুখে একটা ফ্ল্যাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই ফ্ল্যাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। ফ্ল্যাট খুলিয়া গেল।

প্রথমটি দেরাজ, নরেন উপরের দেরাজে আঙুটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও গহনার ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল, কিন্তু আঙুটির পরিচিত স্পর্শ কোথাও হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল, আংটি নাই।

আংটি নাই? কোথায় গেল? প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এমনই স্থিরনিশ্চয় ছিল যে, এই অত্যাবশ্যক ব্যাপারে হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল।

তবে কি—?

সে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, উঁচা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল, না, কেহ নাই। সে চুরি করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়তো আঙুটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝের হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আলপিন পর্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ। সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আঙুটি তো হুঁচের মতো, একটা পরদা পর্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমার তাহার বুক হুর-হুর করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু না নিশ্চয় জন্য। হয়তো আঙুটিটা নরেন চারিদিকে খোলা দেরাজেই

অধিকলাল ৬·৫০ **দূরবীন** ৪·৫০ **কম্বলে**
রাত তখন দশটা ৬·৫০ ॥ **দেখা সেবিকার**
গল্পসম্ভার ১৬·০০ **স্ত্রী** ৬·৫০ ॥ **মিত্র মিত্র**
শুধু কথা ৫·৫০ **তিন তরঙ্গ** ৭·০০ ॥ **চাকলা সেন**
নতুন তুলির টান ৭·০০ ॥ **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়**
মসিরেখা ২·০০ **আশ্রয়** ৬·৫০ **পাড়ি** ৩·৫০ ॥ **অরুণেশ**

ঘুণ বউদি ৬·৫০ **নিশিপদ্ম** ৬·০০ ॥ **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**
জগদ্দল ১৫·০০ ॥ **সমরেশ বসু**
কৃষ্ণা ৩·০০ **কাঁচ কখনো** ৫·০০ ॥ **প্রেমেন্দ্র মিত্র**
দুর্গরহস্য ৫·০০ **হরন্তী** ৪·৫০ ॥ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**
খেলা পাওনা ৫·৫০ **হরিলক্ষ্মী** ২·০০ ॥ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

সাপেক্ষিকী ২য় ৬·৫০ ॥ **প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়**। **রবীন্দ্রভারতী** ১ম খণ্ড ২য় সং ১২·০০, ২য় খণ্ড ১০·০০ ॥ **পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত**। **ভবভূতি** ও **অমরুক** ৬·৫০, **ছোট খাদ** ৫·০০ ॥ **সৈয়দ মুজতবা আলী**। **অযাচিতা** ৬·০০ ॥ **সুবোধকুমার চক্রবর্তী**। **অরণ্যের অন্তরালে** ৭·৫০ ॥ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**। **অর্ধেকি কন্যা** ৬·০০ ॥ **বুদ্ধদেব বসু**। **অন্তর্ধান** ৬·০০ ॥ **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**। **ঝড়ের ঝাপটা** ৬·০০ ॥ **বিমল কর**। **ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প** ৬·০০ ॥ **শ্রীপান্থ**। **একমুঠো** ৫·০০ ॥ **প্রমথ চৌধুরী**। **মনমিতি** ৬·০০ ॥ **নিরুপমা দেবী**। **চিত্রাঙ্গদা** ৩·০০ ॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। **বিশ্বাভিষেক** ১২·০০ ॥ **অমিয়ভূষণ মজুমদার, শঙ্খচিল-শালিক কেন ও কবির আত্মপরিচয়**।

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ৯·০০ ॥ **বরেন্দ্রনাথ দাস**
আপন জন ৬·৫০ ॥ **ইন্দু মিত্র**
সারাবেলা ৩·২৫ ॥ **বিমল কর**
জলডাঙা ৩·৫০ ॥ **সতীনাথ ভাদুড়ী**।
পৌষ ফাগুনের পালা ১৫·০০ ॥ **গজেন্দ্রকুমার মিত্র**
কালো হরিণ চোখ ১০·০০ ॥ **বনফুল বৈরাগী**
আমার জীবন ১৫·০০ ॥ **মনু বসু**
অভাবনীয় ১০·০০ **সোনালী** ৩·০০ ॥ **দিলীপকুমার রায়**
আকৃত আকাশ ১০·০০ ॥ **দীপক চৌধুরী**
আকাশ ভরা সূর্যতারা ৪·০০ ॥ **নিমাই ভট্টাচার্য**
উপন্যাসের স্বরূপ ২·০০ ॥ **শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়**

বিশ্বাভিষেক ১২·০০ ॥ **অমিয়ভূষণ মজুমদার, শঙ্খচিলশালিক কেন ও কবির আত্মপরিচয়**। **দেবকুমারপরিবারের সাথেই পথচলা** ৪·০০ ॥ **মনীন্দ্র রায়**। **আধুনিক কবিতার ইতিহাস** ৭·৫০ ॥ **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**। **ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত**। **সুবোধকুমার চক্রবর্তী সংখ্যা** ১২·০০ ॥ **বিনয় ঘোষ**। **সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ** ৪·০০ ॥ **নলিনীগোপাল সেনগুপ্ত**। **সীমান্তের অন্ধকার** ৩·৫০ ॥ **তরু রায় ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত**। **চীনের ছায়া** ৩·৫০ ॥ **ডঃ সতীন্দ্রনাথ সিংহ**। **বিচিত্র বিষেকবেলা** ২·২৫ ॥ **নীরদবরণ চক্রবর্তী**।

বাক্-সাহিত্য ৩৩, **কলেজ রো, কলিকাতা-৯** | **সেরিব্রেশন গুপ্তের** **শর্মিলা** **বাস** ৩·০০

আরোই রাখিয়া গিয়াছে। তবুও আবার আলো জ্বালিয়া চারিদিকের দেরাজগুলো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনটাতেই কিছু পাইল না। কয়েকখানা ময়লা বিছানার চাদর, ছেঁড়া কয়েক জোড়া শিলপাই উপরন্তু—

একটুখানি ঘুমের মত একটা ক্লান্ত ভাব ছেলেকে চাপিয়া ধরিল, তাহার মনে হইল, এই পুরনো বাড়িখানার আরাম ছাড়িয়া কর্মস্থানে যাইবার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিশেষ তাহার কিছুতেই যাইতেছে না। মনের কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল? তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—মনের ভাবটা পাওয়া যায় নাই বলিয়া সে সমস্তকে ভুল করিয়া দেখিয়াছে, তবে আসুটিটা গেল কোথায়?

ছেলে নিজের সিদ্ধান্তের সত্যতা ভুলিয়া গেল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি সম্বন্ধে, তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই প্রতিবেশীকে না জানাইয়া যাবে বলিয়া ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ছেলে ছোরা ভুলা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন ঘরে আসিল, তারপর রাত্রিবস্ত্র না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ছেলে ভুলা খুঁজিতে খুঁজিতে ভাবিতে ছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে। কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না তখন সমস্ত ভুলা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উসখুস করিতে লাগিল। মুখে-চোখে জল দিয়া আলোটা নিভাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, "আজ ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হল। ঘুমুলে নাকি?" ঘর্ঘরার কণ্ঠস্বরে তাহার স্বর মিলাইতেছে।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলার একটা শব্দ করিল মাত্র। ছেলে বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, চপলা দিব হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অন্য আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা যায় না।

"আসুটিটা পেলুম না, বুঝলে?"

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ছেলে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল—ছেলেটা আছে, না, ঘুমুলে?

চপলার মুখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ছেলে সন্তর্পণে মত বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত গলায় বলিয়া উঠিল "আসুটি? এ আসুটি তুমি কোথায় পেলে?—তুমি কোথায় পেলে—"

আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের জন্য

মধির—মনোহারিণী

প্রিয়া সুরভি

প্রস্ফুটিত ফুলের মতই আপনাকে সারাদিন সুরভিত রাখবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অমীন বর্মন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই নামটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চার শ্রেণীর গল্প মনে নিয়ে আসে : রোমাঞ্চ-টক, ঐতিহাসিক, রোমেন্স ও অলৌকিক। বলা বাহুল্য, বাংলাসাহিত্যে এই চার শ্রেণীর গল্পের লেখক বলতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একক নন। আরও অনেকে আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরদিন্দুবাবুকে আলোচনার মধ্যে কেন টেনে আনা হল, এ বিষয়ে তাই নিয়ে ভাবা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ডিটেইল-এর কাজ (আবহ ও চরিত্রচিত্রণের সংক্ষিপ্ততা), এবং পরশুরামের বাহুল্যবর্জন ও পরিমিত কৌতুকবোধ যা ছিল তীক্ষ্ণ, প্রখর এবং শক্তির অপব্যয়—এই সবের মিলেছে শরদিন্দুর ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণে ইতিহাসে স্মরণীয়, পরশুরাম কীর্তিমান—শরদিন্দু সেই একই ধারা-বৈচিত্র্য নিজ লেখনীতে অঙ্কিত করে আজও অদ্বিতীয়ধর্মী। তবে বিপরীত স্রোতের সমন্বয় ঘটেছে তাঁর গল্পে। তাই তাঁর সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র সকল কালিমার ঊর্ধ্বে হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রলোকে। আবার, পরশুরামের কৌতুকবোধের যেমন ফলশ্রুতিরূপে সব গল্পের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেতনা হয়, শরদিন্দুর কৌতুক-প্রসাদগুণ অনেক ক্ষেত্রে বিবেককে জাগ্রত করে। মন্দলোক গল্পে অদ্ভুত মার প্রস্তাব শুনে ওস্তাদজীর চমকপ্রদ পর্যন্ত জন্মে গিয়েছিল। কারণ, পতিতা-কন্যা অদ্ভুত সঙ্গে বলিদান প্রথাটা ডাক্তারবাবুর মত সংস্কারের দ্বারা অদ্ভুত মা সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। বিড়ম্বিত জীবনের অবস্থা ভেবে হাসি পায় কিন্তু। কিন্তু মন্দলোকের কৃতজ্ঞতা বোধ, তার দীন জীবনের সমস্তের বন্ধ পুজোপাঠীর মত উপকরণীন পদার্থের প্রেমে ডাক্তার কাহিনী অনেকেই বিবেককে জাগাবার করে থাকে?

শরদিন্দুবাবু এ যুগের লেখক নন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে। আজ তাঁর বয়স ৭০ বছর। ছেলেবেলা বয়স থেকে তাঁর কবিতা ও গল্প লেখার অভ্যাস। তখন থেকেই বিষয় আর ভূমিকাবলী—এই দুই দিকেই আকর্ষণ সাহসিকতা ঘটানোর কৌশল নিয়ে তিনি সাধনা করেছেন। ফলে, ৭০ বছর বয়সেও এই চার জাতের গল্প তিনি এখনো তুলনারহিত। দীর্ঘ ৫৬ বছরের তাঁর সৃষ্টিসম্ভার প্রায় অফুরন্ত।

বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণের পরিচয় ঘটলে পরিণামটা হয় ন্যাচারেলেসেন্স-এর মত। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একান্ত অকিঞ্চিৎকর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

একথা ঠিক যে প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনাশৈলী আছে। তাঁর লেখার বচনাবীতি একবার শুনা যেতে পেলে আর সহজে পালটায় না। কিন্তু তবু মাঝেই সামান্য স্রোতের নিচে অনেক বৈচিত্র্য জানা যায়, যে ভঙ্গি নিয়ে রোমেন্স গল্প জমানো যায়, সেই ভঙ্গি নিয়েই যদি ঐতিহাসিক গল্প জমাতে যাই, তাহলে সার্থকতার আশা না রাখাই ভাল। আবার অলৌকিক গল্পের রূপ ও ভাষা নিয়ে রোমাঞ্চ-টক গল্পের আবহ সৃষ্টি করতে যাওয়াটা নিশ্চয় ঠিক হবে না।

এসব কথা যে অজানা, তা নয়। কিন্তু শরদিন্দুবাবুর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনানুগতিক সূত্রেরই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। রোমাঞ্চের বলিষ্ঠতা হবে ভঙ্গিবর্জিত বাঁধুনি নিয়েই না হয় বিলম্বিত। এই আবহেই সামাজিক গল্পের লেখক রোমেন্স গল্পে ঐশ্বর্য-রূপ-গান না গেয়ে গল্পও উপহার না দিয়ে বহস্য-গল্পের লেখক সহসা ঐতিহাসিক গল্পে হাত দিয়ে বসলে ঘটনাস্থলে হয়ে যায়। এই বহস্য-রীতি বিভাগের জন্যই অকল্পনীয় হয়ে হইল অলৌকিক গল্প। তবু-তাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র।

শরদিন্দুবাবুর সাফল্য এইখানেই। তিনি চুয়াচন্দন-এর মত বিশিষ্ট গল্প লিখেছেন পুরোনো বাংলার পটভূমিকায়। এখন সংসার স্বার্থ ভূমিকা সহজিয়া সাধনার নামে প্রতারণা চলছে। সেই পট-ভূমিকায় নায়ক নিয়তিরই সহযোগিতায় তিনি ছুরা নায়ক ঘুণাক্ষরে সাজন-বিবাহ নিয়েও যেমন ছেলে চলনের মধ্যে কৌতুকময় ভাষা, ভরসা-বল এবং বীরত্বের সমন্বয়ে যে মূলের একটা নিখুঁত চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাতে গল্পটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু চুয়াচন্দনের প্রকাশভঙ্গি নিয়ে তিনি বহুকুণ্ঠী লিখতে বসেননি। এ গল্প ফুটতে পারে। তাই ভাষা ও ভাষাও সম্পূর্ণ সফল। প্রেত-কাহিনী রোমেন্সের সাবলীল ভঙ্গিমায়। কিন্তু রোমাঞ্চ পরিবেশন করেছেন ক্লাইমেক্সে পৌঁছে। গোড়া থেকেই যা রমমান করেনি—কয়েক গল্পের শেষে-বক্তব্য বেশী ফেলে যাবে অবোধ আবহে নিশিয়ে গেছে—মন্দুর-মরোদা শক্তিয়েছে চেতনোত্তীর্ণ।

গল্পের বিন্যাসানুসারে ভাষাপ্রয়োগে মন্দুর্দ্দিষ্ট করায়ত্ত বলেই শরদিন্দু-সৃষ্ট রোমাঞ্চকর-কাহিনী অন্যান্যের সোমেন্স-সাহিত্যকে আরো দূরত্বে সরিয়ে দিতে পেরেছে। রোমেন্স-কাহিনী মূলিনের গল্পভারাক্রান্ত হলে রহস্য-রস গৌণ হয়ে পড়ায়। বর্ণাঢ্য ভাষার প্রয়োগ ঐতিহাসিক গল্পে যে সার্থকতা আনতে পারে, রোমেন্স-গল্পে তা হয়তোনি বার্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, রোমেন্স-কাহিনীর মূল উপজীব্য রহস্য, ঔৎসুক্য, কৌতূহল। মূলে এই তিনটি রস সৃষ্টি করার জন্য বাক্সংযম প্রয়োজন, শরদিন্দুবাবুর তা তো আছেই, সেই সঙ্গে প্রায় লেখনীর সুচারুটি আঁচড়ে এক-একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা। চকিত-চিত্রণ ছাড়াও পরিবেশ সৃষ্টি করা রোমেন্স-গল্প লেখকের একটা অবশ্য-কর্তব্য। তাছাড়া ঘটনার সংস্থাপনের কুশলতা, বর্ণনায় মিতভাষা ইত্যাদি গুণগুলি থাকার ফলে পাঠকের প্রত্যাশা বিফলে যায়নি।

রহস্য-কাহিনী এবং রোমেন্স-কাহিনীর মধ্যে ভেদ আছে। রহস্য-কাহিনীর মূলধন রহস্যময় আবহ। [illegible] এর মাধ্যমের জন্য

ঘ সৃষ্টির অন্তরে তাই প্রেরণা। সুরে যা ঝঙ্কারের খেলা সে ক্ষেত্রে সেটা। এ অনুভূতি গল্প ছাড়া প্রকাশকরে সহজ। গল্পের সৃষ্টির মূলপ্রেরণা থাকলেই হল। সেই সঙ্গে থাকা দরকার নিষ্ঠা, বাস্তববোধ ও চিন্তা-চিত্রণ ক্ষমতা। একটি ভালো গল্পের গল্প যা কল্পনা করলে গল্পকারের শ্রেষ্ঠ এগুলি যেন থাকবে, তাদের প্রেরণা-গল্প প্রসঙ্গ, ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য।

কিন্তু প্রেরণা-গল্প, ইতিহাসের মতো যদি বিষয়ভিত্তিক হোত, সে ক্ষেত্রে আরও বিশেষ কঠিনতর সবই থাকত, কারণ, প্রেরণা-গল্পের মূলে বিশ্লেষণের অবকাশ অনেক। গল্পকি ঘোরতের বিস্তার অবলোপ করিত থেকে প্রেরণা-গল্পের মূলে বিস্তার ও পরিধি। এই তিন ক্ষেত্রে প্রেরণা-গল্পকে সজাগতে হয় এবং এগুলি সজাগতাই আগেই ভেবে নিতে হয়। অর্থাৎ লেখা গল্পের সম্ভাবনীকরণ হবেই বিশ্লেষণ কিন্তু থেকে পূর্বেই কল্পনায় ধারণ করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রেরণা-গল্পের আলোকের, বাস্তব-গল্পের নিষ্ঠা, বাস্তববোধ, চিন্তা-চিত্রণ ও পরিবেশ-সম্পর্কতাও থাকা দরকার। এ কথা তাই সুরে।

সর্বানন্দবাবুর প্রেরণাকেন্দ্র ঘটি প্রেরণা। গল্পকি ঘোরতের ঘরেই ইন্দ্রিয়-চেতনার আরম্ভ। বিভিন্ন সূত্র নিয়ে প্রেরণা-গল্পের মতো তাঁর আলোচনা। তাই সর্বানন্দবাবু প্রেরণা-গল্প সৃষ্টি-ঈক্ষণে। যা সৃষ্টি-ঈক্ষণে, মানব-মনে তার প্রভাব চিরন্তন। যেমন, আকস্মিক ভয় ও সর্বনিম্নস্তর গল্প সৃষ্টি। সৃষ্টি গল্পই একবিন্দুর পরেও পুরোনো হয় না। এখেই বলে লেখনী-প্রসাদ। অন্তর, প্রেরণা-গল্প সম্পর্কে একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া যায়, এ ধরনের কাহিনী লেখক পাঠকের দিবারাত্র পড়বে চলে না। অর্থাৎ, সাধারণ প্রথম পাঠেই জানা হয়ে যায়। কৌতূহলও নিরোধিত হয়। কিন্তু কৌতূহল, রহস্য, উৎকণ্ঠা থাকলে যে গল্পে সাহিত্যের আবেদনিকতা আছে, তার মূলোদ্ঘাটন সৃষ্টির মূল-কাহিনীতেই হয়। তাই লেখক যেমন চিন্তিত, পাঠক তেমনি চিন্তিত, রোমাঞ্চেও তেমনি চিন্তিত। প্রকৃত সাহিত্য কালজয়ী। সর্বানন্দ-সাহিত্যও কালজয়ী।

সত্যান্বেষী প্রেরণাকেন্দ্র চিন্তাশীল পুরুষ। তাই তাঁর সমাজনের মতো থাকে বাঁধাধরা ছাদ, সমাজের মতো, তাদের পরিচালনা ও প্রেরণা মতো সৃষ্টির কারণ। এই তাদের একটি বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণী যেসব যে অঞ্চলে জীবনবিদ্যুৎস সমাজোচ্চারণ এক প্রেরণা, সেখানে প্রেরণাদের সম্পর্কে সাহিত্যে গল্প সমাজের, তিন সেই সব কথা স্মরণ রেখেই আমি এখানে সর্বানন্দবাবুর প্রেরণা-গল্প প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

সর্বানন্দবাবু জাইন পড়তে সুরু করে-ছিলেন ১৯২১ সালে কলকাতায়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে নিজে প্রেরণাদের প্রেরণা মুলেরে ফিরে যান। ১৯২৫-২৬ সালে তিনি পটনা থেকে জাইন পাস করে মুলেরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁর পিতাও জাইনীজ ছিলেন। পিতার জুনিয়র হয়ে তিন বছর কাজ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ওকালতি ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের যে জীবন। তুলে এসেছে, তা তাদের করলেও সৃষ্টির মধ্যে প্রেরণা-সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেরণাদের উদ্দেশ্য, তখন চিত্ত পালক ছোকরের প্রশ্ন সাথে আমার কোনো ভালো চিকিৎসক ছিলেন। রোগীকে ছেড়ে যেতেন উদ্দেশ যার কয়েক ঘোলাটে তিনি তাঁর মুখের কাছে শিখেছিলেন এবং সাহিত্যেও সেই প্রেরণা আজও বিরোধিতেন।

আদ্যোপান্তকালে দেখি আমরা প্রেরণা-চিত্ত ও এ-এ-প্রেরণার নিরিক্ষের প্রশ্নে পালাবলী আর্থিকারও আইনবিদ ছিলেন।

সৃষ্টি ধারাবাহিক না হলে এবং উচ্চ সমাজের উকিল-ব্যবহার না থাকলে প্রথম সর্বানন্দবাবুর প্রেরণাকেন্দ্র পাঠকের চিত্ত-গগনে একটা সমাজ হয় না। এ নিছক চিত্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনী কথা ও ভাব মূলে যে কতখানি, তা বুঝতে পারি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রেরণা-গল্প লেখকের দায়িত্ব অনেক। একজন কথা-সাহিত্যিকের যে দায়িত্ব, তা তাকেও অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। এ সব দায়িত্ব অবশ্য প্রেরণাকেন্দ্র লেখককে না পালন করলেও চলে। অবশ্যই পরিতাপের বিষয়, পূর্বসূরীর পালন করা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে প্রেরণা-গল্পে যে কৌলীন্য লাভ ঘটে, প্রেরণা-কাহিনী-কারের তাদের তা জোটে না। এ দুর্ভাগ্য সব দেশের লেখকেরই।

কিন্তু এ হেন ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে সর্বানন্দবাবু একনিষ্ঠভাবে প্রেরণা-গল্প নিয়েছেন এবং তা ও ভাব—এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা প্রেরণা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অনেক লক্ষ্যমান কথাসাহিত্যিকও এই বিষয়ে লেখনীচিত্রে, অবশ্যই করেছেন—সে অবশ্য ঐতিহাসিকতার জন্যে যত না হোক, অন্তরের তাগিদে তো বটেই। সর্বানন্দবাবু কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের একটা কথা-সাহিত্যের এই দুর্বল ও ক্ষীণ সম্ভাবনীকে পুষ্টিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রহস্যসন্ধিৎসীর সৃষ্টি স্রষ্টার প্রথমদিকে অনেক ক্ষেত্রেরকের গল্প লেখা হয়েছে। সেসব গল্পের ভাষা ছিল সহজ, ভাব প্রসাদিত। ঘোরপেঁচ নেই, সরল গতি, কল্পনাও মোটেই নয়। তাই কৌতূহল-উদ্দীপক। অবশ্যই সম্প্রতি এই গতানুগতিক ধারা ভেঙে দিয়েছেন অনেকে। তাঁরা নতুন নতুন ধরনের গল্প লিখে পাঠকের চিত্তবিনোদন করতে চেয়েছিলেন। পাঠকরাও যে, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ও প্রেরণাকুমার ভাবের নামও বিশেষ-ভাবে উল্লেখ।

রহস্যরচনা দুঃসাধ্য। যা প্রকাশ, তার পুরোনো কৌতূহল সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প তেমনি কাহিনী রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মধ্যে করেও ঐতিহাসিক সমাজোচ্চারণকে ডিটেক্টিভ-গল্পের বিচার পরিধির মধ্যে আনা যায়নি।

অন্ত ভাবে-ভাবের এই অবিশ্বাসের অনুভূতির প্রকাশ প্রকাশকে তাদিয়ে তোলা

উচিত নয় বলেই সমীক্ষাকার ডিটেকটিভ গল্পটি লিখেছিলেন। কিন্তু কেউই অনুকরণ পরিচয়ে বহস্য-সাহিত্যের এই ধারাটিকে অগ্রসর করার চেষ্টা করেন নি। অবশ্যই, কারণ এই ধরণের কাহিনীর। তাই নানা বিচিত্র ধরণের জন্যে দিয়ে এ জাতীয় কাহিনী আজ বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার অনেক পরিচয়ই হয়ে সমস্যাসংকুল, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক অবশ্যই অনুমান যায়। চিত্রনাট্যসমূহের ভাবপরিকল্পনা ও ঘটনা-সংস্থান চৌর্য। সবার ওপরে যেটি জীবন্ত চরিত্রের সমাবেশ—যা এগাথাক্রিস্টি কখনো দিতে পারেন—তা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিসম্ভার। বিদেশকলুষ সমের ভাষা, ভাব ও চরিত্রের আন্তর্জাতিক সমন্বয়। বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ রহস্যসিন্ধুর ক্ষেত্রে কলী থাকবে এই কারণে।

কোনো এক সমালোচক একদা লিখেছিলেন, ডিটেকটিভ বই লেখা খুব সহজ কিন্তুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও আঠারো শতকের ইংলণ্ডের প্রকাশিত অসংখ্য অত্যন্ত চটকদার এবং ১৮৫১ সালে ফ্রান্সের গোয়েন্দা-গল্প সাইক্লোপ্রাক্তে প্রচুর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। তাদের সমালোচকের উর্ধ্বে তার প্রমাণ আছে। শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে এই রচনার উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, পাঠকের যে তীব্র কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছিল। এর সাদৃশ্য অনেক উপন্যাসের লিখনকৌশলের জন্যে পরিলক্ষিত হয় এবং সত্য, ক্রাইম-কাহিনীসমূহ

...ন্দর্যের গৌরবে ঝলমলিয়ে তুলতে এই পরম ...ন্ত্রণ। রূপবতী সৌরভে ...ন্দর্যে দেবে আপনার রমণীয়তা, ভরে তবে পৌঁছে দেবে ...নার কমনীয়তা। বিচিত্র গোলাপ-রোজ, রূপসজ্জিনীর নতুন লাক্স আফেকার, চাটকা ভ্যালেন্সি, গার্ডেনিয়া আর মনমোহিনী পামপোর্ট। সারাটা দিন আপনাকে এনে দিয়ে তাজা রাখবে।

লাক্স-সুবাসিত টয়লেট গয়া

লাক্সের নতুন মিষ্টি ইয়ন

আইলাকিস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের নিবেদন

ও সমাধান কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।' (পঞ্চম-সিম্ফনি)।

বাংলা সাহিত্যেও এই প্রকরণ নিয়ে অনেক ইতিমধ্যে। যদু অন্নদাশঙ্কর সিম্ফনি-ধর্মের প্রকরণ, অন্নদাশঙ্করের কবিতা কবিতার পড়ছে। এই প্রকরণ থেকে বিদেশী সাহিত্যকে মোহই পাননি। যেমন 'অন্নদা আইজেনস্টাইন' ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ কুলদারঞ্জন।

এই প্রকরণে বিষয়বস্তুর বাধন, ছন্দিতের সাহিত্যজগতে এই দ্রু প্রকরণ বিভক্ত-বিভাগ, যেমন শ্রেয়ের কথা, প্রকরণ-কথা—এই বিষয়বস্তু বা সেবক বিভাগ হয়তো এক সময়ে যুগে যাবে। তাতেই প্রকরণ-কথা প্রকরণ আবার্তিক হয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায়। যেমন অন্নদাশঙ্কর, শ্রেয়ের আলো আকাশ যদু ঈশ্বরের ত্রাণ ভিত্তি, তা কি এই অনুভবেই আকাশের সৌন্দর্য যেন না যে কবিতার কথাসাহিত্য হবে একটি কবিতার কথাসাহিত্য?

আরও একটি কথা। সেই এবং দেশী দুজনেই মূলত শ্রেয়ার্থিক ধর্মি। অন্নদাশঙ্কর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি কথা-সংকলন (শ্রেয়ার্থিক)। শ্রেয়েন্দু মিত্রও ধর্মি। এঁদের সকলেরই শ্রেয়োপাসনাশ্রিত-প্রীতি লক্ষণীয় বলে মি?

অন্নদাশঙ্কর-রচিত আলোচিত কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে জন্মান্তর, পুনর্জন্মতত্ত্ব কথা। কবিতাগুলি দুটিতে সম্পর্কে দৈবিকতার বিশ্বাসী। এ জাতীয় কথা অনেক লিপিবদ্ধ হয়েছে। কথাসাহিত্য প্রকাশ্যে কথা বিজ্ঞানিক বা পরলোক-তত্ত্বের ভেদাভেদ নেই। এ কথাগুলি যেন অন্তর। প্রায়শঃ, অবচেতন অনুভূতি, বিচিত্র অন্তর্ভাস—এই নিয়েই এই কথাগুলির সাহিত্য। বিশ্বের আমাদের। কথাটি অন্তরে কঠিন। একটি অতীত জন্মের ইন্দ্রাণের সৃষ্টি করে তার মধ্যে এ যুগে প্রথা স্বাভাবিক সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা, অন্তর অন্তরে পরিবেশকে অন্তরে প্রথা করতের শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। অন্নদাশঙ্করের এ বিষয়ে যে কতখানি শিল্পী সফলতা লাভ সে প্রমাণ আছে। তাতেই দেখানো যায়, মুখোচারণ ব্যাপারটি যেমন সহজ তাকিক চরিত্রের অন্তর পাঠিয়ে পড়ল এক অপরিচিত কিশিল্পীর ওপর। উপন্যাসটি মুদ্রিতাবাত করতে করতে বলছে সমান—'আমরা-আপনা, এই আমার স্থানি জন্ম—এই আমার কথার জন্ম—এই আমার নিজের জন্ম।'

সম্প্রতি আর অন্নদাশঙ্কর, প্রকাশ আর পরলোক, অভিজ্ঞতা ও অন্নদাশঙ্কর, ইন্দ্রিয়ের আর বাস্তব—এই নিয়ে বিশ্বাসীর অন্তরে যিনি এক উপন্যাস অন্তর অন্নদাশঙ্কর যৌবনের সেতু নিয়ে বাঁধতে পারেন তিনিই সার্থক স্রষ্টা। এ ক্ষিপ্ত অন্তরুদ্ধান সংবেদনের ভূমিকাতেও প্রকাশ দেখাচ্ছে। অন্নদাশঙ্করবাবু এই পরলোক সেতু নির্মূল হয়ে ভাসা অন্বেষণে। প্রকাশ-ভঙ্গি ও ভাষার কুশলতার জন্যে পাঠক মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাই এখানকার ঐতিহাসিক কথা জন্মান্তর রহস্যানুসন্ধান-পরলোক ভাসার প্রায় অন্নদাশঙ্কর, আজও অন্নদাশঙ্করের। তাঁর কথাটা ও ধর্মিমের ভাষা সার্থক হয়ে উঠেছে এ জাতীয় কথার পরিবেশ ভাসায়।

শ্রেয়ের অন্নদাশঙ্কর যেমন অবধারিত, আমার অন্তিত্ব কথা অমরত্ব যেমনি প্রতি-পাদ্য। অন্নদাশঙ্করবাবু কিন্তু এ তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেই মনে হয়। জীবনের অন্তরা অন্নদাশঙ্কর নিয়ে যে বিশ্বাসিকা, তাই নিয়েই কথা-সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের প্রকাশের পরিবেশের অন্বেষণের চিত্র। বিজ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে ম.ন্ত্র জীবনের পুনর্জন্ম কিনা, তা নিয়ে মানুষ ভাবছে, নি। মানুষের প্রকাশ ও অন্তর মধ্যে মানুষে কাহিনীর প্রকাশ প্রকাশের আকর্ষণ। অন্নদাশঙ্করবাবু সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করেন নি। ডিকেন্স, পো, মোপাসাঁ, হ্যাগার্ড, জেমস, ডেভেলিন, ডিকেন্সেনের মত কথাসাহিত্যিকরা শক্তি, অজানা প্রকাশবাদীর আকর্ষণ নিয়ে এমন ভৌতিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন যা বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর হয়েছে। যে অতীত মন নিয়ে রহস্যময় অতীতের পাঠকে, অভিজ্ঞতায়, শিল্পীদের, জীবিত ও মৃত' র আলাপচারিতায় অনেক 'আইনস্টাইনের' ছায়া আছেন, তার আভাস অন্নদাশঙ্করের অনুসন্ধান-সূচীর মধ্যেও দেখা যায়।

আমাদের মনে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব। অতএব জন্মান্তর-রহস্যের কাহিনীকে আলোকিকতা পাঠকের বুদ্ধিমানকে না ও হতে পারে, কিন্তু মানবমনের সেই চিরকালের নিত্য আরও কৌতূহলী প্রেম নিয়ে ছেলে আছে অতীতের দিকে। এইখানেই আধুনিক সাহিত্য-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানবুদ্ধিও কল্পনাকে কাহিনী। অন্নদাশঙ্করবাবুর 'পুনর্জন্ম' মূলে বড় গল্পটি সেই আছেন। এখানে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বে অতিলৌকিক নিয়ে খেলার আমাদের অন্তরে। তবু তর্ক কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তিমালার নিয়েই বেশি অনুপ্রেরণা। এ যুগেও প্রেতজন্মের প্রমাণ দাবি এসেছেন তাঁর সাহিত্য-বিজ্ঞানের পরিচয়। আর তর্ক দাবি অন্নদাশঙ্করবাবুর কথাটার সি ক্লার্ক তাঁর গল্পসমূহ-বিজ্ঞানের সাহিত্যে প্রেতজন্ম নিয়ে বিজ্ঞান-নির্ভর সাহিত্য বিজ্ঞানের লিখেছেন। আমার পাঠককে কল্পনাতীত অন্তরেও নিয়ে গেছেন। সত্যজিৎ রায়ও একদিনভাবে এই সাহিত্যের দিকে অনুপ্রেরণা। অন্নদাশঙ্করবাবু কিন্তু ওয়েলস-হাক্সলির ধারা এসেছেন অনুপ্রেরণা পরিচয় পরিচয়। আর তর্ক ধারা অন্নদাশঙ্কর রেখেছেন আর্থ

বস্ত্রাই

বনফুল

আলা হাজারিকা বাজা...

একটু চেষ্টাই এই-দুই বুঝি, কখনও সখনও—কখনও প্রকাশ্যত। ছোট্ট নিষ্ঠুর চোখ দুটো, মুখের ছোট-বড় অসংখ্য রেখায় ভরা, একটা ছোট আয়না ছাড়া ঘরে আর কিছুর চিহ্ন নেই। শুধু সেই কারণেই চক্ষু। গাড়ি আছে। বড়ো, কৌতূহলো, অধিকন্তু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা ওদের উপর বড়ো দুল পাঁজরেরা অবক-গুলো। তাকে কেউ বোঝে না, সে-ও কাউকে বুঝতে চায় না। তাই ঔপনিবেশিক ফরিয়াদিনী লেখক অবশ্যে দুলোল বন্ধ বন্ধা গল্প লেখার ইসব সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি গিয়ে মিয়া-বাবী সম্পর্কিত আলোচনা করে মুসলমানের আর্থনিমুলমের অধিকার এবং পাকিস্তান যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তা বিচার করে তার প্রকৃত মনোভাব জানবার চেষ্টা করছিল তখন সে তার হলদে দাঁ-বন্ধ বন্ধ করে হাঁ বাদ্, হাঁ বাদ্ বলে সাত দিয়ে ঘনিয়ে দিচ্ছে মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল — আলা হারামিকা বাজা—

[illegible] যে চেহারা সেটাই [illegible] কেন করসা জামা-কাপড়-পরা [illegible] আলা হারামিকা বাজা। ছেঁড়া [illegible]-পরা হারামিকা বাজাও সে [illegible] কিন্তু তারা এমন দাঁত-পিস [illegible] এই বাদ্যটাই আলাদি [illegible]

[illegible] আচকান-চাপকান চড়ানো, [illegible]-চৌকুরী, জরাজীর্ণ উর্দিতে, [illegible] দেখলে ঘৃণায় কুঞ্চিত করছি। [illegible] আলাই হারামিকা বাজা।

বিশেষ করে এই [illegible] বাজা। অসহ্য সহ্যের। চক্ষুর পাতা [illegible] ঘনায়মান। তাদের [illegible] পাঁচজন চড়ুল বার হোল। ছোটও [illegible] একটা। নড়বড়ান্ধি লিপ্টো পাশের [illegible] এসে থেমে, ঘরে ঘরে ঘরিম কথাই ছোট [illegible] মেরে মারে মারে। ছোটদের বাজা। [illegible] হয়ে যাই দুবরে। দুলোলবাবু আবার [illegible] দেখতে এসেছেন আবাসের জন্যে—উদ্বুদ্ধ উঁচিয়ে পাঁচজন চাঁড়ুরে...আলা হারামিকা বাজা—।

ছোকরাটা চোখ দুটোতে হিংস্রদীপ্তি ফুটে ওঠে। সড়ে ওঠে ঘরে ফেরিওয়ালা বাড়িগুলোর। আর ঘরানের ছোকরাটা চলাতে থাকে সে সমানে।...প্রকাশ্য আসির মত ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে হয়ে যায়।

পুরোহিত ছোকর নিরিবিলিতে দুলে ছোকর, চোখে ছোকর অসন্তোষের ঘাস কালো কালির আঁচড় টানে, প্রাচীরী অফিসিলিতিতে ছোকর ঘরিম ঘরে মাঝ-পুলো তাকে কুঞ্চিত ছোকর, ঘরিমও ছোকরি হাসল ফুটো করে অনুরিত্তির ঘরকরা সহযোগে একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পরিম, ছোটো-দুই বড়ো প্রকার আনাই করে সে। আর সেই পরিম মাসে দুলোলবাবুকে আদায় দিতে হয়। সুদে-আসলে। তবে পরিম টাকা আর বিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ডিটে-মাটি সব বাঁধা আছে। সুদের সুদে তার সুদে...হিসাবের মাস-পাঁচে বিয়াল্লিশ হয়ে গেলে এই সোজা হিসাবে রাজী হয়েছে সে। ছোক আসছের ফাঁচ পরিম মাসে। চক্ষুর পক্ষের অনুরোধে শলা ও রাজী হয়েছে।

[illegible] আর পেয়ে উঠছে না ঘরিম। এই [illegible] আসছে ছোক ফাঁচ পরিম ছোকরিকে কি ছোকা বলা! এ আসলের সব ফাঁচ পরিম ছিল সব ছো এই সংসার পেটে ছোক। ছোক ফাঁচ পরিম পায় ছোকা ছে। অথচ মালাকে চোখের মুখোমুখি। এক কথায় হারামি, ছোকর অধিকন্তু পর্যন্ত এর হাতে-খড়...এর কথায় ওঠে-বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে ছেড়ে।... সেদিন সমস্ত দিন ছোকে ঘরে ঘরে ঘরিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হল তার। ফাঁচ পরিম ছোকাও পাওয়া ছোক না। কী হবে কে জানে।

হঠাৎ মাথায় ঘুন চড়ে ছোক তার। ফাঁচ পরিম। চক্ষুর পক্ষে ঘিরে করেছে শালা ফাঁচ পরিম ছোক আবে ছোক।

হারামিকা আজ্ঞা। চিন্তনের ফলে বাড়ি-পুলের সজাহরে ঘরিম মতো আজ্ঞা হয়ে উঠছে।

তার পরদিন অবুরে আবুর্চি বলতে এসে—'কাল রাই যে মাসে ঘিয়াছিল একেবারে কাবুই ছোকাস। ছোট্ট মাংসে নিয়ে তার হয়ে ছোকে। ছোটপুরো ছোকেছে সব...' ঘরিম নীরব।

ছোকর বাড়ির ছোটো-অবুরে ঘুন অবুর উঠল। আবুর্চি আবার লাগল—'ছোকরীকে কাল ছোকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই আবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে ছোকে ছোকে বকাঝকাই নিত হচ্ছো। পরদের পর্দাতে ছোকাছিল—ছোকার যে ছোক ছোকেরী। আবু বলেছে, যে আবুকে নিকে পারবে তাকে পাঁচশ টাকা বকশিস ছোবে। একটু ছোঁক বাড়িস, বুঝলি...কি যে বলা যায় না ছো...' ঘরিম পক্ষ অবে একবার মুখ ফেরে নীরবে মাসে বুঝোচক্ষে তাকাল। তার চোখ ঘিরে আবুরের হাসা ছোকুঞ্চিত।

বনফুল

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

বনফুলের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় হাসির ছুতোয় নয়, সোনায়। সে-সময়ে আমি নাইন কি টেন-এ পড়ি। একদিন খেলাধুলো নিয়ে মেতে ছিলাম, বাল-বন্ধুরা হল ফাস্ট-উপন্যাস নিয়ে মেতে উঠেছি। বন্ধুদের কাছ থেকে ছোটদের পত্রিকাগুলি হেরে এসে পড়ছিলাম, সেদিন থেকেই এক বিস্ময়কর এবং হাসি-ভরা বিভিন্নতি এক অপরূপ আনন্দের আমার চোখের সামনে খেলা দিল। বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের বই যোগাড় করে আনছি আর পড়ছি। ঠিক কবে মনে নেই তবে বোধহয় এক সময়ে প্রবাসী নিয়মিত পড়তে সুরু করেছি। সেই সময়েই যোগাযোগ ঘটে একদিন বনফুলের কাছ পৌঁছেছি।

পূর্ব-বঙ্গের এক ছোট্ট শহরে আমার বাসস্থান। আমাদের বাড়ির অদূরেই ছিল এক ডাকি বাড়ি। বাড়ির একতলাতে ছিল অফিসটা বোধহয় আজ। যোগাযোগটা পূর্ণিমার ছিল। বোধহয় আমার নিজ কর্মস্থলি আমি, তখন আর বোধহয়। আমাদের বাড়ির বোধহয় উপর সাহিত্যবিশারদ। সে-বিশেষের আমার সাহিত্যের অবর ওঁর কাছেতে বন্ধুত্ব। শনিবারের ছুটি নিয়ে এই বাড়ি বসে আসিতেন পরিচয়ের সেতু আমাদের হলো। ছোটদের মহলে এই আমার সেখানেই বিশেষের আসর আসিতেন। মোহে ছিলেন। সেদিন বোধহয় দুজন মনে হলে সুন্দর চাঁদটির নিচে ছোট বসির বসির আমরা, আমাদের আমি ছোটদের আমাদের বোধহয় একটা পরিচয়ের বোধহয়ে একটা ছোট কথা বলব। বনফুলের, আমাদের কথাও আমাদের ছিল। আমাদের আমি নি। দুজনের আমাদিনের চাঁদটির নিয়ে ছোট। আমাদিনের, সন্ধ্যে আমাদের আমাদের আমাদের আমার চাঁদটা ছোট আমার আমাদের আমাদের নিজের চাঁদটি ছোট আমার ছোট উপরে।

আমাদের ছোটোবেলার স্মৃতি বেশী মনে পড়ে। পরে বোধহয়ই একদিন বন-ফুলের ছোটবেলা বোধহয় আমি এসে ছিলেন। মুখে হাসি পড়ছিল আমরা, বিদেহরা চলছিল, নিজেরা, আমাদেরই, আমাদের কথা, আমাদের আমিরেরা-মনে, বন্ধুরা, ঐশানি আমরা। তখন কত বর্ণের, কতক বন্ধিমি। আমাদের নিয়ে আমার পড়ছিল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। পরবর্তী সময়ে এই আমাদের ছোটোবেলা আর আর পড়েছি।

এক বিচিত্র 'বিষয় নিয়ে এক ছোটোবেলা আমরা সাহিত্যের আমাদের ছাত্র দু-চারজনের বেশি নিয়োজন আমি আমার খোঁজা নেই। আমাদের আর বিচিত্র আমিরেরাই, আমি পরের আর বিচিত্র আমরা নিয়েই না তিনি আমি লিখেছেন।

আমাদের আমিরেরাদের পড়তে পড়তে নিয়োজন আমাদের আর নিজের বেশি হয় না। ইন্দ্রিয়োজন আমি সোনারা আর মনে মনে পড়ছিলাম আমাদের আমাদের নিয়ে। আমাদের আমাদের আমি আমি আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের। আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের

বাংলোয় পরিচয় এক প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

লেখকের অজান্তেই গল্পের আর পাঁচজন-জনমনীর মানসিকতা পরিচয় দিচ্ছে।

"সাবেদে পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই মেজাজ তুলকালাম করবে। একদিন বিয়ে ছাঁদি আছে বলাই—তা কিছু হয় সব ওই সেজে যায়—একটা হাসির খোরাক, বুঝলেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার সিঁথি একটা ছুপোয় ঘণ্টা ধরিয়ে দিয়েছেন...সাজবার বাকি সেজ করতে পারি নি এখনও..." ●

ভদ্রলোক আবার বলছেন। গিন্নির যখন মাইতে যায়, বালতি-বালতি জলে ভরে নিয়ে যেমনতে যেমনতে গল্প দিয়ে দিয়ে যায়। গরমের দিনে ঘরে বসে সিন্নী যখন হাতে ও মুখে করে পাখা করে হাওয়া করে।"

অমল অসুস্থ হয়েছে। সেবা সেল "একটা প্রকাণ্ড 'হলে' সতরঞ্জির উপর গদেল মুখে হইয়া বসিয়া আছে। একটি ফর্সাকায়া মহিলা তাহার মুখে রাখার হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুমাইবার জন্য সজাগ-সাজনা করিতেছেন। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড আয়না। তাহা এমনই জায়গায় যে, পশ্চিমমুখে এবং তাহার পাশে লেখার খোলা দরজা।

"আর লক্ষ্মী বৌ—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর মাল করে এনেছি। চেয়েই দেখ না একটু—"

সাঁতা এমন বাৎসল্যের তুলনা নেই।

'আজমহলে' পরীক্ষার এক উজ্জ্বল সাক্ষী। এই পরীক্ষার সাহায্যের [illegible] এক করে দিয়েছে।

[illegible] এক ঘরিব মুখে [illegible] এলো। পিঠে একটা ঝুড়ি বাঁধা। [illegible] এক বোরখা-পরা মহিলা। মহিলা [illegible] আসন-এ তার মুখের [illegible] মেয়ে। তাঁকে দেখাচ্ছে। ছাদের [illegible] মেয়ে এমন? মেয়ের পরনে [illegible] মুখের এক সাহেব নিচে [illegible] চিকিৎসা হচ্ছে। দিনরাত [illegible] চলছে। একজন সেবা যেন [illegible] দিচ্ছে। কিন্তু মেয়েকে [illegible] মায়ের চোখের মণি। ওরা একটু [illegible] করে রেখেছে। পরীক্ষা মুখের [illegible] চোখেই সাহেবদের [illegible] পারে নি বটে। কিন্তু [illegible] ঘিরে ছাদে মেয়ের জন্য [illegible] মুখের মায় ঝরিব সাজাহান।

[illegible] মেয়ে মনে হয়, সে ঝরিব সাজাহান নয়, পরীক্ষাগ্রে সত্যি সাহাজাহানের চেয়েও সে বড়ো।

এখানে মায়ের ওপর ভালোবাসা নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে।

'হাসির গল্প'-এর লেখক হরিহর অসুস্থ, অসুস্থ। সারাই মেয়েদের সাহিত্য একটি লেখে। বাজারের চাহিদার কথা মাথায় একটি নিখুঁত গৃহিণী চরিত্রও তাঁকে পাকাপাকির জন্যে ভাবতে হচ্ছে। এই পরিবেশে একটি হাসির-ভাবা মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প জমে না মুটি ছবিকে কুটিলের নিতে নিতে, আবার কল্পনা দূর করবার প্রয়াসে যা হাতে তুল মুটিই টিপে ধরে আবার-আবার নিয়ে আসছেন হরিহর। গল্প লিখতে হবে। এই অবস্থার গল্পের শেষ ছাড়াবেন। আজই লিখে হবে—সন্ধ্যাবেলা আসিবে। হাসির গল্প। হাসির গল্প লেখাবেন্ট তাঁর নাম।

আমা করি, ডাবোর প্রয়োজন নেই।

স্বাস্থ্যসমাজ অবশ্য স্বাস্থ্যসংবাদের এক নিখুঁত পরিচয় উদ্ঘাটিত।

ডাক্তারের নিজের পাঁচের মাজারের চেয়েও কঠিন জানতাসার হরিপদাল। তার অবস্থানে সুন্দর পাঁচের দিকে সকলেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। হরিপদাল জানায় এই মজার মানুষের জন্যেই তা হয়েছে। ডৈরবের সঙ্গে তুলনা দাঁড়াতেই সব ফাঁস হয়ে যেল। ডৈরবের এক চুলোচাঁছাতে নকল দাঁত ছিটকে পড়ল মাটিতে। মুখে দাঁত নয়, তাঁর ভালো মনের মুখোশ ছোড়াও-ধরা। তার মেয়ে ডিটেকটিভ-কাহিনী হয়ে হরিপদাল ভালো।

"কেন মায়েরা ভালবাসে বলিস? ধরিস না—এই ধরে ধরেই প্রশ্নের চালাই। মুখের আগে উপরের ঠোঁটে ঘাম দেখা দেয়—

হতভম্ব নির্বাক ছেলেকে খানিকক্ষণ দেখিয়া সে বলিল, আচ্ছা, তুমি এক কৌটা আনবে?"

মনের মোক আর দাঁত দিয়ে চোখ উপমেয়র জন্য ছোবার চেষ্ট হওয়ার আগে এর মধ্যে গল্পে আমাদেরও ডৈরবের মতো মনের ইচ্ছে হয়ে তিল এক মোটা আয়না। পুলিশপাহারা অসুখের প্রতি লেখকের সহানুভূতি তখন আমাদের মনেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে এইখানেই লেখা গল্পলেখকের সবচেয়ে সার্থকতা।

গল্পের নাম গল্পের মুখোমুখির আলোচনার জন্য অবকাশের কথা বলেছেন লেখক। মুখোমুখির কারণের আর না কি আছে? গল্প-কথা, মাতি-মাতামহীর অসুখ আমাদের ছেলেবেলার আরও ভয়ংকরী করে তুলেছে নিজে উৎসাহ আমাদের। রাজার অসুখের অজুহাত দেখিয়ে ছেলেবেলাকার বিকেল আমে এসে। অসুখীদিদি যাবে ছেলেবেলাকার কাছে

প্রকাশিত হলো **পরবাস** ॥ শরিদন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০

হারেমের নায়িকা ॥ সুরেন সমাজদার ॥ ৬·০০	**আদিম রিপু** ॥ ফণীন্দ্র ভট্টাচার্যসাল ॥ ৪·৫০
রুপালী রেখা ॥ অরুণাচল বিশ্ব	॥ ৪·০০
চন্দন মালিকা ॥ অরিন্দমকুমার চট্টোপাধ্যায়	॥ ৩·৫০
মসনদ ॥ শরিদন গঙ্গোপাধ্যায়	॥ ৩·৫০
রঙ বদলায় ॥ অমরেন্দ্র ঘোষ	॥ ৩·০০
অপরাধ দেশে দেশে ॥ বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যসাল	॥ ৪·৫০
বিস্ময়কর বহুরূপী ॥	॥ ৬·০০
আনা পিটারসন ও আমি ॥	॥ ৩·৫০
সেই মেয়েটি ও কাগুজারদের কাহিনী	
সুরঞ্জিকার মন ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তী	॥ ৩·৫০
একই আকাশ তলে ॥ শান্তিরঞ্জন ঘোষাল	॥ ৩·০০

সাহিত্য প্রকাশ ॥ ৬/১, আনন্দ চট্টোপাধ্যায় লেন ॥ কলিকাতা—৯

[illegible] বিষয় নির্বাচনে [illegible]

বিষয় নির্বাচনে' গল্পের সমস্যার একমাত্র প্রতি মানুষের মধ্যে আজও পরিলক্ষিত হয়েছে।

'আজব চেরেরা' গল্পেও আমরা লক্ষ্য করি ঔপন্যাসিক ও তাঁদের প্রতি তাঁদের শেষের মর্মস্পর্শী আবেদন।

সুখের স্যাটেলাইটের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রীতিভাজন হয়েছেন। এমন অনেক মানুষের সংস্পর্শে বিভিন্ন গল্পগুলি এসেছে। তাই সমস্ত বৈচিত্র্যময়ের সমস্ত অনুভবগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিকের মনে উদিত হয়েছে।

কমলকুমার গল্পগুলি আমরা অনেক বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতাগুলি। 'প্রতীক্ষা' অনেক দিনে, মেঘমল্লার, অবতরণ' অনেকগুলি প্রভৃতি তাঁর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আত্মজৈবনিক গল্প। এগুলির প্রতীক গল্পগুলির পরিচয়ই মূলে নিহিত।

বয়স আমার উপন্যাসের থেকে ঔপন্যাসিক লেখকের কাছেগুলোর মধ্যে। কমলকুমার পাওয়ার পরে সমস্যা সমাধান আমরা খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের তাঁর মনে ইচ্ছা পূরণ করা। তাঁদের কমলকুমার বিষয় মেঘমল্লার আমরা পড়ি তাঁদের তাঁর এখানে, যাদের মুখোমুখির থেকে কমলকুমার। তার নিজের বিভিন্ন মেঘমল্লার আমরা। সে তার প্রতীক্ষায় থাকবে।

বয় আমরা পরে আমরা কী একটা আমরা মুখোমুখির মেলা। সেইজন্য থেকে মেঘমল্লারই কাছেগুলোর মধ্যে দেবা। আমরা তাঁদের তাঁর মনে। আমরা আমরা আমরা আমরা। আমরা আমরা আমরা আমরা। আমরা আমরা আমরা আমরা আমরা আমরা। আমরা আমরা আমরা আমরা আমরা আমরা

রাজা

মনোজ বসু

ছুটির পরের দিন— সোনাইমারীর চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে—

মামা, অনুমতি আপনাদের মুখের সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারোটার গাড়িতে কাঁড় পৌঁছিয়া টেলিফোন মারফত কাকিমা এবং বিন্তাদিদির সাক্ষাৎকারে নিবেদন করিব—

শনিবার অর্থাৎ আসন্নাগী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির-ঘরে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ি আসিতেছে। ছুটি পনর নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারিতে এ আর বড় হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, তাহার ম্যাট্রিকের বোধ করি পনরটা ডায়মন্ড হইতে লালগোলা অর্থাৎ পরিক্রমণ সারা হইয়া যায়। তারপর দুইটা চাকরি জুটিয়াছে, ভালো চাকরি—এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগ-সহকারে শনিবার তারিখটার জোড়া হইতে অমা পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিন্তু পুরোপুরি চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাপেক্ষ হইল না। শ্রবণের উপর আজ কাল, চিঠির তারিখটা লিখিয়াছে কি শ্রবণার লিখিয়াছে—বৃশ্চিক-রাশির হইতে পারে, তাড়া করিয়া আর একবার বিশেষ করিয়া দেখিতে বাসনার মিঠে রাগ বিগলিত, তারপর বিছানা উল্টাইয়া ফেলিলেন, এদিক চিঠি পাওয়া গেল না। পরক্ষণে মনে পড়িল, বাসিনের তলায় রাখা ছিল, তবে আছে তোষকের?

চিঠি তখন উদ্ধার করিয়া নিবারণ উত্তেজিত ঘরে কথাবার্তার বিষয়বস্তুগুলির কয়েক ছত্র টুকিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। ছোট ছুটি করিয়া লইয়াছে—তার কিসের-ছাত্র। চার-পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু দুর্বিনের অনেকগুলি কথা কতটা নিখুঁত সংবাদ পরিবার মনে আসে? খাতা নিয়া বসিতে যায়। অকস্মাৎ মোটা কলম পঞ্চমীকে আনেন, তোলাপাড় করিয়া তাহার কোলে দুর্বিনে পড়ার ফাউন্টেন দিল। তারপর কিসব এদিক-ওদিক চাহিয়া সহসাই কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিলম্ব। শাশুড়ী আসিয়া দুর্বিনেন। কিসব চিঠি লিখিয়া ফেলিল। শাশুড়ি মেজাজে মানুষ, অতশত দেখেন না, আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিয়ানের চালের ওয়ার্ক-টোয়ালগুলো ধুয়ে ন.ও তো দিবাদিয়—এখন লেখা করে রাখি, তোর থাকতে থাকতে যেতে দেব—কেমন?

বধূ লজ্জা দিয়া বলিল—যাও মা, কী সমস্ত মিছামিছি বলছ বসে বসে, দেখো না—

শাশুড়ি বলিলেন—তোকে বাহোরাত্র থাকিতে মনে হলে তার আগেই সব ফেলে দেব। মোরালির ছোটে সে দুঃখকে দেখতে পাবে না। আর ছোকরাকেও বলে দিচ্ছি যা, এখনো পনপনি মেয়ের মতো বেড়াবে পারবে না—আমাকে সকাল সকাল ছেড়ে ছিটকানি মোকো। যে যেমন চায় তেমনি থাকতে হয়। পরবে-বারে থাকে, বোঝ না?

আলোক কিসের মুখের ছিলের মোলন করিতে লাগিল হাসিও পাইল। বৌমা—বুড়ো বৌমা—আর বড় মেজিওয়ালা ছেলে, এখনও মা বিনা বোকা বলিয়া ভাবেন।

এদিকে বাইরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর জামার বছর আট-দশ আগে একটা বাঁটি পড়াইয়া দিয়াছিল তাহার লক্ষ্মে এখনো তিন আনার পয়সা বাকি। উহা পয়সার উপায় করিতে আসিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় বাড়ি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে করিবে, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে ব্রহ্মাণ্ড সংসারে নির্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, জানে যে-প্রকার, তাহাকে—নটবরের কথা তাহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—রোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন ছোকো—আজ সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এসে একবার—পাই পয়সাটি অর্থাৎ হিসেব করে দিয়ে যেও। বাও কালকেটা বড়ো—

বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হস্তস্থ কলিকা সরাইয়া নিয়া আবার মুদু কহিলেন—শোন মি নটবর, বল কি—শোন নি, আসে ভুলো দিয়ে যাবে না কি? আমার

কিন্তিৎ যাহারা বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামের সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়-স্বজন বহুবার একথা দুর্বিনয়ে—তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, এখন সময়ের বিলোত থেকে পৌঁছিতে যা দেরি। এবারে আর ভুলো নয়, আসছে মঙ্গলে পয়লা তারিখে দিচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়ের কথনো বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছায় নাই এক মাসের পর মাস অন্তরে পয়লাই আসে। সুধীরের মাতার কথা ভাই, লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। মোক্ষদা হাসিয়া হাসিয়া টানিতে টানিতে নটবরকে যেন আশ্বাস দিয়া শুনিয়াছে, "সুধীরের মার কথা-ভোজ, ভালো চাকরি পেয়েছে। এমন ঐ মেজদা টাকার কথা যদি বার-সাত দিয়া ভাঙতে সন্তাহ টাকা পর্যন্তও পাঠায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুরুষকার সঞ্চার হইয়া বলিতে লাগিলেন—মোক্ষদা সংসারের পাঁচ ছেলের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কলকাতায় থিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লাই না। পাঁচু জলে—দাদা, এসব কি জন্য তিন মহল বাড়ি ভাড়া করেছ, কি-কাজ যে ভাড়াগুলো পুরো ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড়শ আর উপরি—সকলের আপনার বাপ বলি পকেটে, সাধ্যেরেলা দু পয়সা হেন ছিনতে পারে। টাকার খেলা নিয়ে হো'ট আলতে পারবে কেন, বাড়ি ফিরতে হয়। সেবা হলে এসময় পাঁচু মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শিরশির করিয়া উঠিল—এই মোক্ষদার সুধীর, তাহার মেজদাদের সামনে নিয়া বাসি পাতে ভেলেপাড়া হইতে লড় ধরিয়া লইয়া আসিত। বলিল—তা বেশ—বড় ভালো কথা, আর আপনার সুখে কী ছোছুরিমশাই, ব্রাহ্মণের ছেলে—

নিবারণ জিভ কাটিয়া বলিলেন—ছোকরা পাঁচজনে ভালো একলাই জানবে। পাঁচু যা বলে—দুজনে খুলে, হাত ফেরে যায়—সেতার হয় না। ভাইচারুর কথাই বটে! সুখের বোঝাই, এবার আমরা বাড়ি-সুদ্ধ একসঙ্গে চলে যাচ্ছি, সুধীর আসবে সেই সব হিসাবের ভয়ে—

নিবারণ চক্রবর্তী তখন বলিবার লোক নহেন, বিশেষত ছেলের এই [illegible] তখন। অতএব পটলি [illegible] সুধীর টিফিন টাইমে চারটি পয়সা হাতাইয়া [illegible] আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ এখনও কলিকাতার যায় নাই এবং সত্যিকার আরাম যে কী তখনও ঠাহর করিতে পারে নাই। গ্রামে সবের বিনোদন আছে, অতএব রাজা সে অনেকখানি দেখিয়াছে—গায়ে কখনও সাবান কখনও সোনাপাক, আবার খুকুর। সুধীরের মামার উপর খুকুর বরাবরই বিশেষ কী রকম স্নেহ তাহাই সে সযত্নে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয় তাহা কিরণ জানে। তবু আশ্চর্যের আশ্চর্যটুকু বিনাবাক্যে বলিয়া ফেলিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকক্ষণ অনেক আশা করিয়া শেষে সন্ধ্যে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, এখনে নিশ্চয় হইলে সে বলিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সর্বনেশে ব্যাপার। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নতুন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত না। এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।...সন্ধ্যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাগান পাড়ের কাকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে হইল যেন কোন অনির্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশি হইয়াছেন যে সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাহার সেই জন্ম-দুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরানী। আকাশ ও চুলের রঙ্গি পার্থক্য, আবার ভাবিল—দূর ছাই সে, ভুল বলিল মা আর নাই, থেলা একেবারে মেঘে। তাড়াতাড়ি আসিয়া উঠান ঝাঁটাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কেন কী হইয়াছে, তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে...

পটলি পড়া ফেলাইয়া আসিয়া খুকিকে কিরণের কোলে বসিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—এ পটলি, যাচ্ছিস কোথায়? যেন—সুধীরদের বাড়ি যেতনি? তার মা নাকি এসেছে—কলকেতায় থাকা করেছে. তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলি মুকুলত্ব না করিয়া কোথায় জানি অন্ধকার উঠানে কুড়ি-কুড়ি খেলিতে গেল।

উঠানে যেন অকাল পড়িয়াছে. পড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না। পটলি হইয়াছে কুমির আর উত্তর ও পূর্ব কোণ দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে লম্বলে সেই নাহিতে নামে, পটলি দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে ছেলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।...খুকির মোটে চারিটা দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকির গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর আমি সে [illegible]

—ওরে ডাকসাঁই ছাড় ছাড়—ওরে খোকার, আমি যে মাংসের সেরেফ হয়েছে তোমার!

কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকি হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকির দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া বলে—আর খেলেনা খুকি, আর খেলো না। সব মাংস পেটে গেল, সব মুরগী খেয়ে ফেলে।...মেয়ে মোটে এইটুকু, বুদ্ধি কত—সব বোঝে, ছোকরা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আমার হাতগুলি দিয়া বলে—তা-আ-তা—

কিরণ বলিল—হাঁ করে হাসলেন মতো দেখছ কী? তাড়াতাড়ি চোখ মেলে এক নজরে কী দেখছ আমার মাথিক? খেলা দেখছ? খুশিও হয়েছ, বড় হও আগে। ঠিকঠাক হয়ে বসতে শেখো তো— এই যে মেয়েলোকে—

মেয়েরা মেয়েরা হলেনি,
মন্ত্র আমার জিন্দুমি
বর আনবে বর্মনি
নিয়ে যাবে বর্মনি—

খুকি তালে তালে মেয়েলি ভঙ্গিতে কিরণের কোলের উপরে তুলিয়া কচি কচি দুই হাত—মুখ-কান চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকির খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নড়িয়া মুখ ঠোনিয়া ঠোনিয়া বলে—বা-আ-আ-আ-আ। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সন্ধ্যাকাশের কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ঝিনুকিনে করিয়া বলিল—খুকি, দেখিস—দেখিস, কালকে তখন আসবে—তোর খোকা কাকা—যার কোল কত—অত বড় ছেলে, একদম খোকা—হি-হি ছেলেমানুষের মতো হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিক তাকাইয়া দেখিল, মেয়ে কোলোখান হইতে নড়িতে পায় নাই তো? এখন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, তাহাকে দেখে নাই, সুধীরের কথা মনে হইতে দুঃখ হইল না। আবার মনে হইল—এই তো টিফিনের সময় পাইবে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না?

সেদিন গভীর রাত্রে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। বাবা বলম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া বাহির কলসী হইতে জল গড়াইয়া মুখে-চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার কাকে জোছনা আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মতো সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়।...সুধীরকে স্নানমুখ সকালে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সময় কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল, নাকি বয়সে বাচিল ছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ি স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু এই ছেলে মুখো-মুখি হইলেই যে ভালো হইত। সেজন্যেই এমন হইয়াছিল যে, সুধীর বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে। মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে কাহাকেও সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক-এক সময় কিরণের মনে হইত—জানে ডাকিয়া ডাকিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর ৭৩না হইল সেদিন সে খুশি হইয়াছিল, এখন সেসব কথা ভাবিলে কষ্ট হয়। আর মোকদ্দমাও এমন কঠিন-ভাঙা পদ—চাকরি নাই-বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া ছেলে মহাকাহাকে সুস্থ হইয়া যাইত নাকি? কিন্তু সে মনের কিন্তু কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে মস্ত, কয়েকটি কিরণ রাজরাণী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণে—

আবারও কাল এতক্ষণে যে কী হইয়াছে চক্ষু বুজিয়া সেই মনোরম কামনা করিতে লাগিল।

ঘরে [illegible] হইয়া দেখিবে ফ্রক্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মশার পালাই খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে। আলোটা মুখের কাছ দিয়া ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ছুইয়া তলের ঘটি ঠেলাই করিয়া তক্তপোষের নিচে রাখিবে, সন্তর্পণে ফেরে খিল দিবে, তারপর কিরণ মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলোতে একখানা হাত আড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসল সুধীর ঘুমায় নাই, মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিল, কিরণ ঘুমাইলেও হইবার তখন জাগিয়াছে, আসে সাড়া দেয় নাই।

কিরণ বলিবে—বড় গরম, চুল দাওয়ায় বসিবে। কেমন জব্দ? দেখেছ?

সুধীর হাসিয়া বলিবে—জব্দ করবে না? বাবামশায় এক পা আর তালগাছে এক পা—ঐ যে জন্তু একটা কী লাফিয়ে আসে, দেখতে পাচ্ছ?

কিরণ বড় ওস্তাদ। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন মাঠে সে ঘুম করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল সেকথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময় কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমার কচি খুকি পেয়েছ নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কখনো না, কচি খুকি ভাবব—সর্বনাশ! খুকি পেলুম, বুড়ি হয়ে আর বাকি কী?

—এখন আমার মেটেই ভয় করে না—কী দেখে বলল, একলা-একলা এখনি আসতে ভয়ে চলে যাচ্ছ। তারপর কিরণ হাসিয়া আর এক কথা জিজ্ঞেস করিবে—

কলকাতায় যে থাকা করেছ, সে নাকি কিরকম? ছাত থেকে মেয়ে দেখা যায়? অন্তত ঘাট কতদূর? সুশীলদের বাড়ি যেখানে থাকা করেছে সে বাড়ি চেনা? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকিকে নিয়ে সুশীলদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—

অবশ্য এসবও হইতে পারে।...হয়তো কাল-কাল সারিয়া মেয়ে কোলে কিরণ যখন আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো ঢাকিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া তো

যাই—কিরণকে দেখিয়ে যাব, হাসিয়া বই লাখিয়া দিবে। হাতপাখা হাতে দাঁড়াইয়া বলাইবে। বলিবে—এত বেলি হল? মেয়ে কি গাছের তলে ছাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের খুঁত মাত্র নাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখাইতে হইবে। সুধীর পরেই হাজরাইবে। ওমা, একজোড়া সাদা হাস ডিমপাড়ে, অথচ হাস এইটুকু মেয়ের জন্য। মজা দেখো না, চলতি পথে উঠেছে—তিন তিনের বেতের ঝুড়ি মেয়ে ঢাকিয়ে ঢাকিয়ে চালাটা করে নেবে।

বাস নিজের হাতে মেয়ের কপাল হাত পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—ডাক্তারটা পাঠাও, কাল সকালে কিন্তু ওরে ওর হাত খুলে দিও—মেয়ে নীল কপালে খুঁজে অলোমাদুরের জন্যে ওর হাতে ঝিনুক দিও। যাহা, ভাই করবে বউ—যাকে মেয়েরা, যা একটুখানি বাড়াবাড়ি হলে যাও—তা খুঁশি হয়ে খুঁশির কথায় পুরিয়ে দেবেন, সে কেমন হয়ে, বলো তো?

সুধেন্দু চিঠির বাপের বুকে আকড়ায় ধরে লাখিয়া থাকিবে। সুধীর বলিবে—উঃ, একেবারে যে মেয়ের মতো হয়েছে—ডাব খুঁটো, থালের জল, গাছের পড়ন, একটুও তফাৎ নেই—

সুধের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু মাকটা যে মরেছে। বিয়ের সময় ঐ

'এখন অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মীর মনোনীত সাবান লাক্স'

অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী
মৌসুমী চ্যাটার্জী

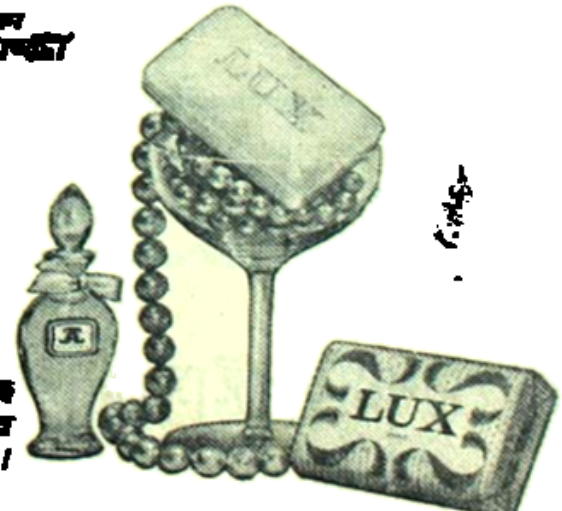

নতুন লাক্সের রঙমহল
আনলো এক নতুন সুবাস, আর
বিশ্বসুন্দরী এক নতুন মাধুরী!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বৌঠাকুরাণীর মনে ব্যথা দিতে হবে হাজার টাকা।

মনের উপর কী পরিমাণ বহিলে ঠিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার [illegible] উঠিবে—সেই তত্ত্বালোচনা পুরোভাগে রহিল।

জ্যোৎস্নালোকে চৈত্র-সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বাতাসে বনস্পতিতে ফুলমঞ্জরীর পরাগরাশি ঘুমের ঘোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুরফুরা করিয়া করিয়া উঠিতেছে। বাহির বাড়ির তাস-টেনিস-ক্লাবে তখনও জমে, চাঁদিনিরের অমল বিদ্যুৎপ্রভ মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভ অন্তর ছায়ার [illegible] ঘন ঘোরা বাস—অটারা-ও-ম, ফ্লক-ওয়ার্ক...বিবাহের পরবর্তী স্বপ্নজাগ্রতির উৎসব উৎসব অনন্তরী কিসের মধুর অনন্তের সাঁইত্ব মিলিয়া সেই রাত্র একটি বিরাট [illegible] রসবন্ধনে মনের অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মনমথ ঘোষ যা উঠিতেই কলা-বাটির খাইবার ঘরে গিয়া বাসনের ঘোরা লাগাইল। বাসন মাজা তো উপলক্ষ্য, কেবল শব্দ আর ফেন—এমনি করিয়া উহারা ঘোষ একত্রের বেলা কাটাইয়া আসে। স্টেশন হইতে সাঁঝের পর হইয়া ফিরে আসিতে হয়। কিন্তু সাঁঝের পিছন করিয়া বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ পটল চেঁচাইয়া উঠিল—ওমা, এত মনমথ এসে পড়ল? তাড়াতাড়ি একটা হাতেই কিন্তু ঘোমটা টানিল। পটল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ও বৌদি, কলাবৌ সাজলি কেন? আমি তাই ভাবি বলি কে? আসছে আষাঢ়ে মনে থাকবে?

মনমথ বলে আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটল যে তাহার ভাঁওতা ধরিয়া ফেলিয়াছিল, সেটা মনমথর সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। সোহাগমধুর ঠেকে এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে।

কিন্তু বলিল—যাই হইক। তুমি বড় ইয়ে হলে, বুঝলেন সঙ্গে ঠাট্টা—তোমার সেখানে—বর বাঁধিয়া বাসন মাজিতে গিয়া পড়িল না, বাসন মাজিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ডাক্তার বাসন্তী উঠিয়া আসে যেবার সময়ে ইতিমধ্যেকার অনেকটা ঘনশ্যামিয়া লিখিলেন, পত্নী যেন আমার কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলির বাড়ি গিয়া বলিলেন—একটা টাকা হাওলাত দিতে পার গাঙ্গুলি? অসুখে নিও—

গাঙ্গুলি নিবারণকে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সুধীর মজুমদার এম. এসেছেন বুঝি? বাসায়ে আছে? সাত তাড়াতাড়ি দেখা যাও, বেলা হয়ে নি। ও আমার কথাটা মনে আছে তো?

নিশি গাঙ্গুলির কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া অফার আপিসে বা অন্য কোথাও সেজদাদের একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তাহাকে খাইয়া এবং গাঙ্গুলিকে বিদায় প্রকারে আপ্যায়িত করিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া নিবারণ বিপদে। চাকরি সম্পর্কে আসিয়াছে, তাহার মান-মর্যাদা চাল আনার বেশি এক আনাও নয়। নিরুপায় পড়িয়া পাঁচ আনা অর্থাৎ বড় দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক আগে দিয়া বসিয়া আছেন। মাথে মাথে ঘোমটাখুন চলিতেছে— ও পাড়ুইদের বৌ, ভুলে যে—অন্যান্য বড় হইয়াছি, ছেলে বাড়ি আসছে, বড় চাকুরে—আমাদের ভাতা ফুরোয়ে দিয়ে যাওয়া তো অভ্যেস নেই—যে যখন ভুলে যে। কিন্তু পাড়ুইদের বৌ কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময় অনুর ফেরুল আই আসা বলিয়া বা করিয়া মাছ ৬-টা লইল।

নিবারণ একেবারে আনন্দময়ী। অনুরও ভাগিয়ে কেন—সকালে মন মনের মতো হয়ে রেঁধেছিল।

খাওয়ার পর যাহাই হোক, একশত অন্ত-খুশি টাকা খাটে থাকলে তাহার মেজাজ ভিন্ন প্রকার।

ভাতের অনেকক্ষণ নিবারণকে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া হাত বলিয়া ভিতরে ভিতরে হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের ঘুম নিতে নাই—হে ঈশ্বরের এত আনন্দময়ী। আনন্দে সুধীর, দেখা যাইবে কত ধরে কত চাল।

সুধীর কথন পৌঁছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সমস্ত করিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সাল হইয়াছে, কিংবা এইবার চাকিটে ঘুমে দিবে। কী মনে করিয়া ওদের যাইতেছিল, এমন সময় স্টেশন সাইকের উপর একটা হাড়ি, দেখে আরও ভালো করিয়া দেখিল। তারপরে বাসাবাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সুধীর আসিয়া ডাকিল—মা, ওমা, কোথায় সব?

সবদিনের মাত্র ডাকিতেছে, টিনের একটি সুটকেস স্টেশন হইতে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, ফলিকাতার বাসায় যে অসুবিধা তাহার একটাও সঙ্গে আসে নাই।

মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পাঁচটি বুঁচিকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীর এক নজরে চাহিয়া দেখিল, ছোয়া [illegible] মুখ—সে ঐ মাই, হাতের চুরকিল মাঝখানে, তার উপর সবের কথা।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, টাঁড়িয়ো গ্রামের 'হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। টিনের বাক্সে সকলের ছোট প্রবীণ, সুধীর সর্বাগ্রে তাহার পায়ের ধুলো লইল। বাঁচিয়া থাকার আশীর্বাদ করিলেন—বাবা সব কথা নিবারণের মুখে শুনে যে কী আনন্দ হল! এখন বৌ-টৌকে আনো, অবশ্য সবারই হোক; বুড়ো বাপ-মাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ তো? নিয়ে যাবে বইকি! গলায় চন্দন করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভালোর কথা কি? আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পল্লী গোঁয়ায়। বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য 'অফিস হস্তরেখার বিচার ও ভালত জ্যোতিষের চর্চা' করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুলী—তোমার সুধীর বাড়ি হবে। উঁচু রেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—ধরি নি?

নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলিও আসিয়াছিলেন, বলিলেন—বাবাজি, আমাদের বাড়িতে অনেকের পর একবার আসিবা করে যেও—তোমার বুড়ীমা ডেকেছেন।

অমনি ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—সে কি করে হবে? সন্ধ্যের পর সুধীরবাবু আমাদের বিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ও'কেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারী করা হবে— কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারী আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিছু বুঝি নে।

মনমথ একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, সেক্রেটারী সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবে। এই বাদুড়, আপাতত উমেশ মুখুজ্যে আর অন্নদাসুন্দরী-সংলগ্ন প্রসাদ এই তিনটে নিল, ছোটো পাঁচকড়ি চুনু দাঁড়ি, বুড়ো ফণীশ ব্রহ্ম আর একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবেন—ব্যস। থিয়েটারের নাম যে কি চমৎকার তাল তার শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু বাদুড়ের কথা কি বলব, তুড়লাই একটা দাড়ির অভাবে অমন সেজে নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলি পুনশ্চ বলিলেন—ছেলে তার ছেলে একবার ছেড়েই হবে বাবাজি, নইলে ছেলের বুড়ীমা তাকি কথা পাবে। সাধারণ

সকল প্রকার আফিস স্টেশনারী কাজের গ্যারেন্টীর সুদৃঢ় ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

৩০৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—১৯

ফোন : অফিস : ৪৫-৪৩৪৪ (৭ লাইন) ৪৫-৪৩৪৫, গুদামঘর : ৪৬-৪৩৪৪ (৭ লাইন)

বসে বসে চলেছেরদুলি খাচ্ছিলো। আমি ছেলেকে পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকরকম অনুযোগ, সুবীর উঠিল। স্নান সারিবার জন্যে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে আর একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের মুখের কিয়দংশ দর্পণে দেখিতে পাইল, সে মুখে এই সুবীর! কিন্তু তাহার সে মুখখানি আর নাই তো। শান্তিময়ের জামাটা পরিয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ডাকবালা এসে, বেলা অনেক হইয়াছে বলিয়া একজনের জন্য-মুরগীওয়ালী করিয়া আসিতেছে।

পরিল মুখটিকে আনিয়া বলিল—বাবা, একবার কোলে নাও না। দেখো, তোমার দেখে কেমন করছে।

সুবীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—বাবাকে এখন।

ছায়াচিত্র জগতের বড়বড়লি লোক—যেহেই কলিকাতাবাসী আসী সেক্রেটারির মন্দুখে মুখেপাধ্যায় পরিচয় দিতে হইবে, বলিল না। ফলে বিহ্বলাল যখন বলিল তখন চাঁদ আমার উপরে। মাতৃহারা মেয়েও একবার দাঁড়ির জন্যেও দিল। সুবীর বলিল—বাস্ত হয়ো না, কালকের মিটিং-এ একটা এগ্রিমেন্ট ঠিক হবে।

দু-তিনি জন আসিয়া সুবীরকে ধরিয়া তোলাইয়া নিয়া গেল।

ঘরে ঢিল আসী, একটা জানলা খোলা ছিল। সুবীর দেখিল—ঠিকাটে করিয়া ছেলিকেল ক্রলিতেছে, কলার ও বাড়িতে মাস-মাসান ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পেছনেই মাটির দেবের কিরণ ঘুমাইয়া আছে। [illegible] বলিয়া বলিয়া অনেকের ছোটো [illegible] ইইয়া পড়িয়াছে। অমনি কেমন [illegible] করিল—কিরণ, ও কিরণ—

[illegible] সেই ডাক একেবারে [illegible]

[illegible] করিয়া উঠিল মেয়ে [illegible] বলিল—তাড়াতাড়ি করো কেন, [illegible]। অনেক কাজের রোই, গান্ধুলিদের [illegible] কাজ—তিন দিন না খেলেও কতি [illegible]

কিরণ মুখে [illegible]—তিন দিন কাজ তো? বাবাকে [illegible] মনে মনে বিলাস, পরিচয় [illegible] কাজের আগে পড়বেন—এ কিরণী [illegible] হয়ে গিয়েছে।

সুবীর বলিল—মেয়ে কি [illegible]? এরি মধ্যে অনুযোগ চাও, আমি মিনিটে [illegible] তিন মাসের জন্য নড়ার নে—দেখে নিও।

—তুমিও, আচ্ছা—দেখব।

কিরণ মুখে টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—আর তাড়াই কেন না, আমা-করা সব সোনা মেয়ে! আসল যা হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুবীর বলিল—সে কথা সে আমারই কিরণ, তার সাক্ষী ভগবান। তারপর মুখ-খানা তাকিয়ার ওপর রাখিয়া কহিতে লাগিল—সত্যিকথা কি জান কিরণ, দেখতে পাচ্ছ তো? দু-বছর যা দেখিনি, আমি বড় সহজের ছেলে নয় তো। আমরা যা দেখে একেবারে ভেঙ্গে পড়ি—সেটাকে মুখে আসিয়েছি—এর পরনের দুটি দেয়া কিন্তু দেখেছ, কাঁদিল তাও তোমরা নি। আমিরা ভগবান আমার মনে পড়ছে, সহজে না।

কিরণের চোখে জল-জল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল—আচ্ছা, তুমি খাবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিম্নস্বরে বলিল—যে মুখে কল্পনায় দেখা ছিল, তা মনে হয়েছে? সে ছাই-ভস্ম ভেবে আর কি হবে বলো।

দুজনে স্নান হইয়া রহিল। সুবীর ঘরের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের মুখে হাসি ফুটিল।

—ওরে, তুমি খুকিকে দেখলে না? এমন মুখে হয়েছে—ঠাইরে মেরে, হাতে হাতে বদ্ধাতি।

সুবীর কহিল—দেখব না কেন? দেখছি তো।

কিরণ যেন কত বড় মিথ্যে, তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল ! ও কখন দেখলে হয় মাকি? মেয়ে আমার সঙ্গে কত সুখ করছিল—আমি আমার হোলেম নিল না, আমার কাল না...তুমি খুকিকে একটা সদ্য হাত বাড়িয়ে দিও—নিশ্চয়ই তিনি মেয়েকে দিয়েছে, আমা দেখার।

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে আমা করতে দিয়েছেন্তুর্তি?

—আসে না? সব কথা বলে, সে কি আর মেয়েকে খুকতে পারে? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার সুরে কহিল—তোমার কাছে, মাকে একলা ঠেলে-গাড়ি নিয়ে দিতে দেবেন—আমি হয়ে পড়ার আগে হাওয়া খাব।

সুবীর হাসিল, বলিল—বটে, আবার আমার মতোন সব হয়েছে?

—কেন আমারই নিজের? আমি আমি দুপাটি আমা কলার আছে, বাবাকে খুকি। তুমি জান, আমার নিজের [illegible] নে। আমাকে যা শিখাবে কি হয়, সবচেয়েছুর সব চলো আমা নিজেরাই।

—কি আমার আমা তো?

—কলকে আড়ি ভরা আছে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে—মেলাবে খুকি নি? তাই তাড়াতাড়ি যাবার আমার আমা চিঠি লিখব, বাবার আগে একটিবার দেখে আমা যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুবীরের মুখ আনন্দে বিবর্ণ হইয়া গেল বলিল—এসব নিয়ে কথা কিরণ।

—কি নিয়ে কথা?

—এই কথা বলার জন্যবাড়ী। ব্রহ্মাণ্ড অনেকদিন ঘটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

পার্টিকারি,

চা ও কফি

ইণ্ডিয়ান টী হাউস

৫৭, নেতাজী সুভাষ রোড

২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড

কলিকাতা-১

ফোন ৮—২২-২৮৩৭

প্রতি টানেই আনন্দ উপভোগ করুন !

অতি উত্তম
ভার্জিনিয়া
তামাক
আপনার
ধূমপানের
আনন্দের জন্য
বিশেষভাবে
মিশ্রিত

এস্কোয়ার
ফিলটার টিপড

মেসার্স গোয়াকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম ভারতীয় উদ্যম

কিরণ বলিল—কেন হবে না—জলবড় ছুবে। মাইনে-খাওয়া লোকে কখনও ব্যবসা করে? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কন্যা পণ্য। আমি তোমাকে কখনো একলা ছাড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাবো কোত্থেকে?

—এ! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বলো না যে?

কিরণ কহিল—আমার খরচ কম, মেয়েরা, আমার নিজের কিছু নেই। কেন তো, আমাকে নিয়ে যাও। আমি বাস না, কখনো তোমার বাসার বাস সম্পূর্ণই বন্ধ দিলাম।

বলিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুবীর বলিল—রাগ হল? কর্তব্যে বাধা এসেছি, তার এইরকম কষ্ট দিয়ে?

—আমি কষ্ট দিই, আর তো কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, সেই জন্যে। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—বন্ধু বান্ধবের মনে কখনো চিঠি দিয়েছ? কখখানা কি এগারখানা। সব বেচে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছি। ঠিকানাগুলো এসেছে, তখন খেয়েই জায়গা দেখেছি। বৃষ্টি—বৃষ্টি—সব বৃষ্টি।

কিরণ চোখ মুছিল।

সুবীর বলিল—কাদলে তো বিশেষ কাজে না, আমি কি করব?

—কি আর করবে— কিন্তু মহল বাড়ি ভাড়া হয়েছি আমি? কিরণ মাথা হাসিয়া, আমি সব জানি।

সুবীর বলিল—না, বুঝলে না—আর কি কাজ থাকতে পারে তো?

—মাইনে ভাড়া উনিশ পাও, তোমার ঐসব সেরেই পকেট ভর্তি হয়ে যায়। ঠিক কি না?

সুবীর বলিল—ঠিক।

—[illegible] বড়।

[illegible] হাসিল।

[illegible] বলিলাম, তোমরা যে কি করবে [illegible] কি বল। [illegible] বলে কিরণ, নিয়ে যাব না তো কি! [illegible] নিয়ে যাব।

কিরণ [illegible]—আমি যাব না, তখনো যাব [illegible] বুঝতে তোমরা নিলে না, [illegible] এখনকার হাসব না, বুঝলে [illegible]? ঠিকানাটি হয়েছে—যাই টাকা, [illegible] ঠিকানা চাইনি।

তখনও শান্ত হাসি [illegible] ছিল।

সুবীর বলিল—এই যে [illegible], তুমি, আমার না? এত কথাও [illegible] বুঝি, তোমার [illegible]—সবগুলো আর [illegible] না।

—[illegible] সবটার কারণে, সেই জন্যে।

কিরণ হাত ধরিয়া টানিয়া সুবীর বলিল—নাও, আর জ্বালাবো না। আজকে অন্যদিনের বড় কথা গিয়েছে।

কিরণ বলিল—বন্ধু তো একলা ছিলেন সেই এতখানি রাত অবধি।

—কি করব বলো? পাশের [illegible] সন্ধ্যেবেলাটায়—ছেলের চাকরির জন্যে দিতে হবে। বলে এলাম, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, যাব। কেমন ছেলে, রূপ [illegible] বয়স অল্পোদ্ধি, সকলের চেয়ে সবের আশা আছে—আর [illegible] ছিলেন হয়ে গেল— কাল সকালে সব আসবেন— মিটিয়ে দিতে হবে। [illegible] আসন বন্ধুকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে রেখেছে [illegible] বলে এসেছে, মেয়েরা এসেছিলে [illegible] পাঠাতে [illegible] ছেলেরা [illegible] বিদায় করবে, তাদের সিনেমার এপিসোড হবে। সকলেরই হাতে না কাজ! সবাই সকল বেলা, কেউ যাবেন না, অবাধাদি যেখানে?

এই সব গল্পের কথা শুনিতে কিরণের ভাল লাগিতেছিল না।

কেন অনেক—বড় কাজ করেছ। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে দুজনের মধ্যে বসিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মতো অধৈর্য নয়, দেখো তো কেমন। নাও।

সুবীর কিন্তু [illegible] করিল না। বলিল—আমার ছেলে আছে [illegible] কলকাতাতে পড়ে। এ সব কাজ হবে। তারি ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই।

ঠিক তাহার কথা শেষ হইতে পরে সুবীর পাশ হইতে নাসিকা ধ্বনি। ছেলেবেলার অভ্যাস ছিল, উঁকিয়া দিয়া দেখিল —মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল।

কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে মোটেই নয়—চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা [illegible] নয়, পাশের থেকে, চাকর [illegible] নয়। কিন্তু বাজারে বলা বলিয়া [illegible] সাময়িক চাকরির সন্ধান হইয়াছে। তোমাদিগকে আনিয়া একসঙ্গে থাকিব। এই আশায় [illegible] করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্থের জন্য আসিয়া দিতে হইয়াছিল, সেটাই [illegible] হইবার নয়। যে কষ্ট দিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। সাহসে বাসায় আর [illegible] করিতে পারি না, তাই দু-একদিন [illegible] আসিয়াছিলাম।

এই মনের মাঝিমের মধ্যে [illegible] খরচ, বাসা-ভাড়া, [illegible] ছেলে-ভাড়া বাবে সম্প্রতি হাতে এমন [illegible] বাস বাসা আছে। চিঠির [illegible] শেষ টানের একখানা নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। ইহা হইতে [illegible] যেন বাসার ছাড়, কেমন [illegible] ব্যবস্থা দেখ, ক্লাবটিক ক্লাবের সিন-ক্রেস, গাড়ুলি-পুত্রের কলিকাতার যাহা খরচ এবং যাবা ও তোমার যদি অসুখ [illegible] সব বাসনা থাকে, সমাধা করিও। আমার [illegible] চিন্তা নাই—অসুখ নাই লিখা লইয়া [illegible] হইলাম।

পরদিন নিবারণ বলিতে লাগিলেন—আপিসের কাজে [illegible] তো বুঝিলাম। [illegible] মধ্যে চৌদ্দিনের এসে হাজির, তোর বেলা ইস্টেশানে পৌঁছে দিতে এলাম। ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাহেবের বিশ্বাস নেই—আপিসের ভেতর দিয়া।

শ্রীমৎ পরমহংস রামানন্দভারতী স্বামীজী কৃত

গুরুবর বলরাম

জন্মস্থান, বাল্য ও ভজনের আলেখ্য শ্রীবলরাম স্বামীজীর
বিস্তৃত জীবনকথা ও অপূর্ব সাধনা
(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনী গভীর ধ্যান সহজভাবে লেখা সম্ভবপর হয় না; আমাদের সৌভাগ্য এক পরম তপস্বী মহাত্মার জীবনকথা আর একজন অপূর্ব ভাগী ও ভগবৎ-কৃপাপাত্র সাধকের লেখনী দ্বারা লোকসমাজে প্রচারিত হইল। আবাল্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ বলরাম স্বামীজীর জীবনকথা—তাঁহার বৈরাগ্য, সাধনা, জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা এমন সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থপাঠে ভগবৎ-প্রীতি লাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

● সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই ● পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ
প্রথম খণ্ড—১০·০০ দ্বিতীয় খণ্ড—৮·০০
দুই খণ্ড একত্রে—১৪·০০

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পরমহংস মঠ, ৭৩ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা মঠের ।
১০১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

মনোজ বসু

আনন্দ পাঠক

মনোজ বসুর 'বাস' এবং নতুন মানুষ' গল্প-দুটি যখন প্রায় একই সময় প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন অনেক আগেই আমরা সাহিত্যে নতুনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের জীবন-চেতনার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছিল, তার আনবার্য ফলশ্রুতি হল আত্মসচেতন মানসিকতা। এবং সেই সূত্র থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন জীবনবোধ, এক আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা। মনুষ্য পরিবেশের যেসব চরিত্র আমাদের আধুনিক মনন-সাহিত্যে কুণ্ঠিত জীবন-চেতনার ভিত্তিভূমিকে এক নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

মনোজ বসু কিন্তু অনেক পরের অনেকদিন পরেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েও বিষয়বস্তুবিন্যাসে অনেকখানি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রইলেন। প্রতিদিনের-পরিবেশের উৎস-সন্ধানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রারম্ভ। সহজ-সুন্দরের কৃত্রিমতার অনেক সেখানে অনুপস্থিত। তাই মনোজ বসু প্রথমবারের নিত্য-পরিচিত পরিবেশে, প্রতিদিনের পরিচিত স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দবেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতকে তুলনায় তাঁর লেখনীতে।

অনেক এখন বিশ্লেষণে ধরা যায়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার অনুবিদ্ধ অবস্থাতেও যাঁরা প্রতিদিনের জীবন-চেতনা এবং অনুভূতি অবলম্বনে এ এ আধুনিক-নির্মিতির উপাদানে এক সর্বকালীন ভবিষ্যতের পথে যাত্রাশুরু করেছেন মনোজ বসু সেই অনুসন্ধিৎসু ছোটগল্পকারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

মনুষ্যজীবনের পরিধি, অন্তরঙ্গ সম্পর্কগুলি, ছোটখাটো সাধারণ ঘটনা থেকে গল্পের সূত্র সন্ধানের আগ্রহ, এবং আপাতভাবে অতি পরিচিত একটি ইঙ্গিতে সমাপ্তি এই হল আধুনিক ছোটগল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উপাদান বা উপকরণ বড় কথা নয়, যার আঙ্গিক-নির্মিতির বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা এবং একটা সুচতুরতার মোহময় বাঁধি-গতের স্পর্শেই আধুনিক ছোটগল্পের সার্থকতা।

মনোজ বসুর প্রথমদিকের ছোটগল্পে এই প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা সহজে সন্ধানে আসবে। তাঁর অনেক সার্থকতার গল্পগুলি, যেমন তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিচিত জীবনবৃত্তের গল্পগুলি, সেই গল্পগুলিতে একটি নিটোল, আগাগোড়া গল্প হয়ে ওঠা ছাড়াও যা বাঁধুনির এবং পরিণতির আকস্মিকতায় ইঙ্গিত, আইডিয়ার আকস্মিক প্রকাশ, আশ্চর্যজনকতার বিচিত্র রূপ, প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশ এবং সমাপ্তিতে এক বৃহৎ জীবনচেতনার উপলব্ধির মত কত অনুভূতির মধ্যে সমাহিত জীবন-সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

মনোজ বসুর গল্পগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কাহিনী-প্রধান গল্প, ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক গল্প এবং প্রতিবেশিক গল্প। আর এই তিন ধরনের গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনচেতনার বিবর্তনের ধারাটিকেও সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

মনোজ বসুর অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী-মানসে গ্রামবাংলার প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ মানুষের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের কাহিনী স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তীকালে যখন তাঁর দৃষ্টির পরিধি প্রসারিত হয়েছে, তাঁর জীবন-চেতনার দুস্তরের দর্পণে যখন শহর ও সমাজের চেহারাটা ধরা পড়েছে, তখনও তাঁর ছোটগল্পের কেন্দ্রবিন্দুটি আমরা প্রকৃতি-সান্নিধ্যে লালিত সহজ, সরল স্বাভাবিক মানুষ। তাদের জীবনের রোমান্স, মানুষে, বিরহ-মিলনে সুখ-দুঃখে, হাসিকান্নায়, বিশ্বয়-বেদনায় প্রকৃতি-সম্পৃক্ত কত কত ছবি তাঁর রোমান্টিক শিল্পী-মানসে একদিন ছন্দ-সুন্দর রূপ নিয়ে ধরা পড়েছিল।

মনোজ বসু স্বভাব রোমান্টিক এবং আশাবাদী। তাই যা প্রত্যক্ষ সুন্দর তাকেই একমাত্র জীবন-সত্য বলে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রোমান্টিক শিল্পী-মানস জীবন-সত্যে যে আলোর অবতরণে ধন্য পেল, তাঁর আবেদনকে জীবনের যে রূপে সুন্দর রূপটি ফুটে উঠে তাকেই তিনি মূল্য দেন তাঁর ছোটগল্পে। অবশ্যই, ছোটগল্পগুলি তাঁর রোমান্টিক শিল্পীমানসের 'অনুকূল উপাদান।

জীবনে সব সময়ে, সব মানুষ নীড় বাঁধতে পারে। কিন্তু আকাশের নীড়ে মেঘ-মায়ের নীড়ে মেলে আশ্রয় দুর্বলতার আশ্বাস। প্রকৃতির নিবিড় আবাস আর মানুষের আশ্রয়ে, অজান্তেই তার জীবন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মানুষ তাকেও বলে জয় করে নেয় এই দুঃখ? নেয় এই দুর্বলতার আশ্রয়? মনোজ বসুর ছোট-

গল্পগুলি মানুষের এই অন্তর্হীন প্রশ্নে অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টায় তাঁর জীবন-দৃষ্টি ক্রমশ রাষ্ট্রনীতি থেকে সমাজ, রাষ্ট্র এবং শেষে ব্যক্তিতে উপনীত হয়েছে। এরি জন্যেই তাঁর আক্রমণও রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ পরিধি থেকে সমাজ থেকে ক্রমশ এক সার্বজনীন জীবন-চেতনে উত্তরিত হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়কের চেহারা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভৃতি তাঁর প্রথমদিকের লেখা গল্পগুলি থেকে শুরু করে তাঁর শেষ পর্যায়ের লেখা সমীক্ষা, দুরন্তকর্ণ প্রভৃতি রাজনৈতিক গল্পগুলিরও সেই একই প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণের ব্যাকুলতা। শুধুমাত্র অতীত পর্ব-স্মৃতি বাদ্ধি ও পরিবার জীবনের পরিধি থেকে দেশ ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমবয়সী' গল্পগুলিতে এক রোমান্টিক ভাবালুতাই সৃষ্টির পরিবেশের প্রোতধারায় লক্ষিত। গল্পগুলি বিশ্বস্ত মেয়েদের অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিত। কিন্তু মেয়েদের অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বলোকের পথে যাত্রা করে 'দাঁড়কাক' বা 'নিশির রোমান্স' গল্পের 'ভূতের অভিমানের রস-মধুর চিত্র, কিংবা 'শিমুলের হাতেখড়ি' 'অসম' সংকলনের 'সাঁঝবেলা' হোক, আর 'অসমবয়সী' সংকলনের 'অরুণা-টগরের রহস্য-লোকই হোক, জীবনসত্য তাঁর রোমান্টিক লোকের এক রহস্য-মুগ্ধ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

[illegible] বাঙালীর গল্পরস প্রেমের রোমান্স-[illegible]র একতা অনস্বীকার্য। 'একা [illegible] স্মৃতির মেঘলা' 'শিমুলের হাতেখড়ি' 'অসমবয়সী' ও চিত্রলেখা', 'নিশির [illegible] 'শিলালি ফোড়' প্রভৃতি গল্পগুলিতে বাঙালীর [illegible]-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র ঔপন্যাসিক নিপুণ তুলিতে।

'অসমবয়সী' সংকলনের গল্পগুলি তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। স্মৃতিচারণের পথায় লেখকের রোমান্টিক মনোভঙ্গি এক নতুন শিল্পরীতির সৃষ্টিতে হয়ে গভীর মননশীলতা এবং তীব্র, তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনার সমন্বয় ঘটেছে। গল্পগুলি রচনার ব্যাপারে এবং একটি নিম্নে মধ্যের উঁচুস্তর ভিন্নে এক সুষমা-বিধৃত সমের বন্ধনায় কেন্দ্রীভূত উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পরিসরে বর্ণনার ঘেরে ব্যাপ্তির প্রধান হয়ে উঠেছে। লেখকের বক্তিত্বের স্পর্শে জীবন-সত্যের যে প্রতিফলন ঘটা সম্ভব, তা নিঃসন্দেহে [illegible] সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ-নির্ভরতার স্মার্ট ঘরোয়া জীবনচেতনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্প যেন জীবনের উপলব্ধি এক-একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। লেখক প্রতীকের আলো-আঁধারী লীলায় জীবনের এক-একটি খণ্ডসত্যকে প্রকাশের অভিলাষী। এই গল্পগুলিতে কোন নিটোল গল্প নেই। একটুকরো ঘটনা, একটি বিশিষ্ট ভাবানুভূতি কিংবা এক কিশোর মনোজগৎ চলার জীবনের এক-একটি ভাব-মূর্তিরূপে ধরা দিয়ে তাঁর ভাবানুভূতির এক নিম্নস্তরের বাহনের ভোজ্যরূপ হয়ে উঠেছে।

অন্নদা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বাদুড়বাগান, বাঁড়ুজ্জি, পদ্ম, পোস্টমাস্টার, মুকুন্দমোহন, চাকুরে ইত্যাদি গল্পগুলি লেখকের পরিবর্তিত শিল্পমানসের সার্থক প্রকাশ।

এই সংকলনের কোন কোন গল্পে ঘটনা ও চরিত্র ঔপন্যাসিক থেকে আর্কি-ক্রাইমিকল সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'কুমলা মেয়ের ছেলে' গল্পটিকে আর্কি-টাইপেরকের প্রথম নিদর্শন বলা যেতে পারে।

আমার মতগুলি গল্পের সমকালীন রেল ও সমাজের চমৎকার বর্ণনাও অনুপম হয়েছে। 'অসমবয়সী' সংকলনের অন্যতম গল্প 'সাঁঝবেলা', 'আমীন সাহেব' 'মুক্তপুর যাত্রা', 'রাজবন্দী' গান্ধিহীন' প্রভৃতি গল্পে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সমাজ ও কাল সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি, মনোজ বসু রোমান্টিক জীবন-শিল্পী। তাই তাঁর রোমান্টিকগুলি তাঁর মনন-লোকের মনস্বাপীকেই নব নব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছে। বিবাহিত মেয়ের নিঃসঙ্গ জীবনী, পল্লী-প্রকৃতির পরিচয়, অজানা-ইতিহাসের আলোছায়ার রূপায়ণ, কিংবা সমাজমনস্ক মেয়ে ও সমাজের ভাষা ভাষা—সবই তাঁর মনন-লোকের অন্তর-কথা। মানুষ, জনজীবন, রাষ্ট্রনায়কের চেহারা এবং নিসর্গ প্রভৃতি গল্পগুলি তাঁর বিভিন্নমুখী এবং লীলায়িত শিল্পদৃষ্টির ক্রমে বিকাশ।

মনোজ বসু।
'রূপা' থেকে বলছি :
কান না ইচ্ছা করে দৈনন্দিনের পরিচিত প্রতিবেশকে ফেলে অজানা অচেনার পথে পা বাড়াতে। আবার সে যাত্রা যদি হয় মরু প্রান্তরের ভেতর দিয়ে, আন্দোলিত খর্জুরবীথির পাশ কাটিয়ে বাদশাহী মহলের একেবারে গোপন অন্তঃপুরে। সেখানে একরাতের বেগম শাহরাজাদী শুরু করেছেন তাঁর গল্প—আর বাদুর জগতে কলী মানুষের মত শুনছেন বাদশা সেই কাহিনী। ভোর হলেই প্রতিদিনের নিয়ম মত প্রাণের রাণীর গর্দান যাবে জহ্লাদের খড়্গে।—এই হল বাদশাহী ফরমান। কিন্তু গল্প তাঁর শেষ হয় না, পেরিয়ে যায় হাজার একটি রাত। তারপর...?
না, আমরা পায়ে চলার পথ পেরিয়ে কোনদিনও পৌঁছতে পারব না গল্পের সেই যাদু-মহলে। তাই 'আরব্য রজনী'র গল্পগুলিকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে আপনাদের সামনে তুলে ধরবার পরিকল্পনা নিয়েছি। আর এ কাজে এগিয়ে এসেছেন কৃতি লেখক তারাপদ রাহা মহাশয় তাঁর অননুকরণীয় কথার কলম হাতে নিয়ে।
দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশের অপেক্ষায়।
তারাপদ রাহা
আরব্য রজনী
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড
প্রতি খণ্ডের মূল্য : ৫.০০
রূপা
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

আরব্যরাত্রের সেউল গল্পটিতে লেখকের বিদগ্ধ রোমান্টিক মনন-মধুর জীবন-রস আস্বাদ হয়ে উঠেছে। গল্পটি এক বাড়িওয়ালার আত্মকাহিনীর বাঙ্ময় রূপ। বাড়ির মালিকের বাড়িতে বহুদিন-বন্ধু এবং ছোট বৈমাত্র ভাইকে ফেলে জীবিকার অন্বেষণে তাকে বেরোতে হল, কিন্তু ফিরে এসে দেখে তার ঘর শূন্য। দুঃখে এবং অপমানে সে বৈমাত্র ভাইকে নিয়ে দেশান্তরী হল। বিশ বছর পরে আবার ফেরা। সে গ্রামে ফিরে এসে, দেখল সে জায়গাগুলোর চারিত্র্য-লক্ষণ। জায়গার নাম, সংখ্যা সে ভুলে গেছে সবের সঙ্গে। তবুও মনে পড়ছিল না। তার জন্য দরকারী হল মালেকের প্রত্যক্ষ-পূর্বে বন্দিনী রূপসীটিকে দেখে মালেকের মনে সাধ জাগল নতুন করে সংসার পাতার। আরবীকে কেন্দ্র করে এক গৃহস্থালির চরিত্রচিত্র সেখানে মালেকের। সেই গৃহস্থালির দেবী-প্রতিষ্ঠা আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য মহাসমারোহে পড়ে উঠবে নতুন বাসস্থানের সেউল, কিন্তু ভাগ্যের বিচিত্র আঘাত এসে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। বিদেশের মাটি প্রতীক্ষা করে-থেকে মালেকের জানতে পারল তার অনুপস্থিতির সময়ে তার বৈমাত্র ভাইএর ব্যবহার বদ্। অপমানে সংসার নিষ্ঠুরে পরিণত সেই 'বরাই পুরুষে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিশাল কীর্তি রাজস্থানের সেউলকে নিজের হাতে ভেঙে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে পথিক অতল জলে ঝাঁপ দিল।

সমস্ত গল্পটিতে এক মধুর ট্রাজেডির চিত্র কি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাস্তবের 'নির্মাত-নিরপেক্ষ' জীবনের অভিজ্ঞতা, নিপুণ মেদোসিসের উপায় বল এবং তার ঐতিহ্যিক পরিবর্তন লেখকের রোমান্টিক মনস্তাপে জীবন-মূলো সমৃদ্ধ করেছে।

মনোজ বসুর ছোটোগল্পগুলিতে, গতিবিধিবাহার রোমাঞ্চকরতের সঞ্চারণের এবং প্রত্যক্ষদর্শিতার জীবন-সত্যের উপলব্ধি ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাই বোধহয় লেখকের জীবনবোধের প্রারম্ভে যে বিদগ্ধ মেজাজের ক্ষুরধার অপরাহ্ণ, পরিসমাপ্তিতে সেই অপরাহ্ণের জীবনসন্ধানী 'বিদগ্ধ কৌতুকের পরিবর্তে অনুভূতির ঘূর্ণিতে বিহ্বলতা বিস্ময়ের।

মনোজ বসুর 'মেঘের কথাতেই বলা যায়, 'চোখের জল আর, অন্তরের ব্যথা উজাড় করে যে আমার গল্পগুলির সৃষ্টি।'

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা?

রিস্টওয়াচ, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি, ক্যামেরা, ট্রানজিস্টর, টেবিলক্লক, ট্রফি—উপহার চাই ছোট, মাঝারি আকার। কিন্তু দাম হবে অনুরূপ—সুন্দর ছোট্ট। তাহলে এখনই ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে, আজকেই, এখনই।

যাবতীয় যে-কোন দামী প্রতিশ্রুতি কিনতে পারবেন।

ইউনাইটেড

গিফ্‌ট

চেক

দেখুন না...

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

যুদ্ধের আবির্ভাব

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখানে আমি চাকরি পাবো কেমন? তবে কলকাতার মেসে চাও তো মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

কলকাতায় পিসতুতো ভাইকে ডাক্তার মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন। পত্রের জন্য মামা না যামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এল। গ্রামে বসিয়া কী কেরোসিন পাঁচিয়া পরিতেছ? চাকরি করিতে চাও তো একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লেখক আমারও চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয়, অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবসা করিতেছি, ছাতা সিলিব, নিজে ট্রাম একবার চড়িতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে-মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পাঁচিয়া পরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম—চাকরি করে কী হবে? তোমাকে কিছু আমি ছেড়ে দিচ্ছি, চলে করো! খাজনা বাবদ কিছু চাই না, ফসল হলে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। পয়সা দিবার পয়সা নাই, আমিই কিছু দরে কাঁটি' আর্জন করিতেছি [illegible],—জমিতে সুবিধে না [illegible] এই বার তোমার শোধ

ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। [illegible] কাজের জন্যে এক রিপোর্ট [illegible] কি-এ পাশ-করা ছেলে [illegible] না করিয়া নিজ হাতে [illegible]—বড়-বড় মেকলুমোনে পয়লা [illegible] দিনেদিনে রাজী হইয়া গেল। ব্যোমকেশ আমিও কী যেন একটা করিতেছি: আমি অধিবাসী, আমার উপর দুই একটা প্রতিবেশ নেওয়া হইয়া যাওয়া।

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারিদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী, ও নতুন রবির মতো ঝকঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোটখেলা হইতে সহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিয়াছেই তাহার মনে ঘরের গাড়ির চাকার একঘেয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্যাপ্ত বাতাসে গাঢ়ির ঘুমাইয়া একটি গাঢ়ে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের সহরে রুক্ষশ্রী সত্ত্বেও ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সন্ন্যাসের তার স্পষ্ট অসীম। তাহার মুখের একটি কথায় জন-মজুর একলোকনা কাজ নিয়েছে সন্ধ্যা করিয়া আনে। দেখিতে-দেখিতে তাহার দুপুরে সামনের জমিটা ফুলফল বনে হইয়া উঠিল; দুইটি সিদ্ধ গরু কোথাকে যোগাড় করিয়া ঘরের পিছনে খোঁয়াড় বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার নিজে হাতের একটি মস্ত বাঁধা দুইল—সেখানে সকালে বেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের তলার মতো নরম ঝকঝকে করিয়া তুলিল। মিহির বেওয়ানি-খান-এর সি সি [illegible] মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তো এইখানে, এইখানে!

বিবাহের দান-সামগ্রীর বাসন্তীর জিনিস আসিয়া পৌঁছিল—পক্ষিদের জন্যেকে ছোট-খাটো একটা ডুয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নিমন্ত্রিতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া মালা করে ও আমি যখন একা ঘরে বসিয়া গল্প লিখি, তখনো আমরা নিঃসঙ্গ নই—তখন কিছু নেহায় করি না, তখনো আকাশ ও আলো, তারা ও অন্ধকার ছিলিয়া আমাদের পারিপার্শ্বের অনুভূতিকে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-একা এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের তলে অপরিসীম বিরহ ভোগ করিতেছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজে ঠিক না পালাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরালয়ে নিয়মিত আসিয়া মিলিতাম। এবং অবশ্য এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অবসরে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিতাম ও জেদের ঘণ্টা বাজাইয়া লাস্ট ট্রামকে যখন অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন চট করিয়া মনে পড়িত বাইতে যে আজ রাত্রে ফিরিয়া যাইবার কোনো পথ-ই আর খোলা রাখি নাই। এবং শনিবারের রাতেই যখন যাই-যাই-না-যাই এমনি মিথ্যা উত্তেজনার মধ্য দিয়া ভাটাইয়া দিলাম, তখন নিশ্চিন্ত ছুটির রবিবার বাতটাই বা ঘুমাইয়া লইতে কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার ভোরে অনিদ্রাক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেসে ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলিগ্রাম কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কিছু নয়, বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহাশয় এখানেই, একটা কাজ খোঁজা লইতে বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখিবেন ও পচা পুকুরের জল খাইতে দিবেন না এমনি একটা অনুরোধে আমার জন্যে বাড়ি-ভাড়ার টাকা যুগিয়েও বাড়ি হইয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে মোঁ বলিয়া বসিলাম, মনে হইল, ছোটা খুলে বাস করিয়া অবতীর্ণ হইলে সেই মেসে অনায়াসে হরদম চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। গ্রামে তো আসিলামই, বাসন্তীকে লইয়া আসিলাম। সে যতোই কেন না নাসারন্ধ্রকে স্ফীত করুক, এতো বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া এতো প্রচুর জোৎস্না তাহার দুই চোখে আর ধুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বাড়িতে নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এইখানে

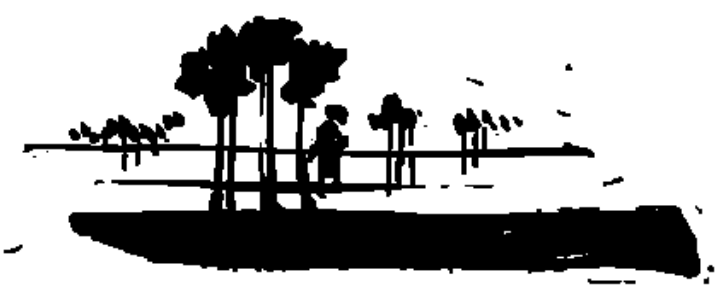

সে সবচেয়ে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথায় যে তাহার আসল, এতো দিনে তাহা আবিষ্কারের পর তাহার আনন্দের অন্ত নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে ছোটোখাটো একটা ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া জীবন তাহাদের অপমানও করিয়া ছেলে। তিনি সগর্জনে বলিয়া বসিলেন : বাসন্তী যদি আমার কথায় অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখবো না। বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম,—সে ধীরে আমার পিছনে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দৃঢ়তিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, মুখ বিকৃত করিয়া অস্ফুট একটা ভিরস্কার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া স্টেশনের পথে আসিতে আসিতে ভাবিলাম,—দুনিয়ার বাজারে সীতার অগ্নিপরীক্ষার একটা অসমসাহসিক সত্তার দৃষ্টান্ত দেখলাম।

[illegible] বিয়ের সময় শ্বশুর-মহাশয় যে [illegible] বাসন্তী [illegible] আমার ভাইপোর [illegible] স্টেশনের [illegible] আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে শ্বশুরমহাশয় তাহা করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে, যে এই সব জিনিস ঘরে[illegible] করিয়া রাখিতে তাহার মূল হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পরিচয় করিয়া রাখিবারো যে কোনোকালে [illegible] অধিকার ছিল না জীবনের এই অবাচীন তাহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী [illegible] করে হইল না,—সমরে-অসময়ে কেবল নানা আবদার আবেদন লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এই-এটা চলমান করিয়া আলোকারার সামনে-পাছুর দোল-দুলেরে [illegible] করিয়া তোলে। বিয়ের সময় কয়া কিছু গহনাগিলায় তাহা সরা বইয়ে-অসময়ে ঘর-দুয়ার ঝাঁঝিয়া ফেলিয়াছে। পা-দোলের মতো সূত্র করিয়া হইতে সূত্র করিয়া হেলা-ফেলা বাক্স-ঘরে দিন-রিনিমি ঝিমিতে ঘর-দুয়ার গমগম করিতে লাগিল।

নিজের পরীক্ষা সম্বন্ধে অবহেলা না হোক, ঘর-সংসারে বাসন্তী একেবারে মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু পড়ু ছাড়িয়া অন্তঃপুরিনীকেই সূত্র দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন ভালো যে সুন্দর হইয়াছে তাহা তাহাকে দেখিলে বুঝা যাইবে না। চেহারার যে একটা আবেদন যেমন তাহার পড়িয়াছিল, সেদিন অন্তরঙ্গতার আলোকের চাঞ্চল্যের মধ্যে এতোদিনে তাহার মর্মা-মর্ম মূল উদ্ঘাটিত হইল। শরতের প্রভাত মধুরতা হইতে সূত্র করিয়া জ্যোৎস্নারাত্রির সূত্র পূর্ণিমা চন্দ্র সম্বন্ধের আলোর তলে একটি নদীরেখা নিঃশব্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাসন্তীর,—এতো সব জিনিসপত্র তুমি যোগাও কখন, এ ছেলেমানুষ বেলায় কে? লোকের দেখাতে না পারলে বিলাসিতার সুখ কী!

বাসন্তী জোরে ঝাঁঝালো ঝগড়াটে-ঝগড়াটে করিয়া,—বে মানুষ দেখবে! আমি আর বুঝি।

হাসিয়া বলিলাম— নিজেদের বেলায় তুমি নিজেরাই তো যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে অনুকরণে নিজেদের খালি সঙ্কীর্ণ করে ছাড়া!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিয়াই জোর ঘাড়ে: তাহাতেও সেটোমানুষটা ঠিক কতিলে তাহার কষ্ট হিবে।

জীবনে নতুন একটি আবাহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত গড়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে যেন একটা হাল্কা মিলন-পাইয়াছি, আকাশের চারুকার্য তাহা বাসন্তীর স্নেহের চাঞ্চল্যটা স্পর্শের মতো পরিচিত, বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর স্নেহ নতুন নয়, জানের অনুভূতিতে নতুন হইয়াছে: [illegible] নিজেই সম্পূর্ণ নিজের কিন্তু নিজের নয়। যখন আমি ঘরে [illegible] বাসন্তী [illegible] পড়ার মধ্যে [illegible] নিঃশব্দে আমাদের ঝগড়া-লড়াইয়ের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অন্ত সময়ের চল-বহুল বিপুল ঐশ্বর্য-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনন্য মনে হইয়াছে।

এই নতুনত্বের নেশা [illegible] আমি সমস্ত দিয়া চেতনি করিব ও চলমান চাঁদের দৃষ্টি মুহূর্তে পাড়ি-জোড়ার উৎসাহ হইতে বাঁচাইয়া চলিবার স্বাভাবিক উদ্যমের দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—অন্তরঙ্গতার আকাশে কী ঝাঁঝিবারের!

যাহা সমস্ত ঠিক। কিন্তু বাসিয়া মন নাই বটে কিন্তু এই ছোট সংসার বাড়িখানি, বিশে পাড়ি-সমূহ আমার [illegible] করিব ঘর [illegible] আমি [illegible] একটি ঝরিবারের সঙ্গে ভরিয়া [illegible] পরিবেশ করিব কোন সূত্রে? চাঁদিকা-নির্দেশের অন্তরালে কঠিন দৃষ্টি-রেখাতে সঙ্গে এড়াইয়া এই যে চলমান একটি চলন্ত সোনা করিয়াছি, কী বলিয়া ইহার চলনা দিব? আমার এই অবস্থা [illegible] হইতে [illegible] স্নেহের ভরা কাহিনী অন্তরা ঘটনা অন্তরা চাঁদের মুহূর্তের গতিন উঠিবে যে বলিতে পারে

যাহ সরিয়া গাঙ্গুলিরা ভালো করিয়া আসিয়া আসিল। নিজের সোনারির আলিমা মতন একটা গল্প লিখিতেছি। ইঁদুরমারার গল্পটা [illegible] করিয়া নিয়া একদিন কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ঘর শূন্য হইয়া গেলে নদীর ঘরে [illegible] মুখ লিখিতেছি।

আমার অন্তরালে বাসন্তীকে যেমন ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল হাতের এই অন্তর প্রশান্তি ধীরে ধীরে যাহাকে তীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে চলতে পরীক্ষারের মধ্যে নিজের যে [illegible] চঞ্চল বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বিরহীর আঁচলে চাঁদ—এখানে তাহার আর তেমন আকর্ষণের না। এক-টানা বৃষ্টির মধ্যে যাহার পরিবেশটি স্পষ্ট জানে থাকিত।

পাহারার মুখের মতো মাঝের ঘরের দরজা ভেজাইয়া কেরোসিন বিছানার শুইয়া পড়িয়াছে। "জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে জাগাইয়া বলিল। কহিল,—আমার বড় ভয় করছে।

বলিলাম- ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না। আমার মুখের কাছে মুখ পুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

হোমরাচিতে নিবাইয়া দিয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি রাশি জোনাকির ঝলমলী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। অন্ধকার রাত্রে মধ্য দিয়া ফোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস হাহাকে আশ্রয় করিয়া বোলে, সারারাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই মিলনক্ষণটা। বাসন্তী পরিচিত জগতে ফিরিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিসপত্র ঝাড়ে-পোঁছে, ঘর-দুয়ার ঝুটির ঝরনার মতো ঝকঝকে করিয়া তোলে।

রাত্রি কাল রাত্রে নাকি অনেক রাত্রে ডাকিয়া [illegible] আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ঝোপঝাড়ের ক্ষেত আগাছা-মাটি সুদৃশ্য করিয়াছে। পাড় সবুজে ঝিকে সোনালির [illegible] দিয়াছে দেখা যায়। ঝোপঝাড়ের স্পর্শে আর ধরে না। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

তুমি ঘরে যাইতে হইল না—তবুই যা ছেড়ে। [illegible] আসিয়াছে এখনো আরোগ্য যায় নাই। সর্বাঙ্গে ঢাকিয়া এখনো তাহার উত্তাপ উৎসাহ। জীবন যাত্র, পাড়। নিজে চাহিলে বন্ধুর মতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, আমি ঝোপঝাড় দেখিয়া করিয়, মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড় ধরিয়া গেল, সাবধান না হইলেই আমি তোমাকে সুদ্ধ গ্রাস করিয়া বসিব। ঘুরে চাহিলে মনে হয়, একটা [illegible] [illegible] [illegible]

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ।
নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক শ্রীরাধেকৃষ্ণ মূর্ত্তি, শিশিবক্স এবং কার্টনের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারকের এম.এল.বসু এণ্ড সন্স দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশতৈল

এম.এল.বসু এণ্ড সন্স আইভরী ট্রী-লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

বিকেল হইলেই মাঠ ফেরত ঘুঘুগুলি মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতোক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দুজনে আবার ফেরারীতে বাহির হইলাম—বেলাশেষের মধুর এইসব সঙ্গে আসিল না। চলিতে চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি। নদী তখন প্রকাণ্ড অন্ধকার মুক্তির উপর পরিপার্শ্বে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সমস্তই নদী—এখন চোখের নিমন্ত্রণেই বাঙালি মেয়ের মতো নিরীহ। ঘুমন্ত জলের বুকে-বুকে কত কাঁপিতেছে। মতো তাহি নদীর দিকে যেন্তেই আসিল না, তবেই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। কার যাইবারই বা আছে কোথায়? যেখানে যাইব, সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রহিয়াছে! চোখে-চোখে মতো কাছে যে আসিয়া আসিল। আমাদের বাড়ীর বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি বহিয়া জল হইয়া গড়াইয়া আসিয়াছে, দেখি তাহা কোনদিন ফাঁক হইয়া গেছে। এখন বাঁধানো একেবারে সাদা, সমস্ত ঘাট নদীর কোথাও এতোটুকু আর নেই—যেন অবিশ্বাস্যরকম পরু হয়। এত বড়ো মুক্তির মধ্যেও দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ছোট হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো নিকটে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জমজমাটের আসিয়া বসিলাম রাত্রে গায়-গায়ের আড়ালে আর একটি কুটিরের নিকট আসিয়া। কোনো চাষা-কুষার বাড়ি হইবে, নদী কাছে আসিয়া পড়ায় ঘরেই কিছু নিরাপদ। ছোট উঠানটি বিরিয়া সংসারের ছোট ছোট ছিন্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়াতাড়িতে সব জিনিস হাতের সরাইতে পারে নাই—মানুষের প্রাণের চেয়ে কতোগুলি ভাঙা-কুড়োর দাম তো আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত, শূন্য ঘরের নিরানন্দ ছোঁয়া দেখিয়া মন আরি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হঠাৎ কুড়ে ঘরের সব কথা কহিতে লাগিল। সন্ধ্যায় এখানে সে ছোট-খাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—বিলে মাইলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া দুঃ-পয়সা রোজগার করিয়া নিজে খাইবে। আমি উহার আবদার নিঃশেষে পালন করিয়াছি, আরো কহিলাম—সরকার-মশায়কে বলে ঘুরি টিনের টালা জোগাড় করে দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আমে কী করতে? এ তো আর বাজে আমে উড়োনো নয়, কল্যাণ-কর্মে দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাবে কোথায়?

—সরকার-মশায়কে বলেই বিনি বন্দোবস্ত করে নেবেন। কম ভাড়া আমি বাড়ি কী পড়ে আছে! এঁদিকে আমার ভাই-বোনের একটা জন্মদিন জন্মুক, তখন তো উঠে পড়ে খরচ করতে সমস্ত আমবে। কেমন, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে টানিয়া বসিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বক-পাখিরা উড়িয়া গেল। পশ্চিমের চক্রবাল সমস্ত নিঃশব্দতাটা হঠাৎ স্পষ্ট করিয়া তুলিল। দূরে খেয়ার পরপার ঝাঁপসা পাড়ায় ঘরে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। মনে এলোই, হঠাৎই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে! শিহর দিয়া চাহিয়া দেখি নিকষে কালো নদী ঝাঁপির বিষাদার পা এলাইয়া ঘুমাইতেছে— কোথাও যেন এক-টুকু নিশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী হাসির দিকে চাহিয়া যেন কহিল, যেন হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর স্কুলের বাড়ি উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে! নিজেই কয়েকের দুইটি ছেলে নিয়া সে ক-খ সুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবে না এমন কথা বলিয়া কহিয়া বলিবার মতো সাহস রহিল না।

মন্দুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া মাস্টার ও বাড়ি ভাইটিকে ইস্কুলে দিয়া ফেরে। তার নিজেই রান্নাঘরে দুজন দুই ছেলে জড়ো তুলিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া করিতে থাকে, বাসন্তীও উনানে আগুন দিয়া বসে। শ্মশান ভবিষ্যতে পর্যাপ্তভাবে আমার অভিযোগের সামঞ্জস্য।

একটুও ভয় তো সে নাই, বরং দুজনে ছেলে দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমুতে-চুমুতে ঘোর-ঘুম আসিয়া ঔষধের সারেন্দা করিতে চেষ্টা করে।

পরিচয়ের কেউয়ে ধরিয়া আমি আহা বেশি ও লিখিবার কিছু পাই খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্ধ্যাসমাজোড়া নদীর নিস্তব্ধতা লইয়া কলম লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সন্তর্পণে কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে খবর করিয়া নদী লুকোইয়া নিয়ে বলিয়া আমরেই সন্ধ্যেবেলাটে তাঁর পায়ে পড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পূজো বসে একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর রাত পাইবে না—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ঘুমন্তের মতো তীক্ষ্ণ দুইটা অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অন্তরের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে নিতাই অন্ধকারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর অভিমান জমা হইতে কখন ছুটিয়া গেল।

বাসন্তী বিরত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উদ্যোগ করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বাসন্তীকে কাটিয়া গেল। এই কয়িয়াও ছেলেকে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে জোগাড় করিতে পারিল না। একদিন গ্রাম ছেড়েপাই হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিনমান হইবার জন্য কে এখানে সখ করিয়া বসিয়া থাকিবে?

সন্ধ্যাসমাজোড়া নদীর সেই ঘনতা আজ আর ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে খুঁজিয়া আবিষ্কারিলাম, কিন্তু নদীর গর্ভদেশের সঙ্গে রাত্রির আকাশ নিঃশব্দতার মিলিয়া যাহাকে এমন আবিষ্কৃত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তোলিয়াছে যে, ভয়ঙ্করী পৃথিবীর আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার মুখোমুখি আসিলাম এত কঠিন ও রুক্ষ যে মায়া হইতে লাগিল। মুছিয়া পড়িয়া ভাবিল মেয়ে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল স্পর্শে ঘুমাইয়া যাইবার, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। তাহার নদীর মতো নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য, আমার কেমন এই কথা মনে হইতে লাগিল, নদীর এই কিপ্ত উৎসবরা বাসন্তীর চোখকে ক্রমে-ক্রমে শান্ত, নিস্তব্ধ করিয়া আনিয়াছে। নদীর সংস্কার, তিন আমাদের কাছে বাসন্তীর স্নেহের মহিমা অসোজন্যে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রবল, এত নিরাবৃত, এত অন্তর্ভেদী যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে [illegible] করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে [illegible] এই অন্তর্নিহিত পরাজয় ইহার [illegible] আর ঘুমানো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নাই, সেই অন্তরের আলুথে তাহার জলীয় ভাব নিজিয়া গেছে। আমি বোধহয় দিনে-সাত নদীর এই উৎসবময় আয়ত্ত হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

অন্তর ভাঁটি-চরকাটি বেঁচিয়া দিন ফুরোইল, একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল ছেড়ে থাকিবার নিমন্ত্রণ জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার [illegible], ক্ষেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতেই কোনো মতে কাটাইয়া সে জন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় যে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে আমি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া খবরটা পাঠাইলাম। উত্তরে জানানো হইল—এবং দেখিতে দেখিতে ইস্কুল বন্ধ বিচিত্র বর্ণচ্ছটার চেহারা নিয়া

বলিল। তাহারা নড়িবার নাম নাই। ক্রমে ক্রমে ঘাম ছুটিতে লাগিল, নদী এই ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে—উহাদের না সরাইলে চলিবে না। অথচ আমাদেরই অবস্থার আছে, আসিয়া হানা দিবে! মনের আধি ভাষাইয়া লেখিকা-পুত্তলিকে চিরকেলে বাঁধিয়া উহাদের পক্ষ লইবার বলিলাম। আজি না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না— উহাদের তাড়াইবার পক্ষে যথেষ্ট এমন বিজাতীয় দেখা যাইতেছে। যদি অনেক হাঙ্গামার একদিন সকলে মিলিয়া লড়ে-ভরাক করিয়া আমাদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন পুনঃপ্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুশী হইল এমন মনে হইল না। রাজা নিজা যে কারণের পলায় মন্ত্রণা-মতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গড়েছিনের ডাকর, রাজপুরী নদী তাহাকেও ঠকাইয়া ফিরিবে!

আমাদের অভিনিবেশনে না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির ইস্কুল-ঘরে আজ রাত্রের জন্য তাহাদের ইঁট দিতে হইবে। মুকুলবাবু বাঁচি পড়িতেছিল,— অন্তঃস্বত্বা যে কাহার প্রথমে ঠিক ঠিকিতে পারিলাম না। জানলা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘিরিয়া কতকগুলি ছিন্ন ভিন্ন কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এই বড়ো আকাশের তলে কেন্দ্রও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া ছাড়া আমার দিবা বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই চেনা নবীন হাইতি। মুকিতে বাকি রহিল না, নদী তাহাদের ফিরিতে বারণ করাইয়াছে।

বলিলাম,—ব্যাপার সব কেমন?

নবীন বড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল— সব হারু, কোনো রকমে সরে আসতে পেরেছি। আজই এখন রাত-বাস করে না [illegible] আরো কিছুদিন থাকতে পারবার। [illegible] আপনি আজ্ঞা না দিলে রেলপুল [illegible] বলবার তাই বললে।

[illegible], বুঝিলাম, তাহার কাজ [illegible] ছিন্নমস্তী তাহাকে [illegible]

[illegible] উঠিলাম। সঙ্গে থাকতে [illegible] সরতে [illegible]? ডিসিপ্লিন করতে [illegible] আসতে [illegible]

কিন্তু [illegible] তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া [illegible] থাকিতে পারিবে, এই ভেবে—দুজন কনস্টেবল, ডিসিপ্লিন দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল— তাড়াতাড়িতে এই জামা আর ধুতিটা শুধু সঙ্গে নিতে পেরেছি—

ওদিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে ঘুমাইয়া উঠিল। তার আমি আমার মাসীমা, বাবা।

মুখ-চোখ বিমর্ষ করিয়া নবীন-মহাশয় ঘরে-ঘরে ঘুরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখু হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম। আমাদের কী নতুন খবর?

সরকার-মহাশয়ের মুখে হাসি আর ধরে না। অনেক ঢোক গিলিয়া পরে কহিলেন,—অবস্থা ভালো নয়।

বিস্মিত হইল না আমি। কিন্তু আমরা এমন সর্বনাশের মধ্যে হইল যেন এইমাত্র কোনো ভাগ্যবিধাতা পরম কারুণ্যে আমাদের খবর পুনিয়াছে। চমকাইয়া উঠিলাম। কেন অমঙ্গল?

—সব। সরকার-মহাশয় আমরা করিয়া বলিতে পারিলেন না। মনে আছে গত বছর আমি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই জানালাতে দেখাইতে দিয়াছিলাম। কিন্তুরাত আকাশ না দিয়া নিশ্চিন্ত এই নদীর ধারায় ঘরে অকস্মাৎ আকাশে ঘুরুল ঝড় উঠিয়াছিল। ঘোরে ঘরের ঘাড়-ঘাড় আর অন্ধকার দিগন্তে মরো এখানে-ওখানে কাঁপিয়া পড়িতে লাগিল, ঘোড়ন বাঁধিয়া বাসন্তীর সে কী আর কুকুরিয়ার ঘটা! ঘুলোর সমস্ত চাই-বাড়ি একসঙ্গে হইয়া গেল, খানিকটা পরে থামিয়া সমস্ত শূন্যে পাখরের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় জানোয়ের পশু-জানল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে— বাঁচি এই আসিল বলিয়া। আর জানোয়ের দেখা নাই, বাঁচি একবার আসিলে সমস্ত আশিবার নাম করিবে না। কিন্তু কথা

For Three-Year Degree (Pass & Hons.)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

1. দর্শনের রূপরেখা (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন একত্র)—৩য় সং 15.00
2. ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy)—৪র্থ সংস্করণ 8.00
3. ভারতীয় দর্শন (২য় খণ্ড) for B.U. 2.00
4. পাশ্চাত্য দর্শন (Western Philosophy)—৩য় সংস্করণ 7.50
5. পাশ্চাত্য দর্শন (for B. U. Part II)—২য় সংস্করণ 10.00
6. নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন—(১ম সংস্করণ একত্র) 15.00
7. নীতিবিজ্ঞান (Ethics)—৪র্থ সংস্করণ 8.00
8. সমাজদর্শন (Social Philosophy)—৩য় সংস্করণ 8.00
9. মনোবিদ্যা (Psychology)—৩য় সংস্করণ 16.00
10. Handbook of Social Philosophy—2nd Edition 12.00
11. পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— 6.00

(অনুবাদের মূলে : ফেডেল-হিফ্‌ডিং)

অধ্যাপক অতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

1. শিক্ষা-তত্ত্ব (Principles and practice of Education) ২৩শ (বঙ্গাব্দ)
2. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (Indian Educational Problems)—২য় সংস্করণ 12.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক রায় প্রণীত

3. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology with Statistics)—৪র্থ সংস্করণ 16.00

For B.T., B.Ed. & P.G. Basic Course

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

1. (a) শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা (Teaching of Social Studies) 8.00
   (b) শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (যন্ত্রস্থ)
2. ভারতের শিক্ষা সমস্যা—অধ্যাপক রায় (২য় সংস্করণ) 12.00
3. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় (২য় সংস্করণ) 16.00

For North Bengal University

ডঃ সত্যব্রতনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত

১। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা 9.00

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

১। কুলীন কুলসর্বস্ব (নাটক) (যন্ত্রস্থ)

By S. Banerjee : Revised by Prof. P. B. Sen Gupta

1. P. U. Logic Made Easy (In Bengali) 2.25
2. Ethics Made Easy (In Bengali) 2.50
3. Psychology Made Easy (In Bengali) 4.50
4. H. S. Logic Made Easy (In Bengali) 4.00

BP

BANERJEE PUBLISHERS

CALCUTTA-9 : Phone : 34-7234

শুনিবার ভের বাসন্তী নয়। হাওয়ার চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রসাধনে সে মন ভুলাইতে লাগিল। তবু এমনি নৃশংস যে তাহাকে প্রবল পুরুষ-পশুর আলোড়নে একেবারে বিপর্যস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বলিলাম,—কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছ? তবু যাবলে ডাকাতকে পাঠিয়ে দেব, সব আজ লুঠিয়ে নেবে। বাজার তো আমারেরই—আবদার কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উপর কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ খুলিয়া দিয়াও উন্মাদে আর ভুলাইতে লাগিল। আছাওয়াটি এত প্রখর ও এত তীক্ষ্ণ যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রথমতঃ মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, একবার দুপুরটা দেখে আসি।

নিজে তো যাইবেই না, আমাকেও সে ভেরে করিয়া আঁকড়াইয়া রহিল। খবরটা তাহার কাছে এত নিষ্ঠুরের যে লড়পুতুলোকে গাল্বারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তবে বলিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ার স্নেহলের প্রকাণ্ড ঝিলমিল থেকে উপর ভাসিয়া পড়ে। কিন্তুর জলরাশির কিনারে মন্তর দুইটি প্রাণী প্রত্যুষ প্রলোভন এড়াইয়া কোন ক্রমে এলের পর এক মুহূর্তে শুনিতেছি!

তারপর আসিল বোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সমর থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে মিলা সে যে লাভল ও বলদ বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কিনা তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই সুখ হইতে লাগিল যে, তাহাকে এইবার সহিস-টহিসের চাকরির জন্য হন্যে হইতে হইবে না। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিলেন না; জানিলেও এত বড়ো মর্মান্তিক কথা সমস্তাসেহে হাসিবার আর তাহার আয়ুই থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাজয়ের মর্মান্তিক মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া। এত দুঃখেও সান্ত্বনা তাই খুঁজিয়া পাইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। সত্যলক্ষ হাত ফেলিয়া নদী স্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, অতএব তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই। বাসন্তী দুঃখের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি ফেতে দেবে নাকি?

এতো বড়ো বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী সাংসারিক না হয়, তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কেন জিনিস-পত্র কিছু সরিয়ে রাখতে পারো দুনি? তা যায়, যাক্।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ার-গুলিও তো ফেলতে পারতে?

—কোথায় ফেলো? কিনারে কে? তাছাড়াই বা যায় পাওয়া যাবে? পয়সা যা পাবে তাও কি আমনি যাবে না খরচ হয়ে? ও নিয়ে ভিখো মন খারাপ করো না—দেখ, দুঃখের এমন চেহারা আর দেখেছ কখনো?

কমিশনের কোঠার পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম, সরকার-মহলের লোক আসাইয়া স্কুল-ঘরের জিনিস-পত্র বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এদুনি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কে ইহাদের বোঝা টানিয়া টানিয়া বেড়াইবে? তবু নিশ্চিত মরণের মুখে ইহাদের তৎপরতা দিতে সরকার-মহলের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ার বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী ঘর তাহার আবেগ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে, তবুই সে কুণ্ঠিত, ছিন্নভিন্ন হইয়া একটুকু হইয়া হইতেছে। কাহার মনে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য-সমারোহের মাঝে সব এমন আকস্মিকের মনে হইল যে সেই মুহূর্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না!

আমাদের চোখের সম্মুখে স্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী।

বুকে মুখ গুঁজিয়াই বাসন্তী কাঁপিতেছে; ক্ষীণ গলায় কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো যে।

—আসুক। বাড়ি নিয়ে এখনো যেঁষে আসে! পূর্বদিক ফেলে চেয়ে পড়ায় শুনেছি—সবাই ও বলাবলি এই ব্যবসা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলেই বেঁচে যেতাম। ভয় কী, বাসন্তী? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিস-পত্র সুদ্ধ পাকার কাছে রেখে লাভ কী? দুজনে আবার কাঁকা হয়ে যাবো।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারবো না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাবো।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই স্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিস্তাই জন্তুকারের ঢেলে দুঃখের-ঢেউয়ের সামান্য একটা দেশকারও আর দুইতে পারিল না।

এখন একেবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি। স্কুলের বারান্দাও গেছে। এখন এক পাড়ে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সম্মুখে নদী—ছোটমুখের, ফেনিল, লালাক্ত—সমস্ত কখন মিশিয়া, কাঁপিয়া তাহারই মতো আমাদের সে বস্তুর জগতে একেবারে উলঙ্গ করিয়া নিবে।

কৌচগুলিতে ধুলো জমিতেছে, আলমারির কাচগুলি আর পরিষ্কার করা হয় নাই। জানোটটা জায়গায়-জায়গায় কুটো হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ভাবের পাতাবাহারের গাছ দুইটা তবে [illegible]—কে আর উহাদের জন্য করিয়া জল দিবে। দেয়ালের বড়ো ঘড়িটা বন্ধ, চাবি দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। [illegible] দিন খোলা জানিতেছে না—[illegible] ও বার্নিসের ওয়াড়গুলি এত মলিন হইয়া গেছে যে, যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কতদিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া কহিল,—এখানে থেকে কী হবে—চলো পালাই।

বলিলাম,—নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠবো। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারবো না।

—যা কিছু অসহ্য, তাইতেই তো তীব্র আনন্দ আছে। বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমা খাইলাম। কেন জানি লাগিল না। উহার

আপনার কেশের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে ॥
কিমকো'র
আমিকা
[illegible]
কিম এণ্ড কোং
(ফ্রেঞ্চ কসমেটিক্স) কলিকাতা
[illegible]
[illegible]
ফোন : ৩৪-৩৮৩৩

চেহারা এই ঘর-বাড়ির মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে। কতদিন উহাকে একটু জলের স্পর্শও করি নাই। মনের এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে অকস্মাৎ দেহের অস্তিত্ব করিতেও হাসি পায়।

ভিতরের উঠান ডাঙাইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় মস্ত খাঁকিতে হেঁট-খাঁট একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই খাঁকি ডাঙিয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার-মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; তবু আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য ঘাটের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চট করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তেমন লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার—কোনটা ফেলিয়া কোনটার প্রতি যে সে পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মনে মনেই ঘর-দোর, বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় করিয়া একটা বড় ট্রাংক, লিখিবার জন্য একটি টেবিল, এমনি ছোটখাটো কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। জমার খরচের খাতা ও বাসন্তীর গহনার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল—নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট খরখানি—রাখীদাসের টালিতে নয়, উলুখড়ে ছোপেরকমে ছাওয়া হইয়াছে! ঢাকব সেই ঘরে একটি বাঁশি ঝুলিতেছে দেখিলাম। বিপুলদার গলখান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিখাটিকে ঘিরিয়া বড় বড় মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো, ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

মনের কিন্তু বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারবো।

জল, জল, ক্ষুরের মতো ঝকঝকে, [illegible] ধারমান ঢেউয়ের [illegible] কাছে আছড়াইয়া [illegible] কোথাও এতটুকু বিরাম নাই, [illegible]—ফুলিয়া-গর্জিয়া দিগন্তে-[illegible] স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। মনের ভুল করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিষ্ঠুর-বেগবান [illegible] মাঝির কাছে আমাদের অস্তিত্ব যেমন তুচ্ছ, সংকুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাসে ফেলিয়া আমাদের এই ক্ষণিক-ধরণের পরিবারকে নদী যেন চরি-চর্বিত চট খলাইয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—সাদা ধবধবে জল! বেগের আবেগে কোথাও এতটুকু বিরামের যতি নাই—ফেনায় ফেনায় প্রবল সাদা আরশি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চক্ষু ঝলসিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছিলাম। রাত্রির আর ঘুম নাই, প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে কী যেন সে চাহিতেছে! সেই ডাকে আমরা কি করিয়া বুঝিব।

ঠাকুর কোথায় কী একটা মন্ত্র পড়িল—মন্ত্র নয় তো এক রাশ মাটি পড়িল—জলে সেই ঝিনুক পড়িল। বড়মন্ত্র করিয়া জানিয়া ফেলিলাম—চাঁদ সঙ্গে বাসন্তী নাই। চাঁদ-দিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে। চিৎকার করিয়া উঠিলাম। বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

টাকাকড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি, পশ্চিমের দরজাটা খোলা, প্রচুর উজ্জ্বলিত বাতাস ঘরের মধ্যে ঘুরপাক উড়িতেছে—এত বাতাসে ও ঘূর্ণায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম : বাসন্তী। অন্তর কণ্ঠে নদী হাসিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল, নদীর জলে বাসন্তী কখন সন্তরা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বুঝি।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। কাশফুল আকণ্ঠে মেঘ-রঙের নিম্ন দিগন্তের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

কাছে হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসো তো!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল,—এখনো ঘুম আসছে না। বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের চোখে তাহার এই আনমনা স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নিস্তব্ধতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে আছ কী করতে? ঘরে চলো!

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ লাগছে। তুমিও আমার পাশে এসে বোসো না।

তাহার পাশে বসিলাম; কিন্তু তাহার পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে পারে—সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার অলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমিও জল দেখিতেছি। তাহার পর জল কখন চোখ হইতে মিলাইয়া নিঃসঙ্গ-নিরবলম্ব অন্তরীক্ষ বেন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে পাইয়াও নিজেকে এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। জগৎ তবু এখানে-সেখানে কয়েকখানা চৌকা রেখা আঁকে, ঘরের চালায় বাসন্তী চকিতের রঙ্গা ও গলা-পুকুরের সঙ্গ কাজে অমিলে অতকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতাম। সামনের বাসন্তী আঁকড়া মেয়ে বলিয়া একটা গভীর পাকিল চাকব সঙ্গও আর খুঁজিতে চাই না। সব যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা অকূল অন্ধকারে শরীর মুক্ত করিয়া উঠিয়া গেল। সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। কাছে ঠেলা দিয়া কহিলাম, এখান থেকে উঠে চলো, নইলে এবার ঢেউ পড়বে।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকিতে মনে হইল, উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে, এমন স্তব্ধ-মন্থরতা এমন হইতে আর কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন এখুনি উহাকে আমার কাছ হইতে ছিনাইয়া নিবে! আর চাঁদ নাই!

আমাদের ঘিরিয়া সত্য-সত্যই অনেক-খানি জায়গা লইয়া চিড় ধরিল। দুই বাহুর মধ্যে মাটি হইতে উহাকে বুকের কাছে তুলিয়া লইলাম। কোনোদিকে না চাহিয়া

বাসন্তীকে বুকে টানিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মুর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

অবশ্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে, বাসন্তী?

দুর্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল, ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে রাখো। আমায় ছেড়ে দিও না।

আমার স্নেহ দিয়া তাহাকে অভয় করিয়া রাখিলাম। কহিলাম,—কেন ছেলেমানুষী করো? কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের এই গভীরতম মিলনের মুহূর্তকে বিচূর্ণ করিতে লাগিল। যেন উপলক্ষ করিয়া এই মুহূর্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তারার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার অন্ত নাই। সেই পরিপূর্ণতার প্রশান্তির নিম্ন নদীর এই নৈর্জনতম উপকূলের কোথাও একটুকু সলাজ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সমস্ত আকাশটাই ছোট বড়ো ঘরে উঁচিয়া আসিয়াছে। চারদিক ছোট টেবিলের উপর যেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাই জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু রাতে আজ ক্ষণ লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!

লিখিবার খাতা ও পেন্সিল সঙ্গে আছে কিন্তু খুলিয়া তিনটি সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু সেমুহূর্তে যেন আমি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিজাই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি এক [illegible] সঙ্গে সে যেন আমাদের অন্তিত্ব হইতে [illegible]। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া [illegible] এই উপকূল ও প্রখর উজানটা ঠেলিতে শরীরে জোর হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ জমিদারীর স্বপ্নসম্পদী আমাদের বাড়িটার উপর কাপাইয়া পড়িল—যে-বাড়িতে বাসন্তী আসিবে ও কোন বিহ্বলতা ছড়িয়া-সে তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোণে বসিয়া আমি বড়ো না লিখিবার তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে বাড়িতে ভবিষ্যতের পরিবেশে পরস্পর দুইজনের নিবিড় [illegible] সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বুকে আর অপূর্ব বিচ্ছেদ-সৃষ্টির স্বপ্নটি রচিয়া নিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নিরেস জ্যোৎস্না—এই জ্যোৎস্না রাতে আমরা দুইজনে যে সিন্ধু-বাতের তেমন বাঁধের উপর বসিয়া অনেক ক্ষণ কাটাইয়াছি—এখন যে বিশ্বাস করিবে?

অনন্তের চোখের সমস্ত বাঁকুনির মধ্যে তেমনি নির্বাক হইয়া রহিল। কতো কতো ছবি, কেউ-টেবিল - চেয়ার - আলমারি, বাসন - কোসন, খেলনা-পুতুল, বিছে-বালিশ, ইট-কাঠ, জানালা-দরজা:—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্বের যেন প্রতি আমার, সুখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর অন্তরে মুহূর্তে আত্মসমর্পণে আমারই সবচেয়ে কঠিন পরাজয়ের! কিন্তুতেই আমার হারিয়ে যা, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। কেননা সঙ্গে কতুর নেই অপরূপ মুখ দেখিতে দেখিতে সারা দেহে জল ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মুহূর্তের সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না।

মুহূর্তে মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুষ্টির আকাশে আসিয়া উদ্ভাসিত হইলাম। সমস্ত কিন্তু আকাশের মতো সাদা হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলার দিকে সরকার-মহাশয় খবর খানি জানিয়া আসিলেন। যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা বাড়িতে বোঝাই হইল। বাসন্তীকে লইয়া বুধ-পথে ষ্টেশন ইন্টিশন-এর দিকে রওনা হইলাম।

অন্ধকার ঘরে সরকারমহাশয় কিছুক্ষণ আরো থাকিলেন ও বর্তির শেষেও বাহি খুব দিকের চর আমা চাড়া দিয়া না উঠে, তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ষ্টেশন ছাড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা অন্ধকারেই যে যাইতেছি ও আমার ভিক্ষা করিতে যে বাজারে আহার জোগাড় করিতে যে বাজারে আহার জোগাড় বাড়িতে গিয়া উঠিব না ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সংগোপনে ঢাকা করিবেন, আমার সঙ্গী হইয়া তাহা তাহার অনুভব।

বলিতে কি, আমার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কলিকাতার অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি ঘর মাত্র—একটিতে সামান্য ফার্নিচার সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের বিছানো সবার ভাড়া আর কোনো উপকরণ নাই। দোরাজে একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলে ও খাদ্য লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া অর্থাভাবের বিজ্ঞাপন লেখিয়া-লেখিয়া সমস্তক্ষণ লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উজান বেয়ে এখানে আসিয়াছে। একটা ছোট-খাটো চাকরি জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অবসরে কিছু জিনিসপত্র কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে যেখায় খুব সুলভায় নিলাম হইতেছে—তার টাকা দিলে আনাইলে ঘরে একখানা কাপড়ের টেবিল ও চেয়ার আসে। ওমাটে করে-এনে বাসন্তীর কাছে উপস্থিত করিলাম। বাসন্তী খুশি হইয়া হাসিয়া কহিল,—তাহলেই বাড়ি, তখন উঠে যেতে হয় তিন নেই, জিনিসপত্র ঘাবে ঘরে কোথায় খুবে বেড়াবে: এই বেশ আছি।

টেবিল-চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া তিনটে একটা কি ফার্নিচার বন্ধ কাজ দিবে।

ও ঘরটে বাড়ি! কথাটা তুলিয়া দিয়া-ছিলাম। তুলিয়ে বন্দর হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

নদী আমাদের বাড়ী ভাঙিয়াছে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ও বাসন্তীকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া জীব করিয়া ফেলিতে লাগিল।

মেস থেকেবার হইতে ছোট খোকাটির জন্য—তাহার একজন ঢাকিকা আনিলে হয়। কিন্তু মেসিঅর্ডারে যদি পারে, মিনি-মিছি করেকটা টাকা খরচ করিয়া এসে তার বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো অরেক দিন যাক।

কিন্তু সবচে বাসন্তী নিতান্ত ছেলে-মানুষের মতোই আবদার করিয়াছে। উনুনের ধোঁয়ার ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিসে ঢাকাইবার জন্য ঢাকিয়া দিয়ে বাসন্তী আসিল না, ঘণ্টি মাসের মাহিনী লইয়া বিবাদ হইতে কি আসিল, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আপিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বেশি হেঁসেল ফেলিবার জায়গা নাই বলিয়া রান্নাঘরের বারান্দে মাত্র একটু জায়গা করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া ছাদমহলের ঘরিওয়ালা সুদের একটা আলোকচিত্র আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত মেয়ে দুইটা তাড়াতাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত [illegible] পাইলেও সমুদ্রের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

ঘুনিতেছি আপিসে কর্মচারীদের ছাঁটাই শুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি কেনিল তরঙ্গ থেকে এ অনেক ভালো। টাইফাসের ধর্তিনির ছিঁড়ে হৃৎপিণ্ড মুহু-মুহু বুক-বুক করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই একরকম ভালো লাগিতেছে। তাঁর সুখের মধ্যে এই যে, শত দারিদ্র্যও সমুদ্রের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—বোম্বেতেলের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না-হয় আরেকবার মায়ার সিন্দুকের জোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-হয়ি একদা কী করিয়াছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অজিত মুখোপাধ্যায়

"অব্যয়াক্ষের সে অক্ষোহী কেমন অক্ষমা অক্ষুব্ধ মনে হলো।

ওটা কি কোনো পাখির ডানা? কিন্তু আকাশের পাহুরে আকাশে অমন পাখি কই?

না, মানুষের কণ্ঠস্বর। ক্ষণ, ক্ষিন, ধাণীবিন্দু।

'এত ক্ষুধে কে ওকে ক্ষমন দেবে?' বলল দেবকুমার খান শনি' অন্তে।"

(কালোজল)

সেই ছেলেটার গল্প লিখেছেন অচিন্ত্য যার মাথার পাহুরে আকাশ থাকে ক্ষণ দিতে বা কুটোপাত ছেড়ে চলে যায় নিরিবিলিতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে আন্তা-মাকাহুলোকে। কুটোপাতেই কি, বা আন্তাকুঁড়েই কি সব-খানেই সমান খিদে। যার এই লোকনিতে আসের হুংস নেই, যেমন তাদের লোকনিতে হুংস নেই সমস্ত পৃথিবীর।.....

যে জীবন আসছে সে আবর্জনা ছাড়া আর কী।

বর্তমান ভারতের কহুণ অধ্যায়ের উদাহরণ স্বরূপ সেই ছেলেটিকে প্রকাশ্য রাজপথে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই কহুণ দৃশ্যটির কাহিনী আমাদের অজানা নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিবরণী সমস্ত কাগজে বেরিয়েছে। সেই মন্বন্তরেরই একটি অতি-পরিচিত ঘটনার প্রতি শিল্পী আলোকপাত করেছেন। দেখ, সেই যে প্রাণ...কে প্রাণের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই... যে প্রাণ অন্যবিধ ল্যাবরেটরিতে জন্মগ্রহণ করল না.....সেই প্রাণ কেমন অসহায়ভাবে নিরাসক্তভাবে সৌরালোক দর্শন করে।

সেই অসহায় ছেলেটির গল্প লিখেছেন অচিন্ত্য।

না, সাদা পৃথিবী অকরুণ নয়।

বিদ্যা আছেন।

'ওকে ঘরে নিয়ে যাই—' অতি সন্তর্পণে আকাশের জড়ানো ছেলির মত তলতলে সেই এঁচড় ছেলে পরম লালিত মাংসকে তুলে নিল বিদ্যা।

বিদ্যা গরিব। মাথার উপরে চাল আছে এখনো, মুখিসে বিশ্বাস আছে। তাদের দয়ার ছেলেটা বেঁচেও থেকে পারে যা।

ঘরে নিয়ে যায় বিদ্যা। কিন্তু খাওয়াবে কী। ঘুরে পাথলে ছেলেটাকে পাইয়েছেন এমন আর পাড়ায়, ন্যাকড়া জড়িয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন বিশলীর মোলের মতো।

ছোট একটি বাহুরের ঠিকর। যেন মুক্তা ও পদ্মরাগের উপরে উজ্জ্বল পতাকা। সমস্ত ক্ষুধা ও কাতরতার উপরে পরম নির্ভীক বাণী। কিন্তু এই বাহুক-বিশ্বের সঙ্গে যে জিয়ের সেই বাঁচবার ভোখার?

সারা জীবন ধরে অচিন্ত্যকুমার সেই বাঁচবার সন্ধান পেয়েছেন কিনা জানি না। সন্ধানও করেন নি বোধহয়। ধারণে-বিন্দু বিশ্বের কামনার অতীত.....এই-টুকুই অচিন্ত্য দেখেছেন। অতীতের ভার-কারণ নিয়ে গবেষণা করেন নি।

কিন্তু তিনি জানেন মরার ছেলেটা বেঁচে ছেতে পারে বলে বিশ্বাস করেন।

মানুষের প্রতি ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে, তিনি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। ইতিহাস চক্রের ঘোরে এই তত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস। সে যাই হোক, সেই প্রাণ-কণিকাটিকে কহুণময়ীর প্রতিনিধি বিদ্যা দেবী বাঁচিয়ে পারেন না।

শুকনো মুখের মরা চাঁদ উঠে আসতে ভরসা আছে বাকি। তবু মরা মুখটা চোখের দৃষ্টিতে অনুভব করে নিতে তার এক নিমেষও দেরী হল না। তার পরে কেঁদেকেটে যে ভালো-ভালো শিঁপড়ে বের উঠেছে তার চলন্ত লাল পর্যন্ত তার চোখে পড়ল।

উনুনের থেকে ছাই-পাঁশ কুটোকাটা কিছুটা নাঁয়ে নিয়ে অন্তর্বিদের মরা ছেলেটিকে বিদ্যা ঘোর দিলে।

সেই প্রাণ যদি কোথাও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে লালিত-পালিত হয়, তাহলে তাকে এই মৃত্যু সংসারের সঙ্গে প্রচুর লড়াই করতে হয়। সংসার যেমন হুংস হেমনি নির্মম। এই প্রচণ্ড মৃত্যুকে নির্মমতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাকে রোগাক্রান্ত হতে হয়। কিন্তু রোগের চিকিৎসের সামর্থ্যই যে নেই সেই মানুষটার। বন্ধিত সে চাকরি করে।

"রেবতী পাংশুমুখে বসে, মাইনে তো এখনো পাইনি। মাসের শেষে সবের তিন আছে।

ডাক্তার বলে—রোজ ঠোঙ্গাদিন ছেড়ে চোখ বন্ধ অপেক্ষা করতে পারে, আমরা পারি না। দিন। তাছাড়া ইঞ্জেকশনগুলোর দাম দিতে হবে একশো—

—কিছুই যে নেই—

ডাক্তার বলে,—নাচার। আমাদের ব্যবসা চলে কি করে তা হলে বলুন?

অতিসের সত্য কথা।—তোমার সামান্য ব্যবসায় থেকে আমার জীবনের দাম তের বেশি—এ [redacted] বাঁচে বুঁচু। নিরুপায় নিরাসহায় [redacted] রেবতী ছেয়ে থাকে।"

(কালজয়ী)।

অর্থলিপ্সুদালার কাছে টাকার মায়ে তিন আনা সুদে কর্জে করে সেই লোকটি চিকিৎসা করায় নিজের পরীক্ষায়। এক সময় রোগাত রেবতীর মনে হয়, সেই নেই...তার বাঁচবার অধিকার নেই।

উপরন্তু মনে সেই লোকটির ছেলেও রোগে পড়ে...এবং মরা-মরা অবস্থা হয় ছেলেটার, তখন লোকটি নিজের চিকিৎসের জন্য সন্দেহহীন অর্থ অকাতরে ঢেলে দেয় ছেলের চিকিৎসায়...কিন্তু ছেলেটি বাঁচে নাই।

লোকটির দীনাবস্থার বিবরণ ছেয়ে ডাক্তারের মারা জানে; লোকটির চিকিৎসে করে ডাক্তার। হয়তো বা ডাক্তারের মারা, মরা লোকটির রোগের কারণ গবেষণা করে জানা-বার জন্যেই রাজি হয়...অথবা লোকটি ডাক্তারকে বিশ্বাসের সঙ্গে ধরা করে বসে ভরসা, অধীকার থাকে। ডাক্তার তার

সমস্ত বিলে-ঘুন্সি ও প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা সত্ত্বেও রোগটার চিকিৎসা হয়নি।

ডাক্তারটি ভাবে যৌবন যে ফেরে উঠবে, সেদিন ও আবার স্বচ্ছন্দে দুপুরে বেড়াতে পারবে, আঁচ সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারবে—এই ওর সুখ! হয়ত সেই রোগেই ও মরিয়ে পড়বে,—কিন্তু হয়ত আর কিছু করবে যা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

রোগের সঠিকভাবে চিকিৎসা করে ডাক্তার। বিজ্ঞানের চাকার উপর ভর দিয়ে যেন একটি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা চলে। রোগটির অবস্থা ক্রমে কিন্তু-কিন্তু হয়ে যেতে থাকে।

—ডাক্তার বাবু,—বাঁচবে তো রোগী?

প্রথমে কিছু বলতে চায় না, পরে শুধু অন্যমনস্ক ভাবে শিগ্রা করে বলে,—

—এখনো মিকেন কি বলে?

শিগ্রা উত্তর দেয় না।

ডাক্তার বলে,—আপনাদের আর কেউ নেই?

ডাক্তার বলে,—বসুন, আমি এই ওষুধটা নিয়ে আসছি।

ওষুধ এনে রেবতীকে খাইয়ে দেয়। রেবতীর আর বাঁচার সাধ নেই, মন পড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে, কেন পড়ুন্ত অপেক্ষা করেই আছে আমি? কী লাভ থেকে? কে ওর রেবতী?

সমস্ত ঘরে পরিষ্কার কী অসহ্য দীনতাময়! বাসনপত্র ওলোট-পালোট, এটা ফেলা হয়নি ওটাকিয়ে থেকে কে জানে, মেয়েরা জামা-কাপড় আর পোড়া কয়লার ছাই, ঝুলকালি মাখিয়ে আর জমাটে একাকার! আর রেবতীর মুখটা কি বিশ্রী ভয়ঙ্কর,—দু-কষা ঠোঁট মুখের ভাঁজে কি কুৎসিত মুখোশ-ভাঙারের সমস্ত নকীর নিঃস্ব করে উঠল। আবার বলে—আপনাদের কেউ নেই আর?

রেবতী ঘাড় নেড়ে বলে—কেউ নেই।" (রক্তকরবী)

যে লোকটা বাঁচার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালায়, যাকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞান বাধ্য হয়, সেই রোগীর কেউ নেই...নিঃসহায়।

লোকটা, ফালু, মাত্র পড়ে একলা না থাকলেও চলে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতাসুধার এই লোকটিকে দেখেছেন, বিভিন্ন তার পেশা বিভিন্ন তার সামাজিক চরিত্র। অন্ধকার (রক্তকরবী) বাড়ি ফিরে ফিরে এই লোকটির জন্য ভয়ে পরিচারিকা করতে করতে নিজেকে অপরাধী ভাবছে। তার মনে হচ্ছে নানা রকম কল্পনা-প্রসারিত করে ওর কাছে রেবতী জীবন ভিক্ষা চাইছে। যেন বলছে—যে জীবন আমার নিলে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

ঘরে ঢুকে জানলা জানলা দিয়ে নিচে মুখ বাড়িয়ে দেখলে রেবতীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিছুই দেখা যায় না। খালি, এই শীতের রাতেও ফুটপাতের ওপর কঙ্কালসার পরিচ্ছন্ন পথিক সুরে আসে।

আর কিছু না।

চেয়ারের গদি কঙ্কালসার।

রেবতী রোগের কাছে আসছে, বিজ্ঞান বাঁচাতে পারে না। সোনারাশি (অজি) রামলার কাছে আসছে, তাকে কোর্ট বাঁচাতে পারে না। হরেন (হরেন) সমাজের কাছে আসছে, তাকে প্রেম বাঁচাতে পারে না।

কৃষ্ণলাল (নরেশচন্দ্র) ধর্মের জন্য স্ত্রীকে বিসর্জন দেয়, আর মন্তাজ (বাঁশবাড়ি) ধনের জন্য পুত্রে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ছবিটি সবচেয়ে জটিল ছিল হুকুমালির। লড়াইয়ে গেছে সে কুলি-মজুরের ঠিকাদার হয়ে। মাথার ওপর জটি মেটে দিলে সে সোনারাশির কাছে। প্রায় জলের দরে। (জটি)

সোনারাশির কি সহজে সুখভোগ মনে জটি-চোরা আছে কখনো?

হুকুমালির সুখের বড় করলে জলিল মুন্সি। নগদ দুশো টাকা দিয়ে আরেকটা কবালা লেখাপড়া করিয়ে নিলে। সোনারাশির কবালায় যে জমিন, তার চৌহদ্দি অনেকের জমিন বলালে লক্ষ্মণ বেচার ভাবনাতে। সেই সোভাবেক জলিল সম্পাদনের আঁধার নিলে। ফলে বাঁধলো এই, জলিল মুন্সির কবালা সোনারাশির কবালার আগেই হয়ে গেল।

প্রথম কবালার দলিললেখক, ইসলাম সর্দার, নিষ্পত্তিবাহক সবাই হুকুমালির অন্যায়-বাঁধ দিল জলিল মুন্সির দিকে। কিন্তু জলিল মুন্সির তৎকরী মামলা ডিক্রীজ হয়ে গেল। অবশ্য পরাজিত হল।

অবশ্য কি ধর্মতে সহজে যায়ে!

আপিল করল জলিল মুন্সি।

এদিকে কামলা-মোকদ্দমায় সোনারাশির হেফাজত হবার দাখিল। খরচে খরচে প্রায়ান্ত পরিচ্ছেদ। তার উপর আমানি, অবশ্য, আদালতী কাণ্ড কিছুই জানে না। জলিল মুন্সি এর মধ্যে করে আমানী-জমিন আরম্ভ করে দিয়েছে। আপিলের মুহুরী খুব ধরে চালান করে দিলে সুবল ঘোষের আশা তার বরবির। অবশ্যে হাকিম ফয়সুল সাবজজ হয়েছে, আপিল পেলেই হাতে মাথা কাটে, তার ঘরে নিয়ে চল। এর আবার উপরোক্তের আছে অবশ্যে হাকিম। যৌবা বলতে আর যেরি নেই, বেশি লিখতে বকতে চায় না, গম-গম করে, সেরে সেরে। যা আছে তাই বহাল থাকবেই তার ঘরে দিয়ে চল।

নিম্ন আদালতের খরচ টানতেই সোনারাশি নাকাল, খরচ আর টানতে পারছে না। বউ বলে, ধর্মের দুহায় ধরে, ছেড়ে থাক। এক আদালতের ছাড় যখন আদালতের দিকে ছুটেছে, তখন সব আদালতের ছাড়ই ছুটে আসবার দিকে। কোর্ট হাকিম ছাড়া আর লক্ষ্মণ নেই। যৌব, ধর্মের ছায় যে ওলটায়।

বলে থাকলে মামলা চলে? বউ আজিজার মামলা-মোকদ্দমার কি জানে?

টাকার জোগাড় করতে হলে এখন, সোনারাশিকে হুকুমালির কাছ থেকে জেনা জমিটা বাঁধা দিতে হয়। কিন্তু মহাজনের জঠরানল ভীষণ। বাঁধা রাখতে কেউ চায় না। সাফ কবালা দাও, জমি দাও।

সোনারাশি ভেবেছিল, যে জমি নিয়ে মামলা সেই জমি বলে যোগাড় কেউ বাঁধা রাখতে চাইছে না। কিন্তু আঁচ সহজে খরিদ্দার এগিয়ে আসে।

নগদ টাকা দিয়ে কিনে নেয় খরিদ্দার, আমিনকে না-জানিয়ে। সোনার জমি কী বাঁধা দিতে, কী বিক্রি করতে আমিনের মোটেই আজি নয়।

তাই নগদ তিনশো টাকায় কিনল বুকনালি (খুনের)। নগদ টাকা জবার কোলা-কাঁটাই পাকন নিল সোনারাশি। কবালা হল। রেজিস্ট্রি হল। জমি মাইল সোনারাশির নিজ হাতে।

আমিনের টুঁ শব্দটিও আসতে পেল না।

কিন্তু সোনারাশি কি জানত মামলা-বাজ লোকেরা, দলিল লেখাপড়ার বিষয়ে ওয়াকেবহাল ফুটিল মানুষের বুদ্ধির পাঁচ কী ভাবে প্রয়োগ হয়! জানে না।

কারণ, বুকনালির নামে জমি কিনেছে জলিল মুন্সি! নিজে।

ফলে, সোনারাশি কিন্তুলেও জমি তার হাতছাড়া হয়ে গেল। হারলে তো কবালী নেই।

আরও কারণ-কানুন আছে, জমি থেকে সোনারাশিকে নিরস্ত করার। আমলের হার-জিতের পরিণামে সোনারাশির হার থেকে জলিল মুন্সি জমি ফেরত দেয়নি। ফেরত নিয়েছে একেবারে জমা পয়সা, প্রাক্তের সময়।

জমি সোনামণির হাতে আছে, চাষ করছে, খাজনা দিচ্ছে, তবে তার ভাবনা কী। সাধারণ চাষীর বাড়না ফসলের দুইপ্রকার মূল্য ; এক—জাগতিক মানে শাঁখলা-রসিদ। দুই—অপার্থিব অর্থ। মানে কে জমি ভোগদখল করছে। সোনামণির দুই প্রকারের দখল আছে। খাজনা দেওয়ার ও ভোগ-দখলের দখল।

কিন্তু জমিদার দুলিন সে পথে যেতে রাজি। নিজে খাজনা বাকি ফেলে নিজের অর্থাভাব নিবারণ করলেন, কোনোরে চড়ার বোনাই বজবার মোহাকে বিয়ে। টাকা নিয়ে নিজে। নিবারণ উৎসাহের সঙ্গেই করলেন। ক্রমশঃ পড়ল সোনামণির উপর, খাজনা বাড়াতে বিরোধ হয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে এল তারা মহাদেবের হাত ধরে। বাড়ি-ঘর ক্রমশঃ হয়ে গেল চোখের সামনে। জমির দিকে তাকাল। মনে হল গৃহহারার মত তাকিয়ে আছে।

'কালোছায়া' যে নতুন গ্রাম-স্পন্দন বর্তমান সভ্যতার কাছে অনেছে, যে রেবতী জনাহার রোগের কাছে, সেই রেবতীর 'গ্রাম-স্পন্দন আর্ত চীৎকার অনেছে সোনামণির বুকে। সরলগ্রাম সোনামণির বুদ্ধি-বিবেচনা বিষয়ী সন্তোষী মামলাবাজ আইনবাজ জমিদার দুলিনের বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে কেন পেরে উঠবে।

হরেন্দ্র, পাশ্চাপুলার হরেন্দ্র আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নারীসঙ্গ বর্জিত। মাথার কল্পনায় হাতে ঘুমোতে পারে না, সম্ভ্রান্ত বাওয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় ন' কুড়ি টাকা জোগাড়। এত টাকা সে কেমন করে সংগ্রহ করবে, তার যোগাযোগ যে মাসে মাত্র আট টাকা। সুতরাং বিয়ের চিন্তা তার কাছে পীড়াদায়ক বৈকি। মেয়েটিকে আবার হরেন্দ্র মনে মনে ভালোবাসে। অনেক অনুনয়ের বিনয় করল হরেন্দ্র মেয়ের বাপের কাছে। বিনাপণে মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। বিয়ে হল না। ঘুমেটী [illegible] উপস্থিত হল একদিন। চলল মামলা। [illegible] নিষ্পত্তির পর অন্তর সেল কোর্টে [illegible] অবলা আশ্রয়ে। এখানে [illegible] বিয়ে করতে [illegible] এবার তাদের মিলনের [illegible] হরেন্দ্রের বাপ ভাই, পাড়া-প্রতি[illegible] দুটোই, সমাজপতি-বিজাতি—[illegible] সমাজ। এমনকি জমি-দারের [illegible] বাপা—তারা হরেন্দ্রের ভিটে-মাটি [illegible] করে ছেড়ে। সম্ভ্রান্ত বাওয়ালী [illegible] বেদনিনি আর তপনে বেড়াচ্ছে, বেদনিনি [illegible] ছোকে, কেটে কুচিকুচি করে [illegible] মুখে করে দিয়ে আসবে।

হরেন্দ্রর উপায়ান্ত [illegible] হাত থেকে রেহাই পেল না।

সমাজের কাছে ছোট, তবু শ্রেষ্ঠিক জন। যে নারীগণ পুরুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাপ্য, যে নারীগণ বঞ্চিতদের সৃষ্টি, মানবদরদী ঠিক থাকতে পারে না, সেই চিরকালের আকাশের মন থেকে বঞ্চিত এক অসহায় পুরুষের কাহিনী হরেন্দ্র।

॥ আমাদের বিশিষ্ট প্রকাশন ॥

॥ উপন্যাস ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের দাবী ৬·৫০
বড়দিদি ৫·৫০
বিপ্রদাস ৫·০০
শেষের পরিচয় ৭·০০
বুদ্ধদেব বসু
আমলার মধ্যে একা ৫·০০
রাত ভরে বৃষ্টি ৫·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি (২য় সং) ৫·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
অনুবাদন ৩·৫০
অন্নদাশঙ্কর রায়
দিবসরাত্রকরণী ৫·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
মেঘের উপর প্রাসাদ ৭·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
এবার প্রিয়ংবদা ৬·০০
প্রফুল্লকুমার সরকার
মনে রেখ ৬·৫০
আশাপূর্ণা দেবী
বিনাসূতোর মালা ৬·৫০

॥ জীবনী ॥

অতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
২য় : ৫·০০ ॥ ৩য় : ৭·৫০

॥ সংকলন ॥

সুধীন্দ্রচন্দ্র সরকার
কথামুক্ত (গল্প) ১২·৫০
জীবনী-অভিধান ৬·০০
বিশু মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সাদর গল্পগুচ্ছ ১০·০০

॥ প্রবন্ধ ও আলোচনা ॥

প্রমথনাথ বিশী
লঘুগুরু ৩·০০
কালিদাসের মেঘদূত ২·৫০
অন্নদাশঙ্কর রায়
রেখা ৩·০০ ॥ অনুবাদ ৩·০০
বুদ্ধদেব বসু
কালিদাসের মেঘদূত ৭·৫০
গল্প : সিংহলতা
রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

॥ পদ্য-সংকলন ॥

সুধীন্দ্রচন্দ্র বসু
পদাবলী ১২·০০

॥ কাব্যগ্রন্থ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কাব্য-সঞ্চয়ন ৭·০০

বুদ্ধদেব বসু
হেলডালিনের কবিতা
(অনুবাদ) ৩·৫০
যে আঁধার আলোর অধিক
(২য় সং) ৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
এষণা কিন্নর ৩·৫০
বিষ্ণু দে
একুশ বাইশ ৮·০০
অতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
আজন্ম সুরভি ৩·০০

॥ গল্প-সংগ্রহ ॥

সমরেশ
গল্পিকা ৩·৫০
কল্পলতা ৪·০০
গল্পকল্প ২·০০
হনুমানের স্বপ্ন ৪·০০
বুদ্ধদেব বসু
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২·৫০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০
প্রেমেন্দ্রকুমারী ইত্যাদি গল্প ৪·০০
বুদ্ধদেব বসু
তাদের আমার কেতা ১২·০০
সুবোধকুমার ঘোষ
বিচিত্র কাহিনী ২·০০
সন্তোষ ঘোষ
কাসিল ৩·৫০
প্রবোধ মুখোপাধ্যায়
জার্মাণীর ছোট গল্প
(অনুবাদ) ৬·০০

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

সুধীন্দ্রচন্দ্র সরকার
আমার কাল [illegible] দেখ ৬·০০

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়
পথে প্রবাসে ৪·০০
রেখা ৫॥৫০
জাপানে ৭·০০
বুদ্ধদেব বসু
দেশান্তর ১০·০০
জাপানি জনান্তিক ৩·৫০
সুধীন্দ্রচন্দ্র সরকার
ধানসি থেকে মালয়েশিয়া ৪·০০
প্রীতি ভাঁড় বিশ্বাস
হিন্দুবাহ পথে নারায়ণ ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কর অসহায় হয়েছে, যার মাত্র দু কুড়ি টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা নেই বিয়ের জন্য। বাবিও যা বিয়ের সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন দেখে, তবু সমাজের ভোজ-ভাষানির ভয়ে সে মরু পাত্রে এগিয়ে যেতে হাতে তুলে নিতে পারে না ধুটি জোয়ান হাত। চুড়ান্ত অসহায় হয়েছে।

জীর্ণ দুর্বল লোক সব এবং সর্বোপরি অসহায় বাহিনীদুঃখের অতিস্থানুমার দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সমাজের চোখে দেখেছেন এবং এঁকেছেন তাদের। অতিস্থা-নুমারের চোখ যাওয়ার চলে গেছে সমাজ পিছে সবার নিচে। স্ত্রীরা কেমন করে ধর্ম, সমাজ, রীতি, দেশের, ঐতিহ্য ইত্যাদির হাতে নিষ্ঠুর ভাবে প্রতারিতা হয়ে আই দেখেছেন অতিস্থানুমার। [illegible] গল্পে তাদের [illegible] করে বিশদে পড়ে। যখন একটির [illegible] নয়, তিন-তিনবার তালাক উচ্চারণ করে ছেলেদের তখন যায় কোথা। আবার স্বামীকে তালাক দিতে হয়। তার স্ত্রী মুজফ্ফরকে বিয়ে করে সেই সমাজ, সমাজ-প্রধান ও ইঞ্জিনাদ্দি, যার সুযোগ দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে নিজে স্বামীকে হাতের বলে তালাক দয়ে ফেলল। [illegible] মুজফ্ফর ইঞ্জিনাদ্দির দিল-দেয়া [illegible]কে।

ইঞ্জিনাদ্দির তালাক দেয়ার আবার ছুটে আসে মুজফ্ফর পুরোনো স্বামী প্রেমিক-স্বামী, কুদ্রতুল্লার কাছে। কিন্তু তখন কুদ্রতুল্লার মন বিষিয়ে গেছে। সে স্ত্রীকে আর ঘরে নিতে চায় না।

সব পত্নী এমন প্রেমিক [illegible]মুজফ্ফরের এমন কী গতি হবে?

আইনের জালে জর্জরিত প্রায় বিচারক অসহায় ভাবে মজুমদারের যেন এক আত্মীয়ের (মজুমদার)। আত্মীয়ের দেখে প্রশ্নাবিত, সে খুনী। তার মজুমদার ছাড়া আর কেনো বিচার প্রশ্ন নয়। কিন্তু বিচারক জানেন, মানুষকেই যদি মেরেই ফেলি, তবে আর কার বিচার, আর শাস্তি? মজুমদার বিরুদ্ধে যত-যুক্তি যত চিন্তাই আসুক, বিচারক আইনের জালে বন্দী। তাকে চালিত করবে আইন। বিবেক, মন, হৃদয় নয়, ধর্ম নয়, কিছু নয়। তিনি আইনের হাতিয়ার। অর্থাৎ আইন হবে কর্তা। তিনি আইন নামক জড়ার ইচ্ছার কর্ম।

কী কঠিনে আর অসহায় অবস্থা বিচারকের।

[illegible] অপূর্ব কলম চালিয়েছেন।

সেই প্রশ্ন-পল্লব, সেই ভেবেছিই আমরা পাচ্ছি নাকি এই বিচারকের মনে? পাচ্ছি। আবার পাব বাসিবাহিনে বেদখলে এবং মুক্তির আবির্ভাবে। তিনিই অতিস্থা-নুমারকে আরও করে তাববে।

বাসিবাহি দেখিয়ে পরনা ছেলেদের ঘরে ঘরে। একেবারেবাহিনীর জীবিকা। বর্তমানে মজুমদার দারিদ্র্যে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের উপর বাইরের আক্রমণ ঠিক রুখতে পারেনি। বাসের ভাষায় উঠে বাসি দেখাতে [illegible]ছেলে, মানে বড় [illegible] পড়ে যায় মাটিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে [illegible] উঠে দেয়। অবলীলা সাধন হয়। তখন পরবর্তী সন্তান—শিশু সন্তান আর্তনাদে ফেটে ওঠে, 'আমি নিশ্চয়ই পড়ে যাব; ধরে যাব আমি—এবার আমার পালা—'

মজুমদার কিছুই বলল না। আবুর (বড় ছেলে) হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, ধরে যাব।' ছেলে অবুলা আবার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিক্রিয়াহীন অনুভূতি।

মজুমদার কিছুই বলছে না। পাথরের মুখে নিশ্চুপ নির্লিপ্ততা। ছেলের আবার উত্তরে রেখাহীন কঠিনতা। উপায় কি, তাকে খেতে হবে যে।" (বাসিবাহি)

কথা...আমি অন্তরিম মুহূর্তের কথার কাছে বাসিবাহি তুচ্ছ, নিতান্ত অসহায়। তবে বড় করুণ ও নিরুপায় বাসিবাহি।

অতিস্থার একটি বড় গুণ, তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন। এই জন্যে তাদের তিনি বিচিত্র চরিত্র এঁকেছেন, সুনিপুণ পরিমাণে তাদের সকলের পরিচয় দেবার আমরা

দেখব, বাওড়, চাষী, চাষবাসি থেকে মজুমদারকারী বিচারক পর্যন্ত নানান শ্রেণীর চরিত্র এঁকেছেন। এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি বাস্তবতার উচ্চ-মানে পঁহুতে সক্ষম হয়েছে।

বেদখল 'বেদখলে' ইমামালি নামে চাষীটি।

'বেদখল' অতিস্থানুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। আইন-কানুন, আইনরক্ষক, জমি-দারের আমলা থেকে নিজের ভাই পর্যন্ত এক বাহিনীদুঃখের তার হকদারি ছিনিয়ে নিতে মানে তার অস্তিত্ব থেকে উৎখাত করার কুটিল কলুষে চিত্র এঁকেছেন 'বেদখলে'ও।

তার দুঃখের আবির্ভাব হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের ছবি। সেই বার্ষ লড়াই। যে লড়াই চলেছে বেদখলী, করেছে ইমামালি, করেছে কুটিপাতের সেই প্রাণ-কবিকাটি, কিন্তু হেরে গেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক নদী উত্তাল হয়েছে, পড় ছেড়ে চলেছে। নদীর কিনারে মানুষের ঘর বাড়ি ফসল আত্মর সব একে একে গ্রাস করছে। কোনো প্রতিকার নেই স্রোতকে প্রতিরোধের। কোনো উপায় নেই সেই দুরে পলায়ন ছাড়া। কী করতে পারে মানুষ। চেষ্টা? তা করতে পারে। ঘরদোর, আত্মর ছাড়বে না, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করবে, কান্না দেবে, আর্তনাদ করবে। কিন্তু মত্ত্বার সঙ্গে কে কবে পেরেছে?

কবলের গ্রাস কে উপেক্ষা করতে পারে।

সেই অসহায় মানুষের, সত্তা মানুষের আর্ত দুঃখের আবির্ভাবেও ধ্বনিত হয়েছে।

এই দুঃখ অতিস্থানুমারের জীবন-দর্শন।

প্রায় অধিকাংশ গল্পেই অতিস্থানুমার অসহায় মানুষের ভূমিকা এঁকেছেন, যেমন 'আরোগ্য এবং 'বিলম্ব' গল্পে।

রোগের চিকিৎসার পয়সা নেই। চুরি করে ছেলে ফিরে, ওখানে হাসপাতালে চিকিৎসার অভিরে মেরে উঠল ছেলেটি। বার বার ছেলে মেলে, একবারও ছেলের মেয়াদে যে রোগ সারে নি। ছেলে ওঠার পর ছেলেটি এতদিনকার অজানে অনিচ্ছাকৃত চুরি-করা টাকা [illegible] মাথে মানি-অর্ডারে করে দিল।

আর 'বিলম্বে' প্রেমিক দুঃখ উপলব্ধি করল যে জীবনের উত্তাল তরঙ্গের বিরুদ্ধে সন্ধ্যে ফেলবারে একেবারে শান্ত হয়ে যা, এর মধ্যেই এক ফাঁকে ডুব দিয়ে চলে নিতে হবে।

অতিস্থানুমারের মূল জীবন-দর্শন হাসির অন্তরে শান্ত-উপলাধা ছড়িয়েছে। তিনি ছেলের বিচিত্র পরিস্থিতি অবলম্বনে কৌতুক ও হাসরসের সরল গল্প রচনা করেছেন, সরল রচনা করেছেন নানান ভাবনা ছেলে করে। ছেলের প্রায় ক্ষেত্রেই অতিস্থানুমার সার্থকতা অর্জন করেছেন। লিপিকুশলী, ভাষা-ভাষা ব্যবহারকারী, সংযমে শান্ত পারদর্শী অতিস্থানুমার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছোট গল্পের মাধ্যমে যে তুলনা পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে বিরল।

তেলনাপোতা আবিষ্কার

বেলেন্দু মিত্র

খুশি ও জলজ্যান্ত,—হলদাই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে ছেলেমানুষও জাদু-নাড়ও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। প্রথম কয়েক ঘণ্টা মানুষের ভিড়ে হারিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু দিনের জন্য ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সহায়তে সরলতম মানুষরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বর্ণালিতে মুখোমুখি হবার জন্যে উৎসাহী হয়ে আছে, আর জীবনের কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন ছেলেমানুষরা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

ছেলেমানুষরা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদ, জিরিয়ে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে চড়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে বাসের পেছন থেকে মুখোশ চটকটে সরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন, কিছু জলার মতো জায়গায় ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারই ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের ধুলো হারিয়ে যাবার পর দেখবেন সূর্য ডুবে গেছে। চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে এসেছে। চলেনদিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পাবেন না। মনে হবে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। একটা সাদাসেতের ভিতরে আপনার অস্তিত্বটুকু পড়ে আছে। মনে হবে নিজের জন্মে একটা ছবে কুণ্ডলিত জলীয় অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে অনেক কথা ভুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই ঘরে বাঁধানো হয়ে আপনাকে। সামনে জল জলজের ছোট্ট ছিপ ঘরে হবে একটা ছাদাজলজের মালা যে কেন ছেড়ে গেছে। সে-মালার মতো ছোট্ট কিছু দূরে গিয়ে দুধারে বাঁশ আর বড় বড় গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ছেলেমানুষরা আবিষ্কারের জন্য আরও দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হবে আপনার মতো ঠিক জলজন্তুর মত, তবে এ অভিযানে তারা এসেছে—কে জানে আর কেমন অভি-সন্ধিতে!

একজন মিতে তারপর ছিপটা আলগা দিকে উৎসাহভরে ছেড়ে দিলেন, মাছে মাছে পা টুকে জলজের ঘনিষ্ঠতার মাঝা দেবার চেষ্টা করলেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইলেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। জলজের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে কলকাতা কেরার বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হয়ত সেই কালা জলের দলা দেখতে জলজের মতো হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে জলজের একটি ছুর্তিকিন্নরকণ্ঠ আওয়াজ পাবেন। মনে হবে যেন জলজ থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষার চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি কাঁপা আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি মোষের গাড়ি জলজের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর মোষুলোচাল গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন ভাঁড়াটি তেমনি মোষগুলি—মনে হবে গাড়োয়ানের যেন বয়সের ভেল থেকে মোষের গাড়ির এই সাক্ষিসূত্র সংস্কারটুকু বেরিয়ে এসেছে।

বুঝা যাবার আগে না করে সেই মোষের গাড়ির ছই-এর ভেতরে ভিতরে যেমন করেই প্রবেশ করুন ও যত জোরা হাত ও পা এবং ভিজিটি ব্রহ্মা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সবকিছু কিভাবে সন্তোষিত করা যায় সে সমস্যায় দীমাংসা করবেন।

মোষের গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে জলজ নালার দিকে চলতে সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার গহনা যেন সন্তর্পণে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারে সেরাল ঘুম আরেকা কিন্তু তবু মোষের গাড়িটি অবি-চলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পারে পারে পথ যেন হারিয়ে হারিয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথায় অযোচিত সম্মান বিসর্জন দিয়ে সন্তাকার যেন একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। কিন্তু সঙ্গে অজ্ঞ ঘনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়বে, তারপর ধীরে ধীরে মুখের পারবেন চারি-ধারে গাঢ় অন্ধকারে চেতনায় শেষ অস্ত-রীপটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশায় এক জলজ মুখ আপনার চারিধারে। সমস্ত সেখানে স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ।

সমস্ত স্তব্ধ ও নিস্তরঙ্গ। এ আচ্ছন্নতা অনেকক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না।

হঠাৎ এক সময় উকটি এক বাগ-অন্ধকার ছেলে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। এবং গাড়ির চলনের তাল থেকে থেকে সোনালুরে একটা ঝাঁকুনি বাজছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত অবিকারভাবে আপনাকে জানাবে—"এজ্ঞে, ওই নালার বাঁধ দেবার।"

ঘণ্টাখানেক ভালো করে ঘুমোবার পর, রাত্রি আন্দাজ তিনটে বাজে-বিরাজের সময় ঝিমা কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উচ্চারণ করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, রাত থাকে চিন্তার কিছু নেই এবং নিতান্ত কুয়াশা না হলে এই গাড়োয়ান আপনাকে ঠিক ঠিক রাস্তায় পৌঁছে দেবে।

মহানন্দাটী তিন মাইল দূরে বাসরাস্তার একটি স্থানের উল্লেখ করে সময় আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে মোষের গাড়ি বিশাল একটি মাঠে পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ মোষের উঠে এসেছে।

স্বল্পই নির্দিষ্ট আলোর আবহা বিশাল ঢেউ সব প্রহরী যেন গভীর দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব দুরোবেষ্টন—কোথাও একটা ঘাস, কোথাও একা বেউচির বিলাস, কোথাও কোনো মন্দিরের উপাশে প্রহরাদের কাছে লাকা দেবার ঘাস অনেক দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেবল একটা নিরবচ্ছিন্ন সাদা সমুদ্রের অস্তিত্ব অনুভব করবেন। অতীত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন সুদূরতীতকালের সমুদ্রবিলোকে এসে পড়েছেন বলে মনে হবে।

ছাড়ু তখন কত রাত্রি তা জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখনো রাত কেন একটা ফুরোয় না। নিবিড় অন্ধকার অনন্ত সমুদ্রজলে সব কিছু বিলীন হয়েছে: —যাদুঘরের মমতা চালাঘরের মেঝে অতীতের মতো থাকে।

দু-তিনজনের মোট হয়ে মেঝের গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পা-গুলো কোন স্থান থেকে ছিঁড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা ঘাট, ঘন অন্ধকার ঘরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করবে। হয়তো সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অন্ধকারেই ঘরের আলোর যেমন একটা মানসিক পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে যেন কিসলাইনের একটি ভীষণ অট্টালিকা, ভাঙা ঘাস, ভগ্নে-পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো গবাক্ষহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই দুরোবেষ্টনেরই একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মাসবোধ করে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে রেখে যাবে। সেই সঙ্গে এক কলসী জল। ঘরে ঢুকে দেখতে পাবেন বহু যুগ পরে অন্বেষণ-জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ধুলো, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ কখনো আগে পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিবাসী আরো যে তাতে আছে, একটি আগন্তুক তখনই গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সমস্ত চলাফেরার হাত ওঁ দেয়াল থেকে ভীষণ পলকাবার সেই ঘুমন্ত আত্মা। অতি-মানুষের ঘরের থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

ভেলেশাসোরা অধিকারের জন্যে আপনার দুটি কন্ধরে একজন পরম-রসিক ও অপরজনের নিরাধিকারী মুক্তজনের মোসব হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে সুরু করবেন। অপরজন পরদিনের নিজেকে নিরীক্ষিত করে নেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের ভিতরে ধুমন্ত গাঢ়ভাবে কালিবালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কেবল জানালার মেঝের-সন্ধানে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের মুক্তজন আবহাওয়ার দল মহাসমারোহে আপনাদের অভিনন্দন জানাবে ও এদের সঙ্গে সৌহার্দ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেওয়াল ও গায়ে বসবার বিলিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মতো সবচেয়ে বড় কুলীন। প্রায়ো-রিয়া দেবীর অভিশপ্তরা বাহন আমেরো-ডিলিড্স। আপনার দুই কন্ধ দুই আক্রমণে অগ্রসর হবে। ধীরে ধীরে নয়ন পরিমাপ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর পুরোহিত গন্ধর থেকে একটি পরিধান পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে মনে হবে পা বা হাঁটু বসে পড়ে ভূপাতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু যেন দুরোর আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে উঠে দেখবেন, — অধিবাসিদল আপনাকে আক্রমণ করেছে—বুলিসার হয়েছে, কাইলো ফাইলো, অন্ধকারের পরম বাহিনী যন্ত্রদলের শিকড় চালিয়ে মেঝের থেকে এ-অট্টালিকার ঘরগুলির ফাঁকে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে: তবু মুক্তজনের ক্ষীণ চাঁদের আলোর সমস্ত মেঘন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মন্ত্রণা সুবৃহস্পতিময় মায়া-পুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনারকাঠি হাতে কাঠি পাশে নিয়ে দুরোন্তরের পার তন্দ্রার অচেতন, তা কেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সমুদ্রের ওপারে একটি জনপদ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানলায় একটি আলোর কণিকরেখা হয়তো আপনি দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি মনুষ্যের ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথ রাত্রে কে সে এই 'বাতায়নবর্তিনী, কেন সে চোখে তার ঘুম নেই আপনি জানবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই আপনার চোখের ভ্রম। দাঁড়ানো থেকে সে-ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা মুছে গেছে। মনে হবে এই দুরোবেষ্টনীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ কণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন। এক কখনো এক সময়ে দুই কন্ধরে পাশে একটু জায়গা করে শুয়ে পড়বেন ঘুমতে পারবেন না।

যখন ভোর উঠবেন তখন অন্ধকার হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেখেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একদিনের যোড়শোপচারের আয়োজন নিয়ে যতো আয়োজন করে পাওনা চাকা যাক আসবে একটি মাত্র বসে গবেষণার সমস্ত জন্যে যতো বস্তুটিকে নেবেন সমস্ত বস্তুটি সরিয়ে নেবেন।

কোনো অন্ধকার ওপারে অনুকেপনা বাহিনীর জন্য থেকে একটা আহ্বান। পাখী ডাকে ডাকে যেন আপনাকে উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে ঘুমের বিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ডাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ওপায় ফিরে গিয়ে মুখোমুখি তাদের আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্তরণ করে একটা মোটা লম্বা সাপ্লোয়া ঘাটের কোন কাঁকর থেকে বেরিয়ে ঘোঁৎ-অক্ষরে পাড়িতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, মুখটা জাঁকিয়ে পাশা দিয়ে পাওনা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার কাছাকাছি ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস মুখের ভাবে আপনি আনমনা হয়ে থাকেন।

তারপর হঠাৎ জলের মধ্যে আপনার প্রেম জাগবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের কাছে মৃদুমন্দভাবে আসে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেরারের একটি ঝকঝকে ঝকঝার পুতুলের পদ্মনা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল আসছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সমস্ত আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার কাছে লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঝকঝাটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত অনুন গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অঙ্গুষ্ঠে লম্বা দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রান্ত করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অভ্যাসগত হবে না। শুধু আকস্মিক চমকের ফলে বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ঘুরে-যাওয়া কাঁকনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত অনুন মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মায়াবরণটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা আর করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মায়াছায়া আপনার শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতি-যোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবান্তর বলে মনে হবে। এই জনহীন দুরের দেশে সত্যি এরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

চিরসবুজ রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড সংকলন। নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া
এইচ-এম-ভির অমরত্ব অবদান।

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড
সাহানা দেবী
এই তো তোমার আলোকেতে
একলা খেলা যে যায় নিমেষে
তোমার সাথী বিভাবরী দেয়
তবী আমার চরণ ছুঁয়ে যায়
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐকতানবাদন : প্রফুল্লকুমার
চন্দ্রশেখরম্
না গো, এই যে খুলা আমার দ্বার
আমরা, দুই অধীর আগন খোলা ঘরে
সুচিত্রা মিত্র
না বলোরে আমারে যদি
ঘরে আসনে
ওওওও ধরিয়ে বালিকায়)
যদি ফুল ফোটার কাল
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ
আমার থেকে দূর রচিল
দৌরমন্ত্রীদের কিংবা পরমান
আজ খেলা-ভাঙার খেলা
বিনয় চট্টোপাধ্যায়
লাজুক আমার বুঝি আমার
একলা খেলা আজকে খেলা যে
আমা ভরি তোমার বিভাবরী
তোমারে যে ডাকা হল
সুচিত্রা সেন
ফুল বলে, ধন্য আমি
বিশ্বের হাসির মীন থেকেও
দুটি একলা আমি বলে বাঁচে
তোমার ফুলের মালা
মান্না দে
কেন যামিনে আমি
জেগেছি, আমি
কিছু ফোন্ অসুখের ফুল
ফোটে নাই, ফোটে নাই

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড
মান্না দে
কথা কও কথা কও
না চাঁদের বনে পাখারা যায়
আমাদের মধুমাস বনে
ফাল্গুন, হল আমার আমন্ত্রণ
শ্যামল মিত্র
আমলকী, আমলকী
আমি ভুলে যে
কিছু পথে নয় কিছু
আমার কবিতা এই পাখির মতিনা
পূরবী মুখোপাধ্যায়
আমার, আজি এ বসন্তে
তোমার এটুকু ভালবে যেন পাই
কিছু যে সাধনের অভাবে
আজি পথিবধূর মতীনে
বিজেন মুখোপাধ্যায়
দুটি ফুল ফুটিয়ে
এই বুকি মোর তোমের ভাষা
রাত্রি এসে যেখায় মেশে
সেই তো আমি চাই

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড
উৎপলা মজুমদার মুখোপাধ্যায়
আমার এই ছিন্ন রাতি
দীপ নিয়ে যেয়ে যায়
মান্না দে
আমার প্রাণের পিছু পানে যেয়ে
আমার ফুল ফুল ফুল
প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
আমার প্রিয়া যায়
আমার আর এল
অশোক তরু
তোমার কিছু দেন নাই
বৈশাখের এই প্রেমের ভাষায়

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড
সুবীর সরকার
বিদায়ের সময়ে এ গান
আমাকে যে ডাকে বার
অর্ঘ্য সেন
এমন একলা কে সন্ধ্যাকে ফুল
কার পূজা আমার তরে
পূর্বা মিত্র
আমার মাথা নত করে
দাও তোমার পায়ের ধুলোর
আরতি মুখোপাধ্যায়
ফুলে ফুলে ধন দিয়ে
আর যেখের চারদিকে হারাবে
অমিতা ঘোষাল
বাদিন আমার বীণা
আমার বিশ্বিয়ালে
সুচিত্রা ঘোষ
ওগো যে মোর বাণীর বাজারে
তোমার নাম লিখিনি, তুমি জানি
নং গ্রেডিং রেকর্ড
আনকমপেটেন্‌ট চেঞ্জার সহ
শিল্পী : মান্না দে, মজুমদী যেয়েরা,
সন্ধ্যা মুখো ও যেয়েরা বাজনায়।
বসন্ত
(রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক সংকলন)
সংগীত-পরিচালনা। সংগীত যেয়েরা; সংকলন ও
তত্ত্বাবধান : আধুনিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কাজী নজরুল। সংগীত : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়,
বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল
মিত্র, মান্না দে, সুবীর সরকার, অশোক তরু,
উৎপলা মজুমদার, অর্ঘ্য সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
সুচিত্রা মিত্র, পূরবী মুখোপাধ্যায়, অনু গুহ,
সুচিত্রা সেন, প্রতিমা যোষ, দেবব্রত মজুমদার, ও
সুচিত্রা ঘোষ।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
১৪, এ আই এম্প্লায়ার্স লেন্স (১ম লেন)
কলিকাতা - বোম্বাই - দিল্লী - মাদ্রাজ - মৌরাণী

এক সময়ে হঠাৎ হুঁশ হবে আপনাকে সাড়-সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে ফিরে দেখবেন আপনার ঘরোয়া-শিকার-টেনপুণের হুবহু ইতিহাসে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কলঘোচন হয়েছে। তাদের পরিত্রাণে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনেন, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পরম-হাসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—ঠক আপনার মতোই। এইজন্য যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে ভোজবাজী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পূর্বজন্মাটের সেই অবসরের [illegible] মেয়েটি আপনার পরম-হাসিক বন্ধুটির অতিশয়োক্তি। সেই সঙ্গে আরও শুনবেন যে, বিপ্রহরিক আহারের অব্যবহিত পরেই সেদিনকার মতো তাদের একজনই হয়েছে। যে ভগবদ্ভূপে পত্র মাত্র ভবিষ্যতের জন্য একটি হাসমূর্তি আপনার চিত্তের উপাদান করেছিল, বিয়ের মুহূর্ত আসার তার প্রতিদিন ভীতিতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাতির মাঝামাঝি সরে গিয়ে তার নগ্ন অবয়বটি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারবেন না।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি ফেরে অবাক হবেন। এই বাড়িটিরই একটি ঘরে আপনা-দের আহারের হয়তো ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন অকাতরে। হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা অকুণ্ঠতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু তাই নয় তার মুখের কমুন গাম্ভীর্য আরও বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিচয়ের বিন্দুতে অনহীন স্তোকলোকের সমস্ত মৌন বেদনা কেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। এইদিন যেন সে এই মুহূর্তমুহূর্তে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-একবার তাকে উরু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলায় কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকবে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যাবর্তনের ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে যেন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

আমাদের কারখানায়
তৈরীকৃত সর্বোত্তম এনামেলওয়্যারের
ছোটদের বিশ্বকোষ
[illegible]

খাওয়া শেষ'করে উঠে আপনারা একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অতঃপর মিনিটখানেক ইতস্তত করে সে যেন সেবে দাঁড়িয়ে হয়ে সরমা থেকে ডাকবে, 'একটু শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পরমহাসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে কুঁড়েমির পর যে আলস্যটুকু হয়ে তা এমন নিষ্কর্মণ্য নয় যে আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন যামিনী অত্যন্ত কাতর-স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা ত কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলবো।'

মণি একটু বিরক্তির সুরে বলবে, 'ও। সেই খোকা এখনো? বিরক্ত এসেছে, জ্বালাবে বুঝি?'

যদি তুলবেই ভুলবেন—সে নিশ্চয়ই এসেছে। শুধু তাকার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ছেড়ে সে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস। কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। জন্ম হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত-অধৈর্য হয়েছে যে কোন কথা বুঝতেই চাচ্ছে না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেছে যে, তখন ওঁর প্রাণ ধড়ফড়ানি হয়ে ওঠে।'

'হুঁ এ ত' বুঝিয়ে দেখছি। চোখ থাকলেও মা-হয় সেঁকের দিয়ে যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরক্ষর নয়।'

ওপর থেকে শুধুই আবার তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠের ডাকটা আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলে যাবিনা, মণি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।' — মণি এবার ঘরে ঢুকেই নিজের মনে বলবে, এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাড় পা পচে গেছে, চোখ নেই, তবু পণ করে বসে আছে, কিছুতেই মরবে না।'

আপনারাও কি এবার হয়তো শুনতে চাইবেন। মণি বিরক্তির সুরে বলবে, 'আপনার আর কি, নিরঞ্জন বলে ওঁর পূর্ব-সম্পর্কের এক বেয়ানের সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-মেয়েরা এসে ওঁকে বলে গেছল বিলেতের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর থেকেই সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজুহাত পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, নিরঞ্জন কি এখনো বিলেত থেকে ফেরে নি?'

আরে সে ফিরেছে কবে, যে ফিরবে। সেখানে বুড়ি নরমোক্তমালা বলে তাকে এই খবরটা দিয়ে গেছল। এখন খুঁজেপেতে কোথেকে উদ্ধার করতে তার বাপ পড়েছে। খুঁজে খুঁজে ফিরে-যা করে দিবি সমাচার আসছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, ভাবে বিশ্বাস যদি করেন তবে একটুনি তো শক্ত হয়ে যাবে। কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিজেকে কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু যার কাছে বলার উপায় ত' নেই। যাই কর্তব্যবোধ থেকে আসি।' — বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হয়তো হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো আমিও যাব।'

'তুমি যাবে!' মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে ভেবে?'

'না, আপত্তি কিসের?' বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সন্তর্পণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছাবেন, বলে হবে, ওপরে এর, বাড়ির তলার সবচেয়েই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর ঠের পাবেন, প্রায়-অন্ধকারে একটি লম্বা তক্তা-পোশে ছিন্নভিন্ন-আস্তির একটি লম্বা কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের এক পাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও চঞ্চলতা দেখা যাবে: 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়লো, বাবা? তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে রেখে। কিছুতেই যে নিষ্পন্দ হয়ে যেতে পারছি না। এবার ত' আর অমন করে পালাবি নে?'

মণি কি কেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'মা নিরঞ্জন, আর পালাবে না।'

মুখে না ফুটলেও মণির বিস্ময়ের আর একটি স্পষ্ট মতো মেয়ের [illegible] স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি [illegible] নিষ্পলক হয়ে মুখ নিশ্বাসে চেয়ে থাকবেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ তেমন করে পরীক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত ধীরে ধীরে সমস্ত সাগরে শিশির বিন্দুর মতো মনে পড়বে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন 'আমি জানতাম তুই যা এসে পারবি না বাবা। তাই ত' এমন করে এই ছেলেদুটো পাহারায় দিয়ে দিন গুনছি।'

মৃন্ময়ী এতগুলি কথা বলে হাঁপাচ্ছিল, চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হচ্ছে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মনেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—কান্না ও জীবনের বিদ্রূপে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় সম্বন্ধের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর দেরী নেই।

মৃন্ময় আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি মায়া। আমার সেটা হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শেষে-তাপে ঘুচ্ছো হয়ে যাবার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে ছেলেটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা আমি কি জানি না? তবু হয়ে ওর যা নেই। এই স্বপনের দেশ—সন্ধ্যা যাচ্ছি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার জন্যে যাচ্ছে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে অহরহ এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এই জন্যে একবারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কি না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটি-বার তাকাতে আপনার ইচ্ছা হয়ে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর মোটেই বাধা মানবে না।

মায়া বলার তখন আপনি মৃদু স্বরে বলতে পারতেন 'আমি তোমার কথা ভাবিনি মায়া। আমার ক্ষমা করতে হবে না।'

তারপর বিকেলে আবার সোহনের মাঝি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে এসে ওকে ডাকে উঠবেন। আবার মৃন্ময়ের' গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকেই সেই মধুর দুটি চোখ তুলে যামিনী মৃদু স্বরে বলবে 'আপনার রিপোর্টিং যে পড়ে ছাইল।'

আপনি হেসে বলবেন, 'যাক্ না। এবারে পারিনি বলে, ছেলেমানুষের মায়া কি আর আর ক্ষমা দিতে পারবে।'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট [illegible] মনে হবে, তার চোখের কোণের [illegible] একটি সকৌতুক হাসি সমুদ্রের [illegible] মতো আপনার মুখমণ্ডলে নিমন্ত্রণ [illegible] ভেসে বেড়াবে। কবে একদা না ফেরদৌস [illegible] মেয়ে ম্যালেরিয়ার মড়কের [illegible] ছেলেমানুষোতাকে চলবার [illegible] কিংবদন্তি-বিলীন ভাঙ্গে [illegible] রেখে গিয়েছিল—আপনার [illegible] সেই আলোচনা করবেন। সে-[illegible] করে আপনার কানে যাবে না। [illegible] খার আপনাকে পীড়িত [illegible], তার চাকার একঘেয়ে [illegible] আপনার কাছে [illegible] যাবে না আপনি মৃদু বিদ্রূপ [illegible] একটি [illegible] ধ্বনিত করে মৃন্ময়কে,—'কিরে [illegible], কেমন আনন্দ!'

মৃন্ময়ের জনাকীর্ণ আপার্টমেন্টের [illegible] যখন এসে পৌঁছবেন তখন আকুমারী জলে ছেলেমানুষোতার স্মৃতি মৃন্ময়ের [illegible] তীব্র অন্তরঙ্গ একটি ভাষার মতো উচ্চারণ করে যাবে। আচ্ছোপান্ত বিস্মৃতির [illegible] ডুবে যাবে। মৃন্ময় আপনার [illegible] এসে হাজির হবেন, তখন মেঘবেলার [illegible] ও মনের অনেক রোমাঞ্চকর ইতিহাসে [illegible] সম্ভ-জাগরা আবার মনে হবে ছেলেমানুষোতার স্মৃতি আপনার কাছে [illegible] একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে যে ছেলেমানুষোতা বলে সত্যিই কোথাও কিছু নেই। পদ্মার কঠিন বার মুখে আর সৃষ্টি যার সুন্দর ও করুণ, মেঘনাদবীপ [illegible] মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব দুরাশার কল্পনা মাত্র।

একবার কাঁপনের জন্মই অবিস্মৃত হয়ে ছেলেমানুষোতা আবার [illegible] মতো অতলান্তের নিবন্ধন হয়ে [illegible]

স্টাণ্ডার্ডের বই

প্রকাশিত হল

শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর দত্তশর্মা লিখিত

অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ভূমিকা সম্বলিত

ধর্ম ও ধর্মান্ধতা ১০·০০

গান্ধী, গীতা, চণ্ডী, সাধু মহাত্মাদের বাণী ও ৪১ জন বিশেষজ্ঞের ধর্মান্ধতার জীবনী। তেত্রিশ জনের ছবি।

অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস ও গল্প	ভ্রমণকাহিনী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	দিবারাত্রির ৪·৫০
সাধনমতী ৬·০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্ধ দিগন্ত ৫·০০
চিহ্ন ৩·৫০	হরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
সরোজ ঘোষ	কলকাতা ৬·০০
ভুল ঠিকানা ৩·০০	যৌনবিজ্ঞান
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	আবুল হাসনাত
স্বপ্নোদ্যান ৩·০০	যৌনবিজ্ঞান
শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত	১ম ১২·০০ ২য় ১০·০০
মৃত্যুকূলা ৫·০০	জন্মনিয়ন্ত্রণ (মত ও পথ) ২·০০
মনবিহঙ্গ ৫·৫০	আদুমঞ্জল ৭·০০
মিহির আচার্য	শিশুমঞ্জল ৪·০০
আলোয় সন্ধোদয় ৪·০০	ডাঃ হানা স্টোপস ও আমাদের যৌন
মুক্তির পদাতিক ৪·০০	আধুনিক যৌনবিজ্ঞান ৭·০০
গল্পসংগ্রহ ৫·০০	ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মায়া বসু	প্রসূতি ও শিশু ৬·০০
পতঙ্গের প্রেম ৫·০০	আইনের
সমরেশ বসু	গৌরীশঙ্কর ধাড়া
উজান ৪·০০	প্রোটেস্টিশিক্ষা ২·০০
প্রবোধকুমার সান্যাল	কবিতা
আদিগন্ত ২·০০	নজরুল ইসলাম
অমৃতের মন্থ	নতুনচাঁদ ২·০০ ঝড় ৩·০০
ঠৈরসন্ধ্যা ৫·০০	অমীয় চক্র
	কালের নিস্বন ৩·০০

স্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স ॥ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা ১২

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যোগাজীবন ভট্টাচার্য

"সুখের তপস্যায় সবাই অসুর, দুঃখের অসুর, দেবেও অসুর। সকল দিক ভালোই, যা হক ভালোই। আসল কথা সকল হওয়া না-হওয়া নেই—তপস্যার অসুর কিসে সেইটেই আসল কথা। সৃষ্টি তো স্থিতির খেয়ালে তৈরী নয়, লীলার খেয়ালে। যা দেখছে চাও অন্তরে সামনা দিয়ে রাখতে হয়, নইলে ফেলে দেতে হয়। এখানে কেউ পায় না, পেতে থাকে—সেই পেতে থাকার অভিমান তপস্যা করছি কিনা তাই নিয়ে কথা।..."

পুরী থেকে লেখা চিঠি। লিখছেন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে। ছিন্নছাড়া-ছেলেমানুষ ঘরে-বাইরে অস্থির, উদ্ভ্রান্ত মতি তাকে আর চঞ্চল ভাব বয়সের জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত, মুখর। অন্ধ মাথার ওপরে রবি-শশী তখনো আপন দীপ্তিতে অমলিন।

সালটি কিন্তু উনিশ শো বাইশ সাল। তিরিশের ঘুম ঘুম ঘুরে তখনো ঢের দেরী। তখনো এই শতাব্দীর অবাধাহিত এক বছর পরেই 'কল্লোল' সাহিত্যপত্রের আবির্ভাব এবং বাংলার সাহিত্যাকাশে তাইসব নতুন জ্যোতিষ্কের। অধিক সাহের অধিকাংশই তখন বিদেশী বাইতে আপন দেশ খুঁজে পেতে চেয়ে অধিকতর আগ্রহী। রবীন্দ্র-বিরোধিতার আড়ালে কবে চাঁদের বুড়ি সুদ্ধো আসি চালানোটেই মুখর, তখনো বেদীর তাঁর। বে-আসলাতে উঠলো রবির কিরণ-লাগা ঝিকি-মিকি। এমন কি সব-দেখে ফেলার নজরটুকু অবধি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই হাত পেতে নিতে হয়েছে।

যে-কোনো আন্দোলনেরই দুটো দিক আছে। হক সাকলা, নয় ব্যর্থতা। তাই বুকে বল হবার সাহসা তো কেউ করে না। সেটা জানা নয় কারো। ওঁরাও তা টান নি। তবু সেই ডাঙায়ার পেছনে ঢেউয়ের মেন ছিল প্রবল, চলার এক অভিমানের তাড়না। যার জন্যে সাহিত্যতাবে দুঃখতো অভিযোগই দায়ী করা যাবে না। সেটা অসম্ভবীয়। তার সেই মনা না-পাওয়ার কারণগুলি নিহিত ছিল দেশ-কালের সমসাময়িক অবস্থা আর ঘটনার গভীরে। আন্দোলনের প্রারম্ভেই সেই পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাস্রোতের দিকে এখনই চোখ বুলিয়ে নেয়াই হবে যথার্থ বুদ্ধিসঙ্গত। নতুনরা সবসময় আলো-চোখে হয়ে উঠবে সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেবার সাধিল। কখন সময় অন্য অবস্থার হাতে আর চাপেই তো ঘটে যন্ত্রের পুনরায় পরিবর্তন, অন্যায় দুঃসাহসিক হয় ইতিহাস।

তাহলে সেই ঘটনাগুলি কী? তৎকালীন ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলার সমাজ-সাহিত্য - রাজনীতির বিশাল পট-ভূমিকায় তার দৃষ্টান্ত কতটুকু? উনিশশো বাইশের আগে-পিছে দেশে-বিদেশে সত্যি এমন কি ঘটনা ঘটে গেল যা ছিল অসাধ্য, যা পরিল অবলম্বনাবী, সহজে আর মেলবান? যার অনুপ্রেরণায় দেখা গিল এইসব নতুন ভাবনাদের চিন্ত-বিক্ষোভ, নতুনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ?

তা হচ্ছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বোলশেভিজমের সিকিমান রিপোর্ট প্রকাশ, আন্তর্জাতিকতার বাঙ্ময় ইতাকাণ্ডের প্রতি-ঘাতে অধিকতু রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি বর্জন, তারত সংস্কার আইন, নিখিল তারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন শুরু, নেতাজীর সহযোগিতায় দেশবন্ধুর স্বরাজ দল গঠন, খিলাফৎ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবজাগরণ, প্রিন্স-অব-ওয়েলসের তারত আগমনে দেশের সর্বত্র হরতাল পালন, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক খিলাফৎ ও অসহযোগ স্বেচ্ছাসেবকদলের সমাবেশ বে-আইনী ঘোষণা। আর? বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রজন্মের আবির্ভাব। বিদ্রোহের ডঙ্গ। পরাভবের বৈশিষ্ট্যকলোলের 'কলমাযুদ্ধি' শুরুর প্রয়াস। ইতিহাসের নিয়তে এক নতুন সম্ভাবনার রঙ্গির উদ্ভাস।

এমনি সময়ে এলেন তিনি। শুধু তরুণী নিয়ে চোখ ভোলাতে নয়, মহাসাগরের মাঝখানে কূলে হতাশাসের সময়ে এক 'ক্লান্ত পথিক'। একা, স্বচ্ছন্দ, সন্দীহীন। সকলের ভেতরে থেকেও তিনি ঠিক সকলের মত নন। পাঁচার সাথে না মিলিয়ে একা হয়েও তিনি অমনা। কিন্তু এই আবহাওয়ায়, তথাকথিত তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভোরাও নেই, আছে এক সহজ আবেগ, যার সঙ্গে ঘটেছে হৃদয়ের মেল-বন্ধন। সহজের পথ ধরে দুর্বোধ্যকেই পাবার একনা। জীবনে জীবন যোগ করার এক দুর্লভ সাধনা। এঁর গ্রন্থ প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোট-গল্পে এল হাওয়া বদলের পালা।

উনিশশো তিরিশ-একত্রিশের 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় 'শুধু কেরানী' আর 'মোসাফেরী' গল্প দুটিই হেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প যা বাঙলা ছোটগল্পের স্বাদকে নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবং প্রথম লেখাতেই বিস্ময়। এমন ঘটনা অতি অল্পসংখ্যক লেখকের জীবনেই ঘটেছে। এ জন্যে জন্মের জোর চাই। অন্তরে নিষ্ঠা জন্মা চাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র পেয়েছেন অনেক। সবচেয়ে তারও বেশী। কিন্তু সেখা মানেই সেই অভিজ্ঞতা নয়। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনার আড়ালে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অবহেলিত সুখ-দুঃখের হাতে থেকে অজান্তে যে-ঋণ তারই নাম অভিজ্ঞতা। এই সেখা আর অভিজ্ঞতার মিলনে জন্ম নিচ্ছে শিল্প। মহাকালের দরবারে নিরন্তর বিচার চলেছে তাদের। কেউ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে স্বমহিমায় স্বর্গে, সম্মানের সিংহাসনে। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ। এখানে ক্ষমা নেই। পাঠক-মূল্যায়ন এখানে অচল। মহাকালের দোহাই তাই সোনার ফসলই সাজানো থাকে চিরদিন।

উইকলোয়ার তথাকথিত থেকে সাহিত্যিক পত্রের সম্পাদনা, সেখান থেকে চৌনিকের দপ্তর ঘুরে চলচ্চিত্রের রাগরঙ্গিনে

অবতরণ—বিচ্ছেদের শেষ সামলানো ছিল না। তার। আর এই বিচ্ছেদ-অভিজ্ঞতাই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে 'পাঁক' উপন্যাসে, 'মিছিলে'। এত ঘোরাঘুরির ভেতরেও তিনি হারিয়ে যান নি, মিশিয়ে যান নি ভেসে। বরং ঘরে-ঘরে তাঁর অভিজ্ঞতার সোহাগার মিশেছে অনুভবের সোনা। অমন হারিয়ে যাবার সুযোগ এর পেয়েই ছিল, আছেও এখনো। অন্তত অনেকেই তখন শিখলে যাচ্ছেন, পুনরাবর্তন করছেন, তিনি তখন অনুস্বাদশ লিখে আমাদের চমকে দেবার ক্ষমতা রাখেন, সাহস রাখেন। হয়তো এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি একটি একটি মুখ, একটি ধারা। জীবনের যে জটিল ঘূর্ণাবর্তের সাক্ষাৎ মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শীতল গবেষণাগারে ছেলেদের মিছ এক হিসেবে তারই সূর্যসূচি। আবার পরবর্তীকালে মানেই তিনি বিস্তৃতি দিয়েছেন বিরাটের প্রতি, মহতের প্রতি এক তাপ-স্নিগ্ধ পিপাসা জাগিয়ে। যে কারণ কালের ছিসেবে কয়েলোদের হয়েও তিনি সমাজিক। সমাজ সূত্রে থেকেই তিনি পুরুষ। 'বিকৃত কুধার ফাঁদে', 'সাগর সঙ্গমে' আমাদের আসাড়ে, আড়ষ্ট করে, 'হারানো' আকাশ নিষ্ঠুর রহস্যময়তা আমাদের হতচকিত করে। মুখের কোমলতম বৃত্তিগুলির গায়ে গা লাগিয়ে দিবা টিকে আছে মানুষের পাশব প্রবৃত্তিগুলি। আশা আর হতাশা যেন একই সূত্রে গ্রথিত এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে আহত না হয়ে পারি নে।

কিন্তু সুখে-দুঃখে উৎসব, বিষাদ, [illegible] সবটুকু বিষ নির্দ্বিধায় [illegible] করে যিনি নীলকণ্ঠ, [illegible] নিম্নবর্গের জীবনের অন্ধকার [illegible] আহরণের সন্ধানে যিনি [illegible], আসর, ছাপিয়ানি—স্থান-কালে [illegible] মিলিয়ে কী তাঁর ভূমিকা আর [illegible] কোন পর্যায়ে তাঁকে ফেলা যায়? [illegible] সিদ্ধান্তে' মিলে 'অহম' সমালোচনের [illegible] কলাকের যার মুখস্থে-মুখস্থে একদিন [illegible] সিদ্ধান্তই স্থির করে ফেলবেন, সে বিষয়ে [illegible] সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধাতা সম্পর্কে সংশয়ের, সন্দেহের বিরুদ্ধ অস্তিত্ব, কর্তৃত্বিরোধী যে-অনুভূতি প্রবৃত্তির কঠিন পাশে আবদ্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদনায় আর্ত, আহত; মুখের-চেনা ভূমি, কর্ম সংসার ও জীবনের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড়িয়ে যিনি নিজস্ব সাহিত্য, অন্তর্দৃষ্টির শানি-মুক্তির মেধে সুখ-স্বর্গের সন্ধানে তৎপর,—আসলে তিনি কবি। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গেই যেন এঁদের মেজাজ তাঁর আত্মার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর মনে হয়।

আর মন্দ চলনা?

সেখানে তিনি রাজা। তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

কবি-চেতনা তাঁর মনের রোমান্টিক অস্থিরতা ও নস্টালজিয়ার পরিবর্তে এনে দিয়েছে এক সতর্ক, সুসম গভীরতা ও পরিণতিবোধ। রবীন্দ্রনাথের পরে প্রকৃতি-মেধার ক্ষেত্রে কবি তিনিই সেই বিরল সার্থকনামা ব্যক্তির যিনি একাধারে প্রথম শ্রেণীর কবি ও গল্পকার। ঘাস-মাটির নিগূঢ় সবুজ তাঁর গল্পকে এক স্নিগ্ধ কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে। যার প্রভাব পরবর্তী কালের অনেক লেখকের রচনায় প্রচ্ছন্ন অবলম্বনাকারে প্রতিফলিত। এবং এখানেই তাঁর জয়। এরা হয়েও তিনি অনন্য। ভাষা ও ছন্দের সহজ, অনায়াস বাহুল্যে উপকরণ তাঁর আপাত কাব্যময়তা আচ্ছন্ন 'লিপিকার কথা মনে করিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা ভালো যে, 'লিপিকার অন্তর্গত কাহিনীগুলির কবিতা হয়ে ওঠাই মুখ্য। গদ্যের ঢিলে-ঢালা পোশাকে তারা কবিতার আসরেই জমিয়ে বসতে চাইছে সবাই। সেক্ষেত্রে ছোটগল্প বিদ্রের গল্প কবিতার হাত ধরে একেবারে সাবালগো পৌঁছুবার তাগিদে অস্থির। ভাষার তার মোহটা নেই, চোখে নেই ছাঁকাজনত চাহনি। উপমার সাহায্য নিলেই বোধ তাঁর পরিষ্কার হয়ে যায়পারে।

তখন পাখীদের বাঁড় বাঁধার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের ঘিরে ছিল—দুটি নেহাত সাদা-সিধে ছেলে-মেয়ের।

ছেলেটি আর্টস্ অফিসের কেরানী—বছরের পর বছর ধরে বড় বড় বাঁধানো খাতায় মোটা মোটা দলিল জমিয়ে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ মহীর মুখস্থ ভরে মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফিকা জুড়ে কালো আফ্রো জাতের উৎসাহ-হুঙ্কারে সারা বছরের মেঘের আকাশ যেমন করে শিউরে উঠে সে খবর তারা রাখে না। মহাদেবের বিপুল মতবাদের আড়ি একটা ঘোমার ফলের চাষর মুখে ছেলে খাড়া হয়ে [illegible] তারা মনের প্রকাশ দিতে, সে খোঁজ রাখবার দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরানী আর কেরানীর বিশেষী বধূ।

নতুন নাটক প্রকাশিত হয়েছে :

অবতার শচীন ভট্টাচার্য

"অফিস ক্লাবের জন্য নতুন আঙ্গিকে লেখা"। মূল্য ৩·০০

দ্রৌপদী জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেচার ক্লাবের জন্য নতুন আঙ্গিকে লেখা। মূল্য ৩·০০

॥ অন্যান্য অভিনয়যোগ্য নাটক ॥

উৎসর্গ	—	সলিল সেন	৩·৫০
অসময়	—	শচিন্দ্র মজুমদার	৪·৫০
রাজা বদল	—	জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
ছায়া ছায়া আলো	—	দিলীপ মৌলিক	২·৫০
হে মোর পৃথিবী	—	সমর মুখোপাধ্যায়	২·৫০
সমুদ্র সঙ্গম	—	মনোজ বোস	২·০০
প্রতিবাদ	—	-	২·০০

॥ ছোটদের নাটক ॥

রাজনিক	—	সমর [illegible]	১·৫০
কথামালার দেশে	—	শান্তিময় মৈত্র	১·০০
স্বামী বিবেকানন্দ	—	সত্যধাম	১·৫০
আলো জ্বালাও			
আমাদের একাঙ্ক	—		

সম্পাদনায় দিলীপ মৌলিক ও শান্তি চক্রবর্তী

নিউ [illegible]—৩৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

কবিতা নয়, অমৃত কবিতার গল্প। একবার পড়লে কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কিন্তু গল্প। কী নিপুণ সংযমে আর সাবলীলতার সঙ্গে ঘুণির কাঁটা সূক্ষ্মে আটকে থাকা হয়ে গেল বাস্তব কবিতার এক নিখুঁত অমৃত নিষ্কৃতি! সেন-কাকার পরিচিত পাঠচক্রটি 'অমৃতে' এসে বাঁচা কবিতার মেয়াদ হল দুটি সকাল, সাদা-কালো প্রচ্ছদের মাঝখানে। আর একটি ফেরারী আর দেরাদারি বিদেশবাসী বন্ধু। অমৃতময় হয়ে। কবিতার কাছে আর কিছুই চায় না, চোখে না, ছোঁয়া না। আলোকবর্ষেই যারা পরস্পরের পাশে বসে ছোঁয়াচ্ছিল। মন্ত্রে এসে ছোঁয়াচ্ছি হাতে মেয়েটির। ছোঁয়া এখানে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবিল, অমরতায়। কিন্তু মনোময় নিঃস্ব, শান্ত, সুন্দর। কবিতার এখানে আলাদা পথ আলাদা দীপের মত। যার হাত ধরে অমৃতের ঘোরে ঘোরানো নিয়ে আসে—সেখানে হাজার চোখের নিত্য চলা-ফেরা।

তাঁর সঙ্গে গল্পের চরিত্রগুলি যেন এক চলমানতার অধিবাসী। জীবনের কখনো এক বিশেষ সময়-কালের পাঠচক্রিকায় সমাপ্ত করে দেবার প্রয়াস তাঁর নয়। যে-অভিজ্ঞতায় তারাশঙ্করের ছায়ার আলোর মৌলিকী, অথচ যে আবার্তিক প্রত্যভিজ্ঞতায় বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে বিশ্বাস ছিপা যে আন্তর্জাতিকতা অমরা-নক্ষত্রের নিশ্চয়তার প্রমাণ অবলম্বন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে মোটামুটি বলা যায় নিরপেক্ষ। কিন্তু মিত্র, নিখুঁত, নির্মল নিরীক্ষণ এবং তার সহজ অথচ অনন্যসাধারণ পরিণতির প্রতি নিবিড় আস্থাবিশ্বাসই যেন তাঁর গল্পগুলিকে স্বকীয় গঠিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। আলোই বলেছি, এমিক প্রেমে বাস্তিক অন্বেষণাপ্রবণতা-সেই সঙ্গে তাঁর সমবেদনার হাত ভরে হয়। আর হয়েছে অনাবিল হৃদয়।

অমর-অমরাবতীর প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। চিন্তার সঙ্গে স্বপ্নের এমন মেলবন্ধন, মাঝে মাঝে এমন দুর্লভের চমক আর কোথায় পেয়েছি মনে পড়ে না।

মিতভাষণ, বহুবোধ সূক্ষ্ম উপলব্ধনা, নিখুঁত চরিত্রসৃজন ছাড়াও ইন্দ্রজালিকের পাঁচ গল্পের আরেকটি বিশেষ গুণ। ঔপন্যাসিকের ভাষাটা খুঁজিয়ে নিতে চাই।

ঘরের বরফার বাজার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'অত-সন্ধ্যের দরজা বন্ধ করে না বেলুনে? খোলো না, তরফদার পাঁড়াবো?'

স্নান-কলা-পান মিলিয়েই তো গল্প। গল্পের পরিবেশ। ঘটা করে বলা না হলেও কাঁটা মাত্র সন্ধ্যের সমারোহ, একটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই তা স্পষ্ট, প্রখর হয়ে ওঠে। উপরে আলাদা তারই প্রমাণ। অত-সন্ধ্যের দুয়ারের ঘরের দরজা খোলা না রাখাই রীতি। কিন্তু এখানে বন্ধ রাখা অনেকই 'বাড়িউলীর' তীব্র আপত্তি। তার কণ্ঠটি কর্কশ। এবং যার ঘরের দরজা বন্ধ তার নাম বেলুনে। আর যেন বলার প্রয়োজন নেই। এদের অমরা মুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন।

এমন আড়ম্বরহীন অথচ আড়ম্বরাদ্যুত্ত সন্ধের সমস্ত প্রয়োজনই তাঁর গল্পের সহজ গঠিত। টিন-ভিজ ঘরে তৈরী হয়েছে একটি অমরাবতী ভিন্ন-প্রতিষ্ঠা যার কোথাও ছেদের বাহুল্য নেই, চেষ্টা প্রয়োগ নেই কোনখানে। না বলা কথাটিই বড় করার তাগিদে গল্পটি এক আচমকা এসে ছেদ-ঘরে দাঁড়ায়। ছেদের অনুচ্ছন্ত গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও সে তখন বিহ্বল। কী [illegible], তাঁকা, দৃষ্টিময় সেই পরম মুহূর্ত।

ঘণ্টাখানেক কিন্তু সত্যি যেন উপন্যাসের মত ছিন্নে গর্জন করছে। উঠে কোথাও সরে যাবার জন্যও বাসন্তী তাহতে পারে না। প্রলেপন পরিতে সে চাবিটা খেলবার চেষ্টা করে। কিন্তুতেই—আজ কোন দুর্ঘটনাই যে ঘটতে দেওয়া যায় না।'

গল্প এগিয়ে যায়।

একটি অবিস্মরণীয় আলিঙ্গনে ঘটিত 'ছেলেমানুষী আবিষ্কার'। ছেলেমানুষীতার ছিরে যে একদিন যাত্রিণীর আয় থেকে সরে গেল তাও এল, বহু-দিন ব্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর আমে হয় মেয়েটি হয়তো.....কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবান্তর দুরাশায় কল্পনা মাত্র'। নিজের দেহা প্রতিমূর্তিটি আজ তার কাছে অচেনাই, অবান্তর, অন্যায় ঠেকে।

মহানগরের সরল, নিষ্পাপ ছেলেকে কি নিষ্ঠুরের ভয়ই না জীবনের দুর্বলিত জটিলতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন লেখক।

অমর মন্ত্রে বাস্তবতা জীবনের কঠিন-স্বেই বিদ্রূপ করে সিদ্ধির সীমায় পৌঁছতে চায় আরেক ছবি, অমর কথন। 'সংবল' গল্পের উপসংহারে তারই পূর্ণ পরিচয় মেলে, প্রথম মন, তারপর চেয়ে তীব্র, তারপর চেয়ে বড়ীর উপলব্ধির বিশ্বাস ও বিস্ময়ের শূন্যতে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শূন্যতা তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের কি আছের? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।'

তেমনি গল্প 'জন্মদের', 'পোলাবাড়ী পৌঁছের', 'সুযোগ'। —এক-একটি হীরের টুকরো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্লান্তিহীন। মাঝে-মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মত চতুর্দিক ঝলকে দেবার ক্ষমতা এখনো রাখেন। কারো-কারো কেরে বয়স হয়তো দেখার শক্তি বাড়িয়ে দেখার শক্তি কেড়ে নেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেলায় এই আশঙ্কাকে সত্য নয়। নব-নব সৃষ্টির তাগিদে তিনি এখনো অনিবার্য, অক্লান্ত। প্রেমেন্দ্র এখনো আমাদের জীবন্ত বিস্ময়।

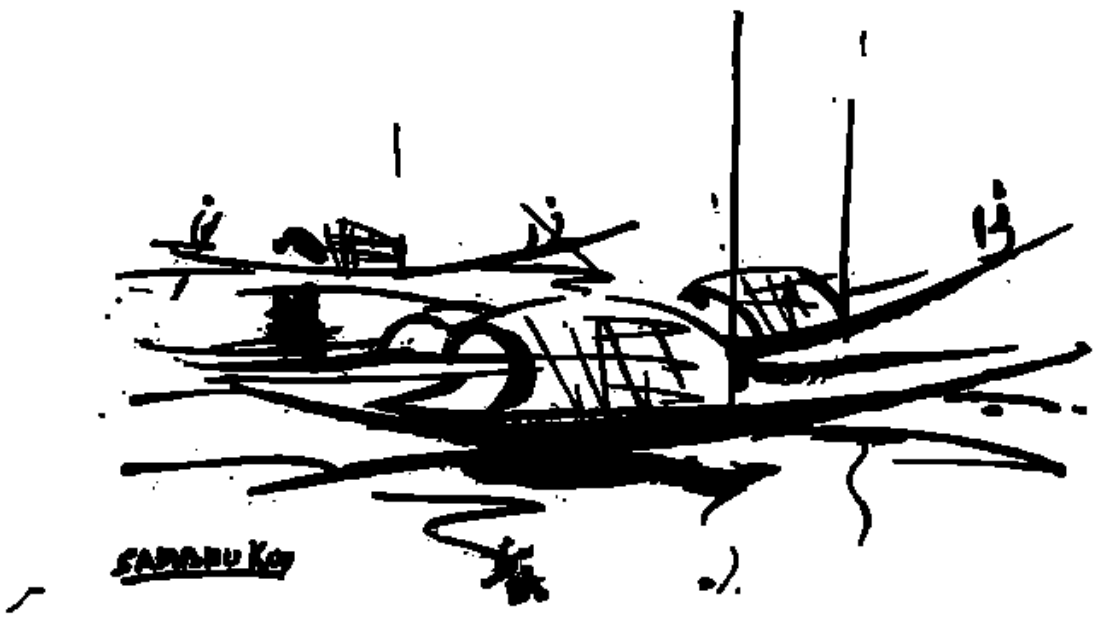

নিবারণের মৃত্যু

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

রেলস্টেশন থেকেই দেখা যায় অতুল-পালের ছোট-বড় পাহাড়ের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ি, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ির চারিদিকে, ফোটা জামরুলগুলা আরও কত কিসের ঝোপ, ঘাস, জঙ্গল। বাড়ির ইটি বেরিয়ে পড়েছে। চোমাদের দেওয়াল স্থানে স্থানে এত ঘরে গেছে যে, কি করে তখন বাড়িতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ির চারিদিকের পাঁচিল প্রায় সবটাই ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অতুলের উঠোন পর্যন্ত দেখা যায়। খোলা-ওঠা উঠোন। তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তার খোলানো, তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, ছিঁড়ে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অতুলের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ভেবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ছেড়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন প্রভাব হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুজে নামতে পারে। এই ঘাটটাই এ পাড়ার খিড়কি, ছোট ছোট পানার তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁড়েও ঘলা হয়।

সকালবেলা। সবে সূর্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের সিঁড়ির ধরে হাতের মুঠো দিয়ে যে কটি ঘাস এখনও অবশিষ্ট সেইগুলি সযত্নে বাছিয়ে করছিল। পাশে একটি আধ-বয়সী স্ত্রীলোক মাথার আধঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে বাড় ছেঁটে নিয়ে নিরাসক্ত বাসন মাজছিল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছিঁড়িয়ে-যাওয়া পাখির কেমন একটা কলরব এসেছে। তারই মিষ্টি ছায়া পাড়ছে নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি ছিপ ছায়া বাড়ি থেকে মন্থর-পদে বেরিয়ে এসে ঘাটের মাথায় মুখে ঢেকে থমকে দাঁড়াল। পারুই বা তার বয়স হবে? কুড়ি-একুশ, কি বাইশ বছর। ছিপছিপে গড়ন, কিন্তু তারও যৌবন যেন আলস্য ভরে পড়েছে। পাশ থেকে লক্ষ্য যৌবন আলস্য হয়ে গেলে লক্ষ্যের যে অবস্থা হয় তেমনি ভেঙে এলিয়ে এসিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই ছোট ছেলের সামনে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কাঁচা ঘাসের মতো কোমল শরীরের মধ্যে কোথায় উবে গেছে। কোমল মুখে ক্লান্তিমাখা এসেছে, মুখে একটুকরো রেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে কিন্তু লাল, মুখের চর্ম লাল। আর তার চুল পরনে ছিন্নভিন্ন হয়ে এসেছে খানিক। এই ওপর মাথার মুখে চুলগুলি বারে বারে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের ভেতরে ভাতি আলোড়ন আনিয়া।

বউটি ঘাটের মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু শুধু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বাড়ি শাশুড়ীর কাল থেকে কোথায় যেন চলে গেছে। আর উঠছে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। মনে করবার এখনই হচ্ছে কি? বলতে গেলে এখনও তো শুরুই হয়নি। এখনও মানুষটার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে। কিন্তু আর বোধ হয় বেশি-ক্ষণ নয়। দুয়ত অন্ত দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো বাঁচবেই, কিংবা বড়-জোর সন্ধ্যায়। তার বেশী নয়। অন্তরে শুরু হয়ে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর...সমস্ত জীবন-ভোর...সমস্ত জীবনভোর...

এর বেশি ভাবুবালা আর ভাবতে পারে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে একত্রবাসের জড়িত বাকি জীবনগুলি সারাদিন চলবে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো জোর নয়। যাকে প্রত্যহ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করছি, তারপরও একটি বিশেষ মুহূর্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—এ কথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা কিম কিম করে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিস্ময়ে উদাসীনতা পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোন মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছিল, ভাবুবালাকে সে লক্ষ্য করেনি। তন্দ্রাগুলো তখন ঘাটের শেষ সিঁড়িতে পৌঁছেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে যেন ভাবুবালাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে একটু সরে বসল। বৃদ্ধাকে মুখটিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু সরে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখীও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু ছেঁট তাকে কোনো দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটে বাসন মাজা নিয়ে কতজনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিনজন একসঙ্গে চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে করে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায় কে সিঁড়ির ওপর চিবোনো ডাঁট ফেলে গেছে; তার পাতের ঝোল ঘাটের কোণে কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে; জলেরও কারুর কি অভাব আছে? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ করে এই বধূটির সঙ্গে ঝিকুতে নয়। ওর সিঁথির সিন্দুর এখনও জ্বলজ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিন্দুর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল সৌরভ আর কিছু পরেই সকল বন্ধনের মিলিয়ে যাবে, তাকে প্রতিযোগিতায় সকল সৌরভ বিলাসের করে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে কখনও আসে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে, অনেক আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভালো লক্ষণ যা ছিল, একটি

একটাই ঘরে সব কিছু হচ্ছে। আলো বলার মতো কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। খোলা উনুন নিজে না। নিজেদের আবাসটা ছেড়ে তার হাত দিয়ে গলাজলের ছলছলানি সরিয়ে ফেলেনি। এই কাদিনের বেদখী-লেখার আর দুর্ভাবনার আর সরদির আবহাওয়া হয়ে ফেরেছিলো কাছাকাছিতে চুড়ি দুখানি চল দেখেছিল। এই দুখানি সরু চুড়ি আর সম্বল। চিকিৎসার আর বেখাঁয়ের পর তার সম্বল শুধু—অবশেষে এই দুখানিতে এসে ঠেকেছে।।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তার তাদের দেব হবে বিরক্তিকর। তাদের বাড়ির ছলে গেল।

জলদুলের দেব। জলে এখনও শীত রয়েছে যেন।

এই জোরার নামলে মাঝিবিকের উচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে- দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অন্যদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মুবালা যেন মেতে গেল। দুঃখে, রোদনীর অন্যদুই আকর্ষণে, পাশুর চোখের অন্তর-দৃষ্টি, নিস্পৃহতার কখনও ঘাবাধাপি, কখনও হিংস্রতা-ভরা পাশুরীর আক্রমণীল বিহনে দৃষ্টি—জয়-জন্তু-আবিষ্কার বিপুলে পাশুরী তার সমস্ত, ভূতীয় নিয়ে এই ছোপনালের সুখেরই নির্জনতায় তালিয়ে গেল।

জন্মুবালা দুখে যোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। সমস্ত রাত জাগরণ করে এখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্নানটা নিয়েছে। এখনই উঠবে বোধ হয়। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত জেগে পাশুরী এ ঘরে এলিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা সম্বলে উঠে পুজোর ঘরটা পাড়াবাড়ীর মারে যেবার জন্যে মেয়ার ঠোক করেছিল। সেটা ঠেক করে নিয়েই দুজনে দুজনে পাড়ার বেরিয়ে গেছে। আবাসীর কাছে কেউ নেই। রোদনীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে এবুধ দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গলা ধরে নিয়ে গেছে, সেইকু গরম করে জাগতে হবে। নইলে দুধার ছেলেটা কাঁদবে। কাল পাশুরীর একাদশী গেছে। তাঁর আহারটার ব্যবস্থা করতে হবে। তার নিজের জন্যে না হলেও, ওদের দুজনের জন্যেও তো দুটো মুখে ভাত তুলিয়ে দিতে হবে। এর একটি মানুষেরই জীবনের ভেল ঘুরিয়ে এসেছে। সে আবে, তার আজকে তারের মেতেও হবে, খাইতেও হবে, সবই করতে হবে।

জন্মুবালার আলস্য নাই। কিন্তু ছোপের ঠাণ্ডা জল আজে আরাম দেয়নুকে। সূর্যটা আলো করছে। উনিশ-কুড়ি [redacted] জন্মুবালা আর পারে না। সে আজও [redacted] ডুবিয়ে এই সুনীতল একাকিত্বে যেন মগ্ন হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর যেন্তার ছাঁস নয়।

যেন্তার ছাঁস না নিজের সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অনেক সুখ-বাঞ্ছিত একাকিত্ব-সম্ভোগের মুহূর্তগুলো। দুটি পাশুরী নারী-মাত্র অনেক অনেকদিন বাঁচিয়েছে কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতদিনের পরমায়ু নিয়ে এসেছে। ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে,—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাতত এই তিনটি প্রাণীর দৈনন্দিন খুরোনো দুটি হাতের অন্ন কে জোগাবে সেই চিন্তা সমস্যা।

কিন্তু জন্মুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধরে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার মেধ-মন যেন মেয়ে, মস্তিষ্কের ভাবনার শক্তি লোপ পেয়েছে। এখন সে বিশ্রাম চায়। একটু; নিশ্চিন্তি।

জোরার নীল জল কলকলে ঠাণ্ডা। উচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলছে আলো-ঝলার খেলা—অবিশ্রান্ত। ছোলে ছোলে কাঁটা পাখী তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কুজন। জন্মুবালার সব ভুল হয়ে যেন.....

সে জোয়ার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে আপন মনে খেলা করতে লাগল।

নিবারণ বন্দ্যবড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিজস্ব বলতে যা কিছু পৃথিবীর আর কোথাও একটুকু চাওলা রেখা যাবে না। সে বেহুদে খবরের কাগজে ছবি, যা লেখা হবে ইনিয়ে বিনিয়ে সংবাদ-বিক্রয় নানারকম প্রশস্তাদি। এক যদি কোনো বড়লোকের মোটর চাপা পড়ে মরতে পারে, কিম্বা পুলিসের গুলীতে, তাহলেও হত। কিন্তু সে মরবে নিতান্ত মামুলি মরণে। দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে অস্থি-চর্মসার হয়ে—আরও ছোটি ছোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর রাখার উৎসাহ বোধ করে! আর কি উৎসাহই বা বোধ করবে? কেউই কি তাকে চেনে? মানব-সভ্যতার তার দাম কি?

নিবারণ [redacted]। হাওড়া থেকে বাণ্ডেল লাইনে সে ট্রেণে ছোটে করে বেড়ান কি কি মতের বিখ্যাত নিজের মানুষের, জন্মপুরের মানসিং গুলীর, নাবকেল ছেলের মসলার, সুগন্ধী দুধ-কাঠির, আর মাথাঘষা, মাথাধোয়া, মাথা জলকরা অমুকদা করার অবার্থ ও একমাত্র ওষুধ মাথালিনের!

তার বয়স পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে বয়স বলা শক্ত।

নিবারণ সাধারণ বাঙালীর চেয়ে লম্বায় চার ইঞ্চি বেশী ছোলা। সে তুলনায় রোগা-রোগা বলেই বড়। আর জলদি নামাতে নামাতে পাল পাড়ার এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাজাঘষা। চোখাল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। সাদের মোছাটা চাপদাড়ি, কিন্তু জলাটা খড়খড়াকার। ছাঁ-মুখ ভোলানো জলদ বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কথা? নিবারণ পাশের গাড়ীতে বসা বলছিল এ গাড়ি থেকে শোনা যায়।

ছেলেটি ওরই মতো একটু; সৌখীন। গায়ে খাকি একটি সিল্ক, সাদা ভাতের পাঞ্জাবী। পায়ের কাপড় মোলায়েম। হাতে ঘিলিমিলি। মাথার চুলে পরিপাটি টেরি। এর সঙ্গে বিলাত না তার জুতো। সমস্তক্ষণে জুতোর অলিও দিতে পারত না, [redacted]ও করতে পারত না। আর সমস্তে [redacted] কৌরকর্মে। কখন-আনারের ঘাঁচিবারও নেই, ফেলা-ফেলেরও নেই। সেই জন্যে মুখমণ্ডল প্রায়ই সমস্ত-ঢাকিত হয়ে থাকে।

মতীর সময়ে যা-হোক দুটি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হত এই যা-হোক দুটির ব্যবস্থা করতেই জন্মুবালাকে উঠতে হত ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিস্তাবিলাসী। উঠতে তার সময় সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে? জন্মুবালা চা নিয়ে এসে কত সাধাসাধনা করে তবে ওঠাত। ভোর মুখে দুজনেই নিবারণ চা-টুকু খেয়ে নিত। তার পরে একটু অবসর কাটিয়ে, উঠে হেলে যেত, একেবারে স্নানের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাইরে বেরে—কি শীত, কি গ্রীষ্ম। স্নান করে এসেই খেতে বসা, তার পরে মতী সাজের ট্রেন ধরতে স্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় জন্মুবালা হাসি-মুখে দুটি পান দিত—প্রত্যহ। এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে পানের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কেন দিন প্রসাদ দেয়, কেনদিন দেয় না।

তারপরে ?

কি সি মতের বিখ্যাত নিজের মানুষ চাই? মানুষ? আপনারা অনেক ঘামি দিশি ও বিলাতি মানুষ ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিজের মানুষও একবার ব্যবহার করে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মানুষে কোন অস্বাস্থ্য কিনিস নেই। এ আমাদের নিজি পাক-প্রণালীতে তৈরি। এতে আছে আমলা হরিতকী, বহেড়া...দাঁত-নড়া, দাঁতে ধরা-পড়া, দাঁতের জোড়া জলকল্ কলা, পাঁচের জোড়া প্রকৃতি মারণীর মন্ত্রোচ্চারণ একদিনেই আরোগ্য হবে। এ আমলের বাকে কথা নয়, মহাশয়গণ, যাঁদের দাঁত হলে হলে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে কথা বলতে সংকোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মানুষ পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি, এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক কৌটার দাম মাত্র দু পয়সা। একসঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। দাঁত মজবুত হয়ে ফেরে নেবেন।

মুখের গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। মাথের দাঁত হলে হলে নড়ে তারও এই ট্রেনে, মুখে [redacted] জল নেই কিন্তু নেই, এমন মহোষধ ব্যবহার করে দেখতে সম্মত হয় না। তবে প্রয়োজন-মত কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

নিবারণ বিখ্যাত মানুষ মাসে পরে আবার একটা নতুন জিনিস তুলে চিৎকার আরম্ভ করে।

জন্মপুরের মানসিং গুলি। চাই মাত্র? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, একটু; বলা করে শুনবেন।

হয়তো কেনো ভদ্রলোক একটু; বিরক্তিভাবেন। ছোপ জলকলে জলাতে উঠে বলেন, বলা না করেও শুনতে পাচ্ছি বলাই, একটু; আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটু ও না নামিয়ে বলে চলে,—মুখস্থ বলার মতো।

—মহারাজা মানসিংহ এই পুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়রা, আপনাদের মেলে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আজে বিলাতি ওষুধের দোকানের ছাপ আর নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন! আমার কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? এতে স্বস্তিশান্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলাব্যথা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টনসিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো পুলির শিশি মাত্র চার আনা। আমার কাছে ছোট নমুনা শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। বার আবশ্যক হবে, চেয়ে নেবেন।

তারপর নারকেল তেলের মলমা। আর পরে মার্কালিন।

সবই পরের পর নিবারণ রোগোপযোগী মতো গড়গড় করে বলে। যাদের ওষুধ, কি বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ বলে যায়। আর নিজের 'অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে নেওয়ার।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধী ওষুধের বেলায়। সেইজন্য এইটে সে সবশেষে বলে। রতিবিলাসও বটে, আরতি-বিলাসও বটে। যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'মদন-গজানন', 'রতি-বিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতিবিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় সে যেন গর্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ওষুধ বিক্রী করে, কিন্তু [illegible] শুধু বলে মহাপুরুষের সুগন্ধী ওষুধ। [illegible] যেন কেউ বাবুদের [illegible] তাদের সাবধান করে দেওয়া [illegible]।

[illegible] 'ষ্টেড মার্কের' কল [illegible] কিরকম হল—চেয়ে চেয়ে দেখে। [illegible]

—যাঁরা [illegible] বাড়ি থাকেন তাঁরা অনেকে [illegible] কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধ [illegible] দৌড় দৌড় করবে, 'আনন্দের' মুখে হাসি [illegible] মুখে নিশি প্রভাত হবে, আর [illegible] ওষুধের জন্য অপেক্ষা করবে। মাদার-গজানন [illegible]। সুগন্ধে [illegible]-হারির কথা মনে পড়বে। নিজে বলে। রতিবিলাস ওষুধ, আরতিবিনাশকারী। ঘটে,—বাঁর [illegible] ওষুধ। এক প্যাকেট মাত্র দুশো টাকা, পাঁচ পয়সার টিকিট [illegible]। একবারেই যাদের চতুর্বর্গ উদ্ধার হবে।' নিবারণ [illegible]-টির হাসি হবে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই ছোক আর যে কারণেই ছোক ওষুধটা বিক্রি হয়ে যেত, মাসে আর তিনিসের চেয়ে কম না।

তবে আরও দু-একজন পাকাচুল লোক থাকেন। ব্যবসা করে এই লাইনে সে করেছে। তাকে তাদের সঙ্গে রসিকতা করতে হয়।

—এই যে বন্ধুবাবু, আবার আপনাকে পরে যে! কলকাতার বন্ধু করেছেন? বেশ, বেশ, বাহোক্, দাসের-গজানন ওষুধ দু'প্যাকেট দিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না!

বন্ধুবাবুর 'না' বলবার উপায় থাকে না। তৎক্ষণাৎ নিবারণ তাঁকে দু প্যাকেট ওষুধ গছিয়ে দিয়েছে।

বন্ধুবাবু কেবল একবার বলেন, দু-প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে আর কথা শোনে। নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয়? কবিরাজের কাছে করেছেন...আবার কবে দেখা হবে...কিরকম! বড়বাবু আছি? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মলমা। আজ শনিবার, জানি কিনা, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই হপ্তাকালের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে।

—ক'প্যাকেট দোব? দুটো? চারটে?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বলেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও কুরোয় নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্য স্পেশাল তৈরি করে রেখে-ছিলাম। বাড়ি নিয়ে যান, যিনি সমঝদার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো করে হাসলে।

প্রতি আদালতে এমনি দু-একজন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বন্ধু। কিন্তু আরও নাম সে জানে না। তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পরিচয় নিয়েছে নতুন করে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্বিঘ্নে। প্রাত-দিনের লেনদেনে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভালো করে চেনবার জন্যে কেনো পক্ষেই কৌতূহল এর চেয়ে বেশি এগোয় নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই। ঘরে মা, স্ত্রী একটা শিশুপুত্র,—আর বাইরে এরা। তার নামের ঝঞ্ঝাট নেই। মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয় নি। যে যা খুশি তাই বলে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু।

এই নামের পৃথিবীতে তার আবিষ্কারের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। বড় নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ শুনলে, কেউ শুনলে না। কেউ জানলো, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের আত্মাভিমানেই এসে মনে একবার বোধহয় অনুভব করলে।

ডাক্তারের খাটে কথা বুলিয়ে অনেকে তো অরাইবে।

ওর মেজ জ্বান লোপ পেয়ে [illegible]। শিশুরই আর যেমন নেই। ছোট মেয়ের মতো আপনজনের জন্য নিজেই খেলাই করছে, খেলাই করছে। সন্ধানের হিসাব নেই।

ডাক্তার-গিন্নি আজ এসে সমস্যে দাসন আলাপ করেন। বন্ধুবালার কাছে এ শব্দ পেণ্ডুলামই না। তাকে এমন নিশ্চিন্তভাবে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ডাক্তার-গিন্নি অবাক হলেন, নিবারণ [illegible] ভালোই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌজা?

নিবারণ কে? নিবারণ কে? বন্ধুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কিন্তুই যেন সে বুঝতে পারেনি এমনি করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তারপরে কিন্তুটির বিষয় বিস্তারিত করে ধীরে ধীরে ফেনা উঠল মাদুর পৃথিবীর ওপর...যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, বোনের চোখের সুমুখে মরে ভাই।

নিষ্ঠুর কঠিন পৃথিবী।

বন্ধুবালার চোখের পলকে আবার ঘনিয়ে এল নিষ্ফল ক্রোধ, ঠোঁটে জাগল নির্যাতিতের অসহায়তা, আর দুই চোখে ভরে উঠল অসীম শূন্যতা।

বন্ধুবালা আবার ভালো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সামনের ঘরা আমড়া গাছের সুকনো ডালে একটা কাক এমন করে ডেকে উঠল যে শুকনোই ভরে ডালপালা শিউরে উঠল।

সেদিন রাত নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মতো সব শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ডাক্তার-গিন্নি চটপট ছেড়ে। ওষুধ মুখে সন্ধ্যেবেলাই নিবারণের ছেলেকে দুটো জোর-জার নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাইরে নিয়েছিলেন। ওঁর ছেলেমেয়েদের বন্ধু-বান্ধবকে অমন অবস্থায় স্বামীকে ছেলে রেখে একলার বাড়ীর সামনে বসতে হয়ে-ছিল, এক টুকরো মাদুরও মুখে দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশিনীরা তাকে জোর করে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাড়ির রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন এক টুকরো মাদুরও তার মুখে গুঁজে দেয়। এ নাকি লক্ষণ।

তখনই বন্ধুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু কথা নিবারণের সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। ঢোক গেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা। সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ চলে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিলুপ্তিরও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই সামান্য। পৌষের জনৈক সন্ধ্যায়ীর মুখে এই ঘটনা শুনে-ছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেকদিন আগের। কিন্তু আমাদের চোখ সেই পর্দা-পড়ুকের বার দিয়ে...চলবার সময় চটার মতো পড়ল নিবারণকে, অনেকদিন পরে।

এই পরিবর্তনশীল জগতের বিলম্বিতের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই

পথ দিয়ে ট্রাকার ট্রেন এসেছে, গেছে। হাজারু হাজার যাত্রী, এইখানে প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে দাঁড়ায় ট্রেনের জন্যে। তেমনি করেও আমায় কেউ মনে পড়ল অনেক বছর পরে। এই পানাগড়ের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় চোখে পড়েছে। কিন্তু দেখে দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের আর্তি এক্সপ্রেসি কোথাও বেজে আছে। ওদিকে চাইলেই এক্সপ্রেসের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

একবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনো একজন লোকের জন্যেও নয়। এবারে দূরে মনে হল মনের চিরন্তন তাগিদের মধ্যে কত বাসনেই নেই। চকিতে সমস্ত মন যেমন উদাস হয়ে গেল।

ট্রেন চলেছে অনেক দূরে।

ট্রাকারপুর...ট্রাকারপুর.....

নতুন লোকেরা যে পানাগড়ের কথা চিরকাল নেই। আবার নতুন জন্ম, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের সব পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তার হল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইউ. পি. এ. ইউ

টি. ডি. সি

বীজের এজেন্ট আবশ্যক

১। সেল এজেন্ট
২। ডিস্ট্রিবিউটর্স
৩। ডীলার্স
৪। সাব-ডীলার্স

সর্বাধুনিক উচ্চফলনক্ষম শ্রেণীসমূহে এবং হাইব্রিডস যথা গম, ধান, ভুট্টা, জওয়ার, বাজরা, পল্‌-খাদ্য, সরাবীন, সরিষা, ডাল, আলু, শাকসব্জী, সুগারবীট, আখ ইত্যাদির দ্রুত বিক্রয়যোগ্য উন্নতমানের বীজের জন্য।

যথার্থ আয়ের জন্য

১৯৬৫-৬৬ টার্গেট ১০ লক্ষ
১৯৬৬-৬৭ টার্গেট ৮০ লক্ষ
১৯৬৭-৬৮ টার্গেট ২০০ লক্ষ
১৯৬৮-৬৯ টার্গেট ৪০০ লক্ষ (প্রত্যাশিত)

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। তরাই অঞ্চলে পন্থনগরের চতুষ্পার্শ্বে এই সুবিখ্যাত বীজসমূহের চাষ হয়—ইহা ভারতের সর্ব-বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বীজ অঞ্চল।
২। ভারতে এইগুলিই একমাত্র বীজ যেগুলি 'অর্থ প্রত্যাবর্তন' গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারে।
৩। ডীলারগণকে বিভিন্নপ্রকার সার, পতঙ্গবিনাশক, আগাছাবিনাশক ইত্যাদির এজেন্সী সংগ্রহ করিতে সহায়তা করা হইবে।
৪। দুষ্প্রাপ্য বীজসমূহ যথা নূতন শ্রেণীর সরাবীন, গঙ্গা-৪ এবং গঙ্গা-৭ ভুট্টা, উচ্চপ্রোটিনবিশিষ্ট খর্বায়তন ভুট্টা এবং প্রকৃত অর্থেই উচ্চফলনক্ষম ডেফসলী খর্বায়তন গম ইত্যাদি ছাড়া হইলে পূর্বতন বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রয় প্রতিনিধিগণকে বণ্টন করা হইবে।
৫। বর্তমানে নিয়োজিত বিক্রয় প্রতিনিধিবৃন্দ তরাই ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের অধীনে কাজ করিতে থাকিবেন—উহা ইউ, পি, এ, ইউ, ন্যাশনাল সীডস কর্পোরেশন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক সাহায্য-প্রদত্ত তরাইয়ের বীজ উৎপাদকগণ ইত্যাদির একটি মিলিত উদ্যোগ।
৬। বিক্রয়কেন্দ্রসমূহের মোট সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ হইবে।
৭। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, সমস্তস্তরের ব্যবসায়ীগণের প্রয়োজনানুগ ইন্সেণ্টিভ কমিশনসহ লোভনীয় সর্তাদি।

সর্তাদির জন্য আবেদন করুন :

ডিরেক্টর সীড প্রোডাকসন

ইউ, পি, এগ্রিকালচারাল ইউনিভারসিটি

পন্থনগর, জিলা নৈনিতাল (ইউ. পি.)

সরোজ রায়চৌধুরী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রবীণ বর্ষীয়ান সাহিত্যসেবী সরোজকুমার রায়চৌধুরী মশাই-এর একটি গল্পের শেষাংশের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হল।... এই পৃথিবীর জন্যতে মানুষের বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পদ্য লিখে হাজার ছেলে এসেছে গেছে। আজও আসছে যাচ্ছে। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে ভক্তির ছড়ো হাতে মনে পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্য। তেমনি করে আমরাও হাতে মনে পড়ল অনেককাল পরে। এই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখে দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতির একটুখানি কোথাও বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্যে হাতে প্রণাম মনে পড়ল।

.....নিবারণের মৃত্যু এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়—ট্রেনের সাধারণ একজন ক্যানভাসার মরলো কি বাঁচল তাতে কারই বা কী যায়-আসে! তুচ্ছ একটি চরিত্রের প্রতি এই যে মমত্ববোধ এটাই এ লিপিকারের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মান বা আর্থিক কৌলিন্য অথবা ঘটনার ঘনঘটার আয়োজন ছাড়া অস্বাভাবিক কোনও মনোবিকলনের মোড় আমদানী না করে অনায়াসে পাঠকের মনের মণিকোঠায় আসন পেতে বসার ক্ষমতাটুকুর যে শিল্পীর আছে সরোজকুমার সেই জাত-শিল্পী। বিভূতিভূষণের 'কানুভক্তর কৃষ্ণদাসের' মতো নিবারণও সাধারণ ফেরিওয়ালা, তবে মৃত্যুও অসাধারণ কিছু নয়—কিন্তু তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চতুষ্পার্শ্বের আলোকপাতে যে নিশ্ছিদ্র তমিস্রা আমরা তা সাধারণ মনে উপলব্ধি অনিবার্যও হয়ে ওঠে। ট্রেন-দুর্ঘটনার লক্ষ্যহীন আঘাতে নিবারণ-বুড়ীর 'হরবোলা ঘাটে গলা ডুবিয়ে মরেই ত' মরেছে!' —তার মনে আজ কোন শোক নেই। কিছুই তার যেমন নেই। ছেলে-মেয়ের ঘর আপন মনে ঘর নিয়ে খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।' চরবালায় এই বোধহীনতাকে যেন মানুষের বাঁচবার চাওয়ার, সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করারই প্রতীক হয়ে পাঠকের মনেও একজন দুঃখানী রেখার ইঙ্গিত করে এসে যায়। অল্প কয়েকটি কথার টানে-বোনা সূক্ষ্ম মায়াজালটির রেখা একদিকে যেমন কাঁচিন বাস্তবকে তাকে তেমনি তাকে মানবমনের স্বভাবসত্য জীবন পিপাসাকে। পানাপুকুরের এই অবজ্ঞার সবুজে ঘন ঘেরে, অবাঞ্ছিনীর অন্তরালের দুঃখান্তরির দুরে ওঠে। বিধবা নির্বাচনের জন্যে সরোজকুমার অপরিচয়ের সুযোগ গ্রহণে বিমুখ। তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলি এই আমাদের আশে-পাশেই রয়েছে। আর কাহিনীর উপাদানও নিতান্ত সহজলভ্যের ব্যাপার। শুধু দেখার এবং দেখানোর গুণেই তা পাঠকের মনে নতুন হয়ে ওঠে।

সামান্য একটুকরো ঘোড়া নিমাইয়ের যে এতো মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে সে কথা কি চরবালার কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল?

এইখানে বিশ্ব সাহিত্যের হ্যামলেটের একটি উক্তি মনে পড়ে : (When Schiller burns a city Shakespeare drops a handkerchief). এটুকুন ভাই। চরবালার দেশত্যাগের জন্য স্বামীগৃহের নির্বাসন ভোগ করে যা বছর পরে ফিরে দেখলে পাড়ার একটিই অন্তরাল বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাত অন্তরঙ্গ করে স্মরণীর ভিটে আসলে পড়ে আসার মানুষে খুঁজতে ছেলের বৌদের-আসবাটুকু নিজেদে খুঁজিয়ে প্রবীণ হোলেছে। তার সর্বস্বী এমনই সুদূরবর্তী যে, ওই সংকটের মধ্যে পড়াশুনো করে মার্টিক পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি হবেছে: সে দুঃখ, বিস্মিত, ক্ষতজ্ঞতায় সে প্রবীভূত: সর্বস্বীকে আর কোনোদিন কষ্ট দেবে দেবে না, এই সংকল্প গ্রহণ করল চরবালা: চলল সুখের নীড় রচনার যৌথপ্রচেষ্টা। অনকাতায় এসে চরবালা স্টেশনারি দোকানে চাকরী নিল আর সর্বস্বী হাসপাতালের নার্স হল। কিন্তু বাইরের সৌন্দর্য ও স্বচ্ছন্দের সুখের ওদের মেই প্রেম আসে আসে অবলুপ্তির দিকে ধেয়ে চলল: অবশেষে আহার যোগ—বন্ধেরও হয়ে দেখা দিলেন। ছোট এক-টুকরো ঘোড়া নিমাইকে কথাবীকে জানিয়ে দিল যে, এ ঘরে বাইরের মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ছুরির সর্বস্বী সেটা প্রথমে গোপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফেটে পড়ল। এই যে অনায়াস পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা এটাই সরোজকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর মার্জিনিক চোখে আমরা ধরতে পারি যখন দেখি যে, হাসপাতালের ডাক্তারদের ঘরেতে চরবালার চিঠি গেল: সকালে ঘুম ভেঙে যখন সে লাইট-হিউটাই জ্বেলে স্বামীর প্রতীক্ষা করছে তখন পত্র মারফৎ জানল যে, সর্বস্বীর বিদ্যালাভে পাঠিয়ে দিতে হবে কেন না দুটির দিন ছুটি নার্সদের হাসপাতালের বাইরে যাওয়া বারণ হয়ে গেছে..... চরবালার কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছিয়ে রইল। চিঠিখানা বারবার পড়লে, কেন তার মন ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপরে সর্বস্বীর বিদ্যালা আর যাওয়া হবে কিনা... তবে যদি তাদের মিলনী না হলে এই মার্মান্তিক বিচ্ছিন্নতার অধিকারী হয় না। এখানে যদি তিনি উপেক্ষা-উদাসীনের ভাষার ছটা ছড়িয়ে পাঠকের মনে চরবালার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন.....

হয়তো তখন আই হোক সিগারেটের টুকরোর মতো বাস্তবধর্মী প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করতে পারতো। তা বোধকরি এই ভারসাম্য, অন্তেরাহিত কোনও এক লেখককে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, লেখার চেয়ে না-লেখা বেশি কঠিন। শুধু এই ছোড়া ছিপ্রহরকে রবীন্দ্র মুখ ভালো করে হাসতে দেখলে। অন্য সময়ে রবীন্দ্রই হলেন। তারপরে উঠে চা তৈরী করতে চলে গেলেন।...

লেখকের কাজ হল পাঠকের মনে গল্পটির প্রভাব বিস্তার করা, পাঠককে নিজের চিন্তার সহযাত্রী করে তোলা। অর্থাৎ অন্যের মনে আলো ফেলে তাকে এমনই সচেতন এবং সক্রিয় করে তোলা যাতে করে সমস্যাকে সে উল্টিয়ে দেখতে পারে এবং বুদ্ধির যা ছিদ্রতর তাতেও সমাধানে উপনীত হবার তাগিদ সে আপনা থেকেই অনুভব করবে। লেখক কোনোকালেই গণিতের মাস্টার নন, তিনি চিত্রকর। এমনভাবেই সে চিত্র তিনি আঁকেন যাতে সমস্যার ঘণ্টালিটি প্রকটিত হয়।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী অনেক জলপরিমিত স্থান পান, তাতেই সেখানে সুখে সচ্ছন্দে নিজে যাবার অসুবিধা হয় না, ঠিকমতোর সুরকে মূর্ছিত করে তুলতে না পারলে সে সৃষ্টি আদৌ নিখুঁত সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে। মানবমনের এই ছবিটার একাধারে কবির ভাব-দৃষ্টি এবং সমাজতাত্ত্বিকের ব্যাপক উপলব্ধি—দুই মূলের সমন্বয়ে গঠিত—সরোজকুমার এই শিল্পীমনের অধিকারকালে বাংলাসাহিত্যে। স্বাধী আদৌ এমন করেছেন, একথা আমি না বললেও ইতি কিছু এসে যায় না' একথা তাঁর। দক্ষিণ, মুক্তি, [illegible] অকালবৃদ্ধ ইতাদি গল্পে উজ্জ্বলভাবে তাসমান।

'বাস্তবেতর' গল্পের মধ্যে যেমন শক্তি-গ্রামের জনচিত্তের প্রকাশ দেখতে পাই তেমন গ্রাম বাংলাদেশে বোধকরি আজও বিদ্যমান। দিল্লী [illegible]নকৌশল কৌতূহলী পাঠককে যখন কৌতুকের শিখরদেশে পৌঁছে দিয়েছে তখনই যদি গল্পের শেষ হত তা হলেও নিশ্চয় ছোটগল্প তৈরী হতে পারত কিন্তু লেখা বিশ্লেষণে সরোজকুমারের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টিই নিরসন হত না—আমরা লেখকে লেখায় কোনও ঘটিয়ালী মিহত ঘাটাইকে দেবতা বানিয়ে দিলেন, তার পা দুইয়ে দিয়ে। তেমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল পা ধোয়ানোর। সকালে যে ঘাটাই লোটা ঘাটকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল—কয়েক মিনিটের মধ্যে সে হয়ে পড়ল অবাধ্য দেবতা। দেবতার জন্যকে উপলব্ধ করে আরও একটি বিষাদে গল্প বানো সাহিত্যে লেখা হয়েছে। পল্লীর সকল গুণে ভীতির [illegible] রহস্যের আকর হলেই অন্যের দৈবর পেয়ে থাকে। ঘাটদেবতার সেই ভাবসুলভ মনোভঙ্গীটি সুন্দরভাবে ধরা।

ঘুঁটির নায়িকা ঘুঁটিকে আমরা ভুলতে পারব না। প্রেমের এমন বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ আমরা, [illegible]। কিন্তু লেখকের মানসিক নিরপেক্ষতা বাস্তবের ছুতোকে [illegible] করার চেষ্টা করে নয় এবং [illegible] জনসাধারণের পেয়েছে। [illegible] একটি সহকার প্রেমের [illegible] মায়া, [illegible] এবং [illegible] মনের ছোটগল্প সম্পর্কেই উজ্জ্বল [illegible] হয় কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমার জন্যই, অনভিজ্ঞ অনুচ্চারী পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাতে পারবে না। কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, সরোজবাবুর লেখায় কি আধুনিকতা আছে? তার জবাবে বলব, না নেই, আধুনিকতার সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে চিরন্তনতার পৌঁছেছেন তিনি।

আজ থেকে চারশ বছরের আগে (১২২৭-এ) 'আবদুল্লা' পাঠকের 'রমানাথের ডায়েরী' লিখে সরোজকুমার ব্যাকরণিক সাহিত্যানুরাগীদের চমকে দিয়েছিলেন। তার আগে মাত্র একটি গল্পই তাঁর ছাপা হয়েছিল 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' নামে এক সাহিত্য সংকলনে। কিন্তু আবদুল্লার মতো ডাকসাইটে আসরের জন্য গল্প লেখার কথা তিনি ভাবতেও সাহস করেন নি! থাক, তাঁর জবাবেই, তাঁর তখনকার মনের অবস্থাটা তুলে ধরি। শুধে পাহাড় উঠাতে পারি, গদা ঘুরোতে পারি। ...কিন্তু গল্প লেখা? ওরে বাবা, ও যে নিজের ফাঁদে নিজেই পা দেয়া। শচীনদাকে (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আবদুল্লার সম্পাদক, [illegible] নাটকার) খোলাখুলিই [illegible] না শচীনদা, এই গল্প-টল্প আমার দ্বারা হবে না। ...কিন্তু দেখা গেল সরোজকুমারের শক্তি সম্পর্কে সম্পাদক শচীন্দ্রনাথের ধারণা ভ্রান্ত! রমানাথের ডায়েরী পড়ে কল্লোলের সম্পাদক শৈলেন দাস দৌড়ে এলেন শচীন-দাদুর কাছে, সরোজবাবুর ঠিকানা চাই ইত্যাদি...। সেই [illegible] হয়ের দাদা। ১৯০৩-এর সিদ্ধু, ১৯৪১-এর উন্মেষকারী তরুণ লেখাটী সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সমাজকে যা দিয়েছেন তার পরিমাণ [illegible] থাক।

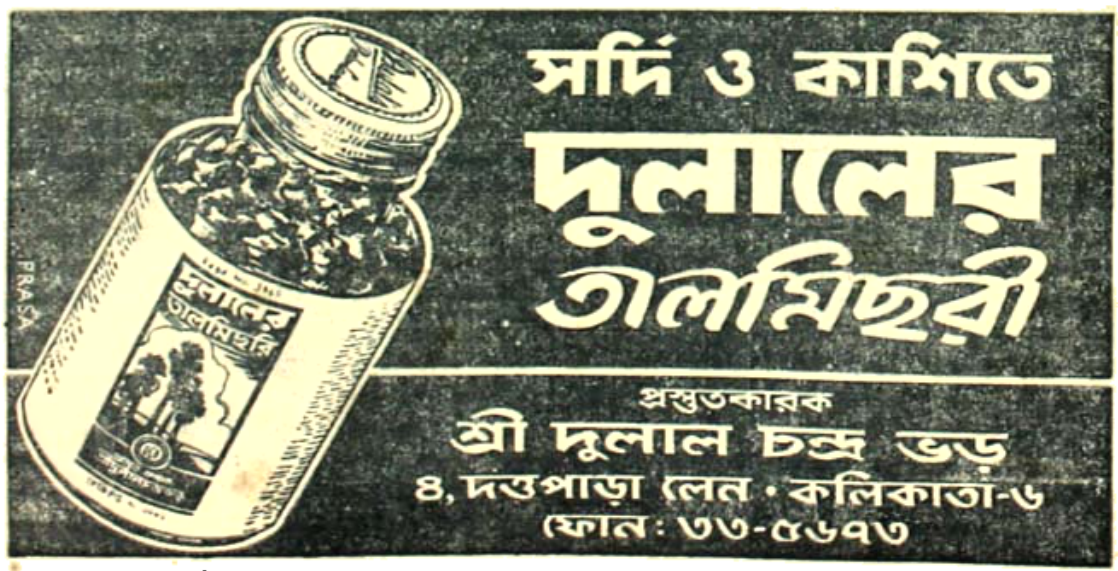

ঢুকলি কাঁটা

অন্নদাশঙ্কর রায়

সেই সব সুন্দর ছেলেমানুষি দিন কোথায়, যাদের ছিঁড়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল। মাঝে মাঝে তাদি আমি অনুভব করি।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। সৌম্যদর্শন সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ দৃষ্টি জ্বলে লালিত্য, চাঁদের পিছনে যেমন রাহু, তেমনি চাঁদপানা ছেলেটার পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূল ইশারাইঙ্গিতে সুকুমার পেত আঘাত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা স্নেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের ভার ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিরস্ত্র ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে, তার একটু হলে হাতটা যেত। আর জন্মে কার ছুরি সেই [illegible]

[illegible] তাকে একা [illegible] পেলুম। সেদিনই [illegible] ছেলেরা হল্লা [illegible] হাসতে [illegible] কিন্তু তারা আমাদের সে পাত্র [illegible] যে আমার প্রকৃত পরিচয় [illegible] থেকে আমার চোখে জল [illegible] করে তাই রাতের বাড়ির [illegible]। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। [illegible] একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুই [illegible] বাড়ি অতবার আসিস নে খোকন।'

তখন ঠিক [illegible] কি কেন এত মুচড়ো। পরে [illegible] মুচড়োর নয়। সুকুর বাবা মফস্বলে [illegible] সঙ্গে তার ঠাকুরমা'ও বরাবর [illegible] আর [illegible] সেই সময় [illegible] থেকে [illegible] আসতেন। এইভাবে সুকুর বাবা কাছে [illegible]। তার বাবা যখন বিদেশে, মার কথা ধরা দিতেন না, ঠাকুরমার কাহিনী ফিরিয়ে [illegible]। মাকে দিতেন বাবা। মেজো ছেলে সুকুর ভাই-বোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে, লুকিয়ে কাঁদত। [illegible] যা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের [illegible] বাক্স-বিছানা নিয়ে সটান সটান [illegible] দারোগার দারোগার দাঁড়াতেন। বাজারের লোক জড়ো হত তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।' তা শুনে কি বলত, আর একটা দিন থেকে যাও, মা।' সেদিনকার মতো যা যাওয়া হলফুলী রাখতেন। প্রতি মাসেই এই আসায়। সুকুদেরই সমান বয়সী, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে, গাড়ি [illegible] সেদিনও হলেন না. দুনিয়ার লোকের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেলস্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাই-বোন কোনকালের তার সাথী হল না, কিন্তু সবচেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। ফাজলটা সুকুর বাবাকে ফরলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁটে মাথার চৌপর পরে খেয়া তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মার কানে পৌঁছল তিনি কুয়োর জল দিতে গেলেন। তিনি তাঁকে ধরে এনে ঘরে তুলে [illegible] তখন থেকে তিনি নজরবন্দী।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। দিঘলদুয়ার হাটের তিন দিকে নদী। যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা ঝুলিয়ে বসে, মা ফেলে দেয়। কত নৌকা স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনটাতে চালের বস্তা, কোনটাতে মাটির হাঁড়ি-কলসী, কোনটাতে শুধো মাঝিমাল্লা। ঘাটের চার কোণে মাকাল ফল দুলছে, ঘাটের ডিঙ্গি ডাঙ্গা দুটো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে রঙ্গ রকম লেখা। মফস্বলের কত রকম মত। নৌকোও তার প্রমাণ। ছেলে-ভোলানো ডিঙ্গি, ঘাটোয়ালের ডাঙ্গা, ঘরকন্নার বোট, আরো কত কী। ঘাটের গ্রাম নদী, নদীর গ্রাম নৌকো, নৌকোর গ্রাম মাটি, মাটির গ্রাম গান। সুকু একমনে গান শোনে আর সুদূরে ঘুরে ঘুরে সারা। এরেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা দেখে ফিরছিল মেলা দেখতে। মফস্বলশহরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েত বৈষ্ণবরা নয়, শিবাইত বৈষ্ণবরাও আসে। মেলা বিশাল ক্ষেত্র, জমায়েত হয় আউল-বাউল সহজিয়ারও। এক দল কীর্তনিয়া গান করতে করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। ছেলের পিছু নে বলবার লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা পাতল। সেখানে ছোলা ভেজে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। ফুটলো ফুটতে ফলল ফলার ছোড়-ছোলকা। বলতে ভুলে গেছি ফলার কর্তা তিনি তিনি সুকুর কে, নাতী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ভয় পেয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান নন। তাঁর বলার সুকুর মার নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। হুসেন-শা-ও আছে, আবার জন্ দা-ও আছে। সুকু ভয় পেয়েছিল ওরা সবাই হিন্দু। তাই আমার সম্বন্ধে [illegible] ভয়ের জন্যে [illegible] পাশের সমস্ত 'পাকি' কথাটা [illegible] একটু খটকা লেগেছিল।

হরিদাসীর [illegible] ঘরে ঘরে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর হবে'। এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত। এতদিনে স্বাদ ফিরল। সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ খেলা করল। সেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সাগর। কানে ভেসে আসছে হরিবাসরীর কণ্ঠসঙ্গীত—

১২ [illegible] [illegible] [illegible]

নারীকে অবলম্বন করে রামাতেরে পৌঁছান যায়। কিন্তু সে নারীর সন্ধান পাওয়া চাই। সুকু একজনের সন্ধান পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে খায়-দায়। গান-বাজনা, লেখা-পড়া করে। ওকে মোকো বাইতে, সমুদ্রে গাড়ী চালাতে, ঘর বাইতে দেখা যেতে। ওর বাবা সন্ধানী বাড়ি। তাঁর বাবা ব্রেক। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে, ইতিমধ্যে তাঁর ছেলেকে বলেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি গড়বো আবার বাপের বাড়ী যান তবে আর একবার চোখা পরার মতো বল, বল নেই। সুকুকে বলেন, 'ওটাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে দেখছি।' কিন্তু এতো করেই তাদের সুকু তাঁর সম্পর্কের কোনো সালাবিত্ত। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে অন্তরে পাঠান।

মজন্ত কাজির এই পুত্র। গরের তাঁর ও সুকুর প্রস্তুতি ঘটকটা এই রকম—

বাবা, তোমাকে জন্ম দোল। যদি সত্যের পিছনে ঘুরে থাক তবে আমার জন্যে আইনো না। আমি তোমার সত্যের নালায় নিতে পারব।'

'আমি চোখের জলে জন্মেছি। কাঁদতে কি ভালই?'

'সারা জন্ম কাঁদতে রাজী আছ?'

'আছি।'

'অন্ধকার ঘুরবে না?'

'না, ঘুরবে।'

'তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে দাওয়ার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুঃখ দেয় নিয়ো। কিন্তুতেই 'না' বোলো না। তার হলফনামা জন্ত নেই। তোমার বলি, কাঁদতে জন্ম নেল যে মৌর বাঁচতে জন্ম নেল।'

সুকু সেই যে খেলা করল তার পরে [illegible] ফিকা ছিল না। তার পুরুষত্বের সেই- [illegible] হল। কিন্তু [illegible] তাকে [illegible] হল, সে পরীক্ষা মাত্র এক- [illegible] সে একজন তার নায়িকা। তার- [illegible] পাঁচজন ঘটিয়ে জেন, [illegible] এর বেশী জানিনে। [illegible] মুখে শোনা, লোকের কথা আমি [illegible], যদিও লাটিন আমার প্রথম [illegible] কথাই ভগবান-এর কথা।

একবার [illegible] এসে পড়ল সুকু নিরুদ্দেশ। [illegible] সারী খোশমী ওকে [illegible] মেয়ে। [illegible] নাকি প্রথমে ছিল [illegible] বৌ। [illegible] বিক্রয় হয়। [illegible] মেয়েকে [illegible] হয়, সেখানে [illegible] মেয়েদের চলাচল-চলন হয়। বৈকালিক [illegible] হলে সেদিন ছিল সারী তার ছিপ-নাড়ী [illegible] করে। তারপর থেকে সন্ধের [illegible] সে তুলিয়ে নিয়ে যায়। [illegible] বিক্রি করে দেয়। গুণের কথা সে পরিচয় পাবে অনাধারণ। গান দিয়েই শুরু করছি।

মেয়েদের অভিভাবকেরা অনুরূপ হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। 'ওকে জানলা জমি বিঁধ করে বৈকালী একদিন নির্যোজিত হয়। তার লালে সুকুও। সুকুর বাবা থানা-পুলিশ করেন, কাজের বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তাঁর মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, 'খোকন, তুমি তো পাস [illegible] বলে, [illegible] পেলেই আমার ছেলেটিকে [illegible] ফিরে [illegible]। ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—'

তিনি বাবা ছেড়ে [illegible] রুমালে চোখ মুছলেন। সুকুর মা বললেন, যে ছেলে মার সঙ্গে [illegible] করবালী হয় সে কি [illegible] ছেলে! আমার জন বলে সুকু আমার কোন [illegible] করে নি। ওর সঙ্গেই সং। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!'

চার

পরবর্তীকালে সুকুর মুখে [illegible] বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, সেইজন্যে মনে মনে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোন-দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোন ভুলচুক থাকে, [illegible] জানাবে।

ওর নাম সারী, তাই ও সুকুকে সুকু বলে ডাকত। সুকু দেখতে সুন্দর, সারী ছেলে নয়। কিন্তু সারী ছেলের থাকী, সুকু মেয়েমানুষ বটে। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দী বলতে শিখেছিল, জাহাজের সঙ্গে মিশে দু-চারটে ইংরেজী বুকনিও। হিন্দী ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠস্থ করত। এমন একটি নাবিকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও সুকুর মতো দুজন দুজনের প্রেমে [illegible] যে ঘর গানের সুরে গান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো অনেক অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই যৌথিক। এদের কথা বলে সারী তাদের তোলাত। মানে বলে সর্বনাশ সেটা অভিপ্রেতিত। এমন কি সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল অভিধানাতীত। কারো কারো লালসা ছিল নারীর [illegible]। ধরাশ লোলুপের দল অভিযুক্তাকে [illegible] রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া ভাঁটিতে সহজ ছেড়ে যেতে হয়! সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাতে রেখে বলল, 'একদিন মাত্র সঙ্গে পেয়েছি, আজ তোর সঙ্গে যাব।'

সারী [illegible] কি হবে, যা।'

সুকু [illegible] তাকে [illegible] ভালো-বাসতুম তেমনও [illegible]।'

সারী হাসিমুখে বলল, 'বেসেনি?'

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'সত্যি! তেমনি জানে কি তেমনি?'

'তবে তেমনি?' সারী বলল আবার।

'একটি,' বলে সুকু ঘুরিয়ে দিল।

জেনারেলের বই!

॥ সাহিত্য ও সমালোচনা ॥

॥ সোরেন্দ্রলাল মজুমদার ॥
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ৮·০০

॥ শচীন্দ্রনাথ বসু ॥
[illegible] কবি [illegible] ৮·০০

॥ সুধাময় মুখোপাধ্যায় ॥
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচারের [illegible] ৫·০০

॥ ডঃ অসিতকুমার ভৌম ॥
বাংলা গল্পের ইতিহাস ১০·০০

॥ ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥
এক বিস্মৃত বিপ্লবীদল ৬·০০
(কয়েকটি কবু পরিচয়)

॥ হিরণ্ময় চৌধুরী ॥
বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা ৬·০০

॥ সরোজকুমার বসু ॥
রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতা ২·০০

॥ অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥
কবি ভারতচন্দ্র ৩·০০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

॥ শৈলেন মুখোপাধ্যায় ॥
[illegible] [illegible] [illegible] ৬·০০
[illegible] [illegible] [illegible] ৬·০০
(একটি [illegible])

॥ চিত্তরঞ্জন [illegible] ॥
বাংলা [illegible] [illegible] উপন্যাস
[illegible] ও [illegible] ৫·০০

॥ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible]
উপন্যাস ৬·০০

॥ অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥
[illegible] ৩·০০

[illegible] [illegible] ও [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] [illegible] ৪·০০

॥ হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥
[illegible] [illegible] ১·৫০

॥ [illegible] ॥
[illegible] [illegible] ৪·০০

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

॥ শ্রীমতী [illegible] ॥
[illegible] ৪·০০

॥ শ্রীমতী [illegible] ॥
[illegible] ৪·০০

॥ [illegible] ॥
[illegible] (১ম) ৬·০০
(২য়) ১২·০০

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

জেনারেল বুকস্
[illegible] [illegible] [illegible]-১২

তখন ছোরা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

আশা তরু ফলিবেরে বাসনা,
সে আশা ত্রিদল নিরাশা,
মনের আশা।

ও সজনী, তোর মনে কি এই সব ছিল?

তারপরে দুজন বাড়তে পড়ে বেরিয়ে পড়ল। সারীর এক সই ছিল বিনোদা মোগিনী। তাদের তার বাড়ী। সারী ও সুকু সেইখানেই নাড়ু বাঁধল।

বিনোদা বলে, সই, তোর সঙ্গে কি ওকে বামনে! ও যে তোর ছোট জাইয়ের বয়সী।

সারী বলে, তোমারও ছিল মোগিনীর ছোট জাইয়ের বয়সী। আরো আরো ছোট ছেলের মতন।

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, যা হয়। ওর সঙ্গে তার তুলনা!

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, যা বলেছিস। তোর মরের সঙ্গে আমার মরের তুলনা!

আসলে সারীর বয়স অত বেশী নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। যিনির হাতে কী ছিল তা বিদ্যুৎবেগে পরে খোলা গেল, সে ছেড়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কাঁড়ি-বদল করেছে।

সারী অবশ্য এ প্রসঙ্গে কথা তুলল না। ফলে বিনোদার আগ্রহ দিন দিন ঢিল হয়ে এল। একদিন সুকু-সারী নাড়ু ছেড়ে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক গ্রহবেরের বাড়ী। আগেই সম্বন্ধে সুকুর বাধা-নিষেধ ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রইবে যায়, সুকু কটিকাঠের আশ্রয়ে থাকে।

গ্রহবের আদি সজন। তাঁর ওখানে যারা এসে তারাও লোক ভালো, কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সমঝে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইছে দেখলে চোখা চোখা বাণ ছুঁড়ত।

তখন সুকুই অনুনয় করল, চল, আমরা এখান থেকে যাই।

সারী অভিমানের সুরে বলল, কেন? আমি কি তোকে বলেছি?

না, তুই বলবি কেন? আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো!

কিসের টান? তোমার না মনুষ্যের!' এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে কিন্তু প্রতিবারে স্বীকার করে যে সে সুখের। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা বহু গ্রাম ঘুরল, ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এসে ফুরিয়ে। তার ও ঘুরে যায় কিছু চাও না, পাও না, নিলে সুকুদের চাহিদাই আলাদা, অন্যান্য কারিগরের। সারী মোগিনী মানুষ, হাতে কিম্বা মেলার সেলাই তার কিছু পড়ে হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, চল আমরা শহরে যাই।'

সুকু বলে, 'শহরে!' বলতে পারে না যে শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বাস-পরিচয় খুঁজবে, পরিচয় দিলে কেউ-না-কেউ চিনবে সে কাদের কুলাঙ্গারক।

পাঁচ

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো তাদের সেখানে ট্রেটম বা এজমালি চলে। ট্রেটম-ওয়ালারা পাশ্চাত্য ঘোলাদ।

ট্রেটম পাড়ার একধারে সদ্য জমাবাধানা। জমাবেতি পশ্চাদ্ভিক্ষিসাব বড় না পারলেও তাদেরকে এস্তার গান-বাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু-এক পরে যখন পশমের ফ্যেসাদের চাকরি খালি হল তখন তিনি সাগ্রহিকভাবে সুকুকেই বহাল করলেন।

সকুল সাবাধিনের মাত্র হল ট্রেটমের ঘোড়া, চকচকে গরু ও বাবুদের কুকুরের জন্য পরিচ্ছন্ন করে ওখুদ লাগানো ও বাদেন্তের বাঁধা। ফোকিদের কল্যাণে ছিপকারে তার জন আলাপালা হলে গ্রাম পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ী খান থেকে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় সঙ্গের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাদারবাবুর খেলার সুকুল এল। তার ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিয়ে, কিন্তু সুকু হয়ে একা যায়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গান-বাজনার ধার। সুকুর কাছে কান মাথার কথা শিখে তিনি দেখলেন সে অনাড়ি। তাঁর একটি গানা থেকে বসেছিল, সুতরাং একদিন সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে ট্রেটম-ওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল খোলে রাখবার আশ্বাস। তাতে কোন ফল হল না, তাদের সুকুর না ছিল যোগাড়া, না অভিজ্ঞতা, না মুখুস্থির জোর। যা ছিল তা সুরেলা। তখন ট্রেটম-ওয়ালারা বলল, আমরাই চালা করে তোমাকে যাওয়াব, তুমি আমাদের গান শেখি শোনাবে।

এতদিন দেখা গেল সুকু ট্রেটম পাড়ের সজ্জাহারক হয়েছে। তারা সজ্জাদের ছাড়ি ফেল ঘুচি খোলাদ ছেলে ধরলী প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিত বর্ণিত জনগণ। সুকু মুখে গান গায় না, গান বরিয়ে দেয়। ছড়িদার আসরের ঐকতান সম্পাদনে পক্ষী মুখের হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তারপর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঙ্গে দেয় আদায় পয়সা অমল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু ট্রেটম পাড়ার সজ্জাকার হবার পরে সে এক দুঃ দুঃখাত হল যে, ছিপ-পাঁড়ুলি গ্রামের দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে-ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল, বাবা এলেন না, মামী এলেন তাকে নিতে।

মামা এলেই শহরের সম্মানদাতাদের বাড়ী ফেরা বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। সম্মানদাতা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! ভেদে-মানুষ নিয়ে কোনদিন তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কারুর কথা শুনল না। ভালো ছেলে হল না। তিনি অনেক ঘরে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার ফলে সুকুকে কূলের আশ্বাসে পড়তে হল।

সারীর বড় পরনার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খোরাই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু মেকে মেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, যাবার বাসী বলে ঝিমুখে লাগে।

মনের প্রসঙ্গ ঘিরে বুকের বেদনা কেটে যায়। দিন কাটে।

একদিন ট্রেটম-ওয়ালাদের ঝিক থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে একথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসার কিছু তার মনে একটা খটকা বাজল। সে উঁকি দিয়ে দেখল ভিতর থেকে খাড়া বন্ধ। ডাকল, সারী, ও সারী!'

মিনিট পাঁচ-সাত অপেক্ষা করার পর খার খুলে গেল বোধার সারী! সারীর হাবভাব দেখে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং মোবটার মুখ দেখে মনে হল সে ঘরে চলে গেল। চলন্তী ছেলেটি মস মোটাই। সুকু ভেবে পড়ল। তার মনে হল সে ঘরে যাবে, বাইরে

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলিতে—
স্নো ভিউ হোটেল
দার্জিলিং-এ
আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে
(ফোন দার্জিলিং ৪০)

না। মন্ত্রের মতো তাহলেন শব্দ ঝরছে ঠোঁট থেকে। একটি ছাত্র হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। ঠকঠক করে দাঁতে দাঁত লেগে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, কিন্তু সারীর সে দিকে খেয়াল নেই। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। সুকুদের একজনের চোখে ঘুম নেই, আরেক জনের দৃষ্টি নেই। মুখে মুখোশ এঁটেছে সুকুদের। নিশ্চল, নিস্তব্ধ।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল, তাহলে এখন তুমি কী করবে?

সারী তাকে এই প্রথম তুমি বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'ঘরে ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?'

সুকু হেসে বলল, 'যেখানে তুমি সেইখানেই আমার ঘরবাড়ী।'

'কিন্তু সেখানে না? আমি যে বেলা।'

'তুমি যে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী কী হো জানতে চাইলে।'

'আমি কে?'

'তুমি রাধা।'

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ছেড়ে পড়বার পালা তার। সে এমন কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনো তার গলায় দুলছিল একছড়া সোনার হার, সযত্নরক্ষিত।

তাদের চাল বাড়ল। কিন্তু সারীর মুখে যে সব কথা ফুটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পায়ে মুখ লেখানো যায় হয়। কিন্তু নিষ্ফল। ঠোঁটপাতার ঠোঁটকাটি সে ধারে ধারে না, ছোটলোকের বুদ্ধিকে। রাধা সেরে নেয়।

এমন করে তাদের বেশী দিন চলে না। দৈবক্রমে সে সময়ে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে ছিল রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিচিত্র শব্দের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুকে উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার সাত-আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তারপর সে সব রেকর্ড ইওরোপে ফনোগ্রাফে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সারীর সঙ্গীতকে নিখরচায় অমরতা আনতে।

সারী এল, তার গান রেকর্ড হল। সে সব গানের আসরটাই আলো হল। সাহেবের মার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইএ বিক্রি হয় না। সারীর কপালে জুটল সাহেব গ্রাহকেরই সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড ভরিয়ে সারী অমরাত্মা হল। তখন তাকে পাস টাইমে আনতে হল অন্য-ভাষায়। বলাবাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তারপরে সারী পড়ল এক ফিল্ম-ব্যবসায়ীর সুনজরে। তার মুখের চেহারায় ছিল না, কিন্তু মনের চেহারাই ছিল। ভালো করে মেক-আপ করলে তাকে চোখধাঁধানো দেখায়। তার ছিল দেখতে যার তাকে সে এনতে লোকন বলে ভুল করে। সে সুযোগ সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টরের হাতে পরামর্শ দিলেন ফিল্ম-গান নিখতে। লোকসঙ্গীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কণ্ঠের ঢঙ্গে সে যাদের নাম করল। ধীরে ধীরে সারী হয়ে উঠল জনপ্রিয়। চার-পাঁচ বছর পরে তাকে দেখে কিন্তু কেউ বলতে না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে একদিন সুকুদলের সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ জানল না, কারণ সারীর আর তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার অনেক মাস পরে আমি ঢুকে ছেড়ে দিয়েছি। চোখে ভালোক দিই। চোখে একটিও বাড়ি বাকি নেই। বয়স অনেক বেড়েছে বলে আমি প্রায় হয়ে ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় একটা সাহেবি কায়দা ছেড়ে কে যেন আমাকে ডাক দিল, 'খোকা? খোকা না?' আমি পিছনে ফিরে দেখি সুকু।

ওর সঙ্গে দেখা। মাথায় মাঝখানে সিঁথে লম্বা লম্বা চুল, মুখে একগাল দাড়িগোঁফ, গলায় একটা 'কালো কালের কি ধলো কালের মালা'। কিউটার চেহারা হলেছিল ছেলের হাতে মোয়ার। হাতে একটা এক-তারা যা আনন্দলহরী ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান ধরেছিল একটু আগে—

'প্রেম করো যদি ছেলের মতো ছেলে।
প্রেম করা কি তখার কথা রে যদু
ধরো ছিনে।'

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু ফুকরা থেকে থামল। প্রেম জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? জামা ফিলছে না?'

আমি বললুম, 'তবে যাত্র যে আমার জন্মে জামা ফাটবে?'

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল কাপড়-কাচার। বাঁধা আমার টিকিট ফেরেন্ড ক্লাসের। স্বভাব বাক্য ফেরে বলল, 'ও সারী। একবারে খুলবে?'

সারীর কথা সারীর স্বামী শুনতে পেলেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটু জল করতে হবে এর জন্যে। আমার বন্ধুবান্ধু।'

ওঁদেরকের মুখে শুনলুম, হাতে ডিটেক-টিভ লেগেছে। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি সুট। অনুসন্ধিৎসার পরশেও হোটে উঠবার বন্দোবস্ত হোটেল পাইনি। তাঁরা বোধ হয় সারীর উপোস করেছিলেন।

সে রাত্রে ঘরে ফেরা হল না। আমি উপরের বার্থে সলাকোচে নিদ্রার চেষ্টা করে পড়ে রইলুম। কিন্তুতেই ঘুম আসে না। ছোটবেলা আমাদের স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে আমাদের সাজানীর কথাটে করতে করতে তার কাহিনী শুনলুম। বাকীটুকু বলেছে ও বাড়িতে।

হাওড়ার শেষ দেখা বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোর সৌন্দর্যে বিশ্বাসী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিল, 'ও যে রাধা।'

অন্নদাশঙ্কর রায়

ক্ষিতিশ আচার্য

আজকের দিনে যখন শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীর কোনো নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে ধরতে পারা যায় না সেই সময় সাধারণ মানুষ হলেও এমন লেখকের ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে সত্য ও সুন্দরের বিষয় যার মধ্যে শিল্পকর্ম ও শিল্পীব্যক্তিত্বের নিবিড় প্রকাশ ঘটেছে।

শিল্পিব্যক্তি বোঝাতে গেলে প্রথম যাঁর আলোচনা করা উচিত তিনি সাহিত্যসম্রাট এমন একটি বিতর্ক বহুদিনের। সে হিসেবে অন্নদাশঙ্করকে জীবনশিল্পী আখ্যা দিতে দ্বিধা নেই। শিল্পকর্মকে আরাধনার আসনে বসাই বুদ্ধির মতন নিছক একটি বুদ্ধিকল্প করেন না। শিল্প যাঁর কাছে জীবনধর্ম, তাই তিনি আর্টিস্ট।

এই ধারার লেখকেরা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ বা বহির্মুখ দর্শন। বহির্মুখ পরিবেশ তাঁদের সাধারণত প্রভাবিত করে না। ফলে তাঁদের নিজস্ব একটি সাহিত্যজগৎ গড়ে ওঠে — ভিতর-দর্পনের-প্রতিফলন। পরিণামে এই লেখকসম্প্রদায় চিহ্নায়িত অর্থাৎ হয়ে ওঠেন না। সেজন্য অন্নদাশঙ্করকে তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মনে হয়েছে না, জীবনের পথে পথে যেমন অনন্য চেতনার বিকাশ হয়েছে, তাঁরই সেই সব অনন্য-উপলব্ধিকেই তাঁর পাঠকসমাজে পরিবেশন করে আসছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁদের গ্রহণ করেছেন।

রাঁচির বিশ্বসাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের যে নিজস্ব একটি স্থান রয়েছে এ সম্পর্কে নতুন করে বলতে যাওয়াও একটা ধৃষ্টতা। তথাপিও শিল্পকলার আলোচনাই তিনি সর্বশিক্ষিত হতে পারেন নি।

মনে রাখতে হবে অন্নদাশঙ্কর সাহিত্যে-রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের একনিষ্ঠ শিষ্য, যদিও তিনি কালের-চেতনাকেই অন্নদার উপরে মনে করেন। সেকালের লক্ষণীয় ধারা শিল্পকর্ম —কী-পরিবেশন, কী পরিবেশনার অথবা প্রয়োজনের কথা-সাহিত্যিক মনে আগ্রহী-তা নেই। সমকালের প্রতিই তাঁর আনুগত্য অধিক।

২

অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসে হোল্ড টাইমার। যেখে তাঁর মনে যত অন্ন-বন্যাবাদ জন্মেই তিনি খাটি টাইম ছোটোগল্পের কাছ করেছেন। আমার বিশ্বাস উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রেই শিল্পীর উপযোগী ছোটো-গল্পগুলি তাঁর মনের সঙ্গে থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ফসল। নতুন তাঁর গল্পের বুদ্ধিকে এখনো একেবারে হয়ে গল্পও জমেনি কেন?

অন্নদাশঙ্করের প্রথম ছোটোগল্প বহুদিন রচিত হয়েছে ১৯২১-এ সম্ভবে। ইংরেজি থেকে ফিরে লিখলেন 'মালিকাবধূ' ১৯৩০-এ। ১৯৩০-৩৪-এ রচিত সাতটি ছোটোগল্প নিয়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'প্রকৃতির পরিহাস'। নজরবন্দী, মাধা মিটির ঘেরা, উপযাচিকা, স্ত্রীর চিঠি, পুরস্কার, বিভীষিকা ও দুঃশাসন। এই সাতটি গল্পের মধ্যে স্থিতীয় সংস্করণে বুদ্ধ হয়েছে পুরোহিত এবং ১৯১ প্রবিরোধী রোড গল্পগুলি।

অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের নাম হয়েছে 'পুনশ্চ', ১৯৪৬-এ প্রকাশিত। এখানে গল্পসংখ্যা সাতটি। এর মধ্যে যে মনের মানুষ ছেলে না, দুঃখের কাটা, সবার উপর মানুষ সত্য, ছায়ার সখী, জরুরী চিঠি, স্বপ্নের ছবির শিল্পী অন্নদার ছদ্মের দাসী ও অজ্ঞাতবন্ধু।

১৯৪০-এ প্রকাশিত হল 'যৌবন-জ্বালা'। তাতেই ছোটোগল্প, যথাক্রমে দুঃখনায়, মালিকাবধূ, একনিষ্ঠ, মেঘালি, দুঃশাসন, নারী, অপরূপ, যৌবনজ্বালা।

'আগামীকাল' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৪-এর। সাতটি ছোটোগল্প। কড়ি-কাঠের ছেলা, এই যার ছিল মনে, আগামী ট্রেন ছাড়ার ট্রেন, বন্ধু আইনি, উপেক্ষা, সবার মন্দ ও লেডিজকেয়ার।

এছাড়াও তাঁর অন্য দীর্ঘক গল্প-সংকলনে ১৯৪৩ পর্যন্ত রচিত পনেরোটি গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। রাঁচিবাসী, ঘরছা পাখি, সবজিকলের ছেলা, প্রভৃতি গল্পগুলি এই গ্রন্থে আছে।

৩

অন্নদাশঙ্করের গল্পের লক্ষণগুলি চিহ্নিত করবার সময় শিল্পীর জীবনের গঠন এবং ইউরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধের বিষয়টি সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার।

অন্নদাশঙ্কর প্রেমিক লেখক। প্রেমকে দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন মনুষ্যত্বকে। যে মানুষ সর্বকালের সর্বদেশের এবং দেশ-কালাতিক্রান্তক। তাতেই অন্নদাশঙ্করের চোখে বিশ্বমানব মনের শোভনযাত্রা বহির্গত হয়েছে।

ইউরোপের পটভূমিকায় প্রভাতকুমার সেকালের প্রথম গল্প লেখা শুরু করেন অন্নদাশঙ্করের বিদেশী অভ্যাসের 'দুঃখ চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ অবতরীয়। এই গল্প গঠনে কোনো ইন্দ্রিয়বর্জিকা বা বজ্রনার সুক্ষ্মতা নেই, নিছক গল্প-কথনের প্রেরণাতেই এই গল্পগুলির জন্ম।

প্রথম চৌধুরীর প্রভাবে ঔজ্জ্বল্যপূর্ণের গল্প-বলার প্রকরণ অন্নদাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পেই রক্ষে হয়। গল্পের আমি কথনে বড়া, কখনো চরিত্র, কখনো অন্যজন। এই কৌশলে লেখকের সমাজনা বোঝবার এই জন্যে যে শিল্পী হিসেবে তাঁর নির্লিপ্তিকে তিনি রক্ষা করতে পারেন। হিসেবের পরিচয়ে গল্পের তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-

পুলিস রাত্রা হয়ের সুচনায়, পুরোহিত, মেনাজিয়েট ছোত, সমস্যার।

এসের হয়ো ,,,ভবার সকলের আর আলাদা। উমার প্রাকৃতিক পরিবেশে সকলের ভাবহীন অবস্থ ঝি চৌধুরী এবং হয়ে বিদেশিনী বন্ধুনী লেখকাদপায় বিমাত্ত হয়ে কী করে তাদের ছেড়না-হয়ে তাদের অন্তরালয়ে বিছায় করতে সক্ষম হল তাই অবলা কাহিনী। আরা তিনটি অংশ উপন্যাস ভাব-ভাষা হয়-আলোর মাধ্যমিকীন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। পুরুষ্টাকিতের ইতিহাসের পরে ইতিবৃত্তান বাড়াবাড়ির। অর্থাৎ অট্টাকার: '১৭১ খ্রেনাজিয়েটা ছেলের লম্বীসিপ নিকাশ: সমস্যাহের নবনী-মোহন বোরতীয় এবনো এদের দাম্পত্য-ইস ভয়ংকীয় ভাষ্যের ত্রিমিত্ত আলাদির।

কিন্তু স্বীকার করতে হয়, এই সকল ফলে লেখক তার কাহিনীকার হয়ে বসেছেন, তাঁর নিজস্ব ছেলের ভিন্তা বা দর্শন প্রতিফলিত হয়নি। এবং অন্তর্দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা উপন্যাসেরও কোনো প্রয়াস নেই।

৫

জেলে ফিরে এসে আসামাদ্দের তাঁর ঐসবের মিহতীয় ফলটি লিখলেন 'বালিকাবধূ'। লেখকের একটি অসম্পূর্ণ গল্প। এ ফেন গল্পকারের ভাঙা কলম হল। বয়সন্ধি বালিকাবধূর যৌবনে উত্তরণের কাহিনী গল্প। পুরুষের নিবাসাদির হবোও যৌবন কী করে বালিকাবধূকে নিবাসিত করে তোলে তারই 'মিষ্টি গল্প।

এই গল্পটির কাহিনী নিয়ে কলবার দোষ সংবরণ করতে পারছি না। নায়ক অমল লেখক। সোজাসুজি আকৃষ্ট হয়ে তাকে ঘিরে কল্পনাও বিদেশের চলচ্চিনী মেয়ে স্থির খুঁজতে পারছে না। অমলকে আরও করতে ফেলে অমলকা হয়ে মেয়ে স্থির বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মেয়ে স্থির ধরবিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন [illegible] অমলের মনে মেয়ে স্থিরকে ঘরে [illegible] চায়। অমলকে ঘিরে সে মেয়ে [illegible] নিবাস করতে চায়। যতক্ষণ [illegible] না হয় তার মনে [illegible] সঙ্গে তাকে মিলতে [illegible]। অমলের হঠাৎ চঞ্চল অমলের বালিকাবধূর নারীত্বপূর্ণ উদ্ভাসিত হয়েছিল তাকে ঘেরে। অমলের মনে মেয়ে স্থিরটি উপন্যাস করে সে। অমল খুঁজছে পরে মৌসুম মোসুমে মোসুমে তার কাজ করে চলে।

৬

আসামাদ্দের গল্পের প্রয়োজনে অ-অনুষ্ঠানের বাইরে যান না। তাই গল্পের বাঁধনেরও বৈচিত্র্য-অন্বেষী যাঁরা তাঁর দুরাশা হবেন। আসামাদ্দের মূলত একটি নিজস্ব ঘরের অধিবাসী। সেখান থেকে তাঁর গল্পের চিত্র বিষয় ও নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ জীবনের সমস্যা। অবশ্য সে-সমস্যা মৌলবার ঘুরে ঘাটক পটোমি। তাঁর সৃষ্টি নারী-পুরুষের পুরাণিক অন্তর-চরাচরিক দিকে। অনেকটা ইউনিভার্সাল পুরুষ-চরাচর। অমল।

এবং একটি লেখকের বক্তিত্বের লেখক সৃষ্টি সমাজকে পুরু ইলিয়েই বিশ্বের অমল না, অমলশীল বিশ্লেষণ-[illegible] বাস স্বরূপ উপস্থাপন করে চলেছেন অমল। এই ধরনের ব্যক্তিকে আবিষ্কার করা যেতে পারে। ফলে পাঠকদের অমল থেকে আর কিছু করার থাকে না। লেখক নিজেই সমস্যার ফল যেসের এবং সমস্যা-মোচনের দায়িত্বও তিনি বহন করেন।

৭

এই আলোর আসামাদ্দের গল্প-সৃষ্টিকে কিছু ক্ষেত্রে আখ্যানধর্মী বলা যেতে পারে। পরিবর্তন দৃশ্য। ঘটনাস্থল সূচনা, চরিত্রের পরিচয় বিকাশ এবং উপসংহার। সুনির্দিষ্ট পরিণাম টেনে লেখক নিজে সিদ্ধান্ত হন এবং পাঠক-দেরও নিমন্ত্রণ করেন। পৃথিবীর বিশ্লেষণধর্মী লেখকদের সঙ্গে আসাম-দ্দের এখানেই সমাজাত। উপন্যাসের ক্ষেত্রে মৈত্র ঘটি বিধবা গল্পের ক্ষেত্রে ঠিক তাই। ঠিক এই কারণেই সাহিত্য-[illegible] করেন।

অমলের চৌধুরীর সঙ্গে এ-গল্পটা জমবে। অমলের মোটামুটি বিকাশ গল্প-কথনের প্রেরণা ঘিরে ও আঙ্গিকগুলোর লেখকদের গল্পপদ্ধতির সঙ্গে আসাম-দ্দের সম্পর্কে বিশদীর লেখকে বসে করেন। এবং বিশ্বাসের বিকল্প কারণে আঙ্গিকগুলোর উপন্যাসেই আসামাদ্দের গল্পগুলোর প্রেরণা পান। সমুদ্রপারের প্রতি আসুরের বিশেষ আসামাদ্দের এই গল্পকাঠামোগুলিকে সম্পূর্ণ কারণে করা যায় না।

বোধ করি এটি লেখকের প্রাথমিক গল্প এবং বিশেষ করিয়ের অনেকই অসম্পূর্ণ হয়েছে। আসামাদ্দের নিপুণ লেখকের অন্তরাল নিরিক্ষার ধরনের এক [illegible] ভাবিত। আসামাদ্দের গল্পের সংকটের আছে নিজের আছে, অন্তর্দ্বন্দ্বের আসল এবং সৌন্দর্যও আছে, যেই সাধারণ মানুষের চলচ্চোলা হলেরস। কিন্তুই এই নিরিক্ষার মনোজ্ঞান আসামাদ্দের নয়, অনেক সহজাত অন্তর্মুখন।

এই বিশিষ্ট সমস্যাটিই আসাম-দ্দের নিরাশিষ্ট করেছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। আসামাদ্দের অপরিমার্জিত 'আধুনিক' কিনা। সে-প্রশ্নের উত্তর। উমার মনে সেই অর্থে 'আধুনিক' কিনা! একথা নিশ্চয়ভাবে বলা যায় যদিও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বাস আমাদের নিজে জীবনের ভাবনার সেই যদি তাঁর মানসিক গঠনের কারণেই প্রাসঙ্গিক আলোকে মর্মাহতকারী। তবেও তাদের সে বাপারকে নিজের 'আধুনিক' বলা যায় না। যেহেতু আলোই বাস্তব সুখটা প্রেমের সাহিত্যের লেখকের গঠনের উপলব্ধি এবং চমৎকার। এই অপরিমার্জিত গঠনের বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যসেবের নিরপেক্ষের সৃষ্টিকর্মে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আনে। যে-বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের সঙ্গে সমস্যা-ভাবিক।

৮

নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-নির্ভর উপন্যাসের গল্পগুলির ভাষা হয়েছে—অন্তরঙ্গ, ঐশ্বর্যাচিক, স্থানীয় শিবি, [illegible] এটা, বৃন্দাবনি, মোক্ষদাসুন্দরী ইত্যাদি। প্রতিটি গল্পই বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানোর অবকাশ নেই। কৌতূহলী পাঠক এই গল্পগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা পুরুষ-নারীর অন্তরঙ্গলীলাই সাধারণে লক্ষ করবেন।

সমকালীন গল্পে ছয় পাঠক-পাঠিকা পরিমাণের একজন আসামাদ্দের চিত্ত অঙ্কন করা হয়েছে। মূল পাঠকালের মধ্যে প্রধান একজন। মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ উপন্যাসে যে লেখকের সৃষ্টি বাস্তবিক সুষমা তারই মধ্যে আঁকা এবং এই বিশ্বাস গল্পগুলি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে এসেছে লেখকের সকালে পরিবর্তনের মাঝখানে। মুহূর্তকালে সে বলে মেয়ে লেখকই তার আসামী। গল্প-কলাতের এই বিশ্বাসকে সব গল্প মানুষ সত্য বলে ভুল করেছে।

ঐশ্বর্যাচিক গল্পে হিন্দু বিবাহপ্রথা সম্পর্কে লেখকের অভিমত এই জাতীয়। 'আমি সাহিত্যে হৃদয়ে পারিমে যেমন করে লোকে অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করে। আমার পাশ হয় বলে, এটা জানি। অর্থাৎ ব্যয়ভবৃদ্ধির জন্যে চতুরেদের মধ্যে যে বিকার আছে সেই 'বস্তুবাদকে মনে পড়ে ফেলে করে নিলে নিজেকে ও অন্যকে বলনা করতে আর বাধে না, তখন সে মেয়ে কামনাবৃদ্ধি নয়, সে আমাদের, মনোরঞ্জন, কর্তার ভক্তির ইত্যাদি। তখন অপরিচিতা মেয়ে পায়ে হাত দিয়ে অন্তর-ঙ্গতা করতে হয় না, অন্তরটাই মেয়ে অন্তরঙ্গ।'

৯

স্থানীয় শিবির গল্পে বিয়ের আগে থেকে নিয়মের স্থানীয় শিবি মোহিনীকে স্থানীয়-পুনে পাবার অন্তর্গত বেদনা। স্থানীয় মেয়েদারী তার কাছে মাতৃজাতি। তাকে স্থানী বলা কল্পনা করতে সঙ্কুচিত হয়। তাই সে মোহিনীর কানে মন্ত্র। একাহারের মাঝুতে নিয়ম-মোহিনীর প্রেম-কাহিনীর লেখক অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের শেষাংশে মোহিনীমায়ের ভূমিকাটি কৌতূহলজনক পরিকল্পনা করেছে। এবং গল্পের ইঙ্গিতকে লেখক মোহময় মেয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

সুজন কাটা হলে সুকুমার বাইন কাঁকিনের কাছে বলেই বিদায় গ্রহণ করেছে। মনে কাঁকিন খুব লক্ষ্মী মেয়েটা সারাদিন আপনার [illegible] সুকুমার একদিন নিমন্ত্রিত হবে। [illegible] মনের মধ্যেকার সহরে ঐকাকি পড়ার সভাবাকে সুকুমার এড়িয়ে চলে। সরী বলিও মেয়েটা তথাপি সহজের বন্ধু নয় তার। পথ মেটেতে তাকে সুকুমার অনেক কাঁদে পড়তে হয়। তাদের সুরেলা কণ্ঠের মোহে সাথী সনজনা হল। অতঃপর ছিন্নবাহত। অবশেষে এক অভিজাত পরিবারের বন্ধু। সুকুমার পৌরুষে বিদ্রোহী হয় না। নারী যে আরো ভাবে আত্মিক-সম্বন্ধের কথা। গল্পের উপসংহারে লেখক সুকুমারের জীবনের এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন। মৈত্রেয়ের বন্ধু। সুকুমারের জীবনের ইতিবৃত্ত পড়ে লেখকের মনে তাকে সুকুমার কবি মনে হয়েছে।

সুকুমারের গল্পে মনস্তত্ত্বের ফুলকে ঘিরে রয়েছে। ফুলিঙ্গলতার ফুলের সেন্টে-মুগ্ধ মুগ্ধ মনস্তত্ত্বের। অথচ ফুলের মনে মুগ্ধ মনস্তত্ত্বের প্রবক্তক। এমনটা আর কারো ঠাঁকিয়ে এসেছে তাকে। সাধারণের সম্পর্ক ওদের মধ্যেই ছিল না, এদের মানসিক সম্পর্কও নষ্ট হল। ফুলা উদাস হয়ে গেল।

অমলাশঙ্করের দার্শনিকিন্দ্রানীর গল্প এই পর্যায় থেকে তুলে ধরতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু এই মনোমন্থনের বিশ্লেষণ নয় সত্য। কারণ মৌল ভাবিতিয়া একটি আবহাওয়া বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন দৃষ্টির সমন্বয়কে মেলে নিয়েছেন লেখক।

তবু আমার পক্ষপাতিত্বের দিক থেকে লেখকের 'যৌবনজল' গল্পটিই অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়। উপসংহারে এই গল্পটির আলোচনা করেই আমার অভিযোগ ধরে টানবার ইচ্ছে পোষণ করি। তবেপূর্বে অমলাশঙ্করের কিছু বিভিন্নধর্মী গল্পের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

৭

একটি মেয়ের গল্প 'দুটি চাঁদ'। যে-অন্তর্বিপ্লবকে নিজে নিয়ে তারই সহজের [illegible] একেবারে গল্পটার সে-গ্রহণ করি [illegible] তার কাছে পারলেন তাহলে জন-মিলনের পথে এমন কোনো বাধাকে [illegible] কাছে নামাতে পারতেন! কোন সম্প্রতি অন্তর্বিপ্লবের দৃষ্টিকে প্রতিফলনের উকো-চাঁদা অভিমানকে কাছে নামাতে চেয়েছেন! এবং কৌতুকের নিজে এ-গল্প লিখেছেন লেখক ১১৩৩-৩৪-এ।

উপসংহারে। অনোজারী ইন্দুকে বলেন, "আমি তোমাকে ছিনিয়ে একটা কথা বলে-ছিলুম তখন সবটা এমন বুঝিনি হয়ত।" ইন্দু হেসে বলে উঠল, "আমার সেই মেয়েটি। এমন মেয়ে আমি তোমার স্ত্রী। ঈশ্বরের নই।"

অমর ছাটি সন্তানের জনক পার্থিক হয়ে নিশ্চিন্তই হলেন।

৮

[illegible] আরো কিছু গল্প হয়েছে লেখকের। সে-গল্পগুলি কখনো রাজনীতিক, কখনো সমাজনীতিক, আবার কখনো মানসিক।

[illegible] মেলে তো জনের মানুষে মেলে না, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহলে বিদ্রু, অজাতশত্রু—সেটাই্টি আমাদের কাম্য। কোথাও কোথাও এমন আলস্য জাগতে পারে তাদের জন্যে গল্পগুলি রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা! হলেও বা কী এসে যায়? গল্পের মোডকেটিকেটী তাকে পুরে দিলে নিশ্চয়ই গল্প-সরস্বতীর জন্য খোলা যায় না? তাহলে তো ব্যক্তিত্ব গল্পের অধিকাংশ নাটকেরই নাটক না হলে প্রকল্প বলা চলে! এবং রবীন্দ্রনাথের 'খোকা' বা শরৎচন্দ্রের পথের প্রকল্প-কে উপন্যাসের সম্মান দেওয়া যায় না কিছুতেই।

সমালোচনাকে এইভাবে টেনলে ভালো হয়; কেননা লেখকের কখনো কখনো তত্ত্ব-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে এবং সে-তত্ত্বকে তিনি কোন্ রূপকের মুখে দিতে আত্মগোপন করবেন সে স্বাধীনতা লেখকের হাতে থাকাই ভালো। তাছাড়া লেখক যে নিয়ম গল্পও রচনা করতে পারেন সে-শক্তির প্রমাণ পরীক্ষিত।

তবে অমলাশঙ্কর লেখকের অন্য পাঠকের প্রত্যাশা অপরিমেয়। তাঁর কাছে পাঠক শুধু স্টোরিটেলিং-ই আশা করেন না, দেশ-সমাজ-মানুষ সম্পর্কে সুচিন্তিত তত্ত্বও আশা করেন।

যেহেতু লেখক শুধু সাহিত্যের জগতেই বাস করেন, তিনি সমাজের সমস্যের সমাজতির অতন্দ্র বিবেকও নিঃসন্দেহে।

এই তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলি থেকে লেখকের বাক্তিগত অন্তরঙ্গগুলি উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না।

...পরিণামে নোভেলদির মনে হয়েছে ভারতীয় সৈনাদলের হুইচেই ভারত-বর্ষের মুক্তির চাবিকাঠি : "এরা একদিন দেশকে জয় করে নেবে, স্বাধীন করে দেবে। একদিন এদের প্রয়োজন হবে যে আরও সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়।" মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না (১১৪৩)

...কোকুল বিশ্বাস, "মানুষের জাত আছে, কিন্তু সে জগতের চেয়ে বড়, এক আছে, কিন্তু সে অনেক চেয়ে বড়। এমনি মানুষ মানুষ বলে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমার মনেই থাকে না সে ইংরেজ আমি বাঙালী, সে হিন্দুস্তান, আমি হিন্দু। সে মানুষ, আমিও তাই।"

ফেরুন বিশ্বাসকল্প হল। বোন্ধু ফুখ-ময়ের বলে, "মানুষে মানুষে আসল তফাৎ-গুলো তফাৎ একজন আদম বয়, ইভলিন-মানে। আরেকজন আদম নয়, মুসলমান।" সবার উপরে মানুষ সত্য (১১৪৪)

...জীবনে অজাতশত্রু হয়ে টিকে-থাকা সম্ভব নয়! সমস্তরের শত্রু হয় তখন শত্রুর আমি একের শত্রু। হয়তো! আমি শত্রু, আমি একের শত্রু! যে আমি একদিন অজাতশত্রু ছিলুম, সেই আমি আজ আমার শত্রুতাময়ের শত্রু!—এরা আমায় শত্রু ভাবতে চায় না। দেখে যখন টাকায় ধরবে হয়।"

অজাতশত্রু (১১৪৫)

৯

অমলাশঙ্করের রচনায় যেটা যে মুখোই আমাকে প্রথমেই করে তা হচ্ছে বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি। সাধারণত একেবে পরম শিল্পীর হাতে উদ্ভাস্ত রচনাই সাধারণ পাঠকসমাজের সবিশেষ আদৃত। লেখক এবং রচনা উভয়ই উভেজনার আবহে পোষণের বস্তু।

যথার্থ শিল্পী নিরোগ, বিজ্ঞানীর মতন নিরাসক্ত। তাঁর রচনায় কোথাও প্রয়োজনে উদ্ভাস্ত আবহাওয়া থাকতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা নিজে উত্তেজিত হন না। অথবা রচনার সঙ্গে নিজে উত্তেজিত হলে তাঁর নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হয়। এবং রচনাও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। যেহেতু নিরেপের আবেদন মানুষের মনের গভীরে।

বাঙলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা-রীতির নিদর্শন কম। সম্প্রতি প্রবোধ মুখোপাধ্যায় এবং আমিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই ধারার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

১০

এবার অমলাশঙ্করের 'যৌবনজল' গল্পটির আলোচনায় করে প্রসঙ্গ শেষ করি।

গল্পের নায়ক কিশলিং নায়িকা রানি-চাঁদকে ভুল বুঝেছে। মুরোপের আবহ-আকাশের গড়া রানি পুরুষের খেলাধেলায় স্বাভাবিকভাবে সংস্কারমুক্ত। রানি বিশ্বজিতের তারই চিন্তার আগুন জেগেছে। অন্যদিকে বিশ্বজিৎ তাকে প্রেমিকারূপেই চিন্তা করেছে। এদিকে রানি এই সম্পর্ককে স্পোর্টস ছাড়া আর কিছু মনে করেনি।

হুজনের সুখ চরম বিশ্বজিৎ।

রানি বলে, "আমি যখন বিয়ে করবে তখন আপনি যুদ্ধবে যে তোমার স্ত্রী। এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারে না। এ কেবল আমারই জন্যে।"

কিশলিং যৌবনজলোর স্তব্ধ।

রানির চোখে জল. "বন্ধু, তুমি কী আমার সর্বনাশ করবে? এই তোমার মনে ছিল?"

বিভ্রান্ত কিশলিং শেষ পর্যন্ত আত্ম-হননের পথ বেছে নিল।

গল্পের সিদ্ধান্ত :

"পুরুষমাত্রেরই অন্তরতম মনের মুখের শেষের জন্য কামনা নিহিত রয়েছে। নারীর শেষ জন্য সেখানেই তাদের চরিতার্থতার জন্য দায়ী পাবে। সে যদি আত্মদান শেষে না হয়ে থাকে তবে নিজের কাছে নিজেকেই পরাজয় হয়। তখন জন্য দায়িত্ব।"

বৈয়াকরণ

সত্যনাথ ভাদুড়ী

...টিফিন দেবার ঘন্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য এবার প্রস্তুত হতে হয়। একটু, শেষ হোমটা দেখেছে ভালো হয়ে যেত। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে ঢুকতে হবে—ঘন্টাটা ঢিঢিয়ে দেবার আগে। টেবিলের উপর মৌলবী সাহেবের পা দুটো নড়ছে। পায়েই পায়ের ছোঁড়া। ছোটটার ভিতর থেকে খানিকটা জিভ খয়েরী দেখতে বেরিয়ে এসেছে—সেখানেই যা বিশ্রাম করে—দিবসান্তে বাঁড় ঘোটন মৌলবী সাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া হয়েছিল না, সেই হাতেই পান খান করে থাকেন। অবশ্য কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব জানোয়ারের মনে রাখা ভাল থেকে মন সরে না। তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সেরেরা টাকাটা ভুল-ভুলাবার পড়িটা সেরে নিলেন পণ্ডিতজী। ডান এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজা আহ্নিক করেন—দুবেলায় খাবেন—দুবেলাই এক সেরের বাঁধ ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করেন, তখন ছেলেরাই চাপরাশীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে ঝামেলা নেই, অসুবিধাও নেই। বিভিন্নার ছোটির ব্রাহ্মণ তিনি; ছেলে স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু কাউকে টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেন নি এখানে। স্কুলের বাইরের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? ছোট্ট ছেলে নিজ হাতে টিউবয়েল থেকে জল তুলে, আলগোছে চকচক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?...

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পর থেকে অন্তঃস্থলে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে বাক্যিতা কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা আক্রমণের ভাষা। ঠিক এই অবর্তমানে কথা পণ্ডিতজী বলতে চান নি। অবশ্য মৌলবী সাহেবের কথার ছাঁচিবাস সোজা-সুজি করতে পারলেন না। স্বভাবসুলভ ঘাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

"আপনাকে আর বক বলি কি করে। বকের পালকের মত আপনার দাড়ি দুধ-সাদা হয়ে গেছে, আবার স্বভাবের জন্য ভালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক বেশ হয়ে যাবেন—আপনি হলেন হংস।"

সন্তর্পণে মৌলবী সাহেব আবার তার একটা নতুন বিধি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো ফুটফুটে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—"দাড়ী চলে বকমারে, দুধের জাকে হাজারে।"

"কিন্তু বুঝলেন মিঞা মৌলবী সাহেব —সেই দাড়ী যখন পাকে পড়ে....."

মৌলবী সাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

"আপনি ঠিক বলেছেন অবশ্য বলছেন। না? বদ্‌লা-বদল (বদ্‌ধাতুটি) দেখতে পাচ্ছি হয়।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবী সাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বদ্‌ধাতুটি তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তাই দিয়ে বদ্‌ধাতুটির সম্বন্ধে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তাই সম্পর্কে যে বক্তব্যটির সম্বন্ধে আছে।

অন্তরঙ্গ একটা স্পর্শকাতর আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। মৌলবী সাহেব নিজের খোলা-মেলামেশায় অন্তঃস্থলে বদ্‌ধাতুর; পণ্ডিতজীর মুখ ছেলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর নজরে পড়ল না। তাঁর ঠোঁটের ডোলা নড়ছে পা দুটোকে ছেড়ে হঠাৎ অগ্রসর হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর মন। চাকরির জীবনে অনেক কিছুই না-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়ে স্কুলে, তাঁদের পরিবারিক জগতে নয়; সমাজ বাহিরও নয়। স্কুল ঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই আবাসন। আগে ছিল স্কুলের অনুমোদনীর ঘর। এখন সেই জায়গায় ঘরখানার মাঝে পড়া হয়েছে এবারের ঠোঁটিয়ে, দুপাশে দুখানা চেয়ার। ঠোঁটিয়ে

বাসনাকে নিয়ে জটিলতার জালে তারা যখন বাসনাকে হিন্দুস্থান পাকিস্থানের ঘোলাজলে ফেলে দিয়েছেন: একদিকে ধুলোয় ঘেরা, একদিকে আকাশ বন্দনা। নিজেই পরীক্ষাকে নিয়ে তিনি যার মুখের মত চোখের মুখোমুখি তিনি আর মৌলবী সাহেব এক লহমা কাছ করেছেন মেলা মুশকিল। কিন্তু তাঁর পা-চেপেছেন এত খারাপ এর আগে তাঁর কখনও লাগে নি। ক্লাসে গিয়ে ছিপ্‌ছিপে ফিট্‌ফাট পা-চেপেছেনরা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টারমশায়ের কাছে বসে যারা মেলে ধরেছিলেন: মৌলবী সাহেব তাঁদের কখনও পছন্দ করতে পারতেন না। এমন একটা খোশামোদকারী লোক হঠাৎ তাঁকে কখনোকি করলেন কেন? নিজের ভাগ্যকে তিনি তো বিশ্বাসের কখনও করেন না। চোখে পড়বার মত ছিলেন বলে একদল ছাত্রসমাজের তাঁরিক ভেবেছিল। তাঁর জীবন-ধারায় আজও তার রেশ ধরে রেখেছে। সব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি সেপাইয়ের মতোকারী ধরনে ধরে এসেছেন, কলকাতাবাসী জানীর চেহারে কখনও দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কখনও আমাকেও তিনি সন্দেহ তাঁর ধরে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনও তো একটুও ফাঁকি নেই। তিনি যা এর বা কোনো তো কোনদিন চেষ্টা করেন নি। তবে কেন মৌলবী সাহেব তাঁকে কখনোকি ভাবলেন? চোখে পড়বার সময় সেখানকার পাণ্ডিত-মশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি বলেছিলেন, "পুরন্দর, তুমি বড়লোক পড়। আর পড়ে কি হবে? বড় চাকরি করে ও তিনিস। ভিক্ষাবৃত্তি ও হিংসাত্মি কবিতা পাঁচটা নয়। ইংরাজদের অনেকগুলোই আমের মত কটিন খাবে।" সেইজন্য খুব্‌ভ আসেনে, লক্ষ্য চাপলোর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পাণ্ডিতজী স্নেহ-পক্ষপাতহীন কাব্যের বন্ধনে বাসনাকে পড়েছিলেন। বাসনাকের বিয়োগদুঃখের সময়ই অবশ্যেপূর্বে সবচেয়ে সুন্দরের বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মনে দ্বিধাদ্বি নেই। তবে কেন মৌলবী সাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, এটা একটা নিতান্ত রসিকতা—কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে আমার পুরো বলা কথা নয়। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ও বিশেষটা কথাই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুহূর্তের উত্তির যে কথাটি দু মাস ধরে তাঁর মনে বিভীষিকা করে রেখেছে, সেটা একটা সমস্যার; তার উপর আক্রোশ। মুখের মতন," কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা হচ্ছে "কথা কি ঘোড়া চাস?" এই কথা শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। ও তো তে—কথার অর্থ তে।...

হঠাৎ মনের পড়ল হেডমাস্টার নিজের চেয়ারটার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ ঘুরিয়ে নিলেন: চোখাচোখি হয়ে গেলে অসুবিধে হয়ে যায়। হেডমাস্টার কথা বলছেন, তখন তিনি শেষ হলেন কথা একটি পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বাসার ঘরে সেদিন তবে হাটি থেকে চোখ তুলছেন উপায় পাণ্ডিতজী। অনেক ক্ষণের মধ্যে তিনি শান্ত এই ঘটনাটি। চৌধুরীর উপর পা-তোলা বসছে। মৌলবী সাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেন না সব ক্লাসে উনি পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে এক নয়। পাণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকের দুঃখের সঙ্গিনে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অমন সব জটিল বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত থাকবেন না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে কি করে, চিরাচরিত অনুশাসন আসবে তোমা মেয়ে,—এমন কেউ বুঝবে না! মৌলবী সাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটেছে কিনা, সেসব বিষয়ে কোন নিশ্চিন্ততা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া চলবে যায়ান: ভেবে নিতে পারেন যে 'বকলমিক' অবমান করা হয়েছে তিনি, তাই পাণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"ও মৌলবী সাহেব, ক্লাস নেই আজ?"

মৌলবী সাহেব চোখ বুজেই উত্তর দিলেন—"আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনদিন ক্লাস থাকে নাকি?"

"কেন আজকে মৌলবী সাহেব?"

"যে যেমন নাসিব নিয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা, আপনি বরঞ্চতক ভিক্টরে ভিক্টরে পড়ে নেবেন; আমি ক্লাস নেওয়ার আসি।"

নিজের অবজ্ঞাকে তিনি আজ মৌলবী সাহেবের ছাতে ছুড়ে বাজা বাসনার অবমাননা বাসনার। কিন্তু যাকে বলা তাঁর চৌদ্দর কোলে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

"আরে ভাই, যে কথা টাকা আইনে দেয়, তার বদলে নিজে পাঁচ কথা আরে পা-চেপেনারের মেহনতই করেন।"

পাকিস্থা চাপবানা পাণ্ডিতজী তাঁদের উপর সান্ত্বিয়ে নিলেন। পাকা মেরি-জোড়ার উপর হাতের উলোটা দিকটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ মনটা ভালো হয়ে গেল—মেয়েদের স্কুলে চাকরি করবার [illegible] কি ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে. চাকরি ও সৌখের বিভাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকেন? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই: চিরকাল তিনি নিজের কাজ-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিয়েছেন; ইসলামি মোলায় বাড়িতে যেন। তবে এসবগুলো [illegible] চলাফেরার নয়। যাঁর খুশি হয়ে যোগের মত, খেয়ে কুলকুচা করবার মত নিত্যির অভ্যাস...

ক্লাস পড়ল। পাণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অলক্ষ্যে সবাই তাঁকে পুরন্দর পাণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম লেখবার সময় লেখেন—পুরন্দরলাল মিশ্র, বাসকলতীর্থ। বাড়ির ডিগ্রিতে পছন্দ। বাসকল যেন তার অভিব্যক্তিতে ঢুকে গিয়েছে, বাসকলতীর্থ পদবীটাও কেমন তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর নামে একবার আর আগে কেউ কেমন সন্দেহ না দিয়ে, পুরন্দরে পড়বার পরীক্ষা নেন পাণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে নেওয়েছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের [illegible] দেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশী বয়সি আর মেয়েমানুষের কাছে. সবচেয়ে বেশী চেহারাটাই আছে বলে। অনেক লম্বা, মজবুত... ছেলেমানুষ নেই, বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধি কমবয়সে যাবে। আবার অবস্থাও ঠিক হয় না। হাঁ, একটি চঞ্চল বেশী।... মুখোমুখি—মুখোমুখি। ক্লাস ক্লাসের [illegible] প্রথম দিনে করে সেই [illegible] পাঠ্যক্রমের সাহসের লোক কতদূর, তাই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্রদেরই সংস্কৃত পাণ্ডিতদের শিক্ষণে লাগতে ভালবাসে। সেই ভাষায় অনুশাসন বিশ্লেষিতাজিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রী-দের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে! বাসকলতীর্থ পদবী ভালোভাবে ব্যবহার পড়বার সময় হয়েছিল, এমন ক্লাস তিনি নেওয়া নি। প্রথম দিন চারটিতে ছেড়েছে, তখন ছাত্রছাত্রীরা যে ইংরাজী না জানা পাণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাস পড়ানর সুবিধার জন্য ক্লাস-পণ চেষ্টা করে নামান ইংরাজী বিশ্লেষণ করেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উল্টো: ছাত্ররা আরও বেশী করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজির জ্ঞানটুকু তাঁর জটিল পরের বিনিময়। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ভুলেন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।

এই ক্লাসের নায়িকা মালবিকা। প্রথম দৃষ্টির বিনিময় তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকের পড়ে: কিন্তু প্রথমদিনের খুব ভাল একটি কথা হলেই ভাল হত: ক্লাসের সকলের মুখস্থবদনে কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে হাঁটে হেঁটেই ক্লাসে ঘর দিল—পুরন্দর পাণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হন হন করে—যেন একটিমিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না। ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ মেয়েরই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল ছুলে তিনি বেশ কয়েকটি চেপটামোর দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন: কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কি হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মত পূজো কুমারীরা। তাদের মুখে এই অভ্যাসে মেয়েদের করে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাসকলতীর্থ ফিরিয়ে আনবার জন্য পুরন্দর পাণ্ডিত ক্লাসের শুরু করে বললেন—'বা—অ-আই ইজ্‌টেসেনস্‌টা।' অর্থাৎ বাড়ি সংস্কৃত পুরুষের একবচনে কি

হচ্ছে? খুব সহজ সুরে কিরে আরম্ভ; এ সুর গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে পর্দা চড়বে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ পরিচিত সুবিধার নয়। তবুও হয় ঘাড় গুঁজে বসে বসে দেখছে কেবল আড়চোখে বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কৌশলে ফিরিয়েছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকালে তাঁর মনে কোনরূপ সংকোচ জাগে না। মেয়েটি কুৎসা।

"এসব নামতায় এত কণ্ঠস্বর থাকা উচিত। ইউ। ইউ বয়। তুমি বলো।"

সারা ক্লাস হেসে পড়ল।

...কেন? হঠাৎ এর হাসির কি হল? মালবিকাই নিজের আরম্ভ [illegible]। ওঃ! অত্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন। এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মধ্যে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার গলা চোখাচোখি হতেই পণ্ডিতজী ফ্রেম আমিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি।

"একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পাইজামা কানে ঝুলান রয়েছে।"

...ছি, ছি, ছি! (শয়ান—চকিত—বিলম্বিতলয়ে) ...লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাইজামা জামার মধ্যে গুঁজিয়ে নিচ্ছেন। অনুস্বুতের জামা কাটির নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেচালেন—"বা—ম—জাই ইন্‌ টেলেক্ট্‌।"

উচ্চহাসির রোল তাঁর গলার সুরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—"আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?"

অন্যদিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী [illegible]—আবার আজকের মতটির ভুল [illegible] করা? প্রতিদিন কি একরকম করে [illegible] হবে?"

[illegible] ক্লাসসুদ্ধ সব মেয়েই [illegible] ছাত্রীদের আগেই ঝিরে ঘুরে যায় [illegible] আর অতদূরে পেছনের পারে [illegible] ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব [illegible] মেয়েদের। এরা হাসতে জানে; ওদের [illegible] ধর্মনি শ্রেণিবদ্ধীর মত মিষ্টি; কিন্তু এই দোষ ওদের—সংস্কৃত চাষার উচ্চারণ ঠোঁটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কি করে সেখানে বলো এসেই! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।

...(মহতী ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)।... ভুলটোন্ত-লোভী বাঙালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে গেছে; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠার, আচার-বিচারে পুরুষদের বিশ্বাতি-চুকু মেয়েরা পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও টিকে আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর ফোরাবার নয়।

ক্লোম, কথার কি প্রতিষ্ঠিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সে সব তাদেরও মুখস্থ।

"কেমনভাবে বাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী?"

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

"বলো—বিরা-অরুন—বিরা-অরুন।"

"বিরা-অরুন, বিরা-অরুন"—বিরা আর অরুন দুটি শব্দ দুটিকে ভেঙে আলাদা করে বলেছে সে। ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার আজ আর তত আগ্রহ নেই।

"আবার বলো। বিশ্বাস বলো!"

...এই দুষ্টুটা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।... মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা ভুলি নি। তখন তার মাথার অত চুল ছিলনা। ছোট্ট কালো শরীরে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। সৌখীন মানুষ; ফিরে যাবার তা না হলে চলে না। সঙ্গে [illegible] নিয়ে এসেছে স্টোভ। কে বোঝাবে তাদের এইসব ছেলেমেয়েদের যে, সাধ্যসাধনা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হলেও কি তাই! স্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের সাড়ীতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। আগুনে কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ফোস্কায় ফোস্কায় ভরে পুড়ে ঘসঘসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটু পোড়ে নি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, বেতে পারলে যেন বাঁচেন।... সেই সময় খোকা ফিরেছিল, মালবিকা মেয়েটি কত আদর এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কত ভোলন [illegible] দুবেলা। সে এসে বলেছিল—পণ্ডিতজী, সীতা-মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া একটা স্নোভার ওষুধ যা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তবের করতে হয়। খুব ভাল [illegible], স্নোভার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল: কিন্তু তাঁর আলার অসহ্যযন্ত্রণাকে ছাড়া আর অন্য কোন ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সেকথা বলেছেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে তার জোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়েছে, সেই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটায় অবধি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কি হত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোটবোনের মুখের দিকে তাকান আর যেত না, শালাজ অনেক দিন পরে। অনেক অস্ত্র-পচিক চেষ্টাতেও কিন্তু তার মুখমণ্ডল ঢেকে পড়তে তার ঢাকতে পেরেছে। এর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! এত অনুরাগ ছিল মুখশ্রীর জন্যে: সহজভাবে দেখা যায় না আজও। এত অনুরাগ, শুধু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পরিবারের?...

"পড়ে যেল চিনবার? পুরু। [Expound সমাস—অর্থবিশ্লেষণ।]"

"অর্থবিশ্লেষণ করীর বলা সব—বহুব্রীহি।"

"খুব। কিন্তু অর্থবিশ্লেষটুকু যে বাকি থেকে গেল।"

"অর্থ। বথাবথা বস্তুর—মুখ—মুখোস সমাস।"

"খুব। কিন্তু ছত্রী ব্রহ্মণী থাওয়া বাঙালীরা কখনও স উচ্চারণ করতে পারে না। সমাস কর, বলো সমাস। কখনও স দিয়ে।"

"ও তো পণ্ডিতজী সামান্য হয়ে যাচ্ছে।"

"এই ঠিক উচ্চারণ। এই বলো কখনও!"

...কবি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যে কতখানি ভাল লাগে, সেই কথাই ভাল লাগছে এই মেয়েটির মুখে উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় ধরনি। সন্দীপের কণ্ঠস্বরের মত এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

...মধুরায় কণ্ঠস্বরায়—মধুরাকণ্ঠস্বরা।...

"সমাস বলবার? নিউ-ডাইন্‌! এবার তোমরা তুমি বলো। Expound সমাস—মুক্ত-পরীক্ষা। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার নেই। অর্থ কিসের?...আনন্দ-অশ্রু। আনন্দঅশ্রু? হাঁ হাঁ ঠিক হয়েছে। গুড্‌। নিউ ডাইন্‌। বেরাই। ধীরা। সমস্ত এস, তুমি বলো। আজকাল পরীক্ষা প্রশ্নটা এত বেশী কেন ছোকারের মধ্যে? কিন্তু মার্কটি বেশ ভাল। ওরকম কুশ আর নেই পরীক্ষাতে।"

...স্নায়ুর অনুরোধে, তিনি বলেছেন ব্রহ্মচারীর সামনে সীতা পড়ে শুনিয়ে-ছিলেন। তখন শেষ নয়। যাকে শোনান, তার তখন শোনবার বা বুঝবার অবস্থা ছিল না। আসল কিনেও শালাজ কথা বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। সে কথাটি তাঁকে বড় দুঃ মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা ছো তার আসল বিষেই বলা।... তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালাজের গায়ে। খুব্বে আত্মীয়দের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে ইজিচেয়ারটিতে শুকিয়ে। ডাক্তারবাবু কেন ভরসা দেন নি রোগিণী সম্বন্ধে। নানান কত, কি বলে চলেছেন...খুব হচ্ছে? ওষুধ ধিকে লাগছে? জানেন কি, সেরে যাবে ধিক-ভোকেশন হবে। না, আবার কিসের? সারবে না! কত লোকের কত বড় বড় রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই যা-ফোস্কাটুকু সারবে না?...

...মা মা আমার আর কেউ দরকার নেই...ছি, ওকথা বলতে নেই।—

...আজকের ঘরে যাওয়াই ভাল।...কি যে বলো। ক্ষেম, হয়েছে কি তোমার?'... এর পরের কথোপকথনের কথা তিনি মায়ের কাছে পরদিন অনেক লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বলেছিলেন। একটি শব্দও তিনি ভোলেন না। শব্দগুলি তাঁর কানে এসে...আর এর পর ভোলার তোমার? শেষ বিভিন্নি, এই কথা বিয়ের আগে তোমার মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছে?... ওরা কি এই চায়... কেন পরিচিতদের পর্যায়ে তাঁর কথা এল। অন্যদের তাদিয়ে বোঝার এসেছে মুখের বিভ্রান্তিতে কথা বলেন। এই কথাগুলি তাঁকে আঘাত করে তুলেছে যত দূরে আসতে। কথাগুলি তোমাই শব্দ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিক সূত্রের মধ্যেই সাক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। শব্দ দীপ্ত আর অর্থের আঘাত তোমা যেন না. ঠিক কি মনে করে মহিলাটি এই ওরা 'ক্ষেমাটি' আহ্বান করেছিলেন।...

"পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাজের উচ্চমান আসনে আসন করি?"

"ও, তুমি। নো। তুমি আলো সন্ধি—আ-আমি—কি হয়? আমি। শুদ্ধ। সখী-ঈয়া—সখ্যুক্ত। শুদ্ধ। বাণী-ঈয়াকার। ঈক হচ্ছে। আলো। হ্রী। বর্ণমালিকায়। শুদ্ধ। সিদ্ধান্তীন। কিন্তু মুখোনা ও এর উচ্চারণ হল না। তোমরা যে বলো ও আর মুখোনা ও এর একই উচ্চারণ কর। আমরা এবার বাণী উচ্চারণ। বাণী তোমার মানের উচ্চারণ কর। সমাসুক উচ্চারণ। বালো নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পারে না, সে নাম ডেকে লাভ কি? বলবার বলে।"

এই ক্লাসেও, হাসির ঘরে পড়ে গেল ক্লাসে। প্রেডমিস্টেস জানিল থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর নিত্যই দাঁড়িয়ে দিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অন্তরিক্ষ পণ্ডিতজী তখন সেই হাসির মেলেছেন জন্য বিদ্যুৎচমকের কথা।

...মালবিকা আসছে। কেন যা তিনি জানেন। কাঁকি দিতে পারেন ও মানুষ না; কিন্তু কি বুদ্ধিমতী!... এ কথা ভেল রাখে। পায়ের শব্দ আসে না কেন?... সে এসে চৌকিদের উপর থেকে বাইরে যাবার পাগড়ী নিয়ে গেল। মেয়েদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস' এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পাগড়ী ঘরে নিয়ে যান তাঁর ক্লাসে। ক্লাসে নিজেই চৌকিদের উপর রেখে গেল, যাতে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। মোক্ষম আঘাতের সময়ের এর সমাধান কেন তিনি মেয়েদের নিলেন, এর নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা কেন?' এসব মেয়েরা তাঁর অবমাননা জানে; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে আরও স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না! মেয়েদের স্কুলের সেই নিজস্বতার ভাব এখানে আসে না কেন?... ক্লাসে এর পরে কি ঘটবে, নিশ্চয়ই তাঁর কথার পরিমাণ না তিনি, তবু দুশ্চিন্তায় থাকে। প্রেডমিস্টেস একবার ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরে চলে যাবার পর এমনিই হয়। সবই চ পুরোনো সেই পুরোনো —অবশ্য, সমাজ নিশ্চয়ই নিশ্চয়—তাঁর বড় পরিচয়ই ঘটেছে, মেয়েদের স্কুলের থাকা কালের। নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে যাবেন। আবার ঘটনা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙালী মেয়েদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংশোধন করা, তাঁর কাজে কি এত ভিত্তি লাগত?...মনে পড়ছে আর একটা ব্যবস্থার কথা। মেয়েদের ক্লাসে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—'বিশেষণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় বলো। বিশেষণটী ও বিশেষণটা দুই-ই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন। কিন্তু এই প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের জন্যে তা নয়। এদের পাশ করানোর না করেও যদি পারা যায়, তবে করবার কি। যে কোন্ জানোয়ে মেরে কে জানে। ক্লাসের ঘরের আলো-বিশ্বাসের মত, তাঁকেও যে সব সময় সজাগ থাকতে হয়; কে কখন কি কোথা থেকে বলে দেবে।...আচ্ছা অন্যদের আসোয় বিশেষণটি যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক নিয়মের। তবে তাঁর তাঁর পড়ানর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের বেলা এক-রকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি?...মুকুলের ঘরের আলো যে আলাদা। আলো ছাড়া নিশ্চয়ই পড়ানো চলে তাঁর ঘরে—সেটা ঘরের সম্বন্ধে; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিবি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধে; ..কারণটা ঠিক মনের মত হল না।...

"লিলি! ডায় ইট্ বি বোর্ড।"

ক্লাসটা বিশেষের পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার ক্রম জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই মুখো মুকুলো মেয়েটিই তাঁর সেই-ঘরানো নিবা-রণের এক্ষে।

"লোখা, ওরা শব্দের সম্পর্কে কি। এর ঘরে ওরার ভাবছ কি?"

"আমি ভাবছিলাম যে, আপনি সমাজ, না ঘর সন্ধি জিজ্ঞাসা করছেন।"

"না, কেন ওরার। তাই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হয় বিদুষীকন্যা—ওরা। ঈশ্বরো জিজ্ঞাসী, বুঝেছ? ...সমাজের যোগাসি, সম্বন্ধে যে ভাবে না, ...পক্ষে তাঁদের যোগ্য কঠিন। যাও, যো ইট্ ডায় সিট্।"

ওরার সমাজের ছেলেও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ডাস্টার ব্যবস্থাপনে রাখলেন; ওরার নিজেন।

একভাবে সমাজে পড়ল। ক্লাসরোমের উপর ভাগে থেকেই মেয়ে ছাত্রে—"বিশেষণ শব্দটি কিয়া একটি ভাল জানা হল। উত্তর। মৌলবী সাহেবের সঙ্গে পুরোনো মুখ করে ঐতিহাসিকদের নিয়ে, বিজ্ঞানবাদীর ও ইথার অন্য ভাবিয়েছেন। শুদ্ধ। নিই ডাউন।"

ঐতিহাসী আর ঘালার তিনি একাই। মেয়েরা পণ্ডিতজীর ঘরের পড়ছে হেলে অনুবিধা হয় না। মুকুল শব্দটির হিন্দিতে অর্থ ডাড়াডাড়ি। তাই মুকুলদলে সমাজী চিরকাল বড়লাট ছাত-ছাত্রীদের ঐতিহ্য ঘোষাক অনুষ্ঠিত এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে 'মুকুলদলের নায়কীর মানে পরস্পর জিজ্ঞাসা করেছিল। মুকুট মেয়েরা তো চিরকাল যাইতে যাবার মুকুট মেয়ের সময় বলত — মুকুলের ফিরে . আজকের পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসবে আর তিনি বেশ উচ্চমনস্কার প্রহার বিয়েছে তাদের। কিন্তু তিনি এখানে ঘরে যাবেন হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অভিব্যক্তি-সূত্রের সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। মেয়েরা তাঁদাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; মুখ ঐকাত্মটা রেকের মত করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। লক্ষ্যবিনাসে কিন্তু কেন হয়েছে যায়। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির ধ্বনি ভেসে আসছে। মেয়েরা জানে যে, প্রেডমিস্টেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাঁরা, পণ্ডিতজী কোনদিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব মেয়ে। তারা যে সমাজের বর্ণবিভিন্ন করে, ব্রাইট ডিসিপ্লিনেরিয়নের সময় পণ্ডিতজী তখন শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুজে আসুন হয়েছেন বলে কল্পনাবিলাস। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের ক্রম জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঘাড়ম দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সম হো যে। "হে বন্ধুবর্গ, হে মান ওরা। যে শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী thing শব্দটির কিরকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?" তিনি ব্লাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বললেন। ক্লেশ ভালবাসার ঘিরে ঘাড়সুদ্ধ হাত থেকে নিয়েছে।... সেই সরলমতী ছাত্রীর মানের উচ্চিতে বন্ধুবর্গ ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি এই চায়।' 'ওরা' বলতে তিনি কি বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমস্ত পুরুষ জাতিকে তিনি ভেবেন তো? তা কি করে হবে। একটা সমালোচনার ভুল, সে-কথা নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীও জানেন। তাঁর জানাশোনা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সাধনী পণ্ডিত তিনি দেখে-ছিলেন। সকলে মেয়েরা হবে যাবে কেন। স্বামীর সম্বন্ধে দুঃসহ মন্তব্যের উচ্চিতা ক্ষমা করবার সম্বন্ধের ক্ষমাবার জন্যই কি তিনি অভিজ্ঞার একজনের বদলে বন্ধুবর্গ ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা কতটা ধারণা হল মেয়ে সে পরিচয়ের? কি ভেবে সে বাঁচানো 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। মেয়া ও আত্মীয় মুখো বন্ধুবর্গ।...আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবী সাহেবকে, এদের মেলার মেলে ভাবে থাকি? ক্লাস-মেয়েরা উপরকার মেয়েরা মেয়ে ও তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে?...কি ভেবে তাঁকেও এই নাম দেওয়া?...

স্কুলের গাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। আজ চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। তাঁদাটিকে প্রেডমিস্টেসের কাছে স্কুলের

ডাক দিয়ে যায়, তিনি ছেলের হাত দিয়ে চিঠি তার ছাত্র কাছে পাঠিয়ে দেন। ভাই-এর হাতে থেকে চিঠিখানা নেবার সময় খুব সাবধানে মিলন পণ্ডিতজী, ধরে ভাই-এর আঙুলের সঙ্গে, তাঁর আঙুল না ঠেকে। এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি বড়-কাছুর। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। চমকে উঠলেন নিজেকে—পরমাত্মীয় ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্য এই এত সতর্কতাই কেন?... কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর বিষয়ে। এলেলে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই নামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই যেন আর তাঁদের বিলম্ব না করে। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি অল্প অনুরোধে রাজী করান গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কি জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।... দুই মাস৷ আগেও। সবুর সইল না! আর কিছুদিন পর হলেই তবু কতকটা শোভন হত।...

"মিলন, খুকের—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলতো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জান না? মেকসই! মেকসই! এমিনিই ইন দি ক্লাস? কেউ জান না?...(মালবিকা আঙুল পারছে)...। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উঁচুতে পরিচয় সম্ভ্রমে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?"

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—গৌরবে বহুবচন। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁধের তাঁর দুলুনি থেমে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রমাদ গুনছে কাঁপছে না, কিন্তু সামনা কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু গুরু তর্কসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে।

"লতিকা, এবার তুমি বলো। লক্ষ্য। খুব সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। বহু-উচ্চারণ কি হয়? বানান করে বলো। খুকে। হাঁ, বর্ষিয়সীকার, জোর করে বোঝো। সাহস কর—স্ত্রীলোকেরা তাকী বলা যায়। হাঁ। খুকে। সিঁথে ছাত্রীরা। মেকসই। পাজী। তুমি প্রশ্ন সংশোধন কর এই কলাটির—প্রমথ। পুলোমহ্ নিবন্ধুক বাবাদিত্য। কি ভেবে বলো। হল না। এমিনিই ইন দি ক্লাস: কেউ পার না?...(মালবিকা একবার মেয়েদি)?... নিবন্ধুক ভুল। পাল্টাও হবে। মনে করে রেখো।"

...আজকে মালবিকাকে কেন করে বকে দিতে হবে। একি অসার কথা। নিজেকে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে। প্রতিদিন সে এই করে! বাই দিয়ে মাথার চুকেছে। এরটুকু আক্কেল নেই —অন্য মেয়েদেরও তো এই পাসখানা নেবার দরকার হতে পারে!

মেয়েরা সকলেই জানে যে, পণ্ডিতজীর সবচেয়ে কড়া বকুনি হচ্ছে "বাজে" মন্তব্যটি। মালবিকা এসে ঘরে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দু-চার মিনিট বাকী। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। ছেলের কথাটা মাকে এল।... সোজন্য—সভ্য শোভনোসভ্য। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?

"অনেক দেরী হল তোমার।"

"আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ সাহায্যের উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।"

...মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে, তা ভেবে উঠার সেই। বড় বড় পাকা গৌরের মধ্যে হাসিমুখ আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরা৷ হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন—"ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।"

"কোনের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী?"

অত্যন্তরের অবজ্ঞা কাটিয়ে নিজে তিনি বলেন— "না না। তুমি বলতো বিশেষণের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়?"

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মত ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

"বিশেষণী, বিশেষণী দুই-ই হয়।"

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। খুব, নিজে ছাত্রীর বলতে গিয়ে ফেলে ফেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই একে বকা করে দিতে হবে—ভাল বলতে হবে। মুহূর্তের আনবেচারিতায় তিনি বকতে ভুলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিশেষণের শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই ভিন্নতির কথা বলতে পেরেছে? আশ্চর্য, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের মুহূর্তের মতো শুধু একটা ভিন্নিসস তিনি লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছেন। "ওরা" শব্দের অর্থ। অন্তর্যামিনা কাউকে বাদ দেননি। পক্ষপাত নির্বিচারে ছাত্রদের পণ্ডিতজী পর্যন্ত না। অন্যান্য অবশ্যবোধিকা লীন করা অসীম। যেমনই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অনাত্মবিষয়কে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছিলেন, সেটাকে বহুবচন সূত্র দিয়ে। খুকেও খুকতে চাহিলেন না। আত্মসম্মানকে নিয়ন্ত্র তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা "গৌরবে বহুবচন" কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিন-ধরে পোষা আত্মগৌরবটুকুও মুছে গেল একই সঙ্গে।

"এসব হোমাদের পড়বার নেই, খুকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব চুলচেরা আসে না।"

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার। বইয়ের পুতুল কটু দিয়ে উঁচুতে রেখার ছলে, নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আজকের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অন্তর উজ্জ্বল নিজে যাবার পরিচ্ছন্নতা নেই এর জন্যে। নিজের উপর অসন্তুষ্টিতার সব-কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, হোসবীসাহেব, ছোট শালা—সবাই।...আরো ঔদ্ধত্যের—পরাজয়ের...। মোজন আঙুলের পথ দিয়ে তিনি বাইরে দিকে তাকিয়ে বিরাম-করের দিকে চললেন। আকাশ—ঃ আকাশ। সমস্ত মোড়া ধূসরছবি চোখ ঝিমঝিম ছাইকে লক্ষ করছে,—ভিতরে নিজেরে সবাই ছাইকে—বিষন্ন, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জায় ঘৃণায় ঘুঁকে পড়েছেন—তবে চলবার আগে ঠোঁটটা চেপে ধরেন।

চৌকিলের উপর মৌলবী সাহেবের পা-দুটো নড়ছে, অবিরাম নড়ছে। এর জ্বালায় চৌকিলের উপর একজন যাই পর্যন্ত রাখবার জো নেই।—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বকধার্মিক বলা লোকটা যদি চোখদুটো৷ খুলে রাখত পা দোলানর সময়, তাহলে আর তাঁর কানে পাইকা অক্ষরানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হত না আজ।

"৷ মৌলবী সাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা আছি—এতদিন বলি বলি করেও বলিনি—কিন্তু মনে করবেন না। আপনি যদি আমার বিবাহে করেন, তাহলে ছেলে-মিসেসের আর স্কুল-কমিটির সেক্রেটারী বিরক্ত হবেন।"

মৌলবী সাহেব চোখ বোজা অবস্থাতেই হুঙ্কার ছাড়লেন—"জো খুলে কি জোহিরা হয়ন, উসে দেখা যায় না খটকা? যে সোলমন খুলতে চায় তার কি কখন৷ ঘাটায় তার করলে চলে?"

...আর খুকো লোকটাকে।...অসহ্য! অসহ্য হয়েছি—নষ্ট-করেছি। ৮-এ ঘণ্টা ঠ হবে, খুকলে মালবিকা।...আজই, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে হয়? সেলফ ডাঁকিয়ে তব চিঠিই তো হারিয়ে যায়। তাহলে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোট শালার বিয়েতে।...কিন্তু মেয়েমানুষদের চোখে খুলো দেওয়া কি অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে! তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়।...যেন উপায় নেই।...তবু তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম ছেলেদের নিয়মমতায় করবেন।... কিন্তু সত্যিই কি ব্যবধানটুকু এই প্রথম বিস্তারের?

সতীনাথ ভাদুড়ী

আশা দেবী

তরুণ বয়সের অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য তিনি হারান বিচিত্র জীবন থেকে সংগ্রহীত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরায় ঐশ্বর্য। কিশোরের লক্ষ্যের অভিজ্ঞতা এবং প্রথমযৌবনের মনের সম্পর্কে অদ্ভুত উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যের প্রাণ। সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখায়ও তেমনি একটি অপূর্ব স্বপ্নময়তার ছাপ এবং অপরূপ উপলব্ধির স্পর্শ পাওয়া যায়। বিষয়ের প্রাণ, তার সাদা-মাঠা বাক্যগুলো তার ভাষা-জগৎ, উপর অপূর্ব যোগাযোগের ছন্দ পর্যন্ত তার ফলে তাঁর অনুরাগের ক্ষেত্র যেন তাঁর চোখকে একটি নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের অভিজ্ঞান ছাড়া হিসেবে তাঁকে বলা হয়েছে "Dickens to London Thomas". তাঁর সতীনাথকে তুলে যায় বিদেশের লেখনী-চিত্রকর। ডিকেন্স চোখ ছাই উপন্যাস রচনা ১৪ ও ২৪ বছর ধরে তাঁর ধীরে ধীরে লেখার চেষ্টা করেছেন।

এই ভাদুড়ী তাঁর আগে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। একটি উপন্যাস লিখেই তিনি পাঠকের মন জয় করে নেননি—এই এক উপন্যাসেই তিনি আগে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন—তাদের সমস্ত অনুভূতিকে পূর্ণ। তবুও যে কারণ সৌভাগ্যবান লেখক একটি উপন্যাস লেখবার সঙ্গে সঙ্গে আগে সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন সতীনাথ তাদের মধ্যে একজন।

ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে অন্তর্লোকের সতীনাথ তাঁর 'জাগরী'কে সৃষ্টি করেছেন দুটির মেল—আগরী কিন্তু। তার মন, তার চোখ সমাজের চিন্তা এবং মার্কসিস্ট অভিজ্ঞতাকে সুনিপুণ আত্মস্থীকৃতা দিয়ে তিনি আগে আছেন। আগের আগার 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ যখন পাঠক সমাজ তখন-চলে পিছনের অনুভূতির অনুভূতি আগেরটি দিয়ে এগিয়েছেন। আগেরে তুলনায় এবং তাঁর আগরী পাঠের জন্য উপন্যাস। মনের মধ্যে যা তার সেখে-যোগাযোগকে যেন চোখের আগের ছাঁচ দিয়ে আঁকা জীবন্ত চাঁদ—আগরী—কিনা।

আগরী আন্দোলনের পটভূমিকায় তুলনে মহিলা বিদ্যালয়ের একটি নিপুণ ছবিও পাওয়া যায় এই সঙ্গে। আর পাওয়া যায় তাই হয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়ার; আগের তার চেনেছে অন্দির অপেক্ষা বাদার মুক্তিযোদ্ধ নেবার জন্যে। সেখে জাতির আগরী বিদ্রূপ সমস্যারী আগেরে ফাঁসি হয়ে যাওয়ার আগেরার পরিসমাপ্তি। নীলু বিদ্রূপ চরিত্র যেন তাঁর তিনি ছাড়া এমন করে আর কেউ আঁকতে পারতেন না। আগরীর আবাসে আমরা এমন একটি মানুষের পরিচয় পাই যাঁর দৃষ্টিতে এমন চিন্তার অনুভব শক্তি, পরিচয় দৃষ্টিতেন, পরিশীলিত মন, সংগঠনের নিপুণদৃষ্টি এবং সেবাপ্রবণতার জন্য একটি সমন্বয়—তিনি তাঁর লেখার মধ্যেই মধুর।

সুন্দর এবং আগরের ছন্দে সতীনাথের আগরতা উপন্যাসিকের ক্ষেত্রে সহজ। তাঁর ক্রোধপ্রকাশ দাম্পত্যজীবন দুই মানুষের কাল পাওয়া আগরীর মানুষের মধ্যে তাঁর মানুষ-চরিত্র সম্পর্কে আগরতা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে এবং অন্য মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় জীবনের অবিচল হালচালের স্বাদ। এই হাসি আমরা মুখোশের আগর করে সমস্যির তাঁর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি মনস্তাত্ত্বিকের মুখোশ পাঠকের বিশ্লেষণ।

'জাগরী ইতিহাস' সম্পর্কিতে লেখক মনকে ক্ষেত্রেছেন সতীনাথকে সতীনাথক-দের এক প্রধান আগরাগর, ক্ষেত্রেছেনে মুক্তিসাধনার জন্য যে সর্বত্যাগীবিত্ত, কিন্তু সেই পর্যন্ত নিজের, স্বাধীন হাত থেকে বাঁচানার জন্য যাকে সাধিনার ত্রাণ বাঁচাতে হবেছে। 'জাগরী-ইন-চার্জ' সতীনাথকের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বাদলের চরিত্রে একটি নতুন মনোবিজ্ঞার পরিচয় উপন্যাসিক আগরেন। বাদল সতীনাথ মুখোশী মেয়ে আগরত আর সবাই নিজের মুখে—এর মুখোশ সবাই মেনে নেয়, যাকেও নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচানার জন্য পালাতে হয়—জীবনের এ এক চরম প্রহসন।

'আগরের-আগর' মনে আগরাগরে নিজের আঁচর কল্পনা না করে আঁকড়াবিলী মেয়েটিকে' নিয়েই তার মন ধর্মিক্ষয়। নিজের দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভাবেন না। আর ভাবনিনই বা থাকবেন! কিন্তু মেয়েটির সাগ জীবন যে এমনও সমাদরে পড়ে। অবশ্যপক্ষ ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন: বিয়ের পর দিন কয়েকের জন্য আগরা পতিগৃহেও গিয়েছিল; কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্য যার দেহ সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে আগরার স্বামী তার সঙ্গে আর ঘরের আগরীতার ঘরে সেই থেকে সে পিতার কাছেই আশ্রিতা। পাঁচ পরিচারিকা বলে পড়ার মেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করে এবং দুর্ঘটনার জন্য। দুঃখ পিতা তাঁর অন্তরালে অনুযোগ করেন।

ঘরের বাড়ী ঘর। বিয়াই আয়োজন। তাঁর মেয়েবাড়ী থেকে নড়বার উপায় নেই। আগরাগরে মেয়েকে দেখে সবাই বাক্যালাপে লিপ্ত করে। উপহাস ক্রমে মোড়ী বলে। আগরাগর ক্রোধ ফেটে পড়ে আগরায়। সহ্য আগরে না পেরে হাস-উপেক্ষে সে বন্ধুবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তরুণ আগরাগর চিরাগরই হয়। ঘাঁচিরে একদা মেয়েদের কলকার আগরান তার আগরে। সমস্যার নিষ্কাই সে মেয়েদের আগরাগর থেকে। আঁচ পরেও মেয়েকে মনস্তাত্ত্বিক ও আঁচ চালনা শিক্ষিয়েছেন।

আগরাগর মেয়েদের নিয়ির আগর-পরে এগিয়ে চলেনা। মনে তার তখন আগরে আগরে। নিজের ওপর তার মেয়েদের দুর্ঘটনা বিশ্বাস আর বিদ্রূপের। পরাজয়ে চলন আগরাগর দুর্ঘটনে এগিয়ে গেলেন এক সময়। আগরাগরে আগরার সীমাবদ্ধ উপন্যাস আগরাগরে-মন আগর নিয়ে-মেয়ে আগরিত

হয়েছে। পড়ে থাকে কয়েকটা সোনার কুঁড়িয়ে নিয়ে পথের, ভাড়িত হয়ে করবার জন্য সে ফিরতে লাগলো। অন্যান্য চরিত্রে মনোবিশ্লেষ করতেই মনিক সোফের আড়ালে আড়ালে হয়ে সমস্তটার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন মহাত্মক পুরোহিতে। ইন্দ্র অন্যান্য অন্ধ থেকে দুর্ভেদ্য-স্পর্শ সেবালতার মন পান করলেন, বিনিময়ে অমলা লাভ করলেন মরীচের দেহ, অপূর্ব রূপ, বহুমূল্য আভরণ ও ঐশ্বর্যসম্ভার, পিতার ইন্দ্রলুপ্ত কেশবাস এবং দৈহিক অক্ষয়ের ক্ষেত্রে অপরিমিত শক্তিসম্ভার।

কল্পনা, অতীন্দ্রিয়লোক ইন্দ্রজালিনী অমলার যে কাহিনীটি আছে, সেইটি অবলম্বনে এই গল্প। কিন্তু বৈদিক যুগের পটভূমিকার জন্যে, ওর দুর্নীতিটি বর্তমান গল্পের মধ্যে ইন্দ্রজালের সুনিপুণ পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং অমলার ও ইন্দ্রের সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ্যে গল্পটি লেখকের শক্তি ও অভীপ্সার এক চমৎকার সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের সাহিত্যে বৈদিক যুগভিত্তিক এই জাতীয় দ্বিতীয় গল্প আছে কিনা সন্দেহ।

'পলাশের' ওর বোনের ঈর্ষোক্তি—বিদেশিনী স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুঃখের তরুণী ভাবী বেয়াকে গ্রহণ করে জীবনে তার অনাসক্তন। বেশও বেয়াকে স্বামীর মনের মত স্ত্রী হতে পারছে না। স্বামীকে সে ভয় করে—সমীহ করে কিন্তু সহজ হয়ে ভালোবাসতে পারে না। সে বেশ বুঝতে পারছে সে স্বামীর মন থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। শেষে একদিন অধিক হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়দাহ্য পাঁয়রার ঘরে পূর্বস্মৃতি এরিলির শোবারে তার সমস্ত হয়ে স্বামীর মনের অধিকারী হয়েছে সে। আবার 'পলাশ-সন্ধিলগ্নে' গল্পে অসীমার জীবনের কলঙ্কের আর একটি দিক দেখানো হয়েছে। লম্পট, রাবাল, চোরাকারবারী স্বামী নিজে অন্যায় আর অন্যায়ের বোঝা অসীমার অসহায় কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। স্ত্রী প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যই কখনও পালন করে না, শুধু বিনিময়ে পেতে অন্ধভক্তির সমস্ত নিবেদন বলে নিঃসঙ্কোচে দাবি করার অধিকার সে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। আর এই [illegible] পরিসমাপ্তি থেকে পূর্বতন জীবনের [illegible]। সমরেশের দুর্নীতিটি লেখকের নিজের [illegible] এবং সমকাল শিল্পী এর চিত্র অঙ্কনে [illegible]। তিনি তাঁর চারপাশের অন্ধকারে [illegible], অন্ধকারেরই নিবিড়-তরে—স্বাধীনতার নিজেই তার অপূর্ব সাহিত্যের সন্ধান পেয়েছেন বলেছেন।

এক একটি গল্পের সতীনাথ এক অপূর্ব আবহাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পগুলোর মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিসিজমের মতো সৌন্দর্যের মধ্যে, এদের কারুকে পাওয়া যায় অন্যের স্বাদের তুলনা। 'রোমাঞ্চ' এই জাতের একটি গল্প। 'মধুমোহনপুর' ছন্দপতন মাস্টারমশায়ের লোকালে উপস্থিত হলেন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। স্বাস্থ্য-বান, বিদ্বেষক এক রহস্যময় ভদ্রলোক। সারাটা জীবন ধরে ঘরে ঘরে তাকে সন্ধান করেছে মেয়েরা, অন্তত সারাজীবন অন্বেষণের বিনিময়ে পেয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে কি রহস্যময় পরিচয় সৌম্যেন্দ্রর। তার অন্তর্লোকের দুটি পা যেন অন্ধকারের অন্তর্নিহিত হয়ে গেছে। অন্তর তার আছিনী পরিচয়টি বিশ্বাস করলেন কিনা সন্দেহ, তবুও তার সমস্যার অন্তরে হয়তো একটা মেয়েলিপনার অন্ত নিলেন, তারপরে—রোমাঞ্চ গল্প থেকে আশ্চর্যের সন্ধান, তাঁর যে অন্ধকারের সমস্যার অন্তরে বিশ্বাস এক চেতনা (বাঁচার) সাপ।

এই সাপ কি নিতান্তই অকারণের? সমস্তটার মধ্যেই কি নিরোপিনের ভূমিকা? তাহলে এই সাপের আবির্ভাব কেন? এ যেন কোনো একটা নিষ্ঠুর নিয়তি—একটা অমোঘ অভিশাপ, যেন সমাধান না হওয়া পর্যন্ত লোকটির মুক্তি এই অভিশপ্তলোকের কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই।

এমন গল্পে অলৌকিকত্বের আভাসই থাকে। এর চেয়েও বিস্ময়কর গল্প 'সহসা'।

হোমলোকিনী চৌধুরীর মেয়েটির নাম 'ঝড়ি'। মেয়েটির একটা বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আছে—মাতৃস্নেহ দেখলেই তার কিরে হয়ে যায়। সেই সঙ্গে একটি অলৌকিক শক্তিও জন্মেছে তার। বাড়ীতে যে পুরোনো অমলের বদ্ধ বিদেশী বাঁচাটা রয়েছে তার সঙ্গে যেন তার এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ। এই বাঁচাটিকে সে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়—এর বলে সে পেয়েছে এক অসামান্য শক্তি—বাঁচি না দেখেই নিরূপণকালে সমস্ত বলে দিতে পারে। কিন্তু যেদিন বাঁচির অন্তর্ধানের কারণ জানে সেটি বন্ধ হয়ে গেল, সেইদিন থেকে মেয়েটিও তার কৃতীয় দৃষ্টি হারিয়ে ফেললো।

কী বলা যায় একে? সাইকিক ফেনো? কিন্তু গল্পের সমস্ত অলৌকিক রহস্যময়তার হর্ষমের মোহময় অন্তে—কিন্তু, সেই রহস্য একটা অন্তর্লোকই নিয়ে আসে।

সতীনাথ অদ্ভুতের হাসির গল্পেরও অভাব নেই। কিন্তু অন্তর চরিত্রের অভিব্যক্তির ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। এদের গল্প কখনও মধুর, মৃদু, বাস্তব উদ্ঘাটিত করে, কখনও কৌতুক হিস্টিরিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। 'বিবি-কপালিরা' গল্পে শিশুর মোকের প্রথমবার গাড়ীর সিটে বসে তার টেনিস ট্রেনিংয়ের সৌম্য-ভাইনিকে দেখার চমৎকার কিস্তিতে দিলো। কিন্তু মেয়েরা সে ব্যাপার চেনাতেও আর গাড়ীর সিটে বসি করলো না কাজেই হার হলো শিশুর। শিশুর মোকের। পরিশেষে আবার পরাজিত শিশু-মেয়ে পার্টিতে অন্যান্য লম্বা-অন্যায়ের হাত থেকে বসি করে বাঁচিয়ে দিলে সে। বলাবাহুল্য শিশুই হয় কিন্তু সহজ কৌতুকে হাস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ।

'এক ঘণ্টার রাজা' এবং চমৎকার এম-এল-এ' কোতুকের নিয়ে মানুষের আর এক দিক। একদা ইন্দ্রজাল চৈতন্যদেবের বন্ধু-বান্ধব, ফুটিল আজ সেদিনের নিয়ে নিরীহ ভোলা মানে পরিণত। রাজা একদিন তার বাড়িতে এসে নিয়ে কৃতার্থ হত, আজ তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু তিনি এখনো চর্চাচ্ছিত আছেন—এই প্রান্তিকতার দুর্বিসহ ঈশ্বর তার মালিক ইন্দ্রিয়বন্ধুকে যে মাইকীয় সম্মান দেখালেন—সেই তাঁর এক ঘণ্টার রাজত্ব—চমৎকার এম-এল-এ—বিজয়ী জনসভার তাঁকে মালার ঈয়ে-হিস্টিরিয়ার সহায়—তবে হয়েছে তার মেয়াদ। সরকারী সেবায় অভিনয়ে মৌলভী সাহেব নিজের কর্তব্য করতে হেরেছিলেন বলে চমৎকার তাঁকে ভেঙে যাচ্ছে যান। অন্ধ সেই মৌলভী সাহেব মন্ত্র লোক-লজ্জা করেও নিয়ে তাঁর বন্ধু স্বামী সহায়লক্ষ্মীকে লম্বা করে দেখলেন—তখন চমৎকারকে নিয়ে মৌলভী সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে হয়। বন্ধুত্বের নারীটি মোহের মধ্য থেকে মোহমুক্তবাণী করে ফেটে দিতেই হবে, কারণ শুধু তো মানুষ নয়—দেবতা।

জীবনের সমস্যা জিনিষকে অসামান্য করে তোলাই সার্থক শিল্পীর কাজ। এ কাজে সতীনাথ সিদ্ধহস্ত। মানের অন্যান্য শিল্পীরা কিন্তু, লেখকের ক্রমে সকলের ওপর নয়—তবু কম্ব থাকে। যাঁর থাকে তিনি জাত-সাহিত্যিক। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে—এ শক্তি বিস্ময়ের হয়ে গেল—এটা বাংলা সাহিত্যের উদ্বেগজনক ক্ষতি।

অন্তত: জীবন-শিল্পসাহিত্যের দুঃখ-বেদনার দুর্বোধ্যতার কারণ জন্য যদি তাদের-পক্ষের বিশ্বেষণকুশলতাকে আন্তরিক সাহিত্যিক বলা যায়—সেই অর্থে সতীনাথও আন্তরিক সাহিত্যিক—তাঁর লেখার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের বিস্তারের প্রায়—গভীর—আর বাস্তবানুভূতির যেন ধরা পড়ে উঠেছে।

ক্ষণিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী হয়না কেন?

যত যত্নই আর যতই আপনার চুলে শুকিয়ে যাক বার বার সাজার লাগিয়ে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে অনেকেই পারে। এতে নিঃসন্দেহ আপনি অনেকের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অবশ্যই আপনার চুল তার সজীবতা সাবলীলতা হারিয়ে ম্লান হয়ে উঠবে। এ দুর্ঘটনা পর একেবারেই অসম্ভাবী। চুলের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে হলে নিচের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম আপনাকে মানতেই হবে।

1. প্রতিদিন অন্ততঃ দু'বার আধা করে চুল পরিষ্কারের।
2. নিয়মিত চুল কাটা দরকার।
3. স্নানের আগে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ভালভাবে তেল মালিশ করা।
4. সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ডিমের কুসুম ব্যবহার করা।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

শহুরে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাঁকিবিলাস সর্দার বিবাহসম্বন্ধে বিলম্ব কতদিন হইল পাপ হইয়াছে বলুন তো?... আপনি যে আমলের দৃষ্টিতে বলিয়া বসিলেন! না, অত বাস তারিখ করিয়া হিসাবে ধরকার নাই। মোটামুটি ধর সাত বছর হইল, না?

তাহা হইলে আমার নায়িকা সোনিয়ার বয়স আঠারোর কিছু বেশি, আর নায়ক মিঠুয়ার বয়স সম্ভবত পনেরো, দু-এক মাস কমও হইবে, বেশি তো নয়ই।

সোনিয়ার বাপের বাড়ি বিধারের একটি শহরের উপান্তে, শহরের ফাঁপ আরম্ভ আর পাড়াগাঁয়ের অবসানের সন্ধিস্থলে আর কি? বাপ প্রথমটা সর্দার অঞ্চলের লোক-যেমনটা অন্তত। ক্রমের মধ্যে আসিল না, শহরে এ বয়সে কত ছেলে উঠিতেছে, আমার বিলাইয়া যাইতেছে। বয়স ছেলেটা মিলাইয়া না, শিক্ষা সবাই মেলাকে ছোড়পাড় করিয়া তুলিল, তখন সে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। ছেলের বাড়ার তখন ধরন হইয়া উঠিয়াছে, পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া প্রায় ক্রোশ দুয়েক দূরে একটি নিরক্ষর পল্লীতে মিঠুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তাহার উচ্চতা সবার গড় আপাতত, সোনিয়ার চেয়ে ঠিক এক হাতের উপর দুই আঙুলে বড়। বিবাহ হইয়া গেল।

[illegible] এই ধর সাত বছরের ইতিহাসে [illegible] দেওয়া ধক। কোনও রোমান্সের [illegible] যায়, নায়ক-নায়িকার মধ্যে ঝুলো [illegible] সতের যো নাই তো রোমান্স! [illegible] সহজে আমলে যাইবে না, আমি [illegible] করিলেন অন্তরালে—[illegible]।.....মিঠুয়ার তরফে যে কিছুই [illegible] তাহা বেশ নিঃসংশয়ে বলা চলে। ছেলেমানুষি চেহারায়, খানিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে বটে, নিরক্ষিতভাবে খাওয়া-দাওয়া, বন্ধু-বান্ধব, চলনো আর ছেলে কলা তোলার ব্যাপারেও যে একটা ধনিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার অত হেলে-ধরার নাই। তাহার 'অনেকদিন' ধারণ ঠিকিলেটাই পছন্দ নাই, মেয়েদের সেদিক সম্বন্ধে তাহার মনোভাবটা কি সে অবশ্যই ঠিক না। এক কথায় বলা চলে মেয়েটা 'আমার ধাক্কিয়াছে', কিন্তু মাথার ভিতরে যায় নাই।

অবশ্য সোনিয়ার কথা একটু ভিন্ন। একে মেয়ে, তায় বড় অনেক বেশি নয়, শহরের একটি, গল্প আছে। তাহা ছাড়া মহলেও তো সে মিঠুয়ার চেয়ে বড়। এর উপর যখন কথা যায় তাহার স্বভাবটাও সর্দারীর মত দাঁড়াইতে নয়, তখন তাহার মনের অটলতা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। ঘর-করার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাহার কম আছে। কাপড়টি ছোবলো, সাজিমাটি দিয়া ঘাটে বসিয়া চুলের ঝোঁপা বোওয়া, সহরে যার সঙ্গে কিছু ছোবলো করিতে হলে সহরের ছওয়া একটু লক্ষ্য করা, বাঙ্গালীদের 'বৌদি-বাহুরা' কিভাবে কপালে টিপটি পরে, এসেন্সটা হাতে কি ধরনের মেহনির নকশা তোলে, ব্লাউজে, বাহুতে, অন্তর্বাস কি রকমের উঁচিত আজকাল চলিত—এই সব। সুবিধা পাইলে—বহুন, যা যখন আহারও করিতে ধাওয়া করিয়া বিসেছে, কিংবা ঘাটটা করিয়া দিতেছে—সে সম-বয়সীদের চলে জিজ্ঞাসাও যায়—এবং তাহার অভিপ্রায় ছেলের পক্ষে বড়টা ধনিষ্ঠ-ভাবে 'ছিক্কা' সম্ভব। মোট কথা মিঠুয়া গোড়ার যে সমস্যা রহিবের পিঠে লইয়া ঘাটের ঘাস অভিযানে নিয়া ছিলেন, 'কিংবা ছুটি-নাটাইয়ের ফলত্ব মনে খাইয়া আমার ছোট পাড়া ধাবার করিতেছে, তাহার পত্নী সোনিয়া তখন সম-বয়সীদের কাছে এসব সবের শুনিতেছে, বহু তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

অবশ্য যখন একলাকার, মিঠুয়ার বাপ যখন তখন এক্কাদিন হঠাৎ আসিয়া যেয়েই বাঁধিতে উপস্থিত হইল। রৌদি মহলো সোনিয়াকে আনিয়া ছোহাকে অভ্যর্থনা করিল। মহলের ছেলেটাই একটু, যেন বেশী দুষ্ক, বলিল, 'এ তো ভাল কথা নয় সর্দার (বেহাই), টাকা নেই টাকা নেই বলে মেয়ের শ্বিরাগমন করাচ্ছ না, ওদিকে আমার যে মুখ দেখানো ভার। বেটীর চালচলন শহুরে হয়ে উঠছে—সে-যেন পর্যন্ত এ জন্য রাগই হয়ে গেল, অথচ তোমার যেন দুঃখই নেই। তবে তোমার টাকা হবে, মেয়েকে কাজল-মাসিক রিয়ার করবে, সে ভরসায় থাকলে তো চলবে না। আমি মনে এসেছিলাম শহরের দিকে, ফিরে গিয়ে জ্যোৎস্নীজীর (জ্যোতিষীজীর) কাছ থেকে দিন দেখিয়ে মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেয়ে পাঠাবার যোগাড় কর।'

বেহাই বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিল। ছেলে ন্যাইটা হইয়াছে ভাল এবার, ফসলটা উঁচিলে মেয়েকে বিদায় করিবে। হাত এখন নিতান্তই খালি, পাওনাদারের অনেক মাস মুখ পর্যন্ত দিতে পারে নাই, সেদিকে একটা পয়সারও আশা নাই...এখন পাঠালে কিছুই আনতে পারবে না। সব সাথ আহ্লাদই বাকী থেকে যাবে.....নাও সমধি, তুমি আজ যে মোটেই খেলাম তুলছ না.....'

ছেলের বাপ রাজি হইল না,—ছেলের বাপই তো! অগত্যা খেলাসঠা ভাবিয়া বলিল—মনে সুখই নেই তো খেলাম করা। তুমি মেয়েকে এক বস্ত্রে, খালি হাতে পাঠিয়ে দাও, আমার ছোটে দেখ পড়তে, না ছেড়ে ন্যাকড়া পরবে। আমি ইজ্জতদার লোক, আমার ইজ্জৎ বজায় থাকলেই হল।.....তবে আসল জ্বালাটা আসতেই হল সমধি, আজ সহর থেকে আমার পত্নে কনিয়াকে (বিধুকে) সখীদের সঙ্গে যে রকম যোগাপনা করতে করতে অসন্তে দেখলাম, তাতে.....'

সেটে অনেকখানি গিয়েছে, রাগিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রৌদিও যোগদান করিল। খানিকটা আড়ু হিসাবে করিয়া কহিল—কে কার বেটী, কে কার বাপ? সব রঙ্গমঞ্চীর লীলা! তুমি নিয়ে যাও তোমার কনিয়াকে সমধি।'

বহুন খেলাসঠা মেয়ে করিয়া শান্তভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল,—না হয় খারাপই তবে বরাবর পাকা পর্যন্ত। তুমি ইজ্জতদার

দেখে, তোমার কথাটা ঠিকানা?—আমার মনে রেখো শুধু মিছে না।'

রৌশি তখন পার্সোনিবার লিখেই ফুর্তি-ভরে, তখন শেষে হাত ধরিয়া বলিল,—আ, মরি, সব মানুষ কথায় মজাই, যত শরিফির জাহাজেরা যায় তারই মতন, বলে—

আমার কথাটা মনে রেখো

আমারো মনের পর যাবো

—আমার কথা এখনই ভিতরে যায়। মনটাকে না ভালাতে চাই না।'

মনের সুই হইতে উপর হইতেই অমনি মুখটা ভাসন করিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছ মহুয়ে—

আজ কোন কিন্তুরা যেতে পারি,
তোমা কিন্তুরা যাব।
মনোরাজ হও মুখটি আমার,
হাত পাতাতো—আজ।

—দেখি না কত? আমার মনে হাত মুছে ধরে আবার—কি হয়েছে না হয়েছে, মুখে দেখ—ভাবি।.....কাজিয়েছে আর আমার আমি? দেখ তো। .....না যাকে পড়-ও নেই.....এ একটা মাথাই আমার হবে কিনা, যত এগোনো যায় তত্তই ভাল।'

(২)

রৌশির বাড়িতে এই ঘনিষ্ঠতা মিটিয়ে হইবার পরে মিঠুয়া মনের সাহসে আসিল। মাথায় একটা মোলায়েম ঢঙের সিল্কের ঝোঁপা, মাঝে সবুজ মেরিজ উপর একটা পালক শিয়ান, মোজায় হলুদ-রোজাবনা আলম, হাতে একটা বাহারি আছে। মাথায় অবশ্যে ঢুকিয়া মাথা নত্রিয়ার ভেল ঝোঁপার সাহিত আলাপী মিলাইয়া অনেকটি বাজার কপাল, আল, মাথ বাহিয়া মাঝে আসিয়া আপিয়াছে—ভেবে পরল।

পরে এক মাসিকা মিঠু মিলিয়াছিল, মনের মধ্যটি মিলে আসিয়া একটা কথে দুর্ঘটনা মিলে পরাজয়ের পরের হইল মহিল।

পরের-মনের মাঝি ছিল না। মেলিয়েরে আমার দুই মিলনের মনী মোর পাইয়া আসিল আলোচনাটা মেরের আরম্ভের পাই পরাজিল—কথন দুরে যে মোর করিতে হইল, এমন নয়। চলুক ফাঁক দিয়া মেলিয়া মোটা উঠিয়াছিল, বাকে মিলিয়াছিল মোলিয়া মনে পরাজয় বলিল, ইস। কি আমী মন যে আমার। .....আমি মোজা মোক? নিজে মেন হাতের মতো ' মন হাতের মাটিই আমার!'

মনটা চালা কথায় ভুলিয়া মাইল।

একদম ' মনী বলিল, 'আমী মোর মে মিলির মতই এত মেরে মাঝে মুখের ভাবটি মোলিয়া।'

মনের একদম বলিল, 'মাঝিল, মেরে মিলির মত কথে মিল মি মা:মাঝেই—'

আর একটা হাসির লহর উঠিল।

...মন মে মুখিমেন মেরেছে আকাশেই মে একটা মিছু হইতেছে পাঁচ হাতে উপর করিয়া, মিঠুয়া মোটা যেন বুঝিতে পারিল। নিজের পুরুষত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা গলা খাকারি দিয়া মাঝিয়া চরিত্র বলিল এবং তাহাতে আরও একটা কি হস্তক্ষেপের মনের মেরুদণ্ড ও-ধারে হুকমত হাসির মেরে ওঠায় অসহায়ভাবে হাত-পা পড়িয়াই বসিয়া রহিল।

একটু মেরে ভিতর হইতে ধাক্কা খাইয়া একটি মেরে একেবারে সামনে আসিয়া পড়িল। একটু মরমের খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রশ্ন করিল, 'পাঠানো (কুইন), মেন ভাল আছ মো?'

মিঠুয়া জবাব একটু করিয়া বলিল 'হুঁ'।

মনের মাঝির সব মেরেরা আছে?' নিজেও হাসিয়া উঠিল, পাশেও দুই তিনটি অমনি হাসির ধক্কা পাওয়া মেল। মিঠুয়া আরও মড় পুড়িয়া নিরুত্তর রহিল।

আর একটি মেরে মহিমার উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহিরে আসিল। অবশ্য এও আর হাসিয়া আমার কুটির কলকাতার সাহিত বলিল, আমরা কাঁচ মেরে, মুক্তোদের পর মেরে এসে একেবারে চুপটি হয়ে পড়বে মো। মুখ মেরে এসেছিলে পড়মো?'

মিঠুয়া মেরে-মাঝে একেবারে অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া মত মেরে মেলিল আর একটি মাঝির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, মুখ মেরে মো পড়মো, কাঁটা নাঁচ হয়েছে মেরি। আহা, নাঁচা মত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মাঝ তুলতে পারছে না।.....আহা, তাকনা মেরি, মাথার সমস্ত মোটা মেরে হবে না—ঝিঙিনাকে (মেরিকে) মনে মোলে আরে নিয়ে.....'

এমন সময় মনের একটিকে মৌলি মনার আওয়াজ মোনা মেল। সে ডাকি ছিল না, এই মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মেরেরা যে মেরেকে পাঠিয়া মুই দিল।

সময় পর্যন্ত মৌলির মনী এবং মনী ও মাঝি ঝিমিয়া ; পরের মনীমিলনীর আসিয়া মত আরোই পর্যন্ত মন হইল। আরেকে উপলক্ষ করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার হই-মেরে আসিয়া মিঠুয়া মেরেদুলার হাতে মেরেরে আওয়াজ আমার অনেকটা ঝিমিয়া পাইল এবং মাঝে মৈথিলিতে মেরা করিয়া মনের পক্ষ আরো ঝিমে মাঝিয়া নিষ্ঠে মাঝ মুলোইয়া অন্তত মন একটা ঝিম৩ থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে পুরুষত্ব আওয়াজের মনে মেরে মনেই মাঝি হইল না।

[illegible] সিকাল সমস্তের ঝিমিয়া [illegible] মেরে একেবারে ঝিমিয়া মাঝিয়া [illegible] মোটা। কাঁচ মেলিয়া সে একটা মুখেই মনেরের মেরে পড়িয়া মাইয়া নিমাই হইল।

মুক্তোদের বাইরে না বলিয়া বাড়ির ভরে মুখে একেবারে আমাআমি, একা-আমির ঝিমিল, ঝোঁপাটার বাঁধিয়া আর একটা আন্তর্বর্তিত্ব, ঝাঁকিল, তারার পর মোজার আরো একটানা কালার মুখ টুকিয়া বাঁধে বাঁধিয়া আসিল হইল। না, শিশি, পাউডার বর্ণালী আর মধ্যে আমিয়ে ঝিমিয়ে মুহূর্তের জন্যে 'বড়মার' মেওয়ার' (ঝুমুরের) আনন্দানা পর্যন্ত মনের মেল, তারপর পরে একবার গলা-ঝাড়া ঝাঁকিয়া আসিয়া, মোলিয়াকে 'বাঁধু' দিয়া আনন্দানার কলম-তুলা টিপে বাঁধ হইয়া রহিল।

(৩)

পরদা ভার মোহাবনের পর্যন্ত মেরা মিলায়ে। একটু মোমিয়া এমন ধীরে ধীরে চলিল যে, মনে হিসাবের মিঠুয়ে আঁধিয়া পড়িয়া তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। আপাতত যে-রকম মনুষ্য মোকিয়েছে, মুখ বাড়াইয়া মেরেরকমে পলাইয়া যাইতেও পারে—মনুষ্যে মেরেকে মিশ্যাল নাই। মোজাটা খুলিয়া আনিবার পরে কিন্তু তাহার মেন বোধ হইল, মনের পরদেশ একটু একটু করিয়া মুক্ত হইয়া উঠিতেছে। মুক্তোর মনে হইতে একটা ভয়ও মুক্তার ব্যাপার মাঝিবার জন্য তাহাকেও পরিচয়টা বাড়াইয়া দিতে হইল। মোঝিল, তাহাতেও মিশ্চয় নাই। তখন নিজের চাদরের ছায়ায় পাটা মেন ঘনায় করিতে লাগিল। —মেরেটা মনের পাঁচায়ার বাঁধিল হইয়াছে, ব্যাপারখানা কি?

ইহার মোনিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া মেল। মিঠুয়া আরাদের ঝলিটা আনাইয়া দিয়াছিল, তিনিয়া মোঝিয়া ধীরে ধীরে মনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল তিন এক মনের সাহিত মে কথাও কথা [illegible] নাই, প্রথম আশ্চর্যান্বিত পরিচয় আমির মাথার হাত বুলাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে মোজাটা মনের মেরেই তিন তিন করিয়া মুখ কথা মুক্তিল, ইস্, মোরেনো হয়ে একেবারে!

ইহা আশ্চর্যের আশ্চর্যাশ্চিত্য! মিঠুয়ার মুখটা আরই মোনাইল না, একটু পরে তিনে মৌটি তিনিয়া আমরা আমরা করিয়া বলিল, আমি, তুমিই তো মোরে চলতে আরম্ভ করলে, আমি মে মনমাঝারে চলতে পারতাম মেরে?'

মেরেটার একটা কাঁচানি হইল, মনে কাঁদির হইল, 'মনার কাঁদিবে?' আর্থাৎ, মেরো মোনাবার!

মিঠুয়ার মাথা নিচু হইয়া আসিয়াই ছিল, মনের এরূপ মনোভাবে একেবারেই নিমেষে তার হইল। একটু পরে বলিল, মেন, চল আমরা আমরাই।'

আনিকটা মেল। একটু পরে হইল নিজের নিমিত্তে মোঝিল—মনের মাঝার মোরটা নাই, কথন পুলিয়া মোনিয়াছে, মে অন্যমনস্কে হাতটা আরাআরি নিমাইয়া মইল। আশ্চর্যান্বিত পরিচয়—এ তো তাহার কথামনে পড়া মেল, আরাআরির কি করিয়া এই আরাআরির নিমন্ত হইতে উপায় পাইবে নিমা করিতেছে, এমন সময় নিজের মনের

কামাও ঘুরছে টান পড়িল। ঘুরিও ফিরিয়া দেখিল, মধুর হাত তাহার কন্ধনের ভিতরেই অচঞ্চলভাবে আছে, তবুও তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ ঐ মুসলমানিসকারই কাজ। প্রশ্ন করিল, 'কিছু বলছ?'

মধু ঘোমটাটাকে মুখটা অল্পের সহিত মুছাইয়া লইয়া বলিল, 'আছে?'

'আমায়?'

সোনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'এ-ও'কে বলছে, অন্য সমস্যার লোক কিনা। সোজা বুঝবে মধু, মোর বলবার কথা।'

এরকমভাবে যা দিলে মিঠুয়ার মত লোকেরও লাগে, হাতে মুখটা আর করিয়া বলিল, 'ছাড়, ছাড়ি কিনা বলেই দেখ না।'

'তের বলেছি আর তের হয়েছে, চল এখন, সামনে লোক আসছে।'

ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যখন আসল করিল লোকটা দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলে গিয়েছে, ঘোমটাটা খুলিয়া একেবারে পাশাপাশি আসিয়া পরস্পর জড়িয়া দিল। মোর হয় দুই-জনে মতলব করিয়া পরিকল্পিতে প্রবেশ করার সুযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতরটা আরও নিবিড় হইয়া গেল আশা সোনিয়াই আগুনী, বলিল, 'কল কল্লছে করতে চলেছ, হাবা না মোরা?'

'কি কল বলব?—রাজারানী না ইন্দ্রাসের?'

সোনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'সমুদ্রসার (মিনসের) কথা শোন না! আমি কি বুঝি যে মত-ফুতের কল মুখের? তুমিই বরং মুখের ছেলে। কলহংসের কথা মনে আছে? —আমার মিঠিমনের হয়ত সাকালটা?'

মিঠুয়া চুপ করিয়া রহিল। সবটাতেই একটা কথা সম্বন্ধে সংকেত করিয়া সোনিয়া বলিল, 'কথা, বাবা কল্লছ না তো?—বদি কল্লছ তো বল না হয়.....'

হেসে করিতে না পারিয়া মুখে হাত দিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঠুয়া লাজিমা বানাইয়া কপটীর হইয়া বলিল, 'তাদের সবলোকে আমি ফাঁকি দিয়ে ঘরে অন্ধ পাঁচ রোল মুখে আসতে পারি—আমার নাম মিঠুয়া মরদ, হুঁ!'

'ওঃ, তাই-হয়ে তো! তা, তাদের বললে না কেন? তাহলে হনুমানটি বলে তোমার পুজো করত।'

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তিনিও রাম-লক্ষণ-সীতাকে—সবাইকে এক সঙ্গে ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতেন।.....এও, বানিকটা তাপিয়ে যাও, একটা গ্রাম এসে পড়ল।.....এখন হাতে ধরে ঘরকন্নাকে দেখাই মুস্কিল।'

নিজেও ঘোমটাটা টানিয়া দিল এবং গতি মন্দ করিয়া আবার আর নিজের মধ্যে উপভোগে মাধবান করিয়া লইল। রাস্তাটা কর্দাক্ত ছিল, তবে রাস্তার দুধারে ঘুরে ঘুরে ঘাসগুলি তার আর রাইল পর্যন্ত বিছানো। সোনিয়ার ভুটীর হইতে বাহির হইয়া, মোমবাতি না লণ্ঠনের আলো আসিয়া—আলিয়া গেল, মুখে বলিয়া 'ক'—বলিয়া ঘুলিয়া ঘুলিয়া হাত আঁকিতে লাগিল। একটু, যাহারা মোকে, ঘর-আলের আলোর তারতম্য লইয়া আলো-মধুর মন্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল।

(৪)

গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা গিয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুর পড়ে। রাস্তার একটু পাশেই কাঁচা বকুলগাছের তলায় রাস্তাটা একটা পুরোতন ঘাট। লোকজন নাই কেহ। সোনিয়া বলিল, 'কেন্তা দেরেছে, চল একটু বসি।' মিঠুয়া, বাহাদুরি দেখাইয়া বলিল, 'ই মুকোশ তো পথ, আর মধো আবার চলবার বসা। আমার কোলা পায় নি।'

সোনিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'তবে তুমি যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি ফিরিয়ে ইঁদিকে বাড়ি ফিরে যাব।'

যা ভেবে দেখা যাইতেছে, ও তা পরে মিঠুয়া মুখে মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সোনিয়া ঘাটের ধারের একটা আসনের গিয়া বসিলে সেও গিয়া পাশে বসিল। সোনিয়া পা-টা পুকুরে ডুবাইয়া দিয়া আর মাইল পর্যন্ত নিবারণ। মিঠু

...ধীরে পা দুইটি তুলোইয়া, বিস্ফারিত নিষ্প্রভ চক্ষু পাকাইয়া বলিল।

একটু পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ, পরম কল্যাণে ভগবতী নিজের পরাজয় বলিয়া মানিয়া লইয়া, অবনত হইয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় উপর বলিয়া আসে। একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, 'তবে না হয়ে একটা আলবলিয়ন (বহুমূল্য) কথে তুলেও দিবিস। আমি তখনও মুখে বলে আসি।'

'কথে কি হবে?

'আমি বিয়ে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছিনে,—হাসিমুখে—'

মুখ মুছিয়া আসিয়া দেখিল তখন পরম কাঁদিয়া উঠিল। তোমিনা গাড়ির দেউল দিয়া মুখ মুছিয়া বিদ্বেষের দিকে মুখোমুখি হইয়া অবলীলায় বলিল, 'তবে তো আমার কপালে চিরকালটা (চিরু) ঠিক আছে কি না।'

'এক পলকে সরে গেছে।'

'কেমন বিশ্বাসের?'

'তার বিশ্বে।'

তোমিনা তেমনি অবলীলা 'তবেই আপদ্ধর্মের তরে চিরু ছাড়া কপালের আর সব আলবলিয়ন তুলোইয়া বলিল, 'তোমার? মুখের পরাজি না তো।'

'তার বিশ্বে তুমুল তাসের।'

তোমিনা আবার সৌহার্দ্যস্বরে হেসে তুলোইয়া বলিল, 'তোমার? বড় বিশ্বে তার, পরে তোমা নিলের।'

'না না, পরেনি।'

তোমিনা কলহ কাঁদিবার মত কাঁদিয়া বলিল উঠিল, 'হাঁ! হাঁ হাঁ—পরেছে, নিশ্চয় পরেছে—তুমি।'

বিদ্বেষ আশ্চর্য হইয়া গেল,—তাহাকে তোমা কপালের হাত তুলোইয়া চিরু তোমার বলিতে পারিল না, এ যে বিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া বিহারে তার কাঁদিবার, কলহ করিবারই বা কি আছে? একটু, বড়মানুষ হইয়া বলিল, 'তার তার তা কত তো তোমার দিবে।'

'তার চাই চিরুটা তোমার দিবে বিশ্বে বলিয়া বিদ্বেষ দিকে পরে তো বিশ্বে তাহলে না, কিন্তু তাহলেও, তো.....তাকে তো তোমা তার বিয়ে বিশ্বাস তো।'

বাহিরে হাওয়া কাঁপিতেছে ছিল, তাহার উপর অন্ধকারী পল্লীগ্রামের কত চিরুটা যেন একটু থামিয়াও ছিল; বড়টিতে বিয়া কপাল হইতে মনে পড়িল, সেখান হইতে দুইটি চোখের অবসান।

বিদ্বেষ তাকে আর, বাহারী অন্ধকার আলমারীতে সৌহার্দ্যে উপর কাঁদিয়া কপালে তাকাইয়া ছিল এবং একটা সিগারেটকেস নিস্তব্ধ তোমিনা।

তোমিনা দুইটি আঙুল দিয়া চিরুটা একটু চাপিয়া দিয়া বলিল, 'তোমার তোমারও।'

বিদ্বেষ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া তোমা, চুপ করিল, 'আমার এ কথা বলছ তোমা?' বিয়ে কি তিন পরে খুব সমবয়সে?'

'নিশ্চয় বলব, আমার খুশি। নাও চুপ। আমারই তোমা।'

আবার দুইজনে চাঁদিয়ে আরম্ভ করিল। তোমিনা কি আবিষ্কারিল, একটু পরে বলিল 'তুমি তোমা আমার ছাই; কিন্তু কাউকে যদি তুমি সে আমার গায়ে হাত দিয়ে কপালের তিন পরিয়ে বিয়ের তো সে আমার তোমা বলবে। মনে থাকে তোমা।'

বিদ্বেষ হাসি মুখ মুছিয়াসের মত বলিল, 'সে আমি কাকে বলে তোমা? একটা তোমা আছি?'

আবারও আরও অন্ধকারের দাহিত হইতে লাগিল। পরের মধ্যে তোমা তোমা সত্যসত্যই দুইজনে মিলিয়া যাইতে লাগিল, তোমা চলিয়া তোমে তখনই আবার আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া চাঁদিয়ে লাগিল। তোমিনা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল। পল্লী-মাতির তথা, নদীর, তোমার পরে বাঁধিয়; নিম্নে সহরের কথাও বলিতে লাগিল। বাঙালী তোমেরের কথা। তে এক অন্ধকারী তোমে তাহে মত অন্ধকারিত। তোমিনা তাহাদের বাড়ি খুঁজে তোম হইয়ে যাইত মনে মনে—তাহাকে আমার পরিয়া বলিত, তোমারই—মনে, তোমার তোমারী। সে বাড়ি সুন্দর বলিয়া তাহাকে এই আশায় দিয়াছিল.....হয়তো, সম্ভব, বাঙালীর তোমেরা এত বিশ্বাস হয়ে। তোমিনা বাড়ি আসার খুশিতে।

বিদ্বেষের সাহস বাড়িয়াছে, একটু তোম হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধিও হইয়াছে, পথ চলিতে চলিতে। বলিল, 'বিয়ে কথা আর কি বলেছে। তুমি তো সুন্দরই।'

'বিয়ে যে সুন্দর সে ও তখন বলে—মনে, সত্যকারীর তোমা বিয়ে সুন্দর বলেই আমার প্রশংসা করত।'

বিদ্বেষ ঠিক বুঝিতে পারিল না, এর মধ্যে তাহারও প্রশংসার প্রমাণ আছে কি না।

তোম মনে হইল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একটু বলিয়াছে এবং যে প্রমাণটা এত-সাপেক্ষে, 'তোমরা, তোমরা' ইত্যাদি আসিয়া যে তার মুখে আসাই সম্ভবিল তখনই।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, 'গাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে তোম। ইসমাইলের পরম বিয়ে মুখোমুখি আমাদের গাড়ির তাকা বিয়া। আচ্ছা, আসবার সময় তুমি তত তাড়াতাড়ি করিলে তোম তত ঢেলা? এমন তো তোম...'

তোমিনা একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। পথ করিয়া একলম্বা তোমারী বিয়া চলা সহজ ঠাট্টাচ্ছলে বলিল, 'সত্যি, এসে পড়েছি নাকি? তাহলে তখনে হয়,—এগিয়ে যাও,—তবুও এগিয়ে যাও—'

সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিরক্ত হইতে তাহার সরে উঠিল। বিদ্বেষ অতিমাত্র ভীত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'ও কি! এই তো বিয়া বিয়ে, তাহলে, আমাদের গাড়ি খুব তাল তাকবে, আরও তাহলে...'

সহসাই তোম একটা ঘাড়া বিয়াই—আলবিয়া তোমিনা তাড়াতাড়ি বলিল, 'গাড়ি যে এসে পড়েছে। তোমা তুলসীকে বিয়ে কী তাড়াতাড়ি—'

তাড়াতাড় বিয়ের গাড়ি মধ্য তাকিয়া তোম ঠিক বুঝেই বিশ্বাসিয়া বিয়াইয়া চলন তাকিয়া বিল।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিন্দু মুখোপাধ্যায়

মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিচিত্রতার উপরই প্রধানত কথা-সাহিত্যের সৌধ গঠিত হয়। নানা রসের সমাবেশে গড়া এই সৌধ অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, তার মনে বিস্ময়, ভীতি, কৌতূহলের উদ্রেক করে। কথাসাহিত্যের মধ্যে একাধিক রসের-ভাবের কোন বিশেষ একটি বা একাধিকের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়। তবে একথা সর্বতোভাবেই সত্য যে, বর্তমান এই আত্ম-বিশ্লেষণের যুগে, বিকৃত মানসিকতার হাত হতে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হিসাবে মনে হাস্য রসের যে হাস্য বা কৌতুক রস, তা যিনিই পরিবেশন করেন এবং যাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেই রসের সন্ধান প্রকাশ দেখা যায়, তিনিই নিঃসন্দেহে রসিকাগ্রগণ্য এবং সাধুবাদের যথার্থ।

একদিকে যে হাস্য-কৌতুক মানুষের জীবনকে সম্প্রসারিত করে, অন্যদিকে জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি সেই হাস্যরসের উৎস হলেও সর্বক্ষেত্রে যেখানে যিনি আনন্দের উপাদান খুঁজেছেন, অন্যের বিতরণের উপচার সাজিয়ে ধরেছেন, ইংরেজীতে যাকে বলে 'দি কমেডি অব লাইফ', তা প্রবীণ সাহিত্য-শিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প গুলির মধ্যে এসেছে বহু বৈচিত্র্য নিয়ে —কৌতুকরসসৃষ্টির অপরিসীম ক্ষমতা-কৌশলের সাহায্যে। গল্প ব্যতীত উপন্যাস, নাটক ও রম্যরচনাও তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র ছোটগল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং একথা সত্য যে, তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ অপেক্ষা গল্পগ্রন্থের মধ্যেই সর্বাধিক।

প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ এবং এগুলি প্রায় চৌত্রিশখানি গল্পগ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে। সাহিত্যজীবনের শুরু হিসাবে বিভূতিভূষণের যাত্রা শুরু হয় ছোট-গল্পের মধ্যে দিয়ে, গল্পের মধ্যেই তাঁর ইতিহাস-সন্ধানের সূত্রপাত। তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। সেই সময়েই 'প্রবাসী' গল্প-প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম গল্প 'মেঘমল্লার' পুরস্কৃত হয় এবং প্রবাসীতেই সেটি প্রকাশ লাভ করে। অন্তঃপ্রকৃতির আত্মসৃষ্টি বা লেখক হবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, একথা নিঃসন্দেহে তিনি কখন বলতে পারেন কি যে ভবিষ্যতে সাহিত্যের মাধ্যমে হাস্যরসের সিদ্ধ হস্তে তিনি আনন্দময় সাধারণের অবিমিশ্র হাস্য-কলরোল মুখরিত করে তুলবেন। তিনি লিখেছিলেন :

> সুখে-আনন্দে-রঙ্গ-রসাধি-
> বৃক্ষ-শোভনার তরে,
> কেবা-কদম্ব-জলে-
> পরিপূর্ণ মোদের সংসার;
> হাসি ও আনন্দ লভে, হে বন্ধু,
> দুদিন অন্তরে
> সহজে কেন্দনে সবে,
> ধরাইলে আসার সঞ্চারে।'

এই অনুভূতি নিয়েই তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূচনা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে হাস্য-কৌতুক রসের প্রাধান্য ও তার উপযোগিতা সাধারণের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই হাস্য ও কৌতুক-রসের প্রবাহ তাঁর গল্পগুলির মধ্যে থাকলেও প্রত্যেক গল্পগুলিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এমনটি পর্যালোচনা করলে। প্রত্যেক একটি গল্পগ্রন্থের বিশিষ্টতা বিভূতি-ভূষণের সমগ্র রচনাকেই মহত্ত্বের করে তুলে ধরা যায়। তাছাড়া সংকলন বিশ্লেষণের জন্য যে আকার-প্রকার ও বাহুল্য তিনি গ্রহণ করেছেন, তার ফলে প্রত্যেক-এর স্বাদ ভিন্ন হলেও, আসল যে রস-চিত্র তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তার স্বাদ ও আনন্দে কোথাও তিনি ঘাটতি হন নি। এটা গভীর পরিজ্ঞান ও বিশেষ মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক।

বিভূতিভূষণ একমাত্র কৌতুক-রসেই পরিবেশন করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ও কৌতুক রসের গল্পগুলি বাতীত, নিছিরাম চাঁইস, কমল বা অন্য কোন রসাশ্রিত গল্পও টাঁর অনেক আছে। যাঁরা 'ছেলেটা', 'তৃষ্ণা' বা 'অক্ষয় বট' পড়েছেন, তাঁরা আমার উপরোক্ত উক্তির সমর্থনে সায় দেবেন। হাস্য-রসের বিভিন্ন দিক দেখাতে গিয়ে অনেক স্থলে বাক্‌চাতুরীর সঙ্গে টাঁর গল্পও এসে পড়িয়েছে পাশাপাশি। এর বিশেষত্ব হিসাবে 'নাগলতা' ও 'বিপিন পালা' গল্পের নাম করা যায়।

বিভূতিভূষণকে সবচেয়ে সার্থক-ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, টাঁর কমল-কৌতুক রসের গল্পগুলি বিশ্লেষণে ও পর্যালোচনার মধ্যে। টাঁর প্রথম প্রকাশিত 'কমলের প্রথম প্রেম' ও ঐ শিরোনামের গল্পগুলির মধ্যে। এছাড়া 'মেঘমল্লার' গল্পের ভূলো ভোম টাঁর 'পেনসন' টিটি ও 'নুখুটী' গল্পগুলির তাঁহিরীর মধ্যে আমরা টাঁর হাস্য রসের প্রকাশ। 'কমলের প্রথম প্রেম' গল্পগ্রন্থের গল্পের শেষে একজন বলেছিলেন :

> 'কমলের প্রথম প্রেম হাতে এল
> ছোঁয়া আমার,
> দেখিলাম সৌন্দর্যই অবিকার
> দুঃখ-প্রতিকার।'

মনীষী সব-চেতিকর সার্বক প্রতিভাসের দেখা মিলেছিল বাংলার এই আনন্দ-সুন্দর কলকাতার মধ্যে। অনাবিল পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রকাশ, চরিত্র-চিত্রণের কুশল প্রয়াস এবং আবেগপ্রবণ মনন ফুটিয়ে তুলেছে, সৌম্য মেজাজপ্রসূত হাল্কা ভাষিতে এই বিদগ্ধজনী, বন্ধুবৎসল সাহিত্যের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ।

বহু হাসির ফলন-এর নিদর্শন আছে 'বাসর', 'পালঙ্ক', 'মেজদি' ও অন্য-রোমান্সের কলকাতার মধ্যে। 'বাসরে' ও 'মেজদি' গল্প বাদ দিলে সেকালের ঔপন্যাসিক বিষয়ের হাসিলাভের ফলন কম বলে গণ্য হয়। মেজদির মেজ আদরের ভাইকে বন্ধুর গল্পের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ও আত্মসম্পর্কিত ঔপন্যাসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-ভাবের বিচ্ছিন্ন ভিন্ন করতে পারে। ঔপন্যাসিক পরিবেশের চমৎকারের ঔপন্যাস ও হাসিলাভের মেজদি ঠাকুরমাকে যে-দেবতা আসনে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসেবে অধিষ্ঠিত করে গেছেন, সে-দেবতা বিচ্ছিন্ন-ভাবের পরবর্তীকালে ঠাকুরমাকে মধ্যে সম্পর্কের ঔপন্যাসিক করে তোলে আমাদের মনে হয় না। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবের গল্প যে-দেবতা আমার মেজদি কলকাতার বা অন্যান্য ঔপন্যাসিকের আসনের অধিষ্ঠিত, পরিচয় এবং নিজস্ব ও সৃষ্টির কৌতুকের বিশ্লেষণের ভাবনায়, সে-দেবতা ইমারসিভনেসের একমাত্র ঠাকুরমাকে মধ্যে পরিবর্তী মোক্ষদায়ীর সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নে ভিন্ন অনেকে মনে করে থাকেন।

এই ঠাকুরমাকে মধ্যেই একমাত্রে বিচ্ছিন্ন-ভাবের ও মেজর আনন্দাপাধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের, ইমারসিভনেসের লেখার ঠাকুরমাকে বিচ্ছিন্ন মধ্যেই দেখা যায়, তার মনে হয়ে ইমারসিভনেসের স্থানে স্থানে ঘটে হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবের আলোচনা অতি সূক্ষ্ম।

প্রকৃতপক্ষে হাস্য-পরিহাসের ঠাকুরমাকে দেখা যেখানে, পরিবেশের সেই মধ্যের ঔপন্যাসিক হাসির ঠাকুরমাকে, সেখানে সেকালের অবাধের পরিহার ও সংবাদিক মানস মধ্যের বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা বৈশিষ্ট্য। এমন অনেক মেজর দেখা যায়, যাঁরা হাসির গল্প বলেছেন, প্রেক্ষাপটকারী অটোর সে গল্প মধ্যে মধ্যে মধ্যে পড়েছেন্দাই থাকে, কিন্তু তাঁরা নিজে হাসেন না! বিচ্ছিন্নভাবের ক্ষেত্রেও অটোর ঠাকুরমাকে মধ্যে। অর্থাৎ তিনি গল্প চরিত্রের মধ্যে না হয়েও, পরিবেশের অনেক গল্প বলা, গল্প-চরিত্রের মধ্যের মধ্যে নিয়ে। রোমিন্দ্র বাসী হাসাধিক, 'বি এন মজুমদার' হাস্য সরকার, 'ওস্তা ও আমরা', 'মন্দাকিনী', 'ঘাস সংস্কার' প্রভৃতি গল্প-পরিচয় চরিত্র ঠাকুরমাকে পরিচয় মধ্যে করে।

ঠৈলোক্যনাথের মধ্যে কৌতুক-বিচিত্রের ঔপন্যাসিক গল্পও আছে বিচ্ছিন্নভাবের মধ্যেকটি। যেমন মধ্যে 'ঔপন্যাসিক' মধ্যে বলা সেকালের অধিবাসীদের নিয়ে লেখা পুঁথি মধ্যের গল্প। যার মধ্যে আছে খাঁদা ও 'পলাশি' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও 'আশা' ও 'বৈরাগীর ভিটে' গল্প পুঁথি নিয়ন্ত্রক ঔপন্যাসিক পর্যায়ের গল্প। এ ধরনের গল্প হাসি আনন্দ মধ্য-চার্যাই থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবের কিন্তু ঔপন্যাসিক আনন্দের (মধ্যে) বিষয়কে সর্বথাই মেনে নিয়ে মেজেন।

কৌতুক হাস্য ও ঔপন্যাসিক হাসি মধ্যেই মধ্যের মধ্যে বা বর্ণনার গল্পও বাদ পড়ে নি অবশ্যই বিচ্ছিন্নভাবের মধ্যে। মধ্যেরের বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন ঠৈলোক্যনাথের 'ঠৈলোক্যনাথ' গল্পের কথা বলা যায় তেমনি বর্ণনার মধ্যের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক করা যায় 'মহাপুরুষ' গল্পটিকে।

এইভাবে সুনির্দিষ্ট নিজস্ব বিচ্ছিন্নভাবের মধ্যের থেকে আমরা যদি হাস্য - মধ্যে চরিত্রেই লক্ষ্য করে থাকি, কিন্তু হাস্যরসের, ইমারসিভনেসের ক্ষেত্রেও তিনি একমাত্রে এড়িয়ে যেতে পারেন নি—তাঁর মৌলিক মধ্যের এই বৈশিষ্ট্যই, দ্বিমৌলিকী হলেও, কোন-না-কোন মধ্যে এসেই মধ্যে তাঁর সমস্ত গল্প-সাহিত্যের মধ্যে।

বদলি মজুর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোট একটি টিন লাইন। এক জংশন স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর এক জংশন স্টেশনে গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোটো ছোটো স্টেশন।

তা লাইনের সবকয়টি স্টেশনই দেখিতে প্রায় একরকম।

পরোপ্টে করা লাল ইটের তৈরী ছোট একখানি ঘর, সুমুখে একখানি টাকা বারান্দা, বারান্দার পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার কল, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুলঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের ওপর টেলিগ্রামের কল সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনি স্টেশনমাস্টার—তিনিই সব। আসিস্টেন্টের বালাইও লাইনে নাই। আসিস্টেন্ট বলিতে একজন বাঙালী। স্টেশনেও কম করে, অন্যের মাস্টারের বাড়ির অর্ধেক করিয়া দেয়। মাস্টারের চাকর সাধারণ পরদাটা অন্তত বাঁচে।

কম নয়।

স্টেশনমাস্টার এইচ পি বাদার্জি। আসল নাম হরিপদ। মাহিনা মাসিক্তর টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। স্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পরোপ্টে করা ইটের তৈরী দুখানি ঘরের একটি কোয়ার্টার—হরিপদ মাস্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী বীণাপাণি। ছেলেপুলে নাই। একা মানুষ—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।

বীণার স্বভাবও একরকম নাই বলিলেই হয়। ইস্তাক হইতে রামধনিয়া বাঙালী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীর জন্যেও মাসকাবারি দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না—শুধু দুবেলা দুটি রান্না।

আজ একরকম অসহ্যই। অন্যের মধ্যে সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে আসিবার পূর্বে বীণা ছিল এক পল্লীগ্রামে—মামার বাড়িতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি দেখাও পাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই অল্প বয়সে বাঁচিয়া সে যেন এই মাসেই পঞ্চাশটির অধিক বীণাকী হয়ে আসে। আশপাশে এমন কেহ নাই যে, দুটি কথা সুটো কথা কয়। উপরে ছাদখানের মধ্যে শুধু ঐ খাঁচার মতো ছোটো ঘরখানি এক অসহিষ্ণু যে, দু-দণ্ড দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই—এক লক্ষ্মীর সঙ্গে চাঁপাল কথা কহিতে তাহার ভালোও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময় আসার আসে। স্নান করিয়া ঠাকুর হইয়া খাইতে বসিলে পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলে, হ্যাঁ গো, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদলী আর কি হবে না কোনদিন?

হরিপদর সেই এক জবাব।

বলে, 'কই আর হয়!' বলে, 'দেখ, জায়গাটা তেমন খারাপ নয় তো। সব জিনিসই সস্তা। ডাক-হরকরাটা তো একরকম বিনামূল্যেই দুধ দিয়ে যায়, তারপর তার থেকে ঘরে পাতা দেবার বন্দোবস্ত করেছি, ঘরেই দুধ—একেবারে বিনিপয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি সুমধুর হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। তাকে বীণা ঝিনুকের তাহার এই দুশ্চিন্তাহরণ ভাবিক ভাবিয়ে। কিন্তু ভাবিক কথা দূরে থাক, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে, মেঘে মুখে মুখের আঁচলের পাড়টা সে বাঁ হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মনে হয়, কথাটার যেন সে কানেই যায় নাই। হরিপদ কিন্তু না শুনিয়াও তৃপ্তি পায় না, বলে 'ঐখানে ঐ জানলার গরাদের বাইরে দক্ষিণ দিকে ঐ-যে সে ঐ গাছপালার ফাঁক দা-টা দেখা যায়, ঐ দা থেকে মধুবনের আর পলাশের ফোলো-গুলো সব লাইনের ধারে সোজা চলে আসে। কাঁড় কাঁড় আম কাঁঠাল তো আর কোথাও পাবে না।'

রামধনিয়াকে দিয়ে সোজা ফোলো আনিয়া দিবার আশ্বাস করিয়াছিল। বলিল, 'কলকাতার ছেলেরা ঐ একটা সোজা কি বস্তুর কোনোদিন যদি লাইনের ওপর আসা পড়ে তো হাজার টাকা অফিমানা—একেবারে 'অনোমাটি' উল্লম্ফ হয়ে যাবে। তারা তো কেলেই ফাঁপিয়ে। বলে, পাকে আম কাঁঠাল এক আঁটি খড় নাই হুজুরে, সোজা 'আমার' নাই, ছেলে পিলেই সেটার জন্যে হা-হা করে, সোকের কলমুল দিয়ে মুখে, এই লাইনের ধার ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই হুজুরে।'

বলিলাম, আমি তো তোমার হুজুর ভেবেছ তো, তামাক আমার লাগে? রামধনিয়া এক সের আনিয়াছিল, কিন্তু এক সের আর হলো না, সেরে আর সের ঘরে খাটি দুধ, ঠিক হলো যে, এরা নিজেরাই এসে কাল সেরে পৌঁছে দেবে।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, 'কেমন ভালো হয়নি?' হাসিয়া এক-বার ঘাড় নাড়িয়া বীণা সীকারে সে-কথার জবাব দেয়। কিন্তুক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া খাইতে দেরি তো হরিপদর চলে না।

রামধনিয়া দুটিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'বাবু, টেলিগিরাপ...বাবু! সেদিনের মতো হরিপদের খাওয়া ঐখানেই সেরে।

হাতে জল ঢালিয়া দিয়া পাশ আসিয়া যে বীণা তাহার হাতে দিবে তাহারও অবসর নাই। পাশ ঐ রামধনিয়ার হাতে দিও।' বলিয়া হস্তদন্ত হইয়া হরিপদ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। আবার কখন ফিরিবে কে জানে।

বীণা তাহার জানলার আবাটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাসেঞ্জার ট্রেন হুস হুস করিয়া স্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। কোনোটা বা এই দিক দিয়া, কোনোটা বা ঐদিক দিয়া। কিন্তু যেদিক দিয়াই যেমন, তাহার এই জানালাটির পাশ দিয়া সকলকেই পার হইতে হয়। এই ট্রেনে চাঁড়য়াই সেই যে আই বৎসর আগে সে এইখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর কোনো দিনই তাহাকে ট্রেনে চাঁড়তে হয় নাই। ট্রেন দেখিতে তাহার বড়ো ভালো লাগে। জানালার কাঁটিক মুখ বাড়াইয়া ট্রেনের বাড়ীরা তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের সুমুখে দিয়া পার হইয়া যায়। বীণার দুটি ক্ষুধিত আন বড়ুলা চক্ষু পরম ঔৎসুক্যভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনোদিন হয়তো একটি মুখের চোখাচোখিতে সারাদিন মনে করে তাকে, আবার কোনোদিন বা সব মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে

করিয়া রাখিবার মতো একখানি মুখও তাহার চোখে পড়ে না।

ট্রেন চলিয়া যায়। বীণা দেখে নিস্পন্দ-নিস্তব্ধ শূন্য প্ল্যাটফর্ম, এদিকে ওদিকে ঘাসে, ওপাশে ঐ মাঠের ধারকাছে গাছপালার ছায়া যেন একটুখানি ঘন—দূরে—বহুদূরে মাঠ-প্রান্তের পর হইতে নিচু আকাশ ঘুরিয়া-ফেরানি রাখার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

বিদায়-উন্মুখতার অনুভূতিটা যেন ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাঠের মাটি ক্রমিয়া চওড়ি হইয়া বিছাইয়া পড়িতেছে। দূরে দূরে দূরে গ্রামগুলির মাথার উপরে ধূসর আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নিজের পর নিজ, কতদূর পর কতদূর ছড়াইয়া আছে, বীণার চোখের সম্মুখে তাহার ঐ সমস্তটা অত্যন্তই অপরিচিত বলে পরিবর্তিত হয় যেন।

কাল সকালেই কিন্তু আমার চলে যেতে হবে হরিপদদাদা।'

'আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। তুই বোস, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বল, ততক্ষণ আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ স্টেশনে চলিয়া গেলো।

বৌদিদির চা তখনো হয় নাই।

একটা ঘরের মধ্যে একাই যা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া।

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। যাঃ! এখনও লজ্জা ভাঙি? না বৌদি, তাহলে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সে সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেন যাবে কেন ঠাকুরপো? বিয়ে অবশ্যি নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না বৌদি, বিয়ে আর হলো না। হলে আপনাকে নেমন্তন্ন করব। যাবেন তো?'

বীণা বলিল, 'কেন যাবো না?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটিটি বীণা সুকুমারের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ভালো চা হয়তো হলো না ঠাকুরপো; তা কি আর করবে বলো, ঐ খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া সুকুমার বলিল, 'বৌদিদির হাতের তৈরি এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভালো চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চায় না।

'রাত্রে তুমি কি খাও ঠাকুরপো? লুচি করে দিই খানকতক, কি বলো?'

'সেসবই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনোদিনই খাই না, আমি ভাত খাবো।'

বীণা বলে, 'ভালো হরিতকারীর ব্যবস্থা কিন্তু নেই ঠাকুরপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন মজাদার আমসা—কিন্তু খেলে না।'

সুকুমার বলে, 'এবার আমি চাল করব বৌদি, এ কী আরম্ভ করলেন আপনি? অত লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।'

বৌদিদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর বোঝ আমাকে? পর ভেবে হঠাৎ এসে পড়েছো, আর হয়তো এই বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

সুকুমার বলে, 'থাক। ভুলভ্রান্তির জন্যে বৌদিদি-ঠাকুরপো নয়। আপনাকে একবার যে দেখে, সে দ্বিতীয়বার আর জীবনে ভোলে না।'

এ-কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া সুকুমারের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া সেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক।'

তাহার পর দুজনেই চুপ।

সুকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। বাটিটি হাতে লইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি এবার বোধহয় ক্ষমা চাইবেন? আমি এইখানে বসে থাকলে আপনার লজ্জা করবে না তো?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে চৌকাঠের কাছাই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, 'ভালো করে এখানে ছেপে বোসো ঠাকুরপো, তোমার কথা আছে।'

সুকুমার ভালো করিয়াই চাপিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা; বীণা বলিল, 'সমস্যা হয়েছে ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভালো করে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও। খেতে হয়, কাল যেও।'

এ-অনুরোধ এড়ানো শক্ত। অগত্যা রহিয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইল।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়াছিল, সকালে হরিপদ তোমা হইতে একটা মায়া সংসার করিয়া রামবলিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিল, 'আপনাকে দেখছি স্টেশনের সব জানই অবশ্যে হয়, যাক্ এসে যে দু-দণ্ড বিশ্রাম করবে তারও ফুরসৎ পেলে না—না বৌদি? একা একা আপনার দিন আটে কেমন করে বলুন তো?'

বাহিরে যাইবার পাঁচটা আছে, তাড়াতাড়ি সেইসবে ফুটিবার অবসর না করিলে একলাই হয়তো কাকে দুঃখ দিবে, তাই সে সজল একটু হাসিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

আপনাকে যে সুকুমার বুঝিল না তাহা নয়, কথাটা বলা হয়তো তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিয়ৎক্ষণ জানলার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার নীরবতাও বীণার ভালো লাগিল না। মাছটা কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলিয়া বলিল, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিল, 'কলকা করবো আপনার সঙ্গে।'

বীণাও হাসিল। বলিল, 'করো না। পারবে?' বলিয়াই সে জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিল, 'যাই একটু স্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিল, 'এসো। খাটার ছেলের কাল থেকে বাস করে জীবন যোবনার তোমার হাসিয়ে উঠেছে।'

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল মাত্র।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবেন যে?'

সুকুমার বলিল, 'আমার বাঁধ এই একদিনেই হাসিয়ে ওঠে, আপনার তাহলে আট বছরে কী হওয়া উচিত?'

অভিমানভরে বীণা বলিল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই মেয়েমানুষ, আমাদের উপায় কী?' বলিয়াই আবার একটু হাসিয়া বলিল, 'বৌদি ফৌদি বলো না, আমি চা তৈরি করে আনব।'

তৈরি অবশ্য বৌদি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, চাকর ঝাড়া বাড়িয়া মস্ত হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া বারান্দা খুলিয়া দিলো।

দেখা দেলো, বীণা যেন করিয়া গা ধুইয়া ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভালো একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায় দিয়াছে, পায়ে আল ঈষৎকে আলতা; হাতে অনেক গয়না সোনার চুড়ি, আবাকাপড় হইতে ভুরভুর করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে। কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ তাকাইয়া থাকিতে হয়। সুকুমার বলিয়া উঠিল, 'যাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না বৌদি!'

সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিল, 'কেন? অপরাধ?'

সুকুমার বলিল, 'অপরাধ নয় বৌদি, তাই চারা আদুরের ছাই উড়ে গেলে যেমন আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমার দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম দুঃখ-পুরো উপেক্ষাদুপেক্ষা, মলিন একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিল না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নতুন মানুষ বলে বোধ হচ্ছে।'

'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হলো ঠাকুরপো, আমার দুঃখ নিয়ে কবিতা করতে নিয়ে 'আপনি' 'তুমি'-তে যে ঘুলিয়ে ফেললে।'

সুকুমার বলিল, 'তা হউক বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না বলা যাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারি ভালো দেখাচ্ছে। দেখো তো পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়। আজ তোমার ও-পায়ের উপর প্রণাম করতেও সুখ।'

বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

'যাঃ হাসালে যে বৌদি? আমি কি বিয়ে বসলাম?'

'যা, সেজন্য হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ ছেলে বেলায়। বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে এখন কখনও করে নেই কে জানে। তখন কী আলতার আদর! ঐ দেখো।' বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া বাড়াইয়া তাকের উপর যে তিনিসগুলি দেখাইয়া দিল, সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিল না। বলিল, 'কী ওগুলো?'

বীণা মুচকাইয়া বলিল, 'আমাদের ঐ ইস্কাবনের পাশে কতগুলো কপটিমমার গাছ আছে দেখেছো? ঐ গাছের ওগুলো ফুল কি ফল জানিনে ভাই, ছোটবেলায় আমরা ঐ দিয়ে আলতা পরতাম। আজও হঠাৎ আলতা পরার সখ হওয়ায় সমস্ত দুপুরবেলা ঐগুলি ফেটে আনালাম। আমি বিশ্রী কাজ, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরুতে চায় না। তাই খুব সাবধানে ঐগুলো বেছে বেছে টিপে টিপে বার করে

হল বিয়েতে আমরা যখন আসি পর্যন্তিলাম, তখন তুমি বড়মার কাছে নাড়লে। আঁচলেতে হাসি চেপে তোমার আমি ধরলা খুলে দিলাম—বাঁচাও তাদুলের ছেলে দিই।'—বলিয়া পুরী কলহিলাসার ফলদুলো ছেলে হইতে তুলিয়া লইয়া বীণা হাসিতে হাসিতে তলিলা ফলগুলো বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, 'ওটেই এমনি, তা না আনি সাঁতারদের আলকা পাহাড়...'

হাত বাড়িয়া বীণা বলিল, 'যাওয়ে।' বলিয়াই একমুখ হাসিল। চুমিল, আর, এত চলনো যখন করলে, তুলুন, তোমার এত সেবালা চা আমার সেবাটি এনে দিতেই হলো। উঠোন আমার ধরে গেছে। বেশি দেরি হবে না, যেয়ো।'

বলিয়া বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

মিনিট কয়েকই সুকুমার সেইখানেই বসিয়া বসিয়াই বলিল, 'চলনো নয় যেতি, সামনে তোমার সাঁতা পড়ে সুন্দর দেখায়।'

জবাব হইতে জবাব আসিল, 'কিন্তু তাতে তো কিছু লাভ হবে না ঠাকুরপো, তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে করো। মেয়ে দেখবার ভারটা না হয় আমার হাতেই দিও।'

লজ্জায় সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মানিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না যেতি। সে-জন্য না জানেও খুবতে নিশ্চয়ই পেরেছো। আচ্ছা, তোমার পথে যদি পাড়ি তো না হয় একবার...'

'এসো।' জবাবটা বীণার মুখে দিয়া আর বাহির হইল না। সুকুমার যে এত শীঘ্র ঘটার আসার চলিয়া যাইবে, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দিয়াছিল।

হরিপদ ইহারই মধ্যে স্নানের ঘরে গিয়া পড়িয়াছে। হরিদাসী বলিল, 'খুকী তবে আজ সুকুমার, আসার আর পড়িবার সময় নেই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেলো।

বীণার বাড়ির পাশ দিয়া যে পাড়ি পথ হইয়া যায় এ দুদিন বীণা সে কথা ভুলিয়াই ছিলো; আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবার দুটি তাহার সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

মানিকগঞ্জ যাইবার পাড়ি পথ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে। পাড়ির আরোহীদের মধ্যে ছিল সুকুমার আরও পনর ষোলটি যাত্রী, আর সেই বড় পথের অবসান পর্যন্ত বীণা ছিল তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু প্রসারিত করিয়া, আকাশে ছিল অজস্র তারকার সম্ভার, পাড়িতে ছিল আলো, অন্ধকার কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বীণার আঁচলের তলে দুটি চক্ষু-তারকার সম্মুখে ছিল সুকুমার চোখের পর হইয়া গেল।

সুনো গাছ আবার হেমন্তি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন। দুদিন দিন পর আবার সুকুমারের ফিরিবার কথা। বীণা তালায় তারে বসিয়া বসিয়া ছেঁড়া দেখে, আর তারে, আর দিন গোনে!

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে অপরূপ-ঐশ্বর্য তাহার চোখের সম্মুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ পড়িলেই সে সকল তাহার মনপ্রাণকে মুগ্ধ করিয়া অতো আসিয়া উঠে, সেইটুকু দেখিবার এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে—দক্ষিণের মাঠে একটি ছেলেমেয়ে পালাপালি গায়ের নিচে একটি উঁই-এর ঢিপি, পশ্চিমে ছোট একটি ডোবার ধারে ঘাস জল করিয়া আছে, তাহারই এক কোণে একটি জল সাপলার ঝাড়, জলসত্রের দুইটি পাখুকে সেখানে রোজই ঘুরিয়া থাকিতে দেখে, ডোবার ভিতর একটি ডুবুরুলপাতি বোধকরি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। ভিতের কোনার তাহারা ডোবার ধারে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই তাহারা দুইটি তাহাদের সন্ধ্যাসভাতি লইয়া ঐ সাপলা ঝোপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সুকুমার বীণার মাথের তিনটা আঠ বাস দিয়া চতুর্থ মাসের আলটা বাঁধা। দূরে একটা পুকুরের পাড়ে পাঁচিলটি তালের বাগ, বাঁধল দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে দিনের সূর্য সেইখানে দিয়া সোঁছিলেই তাহার মন হয় বলে—বীণা তখন বুঝিতে পারে, সুকুমার হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল তার এ-সবের দিকে যেন নজর নাই, আজকাল সে দেখে শুধু মানিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেন। ট্রেনের জানালাপথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে। নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসে। অনুমুহূর্তে সে মনে মনিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মালবাড়ি কি পাসেঞ্জার।

দুদিন যায়, তিনদিন যায়, চারদিনের দিন—উতলও সে আশা আছে না, মনে হয় সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া গেল সপ্তাহ পার হইয়া গেল, সুকুমার আসিল না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না তবুও, ছেলেটি বেশ ভালো ছেলে, তখনার তখনার করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করে। যে-মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয়তো তপস্যা করিতেছে। নিজের যেয়েমানুষ বাড়ির দিয়া এখানে তাহার এসবই বা কী আকর্ষণ যে, বলিয়া বলিয়া দুদিন সময় করিয়া যাইবে। আসিতে সে পারে না, আর যেসই-বা আসিবে, আর সেই বা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো তাহার আসিবার কথাই বা ভাবে কেন?

হরিপদর জামাটা বড়ো ময়লা হইয়াছিল, বীণাকে সে সেদিন ডাকিয়া বলিল, 'জামাটার আজ একটু সাবান দিয়ে দিও তো।'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লাইফ বাইবোঁয়াইল, পকেটে কিছু, আছে কিনা দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই তার মতো কী একটা, কড়ে হাতের হাতে ঠেকিল—এটা কি গো?'

তিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিল—লাল কাগজের বাক্সে মোড়া তরল আলতার শিশি। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গো, এটা তুমি পেলে কোথায়?'

আহারাদির পর হরিপদ একখানা পত্রিকা লইয়াছিল, বলিল, 'যেখানে, কতিকম ছবির ফুল। আজ চারদিন ধরে ভাবছি ভাবছি করেও ফুলে যেতি। সুকুমার সেদিন রাতের ট্রেনে মানিকগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছিল, গাড়ি থেকে আলটি ফেরে তোমার জন্যে ঐ আলতার শিশিটি দিয়ে গেছে, এত করে বলনাম তা কিছুতেই শোনল না, বললে, বড়ো জরুরি কাজ আছে দাদা, আজ আসি।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটা বীণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। দুলিয়া দেখিল, চমৎকার আলতা! অনেক দিনের!

দুদিন পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমারের আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্তকাল। পলাশের ঝোপে, লাইনের ধারে, যেখানে সেখানে বসন্ত জাগার কোকিল ডাকিতে সুরু করিয়াছে। এমনি দিনে হরিপদর বদলির পরওয়ানা হইয়া আসিল।

বদলি হইয়াছে চন্দ্রকান্ত এক জংশন ষ্টেশনে। সেখান হইতে মোটর পথে যায়। বীণার বাপের বাড়ির কাছেই।

কিন্তু সেইখানে কী হয়, বীণার মেন এখন আর সেদিকে মোহ নাই। গত তিন-চার মাস তাহাকে মাতালিয়া রাখিয়াছে। অত সুখ তাহার এই অল্পদিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র গাড়োয়ানিয়া বাঁধাছাঁদা করিয়া দিল। লরি আসিয়া গোরু ঘরপত্র দিয়া করিতে লাগিল। যে স্নান পরিষ্কার করিবার জন্য বীণা একদিন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পর বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বীণার চোখে জল আসিল।

জংশন ষ্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়িখানা বড়ো, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেকট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, সাহেব মেম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝোপঝাড়ওয়ালা পহরের মতো আরগা। লালফুলে ভরা প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ সম্মুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন? হয়েছে তো এবার?'

বীণাও স্নান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, হ্যাঁ।

হরিপদ বলে, 'আসলেই হলো। এখানে এসে পরীক্ষাটা তোমার সামনে এবার। ছেলের

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের জন্য

সুলেখা
স্পেশাল
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়াল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্রাউন

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক, নেভি ব্লু
ও সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়াল ব্লু, এমারেল্ড
গ্রীন ও স্কারলেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
ব্লু-ব্ল্যাক ★ ব্ল্যাক
রয়াল ব্লু ★ রেড
গ্রীন ★ ভায়োলেট

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২

এখনকার মতো ভয়ানক ভয়ের কারণ, আমাদের এখানে থেকে যেতেও তো বলি।'

বীণা বলে, 'না গো না, আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এমনিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে যেদিন গায়ে ফুল চন্দনাদির সহিতই বীণা ভাহার বেশ বিচিত্র করিয়া এঁকে, সেদিন অন্তত হয় না, অথচ দিনের দিনের দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদেরই যেকোনোদিনে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম করে, স্নান করে, খায়ও খুব—অথচ দুদিন দুর্বলতা স্বামীকে যেকোনোদিন যেকোনও কথাই বলে না।

পাছে না খেতে খেতে স্বামী-হরিপদও নিজের কাজকর্ম ফেলিয়া বসিয়া থাকে, তাহার আশিবার জন্য সে তুলিয়া দেয়।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর হোমিওপ্যাথি ওষুধ 'ডিটারি' পড়ে, নিজের বেশ পড়িয়া পড়িয়া খাওয়ায়।

সেদিন সে অফিস যায়নাই, ডাক্তার আসিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা একদম কাঁদিয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বলিল, 'ওকে আমার ওষুধ এনো।'

সেদিনের পর তিন চারা দিন অপেক্ষা করিয়াও হরিপদ বীণার কান্নাকাটি আর থামাইতে পারে না।

শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সেদিন ডাকা হইতে বীণা বলিল, 'এমনি তুমি রাত দেখেছো, যাও স্নান করো গে, ওকে নিজেই চারটি ফোটাও থেকে—কী আর ওষুধে ওষুধি.....' বলিয়া সেদিন ডাকার রাজকুমার হাসিতে হরিপদ হাতখানা বীণা ডাক্তার আদরের মতো করে হাত দিয়া বসিয়ে দিয়ে করিয়া ফেলিল।

সে কথা হরিপদ ফেলিতে পারিল না।

পরিত্র, আমিই ডাক্তার আসছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই আর বাড়িয়া পরিয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'খেলে? ডাক্তার ওকে খেয়েছো তো? কালের সেই বড়ো বাটিতে বাহার ঝোল ছিল, আলু-কলা সেই সাদা ভাতে—'

অন্যমনস্ক হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, বলিল, 'খাই গো খাই, সবই খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে ঘুমাও তো। আমি ডাক্তার থেকে আসি।'

বীণা ডাক্তার মুখের ডাক্তার দুলিয়া বলিল, 'যা, তুমি যেও না। ডাক্তার ডাকতে হবে—ডাক্তার ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে ডাক্তার স্বামীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার এক পান জল দিয়ে তুমি ঘুমাও। তোমার আবার ঘুম ডাক্তার হবে।'

হরিপদর জল আজকালই হরিপদ পারিবে বুঝিতে।

বৈকালে ঘুম ভাঙিয়াই দেখে, বীণা বসিয়া বসিয়া একটা খাটো ব্লাউজ কি একটা সিলাইতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, 'একি! ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিল, 'ঘুম ডাক্তার আরেকটুখানি সেরে নেয়।'

হরিপদ বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'সত্যিই হলে আমি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ পায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার পায়ে হাত দিয়া দেখিল, সত্যিই তাই। ঘরে ডাক্তার বাড়িয়া গেছে।

বীণা বলিল, 'ডাক্তার দিয়ে দেওয়ালে। কী খাই বলো দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। আদর পায়ে দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও আমে ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকি।' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'অবশ্যিরিয়া-পুরোনো অনুর, ৩-অমনি আসে আর যায়।

খেতে দিও, কিন্তু একদম ভেবে পাঠাতে পারলে ভালো হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিল, 'ভেবে? পাঠালেই পাঠালে চলে?'

ডাক্তার মাথিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।' বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিল।

ডাক্তার আসি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে, দেখো, আমি কিন্তুদিন না হয় ছোটোদেরই খাই, আমার খেলোও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিন কতক বাপমায়ের কাছেই থেকে এসো গে, যেমন?'

বীণা বলে, 'যা গো যা, আমার কিছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ হাস করিয়া বলে, তোমার সঙ্গে কে পারবে বলো। বেশ থাকো, এমনি করে মনে আদুরে আর আমাদের ডাক্তারের করো, তারপর একেবারে সন্তানবতী হয়ে পড়ে থাকবে, এখন ছোটোদের দেখে কিছু না, তখন আমায় নিজে ছেলে দেখে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'যাও যাও, নিজে ছেলে থাকার মোকাটি কেমন! তখন তুমি আর-একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। হাস করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার হাস ভাঙাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বলে, 'যা গো না, হাস করলে? না না, বিয়ে তুমি করবে না আমি জানি। তোমার বিয়ে-করবার সময় কোথায়?'

এবার করিয়া হাস-পরিহাসের পালা চলিতে চলিতে বীণাকে একবার ডাকারী হইয়া হইল। বলিল, 'আমার ভয় হয়, আমার বিয়েই এসে আদু, পরীক্ষা না হয় সারিয়েই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

বীণা বলিল, 'আমার যা ডাক্তার দিবি ভয় করে—এমনি না কি! ছোটোদের আবার আদুর খাই। তার চেয়ে এক কাজ করো, এখানে একটা চাকরী ডাক্তার পাওয়া যায় না?'

হরিপদ বলিল, 'আচ্ছা তাই না হয় একটা বাদুরে-টাদুরে দেখে ডাক্তার করা যাবে।'

বীণা বলিল, 'যাবো নয়। তোমায় আমি খুব ভালো করে চিনি। সকেটে প্রালভার দিলি রেখে, যে চারদিন ভুলে যায়..... যাদুন তুমি একটা নিয়ে এসো-টেসো। তাকে আমি লেখাবে-পুড়িয়ে বিয়ে, দু-দিন বসা ডাক্তার, আমি লেখি— ডাক্তারের.....'

হরিপদ এক ডাক্তারকে পাওয়া গেল। নাম বটকৃষ্ণ। সেখান হইতে ক্রোশখানেক দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ি। বাইশ ডাক্তার। অবস্থাও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর স্বামীকে তাহার হাতে ডাক্তার হাত দিয়া ডিন সময়ে স্নানাহার করিবার বিষয় করাইয়া ডাক্তারিল যে, সে বাইতেছে বটে কিন্তু মোটেই সেখানে বেশিদিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

'যাহা আমি নিয়ে যাব না। ৩,-চারখানা কাপড় আর তোমার ঐ তিনের হাতব্যাগটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তারপর দরকার হয় আমীরা দেখে, সেজন্য ভেবো না।'

তিন কয়েক পরে একটি তিনের ব্যাগ লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার আমীরার কাছে রাখিয়া আসিল।

বাপের বাড়ি কাজেই, কিন্তু সেখানে তাহার মা৩ নাই বাবা৩ নাই, তাহার বাড়িতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার আমীরার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া উপায় কী?

বীণার চিঠি আসে—সে ভালোই থাকে। মনে একটু-আধটু, মাঝে মাঝে আসে যায়, কিন্তু সে,কিন্তুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি-পড়িয়া হরিপদ খুশি হয়। আহা, এতদিনের সাধ তাহার—বরাবর হইয়া বসিয়াই না সে তখনও সেখানে আসিল, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে সুখে স্বস্থ করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতোই হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই তরো অন্য।

এক মাস পার হইতে-না-হইতেই বীণার আমীরার কাছ হইতে চিঠি আসিল। বীণার ছেলে অসুখ হইয়, ডেমনি জ্বর আসিতেছে, কিন্তু চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিতেছে, এখনও কম হয় নাই, কাল জ্বর একটু; বিকারের মতো হইয়াছিল, খুব বকিতে বকিতে হঠাৎ বাকরুদ্ধ হইয়া গেছে, জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি যাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।'

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। অবশ্যই, সেইখানকারের কাছে গিয়া ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেনে চড়িয়া বসিল।

ট্রেনে চড়িতে চড়িতে হরিপদর মনে হইতে লাগিল, তবে

সে ঘরে ঢুকিল। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার সাহস হইল না। ফোয়ারার ধারে মুখ নিচু করিয়া মাসীমার অন্য সকলের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেলো মাসীমা নিজেই সকলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া ধরধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজি অনেক মাসীমা বলিলেন, 'ঘরে যেয়ে যাও, বাবা ডেকে গেছে।' আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে, হাঁটু দুইটা ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছে। এমন অকস্মাৎ সে যে চলিয়া যাইবে কে জানে!

মাসীমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার বৈধব্যে যিনিই সেইখানেই ভাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেখা গেলো, অবলাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখের অরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক লাল চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মতো হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাসীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার সময় কিছু বলে গেল না বাবা, শুধু কাল কাল করে চেয়ে রইলো।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্ধ-মুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে প্রায় তাকাইতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া দুমড়ে করিয়া উঠিতেই সে মাসীমার পদপ্রান্তের মুটোইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে সে চারটি মাসীমা, আমি ওকে ভোর করে পাঠিয়েছিলাম।'

নবীতীরে অবাধে বীণার মুখখানা দেখিতে দেখিতে চোখের সুমুখে পড়িয়া ঝাপসা হইয়া গেলো।

হরিপদকে মাসীমা বারম্বার করিয়া স্নানাম হইতে বাড়ি ফিরিতে বলিয়াছিলেন, লোকজনীরাও বারে বারে তাহাকে স্নানে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ তাহার কথা শুনিল না। অবলা তখন তাহার ঠিক পাশটির মতো। বীণার-হাতের আইবাধি সোনার চুড়ি ও অঙ্গের গহনাটি লইয়া নিজে কাপড় পরিয়া নিজে আমরা তাঁরে ফেলিয়া নবীতীরের পথের উপর দিয়া হরিপদ চলিয়া গেলো। শুশ্রূষিত আজার পিছনে পিছনে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া কাঁচারাটি একটা ঢেলার মতো খানিকটা চিন্তাভগ্ন ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'পারো তো এটাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও, বুঝলে? দিতে হয়।'

মাটির গুলাটি হরিপদ হাতে করিয়া গ্রহণ করিল।

ষ্টেশনে চড়িয়া হরিপদ তাহার নির্দিষ্ট সেটখানে বসিয়া বাহির দিকে চাহিতে লাগিল, চক্ষু সজল হইয়াছে। ফেলাইটের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা স্টেশন পার হইতে হয়। তাহার উপর দিয়া হরিপদ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কিন্তু কিছু দূরে এই ষ্টেশনের কয়েকজন মালবাহি হইতে প্রচুর ডিনামাইট চুরি যায়, তাই এখন এখানে অন্ধকার পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ি। অদূরে 'লোকো-শেড'। কালো কালো প্রকাণ্ড দানবের মতো ইঞ্জিনগুলো হুস হুস করিয়া চারিদিকে ধুমোদ্গিরণ করিতেছে। ওদিকে ইলেকট্রিকের ইঞ্জিন ঘর, ওদিকে কারখানা, ওদিকে মস্ত, ওদিকে জল। শুধু লোহা আর ইস্পাত। শুধু শব্দ আর আগুন! হরিপদর আপিসটা যেন মাইলখানেক। কলের মতো লোকগুলো, চেহারাগুলো কাজ করিতেছে। মনে হইল, সে নিজেও ঐ কয়েকখানার সামিল। মনের মতো পরের ইঙ্গিতে সেও তাহার এই অন্ধকারী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মতো হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে একটু ভোগিবার অবসর পর্যন্ত নাই। বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হুহু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—নবীতীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা। আর সেই ধূম, সেই আগুন, আর সেই নিঃসাড় নিষ্পন্দ বীণার দেহখানা!... হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া হরিপদ সেই ফুলফুল গন্ধের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের পথটায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কোয়ার্টার। এইখান হইতেই সে জোর করিয়া বীণাকে মাসীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। ঘরের দাওয়ায় একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিল,—অভ্যাস মোকদ্দমাটি বারান্দার আদুর বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইল না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। জিনিস কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা আর হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠিক করিয়া কিসের যেন শব্দ হইল। হাত দিয়া দেখিল, বীণার চুড়ি। বীণার চুড়ি ও দুল সে বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিয়া আসিয়া খাটের নিচে ঝুলিবের তলা হইতে তাহার চাবির ঝোলাটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিল। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতে সাজানো জিনিস। কিন্তু একি। থাকে থাকে কাপড়-জামা সব যেন তছনছ। মনে হইল সব যেন ঘরে ছোপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটি ভালোকরিয়া রগড়াইয়া লইল, দেখিল, না, চোখের ভুল নয়, সত্যই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল বাক্সের একেবারে নিচে ছাপিত সুকুমারের সেই আদরের নিদর্শন। তাহারও ছোপানো সব লালচে লালচে ছাপগুলা পড়াইয়া পড়িয়াছে।

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিল, হাতানী দেওয়া ছেলে ছোপানোর একটা লাল খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মতো কী যেন লেখা হইয়াছে, কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। বীণার হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি। কিন্তু চিঠির অধিকাংশ লাল আলতার দাগে জলন্ত।

একখানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে লাগিল। লেখা আছে—

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেক-গুলি অক্ষর ভাই! তাহার পর লিখিয়াছে, তোমাকে যে চিঠি লেখো কিন্তু ঠিকানা জানি না যে।'

সে চিঠিখানার আর কিছু পড়িবার উপায় নাই।

আর একখানি চিঠি! আরম্ভেরও মর্ম লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েক লাইন... লিখিলে আমাকে ভালো দেখায়। তুমি যে আমার আলতা পরিয়া ভালো করিয়া লিখিতে বলিলে, কিন্তু আমার তখন লিখিবার ভাই? কে দেখিবে!

চাঁদনরাতী সে তাহার কাছে পাইয়া বসিত যাকে তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে নাই!...'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেলো। মাথার ভিতরটা ঘোঁ ঘোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার দুই দৃষ্টির চক্ষুর সম্মুখে মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লাল রঙে যায়া হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে অজস্র ইলেক্ট্রিক আলো ঝোলা, কলকারখানা, টেলিগ্রাফের তার আর অন্তহীন কর্মী... ওদিকে দুইজন মালিক, এদিকে ষ্টেশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, লরীবোঝাই, ডিজেল, লরীর ঘরঘর.....

ষ্টেশনমাস্টার আসিয়াছে বীণার অসুখ, বীণা ঘাস করিয়াছে, বীণা চলিয়া গিয়াছে। সত্যই তো! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!...

কোয়ার্টারের মাঠে সন্ধ্যা নামিয়া বস্তীর এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উহার ঘুমও ঘুমাইয়া প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, ঘরে কোন্ সময় আসিয়াছিল তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাক্সের ডালি খা, ডালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সের জিনিসপত্র ওলটপালট ইতস্তত ছড়ানো, আর তাহারই মাঝখানে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

আর—পাশের বাড়ির একটা সালোয়ার-এলটা সেমিজ বিড়াল বীণার সেই অস্থি-পিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট লেখক

শৈলজানন্দ কথাসাহিত্যিক হিসেবে যখন বাংলা সাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন সাহিত্য তখন এক পর্যায়ান্তরের যুগে।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীব্যাপী চলছে বৈপ্লবিক, নিয়মভাঙনের ও মূল্যবোধের বিপ্লবাত্মক বিশ্বাসের তখন উদ্দামবেগে ভাঙন-ধর্ম। সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং অবশ্যম্ভাবে ফলে সাহিত্যেও এসে লাগে ভাঙনের ধাক্কা।

ইউরোপের সাহিত্যে তখন এই সমাজ-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মূল্য-মানের ভাঙা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিন। সাহিত্যে সে বিদ্রোহ প্রতিফলিত হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজের মূলোৎপাটন, প্রচলিত নিয়মনীতি ও সেকালের রীতি-প্রকরণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে। পুরাতনের সব কিছু অস্বীকারের মনোভাব।

কিন্তু এই অস্বীকৃতির বিকল্প হিসেবে বিদ্রোহীদের হাতে তেমন অস্ত্রশস্ত্র সমস্যে না থাকায় এই বিদ্রোহ বেশির ভাগই ছিল মানসিক অনুভূতিসার।

সাহিত্যে এই বিদ্রোহী ভাবনার মূলে মূলধন ছিল সেদিন 'কল্লোল'। সহযোগী—'কালিকলম', 'প্রগতি' ও অন্যান্য কয়েকটি সহযোগী পত্রিকা।

বলিষ্ঠ শৈলজানন্দের প্রথম গল্প 'কালা-মুটি' প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৯) এবং একই বছরে প্রবাসী পত্রিকায় কল্লোলযুগের পটভূমিতে রচিত রেজিং-রিপোর্ট ও অন্যান্য কয়েকটি গল্প পাঠকদের দৃষ্টিগোচর সমাদৃত হয়ে ওঠেছিল, তবে পত্রিকার মাধ্যমে কল্লোলের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠ সহযোগী শৈলজানন্দকে পরবর্তীকালে কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শৈলজানন্দ নিজেও কল্লোলের এককাল আমার উপেক্ষাও। আলি-কলমের মল্লযুদ্ধের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এবং এসব পত্র-পত্রিকায় তিনি ছিলেন অন্যতম লেখক।

কিন্তু নিঃসন্দেহ সাহিত্য-বিচারে শৈলজানন্দকে যেমন ঠিক পূর্ণাঙ্গ কল্লোলিয়ান লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। কল্লোলের সঙ্গে তাঁর যেটুকু যোগ তা বহিরঙ্গিক ধর্মের; মর্মের নয়। কল্লোলের চিন্তিত প্রোক্তাদের তিনি হয়তো ছিলেন সমবয়, কিন্তু শিল্প-চেতনা ও জীবনদর্শনের আপন পরিচয়ে শৈলজানন্দ ছিলেন স্বতন্ত্র।

শৈলজানন্দের সঙ্গে সমকালীন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের আপাত মিল ছিল একমাত্র বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্যে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, পুরোনো অভ্যাসে পা না ছাড়িয়ে সব শিল্পীরাও নিত্য-বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র রীতি-নিরীক্ষার দিকে পা বাড়ান—এ ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। কল্লোলযুগের লেখকরাও সেদিন চেয়ে অভ্যাস-বোধ ও অভ্যাসের ফোঁক থেকে গল্পের বিষয়বস্তু সন্ধানে পরিচিত পরিবেশের বাইরে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। দূরের সমুদ্রে সভ্যতার আওতার বাইরে জীবন যেখানে রয়েছে অকৃত্রিমতার অনাবৃত আদিম উদ্দাম, কিন্তু সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি—সেখানে তাঁরা জীবন-পরিচয়ের অন্বেষণে করেছিলেন সেখানেই।

এই একই কারণে আন্দামান, নিকোবর জীবনের অকৃত্রিমতার ও সীমাবদ্ধতার অকৃত্রিম শিল্পী শৈলজানন্দ তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আদিমের পরিচিত সাঁওতাল জীবন ও কয়লাখনি অঞ্চলকে।

সাঁওতাল জীবনের নিত্যকার আদিম সরলতা, লড়াই, প্রতিহিংসা, সোহরাই উৎসব জীবনযাত্রা যেমনটি তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন তেমনি বাস্তবতার বলিষ্ঠতায় পরিবেশন করেছেন। আবার ঝিলমীতে, ঝাড়খণ্ডের বাসীদের অন্তরঙ্গ কয়লাখনির পটভূমিতে যেখেছিলেন তেমনই

দীনতা হীনতায় লাঞ্ছিত হল। সাঁওতাল জীবনের এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তই তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বিস্ময়বস্তু হিসেবে। তার আঙ্কার ক্যানভাসে যারা ফুটে উঠল সাঁওতাল, সাঁওতালপল্লী, প্রতিবিম্ব, প্রবল-বন্ধন, জনমী, বনের হরিণ ছিল তবে প্রকৃতির অনুষঙ্গ মাত্রে।

কিন্তু নিসর্গবোধ ও জীবনদর্শনগত মৌল-চেতনায় শৈলজানন্দ ছিলেন মূল অঙ্কুরোদ্গম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অঙ্কোল-বনের প্রধান দুটি লক্ষণ, যাকে অভিজ্ঞানচিহ্নরূপে সেই গল্পে চিহ্নিত করেছেন—প্রবল বিদ্বেষবোধ ও বিরূপ ভাবপ্রতিবেশ—মূলে—শৈলজানন্দের রচনা প্রচেষ্টাগতি ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন বিদ্বেষতা নয়, বিদ্বেষ নয়, উল্লাস বা আতিশয্য নয়, জীবনকে দেখেছিলেন তিনি এক প্রশান্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে। লেখকের আপন-কথায়, 'আমার মনের মোলায়েম এই অসহায় মানুষগুলোকে ভালবেসেছিলাম। ভাল-বেসেছিলাম ছোট্ট মানুষকে।'

এই ছোট্ট মানুষকে ভালবাসতে গেয়ে-ছিলেন বলেই তাঁর ভেতর কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বমান ছিল না। লাঞ্ছিতা-দীনতা, সে ভ-ইবাস্থ ছোট্ট মানুষটিই তিনি তাঁর সাহিত্যে বারবার করেছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে যা সুন্দর, যা মহৎ, যা কল্যাণকর সেই দিকে ধরে রেখে কথা। চিরন্তন জীবন-সত্যকে আবিষ্কার করা।

এই দিক্‌দর্শনটিই বহু ক্ষেত্রে শৈলজা-নন্দকে গল্পের জীবনের প্রচলিত ঢঙের বাইরে যাওয়া-চিন্তা করার সাহস, স্বপ্নে উত্তীর্ণ করেছে। আপাত-রুক্ষ জীবন-চিত্রেও এনেছে এক হৃদয়োজ্জ্বল গভীর ব্যঞ্জনা।

স্বামীর মৃত্যুর পরে মাঝি বউ তুলির কথাই ধরা যাক। স্বামীর মৃত্যুর ছোট বোন টুরানির চোখে দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলছে তুলি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বামীর হাতে নিগৃহীতা হয়। স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রথম যৌবনের প্রেমিক ঝোলাকে এসে উস্কায়, তুমার জোরে সে যদি পারে তাহলে ঝোলাকে সাদু করে ও। কিন্তু আসল, তুলি জানত, ঝোলা পারে মাঝির হাতে পরাস্ত হবে। হলও তাই এবং পরাজিত ঝোলার সামনে দাঁড়ান স্বামীর ক্রোধদৃপ্ত পৌরুষ দেখে এক মন জানন্দে ভরে গেল। শুধু তাই নয়, স্বামী যদি তাদের মাঝির স্বামীর সর্দারকে মারিত, তাহা হইলে সে হয়তো বিজেতা স্বামীর গলা জড়াইয়া সহজ চুম্বনে তাহাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইত।'

কিন্তু নারীহৃদয়ের রহস্য-সন্ধানই এ গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই ঘটনার পরি-এক বছর তুলি সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। টুরানির জন্য তখন চৈতের সারাদিন অশ্বিনীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে তুলিটি। টুরানি তুলি হিসেবে আসার থেকে গাড়ী ভরে আসার টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে। তুলি এসে সেই টাকার বিনিময়ে টুরানির বদলে ওকে তুলি হিসেবে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। অবশ্যটির ফলে টুরানি যা তুলিও তাই—মাঝা পুরোহিতে একজন সেলেই হল। তুলির আর্দ্র মনের ভরে তাই। তুলিও সঙ্গে সঙ্গে ছেলে উঠে বসে। স্টেশ ছাড়লে ট্রেনে পড়ে, টুরানি ছুটতে ছুটতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেখানের ঘর একবার ছোট বোনকে প্রাণভরে দেখে নেয় তুলি। চোখে জল।

এই চোখের জলেই গল্প শেষ। কিন্তু এই চোখের জলের মধ্য দিয়েই প্রতিহিংসা-পরায়ণা সাঁওতাল মেয়ে তুলির চিরন্তন এক নারী প্রেমিকার রূপান্তর।

এ রকম নতুন ধরনের গল্প শৈলজা-নন্দর অনেক গল্পেই।

এই সহজ সিদ্ধ-চেতনাই শৈলজানন্দের রচনাকে স্বেচ্ছা-সাবলীল করেছিল। অঙ্কোল-বনেরও কিছু মুখলক্ষণ—আতিশয্য, উল্লাস, দৃষ্টিকটুত্ব, আত্মসচেতনতা বা জীবন সন্ধানের নামে বাড়াবাড়ির মৌল-প্রকৃতির পরিচয়কে অনুকূলনাথ, মুখে প্রশংসাবাদ, বলেছিলেন,' অন্তরের সাহিত্যে নতুন কৃষ্টিকে কিছু স্বাধীন জীবনের সন্ধানের ধরণটি ভালবাসার কথা—এগুলি—তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন শৈলজানন্দ। অবশ্য, গল্পের জন্য যে জীবন জীবন ও অভিজ্ঞতার কথা থাকে থেকে নিয়েছিলেন তিনি, তাতে তথাকথিত বাস্তবতার মোড়কে উচ্চ মৌল-জীবন অন্বেষণ অবাধিত সুযোগ ছিল তাঁরই।

শুধু বিষয়-বর্ণনায় নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনেও শৈলজানন্দ অবশ্যই সচেতন ছিলেন। প্রথাগত জীবনের প্রচলিত অভিজ্ঞতার বেষ্টনকে লেখকের তার বাইরে প্রায়ই হাত বাড়াতে দিতেন। ধারালো, যে মুহূর্তে সে প্রচেষ্টার মৌখনি-মনুষ্যত্বের ধর্মতা আলস্য করেছেন, সেই মনুষ্যত্বের ধর্মতা আলস্য করেছেন, সেই অভিজ্ঞতার পরিচয়ে।

শুধু জীবন-বর্ণনায় নয়, ভাষা-শৈলীর বৈশিষ্ট্যেও শৈলজানন্দ ছিলেন এক একক-ব্যক্তিক্রম। তাঁর ভাষার অভিনতা-বৈচিত্র্যের বাগ-বৈদগ্ধ ছিল না। প্রয়োগের বিচিত্র রীতি-কুশলতাও না। কিন্তু নিরলঙ্কার, নিরোধ এক স্বচ্ছ-প্রবাহ ছিল তাঁর ভাষার সম্পদ। শৈলজানন্দের সাহিত্যের পাঠ প্রকাশ জীবনের পাঠশালায়। বিশেষত্বের কোন দর্শন বা রীতির প্রেরণা বা প্রভাব মুক্ত ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সহজিয়া ভঙ্গীতে নিজস্ব প্রত্যহিত পরিচিত জীবন-নাটোর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে এক নিরাসক্ত দর্শকের মতই তুলে ধরেছেন তাই তাঁর সাহিত্যে। অনেক সময় যে নিরাসক্তকে জীবনের প্রতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য বলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা থাকে। আত্মসচেতনতাই এই নিরোধ জন্য তুলনা থেকে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরোধ নৈর্ব্যক্তিকতার পূর্বসূরী কি শৈলজানন্দই?

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকিই চুলের প্রধান উপকরণ

কেশ পতন, অকালপক্কতা ও কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

পুতুল

প্রবোধকুমার সান্যাল

স্লাজের ঘাট পেরিয়ে ট্রেনখানা দেখতে দেখতে অনেকদূরে চলে গেল। কেবল তার ধূসরবর্ণ অওয়াজটা চারিদিকের বিশাল মাঠের বুকে বুকে বুকে করতে লাগলো। তারপরে শূন্য রইলো নিকটে নিবারণ স্টেশনের পথ।

মল্লিকার্জুন বললেন, পূর্ণবাবু, নামলেন ত মাঠের মাঝখানে, যাবেন কোন্‌দিকে?

পূর্ণ বললে, একটা রিক্সা—স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। আমি আসছি—।

বীণা চৌধুরী বললে, আমি খোঁজ করবো সেটা করবেন আমার বাবা পাওয়া যায়।

আপনারা দাঁড়ান্—আমি আসছি একুনি।—বলে পূর্ণ সোজাসুজি খোঁজ-খবর নিতে গেল।

মেয়েরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুব বেশী উৎসাহিত বোধ করছে মনে হোল না। তা ছাড়া স্টেশনটা বড়ই ছোট এবং এত যে সামান্য সেটা ওরা আগে কল্পনা করে নি। একা পূর্ণকে সম্বল করে ওরা কতদূরে কি করে টিকতে পারবে সেটা ভাববার কথা বৈকি।

একটু পরেই পূর্ণ ফিরে এলো। বললে, এলাকপুরের ঘাট এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল, সেখানে গিয়ে নৌকা ধরতে হবে!

মল্লিকার্জুন একটু চমকে উঠে বললেন, পাঁচ মাইল! হেঁটে যেতে হবে?

পূর্ণ বললে, হাঁটবার কথা শুনলুম, কিন্তু গরুর গাড়ি নিয়ে নাকি যেতে হয়।

আত্মা বললে, আপনি বুঝি আগে এটা জানতেন না?

পূর্ণ হেসে বললে, জেনেও লাভ থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতুম, কেমন ত?

বীণা বললে, ভাব দেখলুম?

না,—ভাব কিন্তু ত কোথাও পাওয়া যায় না!

আত্মা ধমক দিয়ে বললে, [illegible] কেন বুঝি? এক ঘটি জল নিয়ে তো কেউ ঘরে যায়?

বীণা বললে, জল? এখানকার? যদি ম্যালেরিয়ার ধরে?

মল্লিকার্জুন বললেন, তবে ম্যালেরিয়ার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করলেন, তাতে যদি কিছু হয় নি, বীণা।

আত্মা বললে, পূর্ণবাবু, আপনি তো বোকাচন্দর। কেবল এলাকপুর, কেবল বা ফুরোবেপঞ্চায়ৎ বেলা! আসবার সময় বড়দা আমাকে টিপেই আসছিল। মনের বাঞ্ছিত ঠেকেও শুনছি!

বীণা বললে, ঘাট ত নয়, অথৈ জল!—এই বলে সে তার ফ্রকটা তোল দুটো এদিক ওদিক চালাচ্ছিল করতে লাগলো।

স্লাজের লাল স্টেশন। এখানে একটি বিশ্রামের জায়গাও আছে তৈরি হয়ে নি—জলখাবার ইত্যাদি ত দূরের কথা। স্টেশনের বাঁধে দিয়ে মানুষের আনাগোনায় সামান্য একটি পায়েচলা পথের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। স্টেশনমাস্টার নতুন লোক, তিনি এসেছেন নিজের কলসি নিয়ে নিয়ে আছিনেরোজ করতে সাহস পান না, কেননা এরা বড়লোকের ছেলে। অনুমান করার মনে কেবল তিনি বলে দিলেন, কলসুরে গেলে গরুর গাড়ি পাওয়া যায়—এবং শ্রীমতী বীণার জল নিবারণের জন্য দূরের গ্রাম থেকে আনা একটি টিউব-ওয়েলের জল! তাঁর কর্তব্যবুদ্ধির এর বেশী এগোবার সাহস করলেন না। তিনি এসে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে এখানে এসেছে, কি করবে ভেবে।

গাড়িতে মাল তোলা আরম্ভ হয়েছে, সুবেলা যেমন করেই হোক এলাকপুরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছতে হবে। স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে এসে পূর্ণ অনেক পরিশ্রম এবং তদ্বির-তদারকের পর দুখানা গরু-বাহিনের গাড়ি ভাড়া করতে পারলো। ঘুমের-পাড়ার মেয়েরা পৌঁছবে পারলে সেখানে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। মেয়েরা যাবে গরুর গাড়ির ছাদে, পুরুষেরা মেয়েদেরই উল্টোদিকে। এখান থেকে ছোট পাকার রাস্তা ধরে গেলে প্রায় সাত ক্রোশ নদী পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সহরে বেলা বসানো হয় নি। এই ক্রোশের মধ্যে,—যাদের মধ্যে দু'চারজন ওদের কলেজের সহপাঠিনী—যাদের বিশেষ অসুখ, দেশের প্রাণের কিছুদিন নিয়ে থাকা দরকার। অর্থাৎ কথা অবশ্য হয়েছিল এখানে বড় করা নয়, আসল কথা, গ্রামকে মন দিয়ে আজকের দিনে কলকারখানার কেন্দ্রও আমরা চালাবে না।

কলকাতা ছেড়ার সময়ের মাঝখান দিয়ে দুখানা গাড়ি উঁচুনীচু পথ ধরে চলেছে। মাথার উপরে রাই ছাওয়া, গাড়ির তোড়জোড় আলাদা। তাছাড়া দুটোই একদূর সঙ্গে দুটি পরিবেশনের জন্য ও আকস্মিক অসুবিধে এমনি সামান্যই ঘটেছে যে, ওদের নিয়ে খুব বেশীদূর যাওয়া চলবে না। মল্লিকার্জুন তাঁর বাগে থেকে কামরাপর বার করে একটু-আধটু সেবে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অসমাপ্ত আছের গুলোট-পালটের হাত থেকে ফলে ফলে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই তাঁর সময়টা কাটতে লাগলো। তাঁরা কলকাতার মেয়ে—গরম এবং গরুর গাড়ি কোনোটাতেই অভ্যস্ত নন। কিন্তু তবু তাঁদের মেতে হবে, অবস্থা-বৈগুণ্যের নিয়তি। কুটীরশিল্প প্রবর্তনীতে গিয়ে তাঁরা আজীবন ধরে গ্রামবাসীদের কাছে বক্তৃতা করবেন। এ বিষয়ে তাঁরা অনেকদিন আলোচনা করেছেন এবং শিক্ষানবিসদের হতে তাঁরা পুস্তকও হয়েছেন। তাঁরা অযোগ্য নয়।

আত্মার উৎসাহ চৈত্রের খরতাপে। কোনদিকে জলাশয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা সহজে অসুবিধাকে জয় প্রকাশ করতে চায় না, কিন্তু জলাভাবের কিনে পৌঁছবার অভিলাষ উৎসুক্য লক্ষ করে পূর্ণ সেকথা উত্থাপন করেছিল। সামনের গাড়িখানার ছিল বীণা আর আত্মা, তাদের ফলাফল অনেক অংশেই ভেঙে গেছে; এবং তাকে মাঝে মাঝে মুখরোচক আলোচনার ছিটেফোঁটা ওখানি থেকে ছিটকে এ-গাড়িতে ঝরিয়া ও পূর্ণর কানে এসে বিঁধছিল।

প্রায় ক্রোশ দুই পথ চলার পর একটি ছোকরাকে পাওয়া গেল। পূর্ণ তাকে গাড়িতে তুলে করলে, ওরে—সোনো, সোনো।

বছর বারো বয়সের একটি ফুটফুটে বালক তাঁর চক্ষু নিয়ে গরুর গাড়ির আগে-

ভাঙি এসে দাঁড়াল। পূর্ব জিজ্ঞাসা করলো, এতক্ষণে আর কতখানি পথ যে!

ভোলা আঙুল দিয়ে দেখালেই হয় যে। আমাদের বাড়ি দেখবে।

ভাঙির চুপ করলো, তখনো খরস্রোতা নিম্নু পাওয়া যায়?

ভোলা বললো, আপনার কি চাই?

মুড়ি, চিড়ে, মুড়কি, দুধ...

এ, দুধ নেই। চিড়ে মুড়ি পাওয়া যায়।

বাজার আছে সেখানে?

ভোলা হাসলো, বাড়ি-বাড়ি ঘুরলে হয়তো দোকানে আসে। অত কি দরকার।

ভোলা মুখ ফসকেই বলে ফেলেছে। ভাঙির মুড়কি ছাড়া অন্যকে আর ভোলা আসা নেই। আস্তে বললে, আচ্ছা, এখানকার থেকে মুড়কি-পাকার জন্যে, ভাইরে?

ওই সন্ধ্যাবর্ণাই শুনে ভোলা একটু ভেবে জবাবদিলে বসেই বললে, দোকানে দেখে দেখে ছিনেছে।

তখন দোকানে?

আপনার ঘরে ঢোকেন বললে, ভোলার কাজে মুড়কি?

সকলে ভেবেনাহে বললে, হাঁ হাঁ.. মুড়কি ভালো দেখেছি।

আমি যে এখনো পুকুল নিয়ে যাই ভেবেছে।

ভোলা চোখমুখের ভাবে নারী। সুতরাং ভোলা ব্রাহ্মণের চুপ করিয়ে হয়ে গেলো। ভোলার আর ভাঙির এক সাথেই আছে,—সে আজি পুকুল পড়ে। ভাঙির মুড়কি পাওয়া বড় কঠিন। সন্ধ্যাই-এর সন্ধিতে ভাঙির, ভাঙির তৈরী পুকুল নিয়ে ওই ভোলাই ভুবনেশ্বরীর ভোলা দিয়ে আসে।

ভাঙির ভাঙির ভোলার মুখের আজির ভাবখানা বুঝি। সবাই মিলে তারা এখন এমনস্থানে এসে পৌঁছেছে, যেখা থেকে ফিরবার আর পথ নেই।

ঘাটিয়ারীর এক ভাঙি ভোলা। আজি মুখোমুখি সেখানে একসাথে এসে দাঁড়ালো। ভাঙিবাড়ির ভোলা এবং ভোলার ভোলেপুকুর আজকাল ওই ভোলার তলা এই পথ দিয়ে তারাই আসা-যাওয়ার ভাঙির, সুতরাং এর গতিপথ দেখে ইতিমধ্যেই ওই ছোট্ট গ্রামটিতে সাড়া পড়েছিল। সুসজ্জিত, সুশ্রী ও আত্মবাদী মেয়েরা এই অঞ্চলে অন্যকার প্রথমের পক্ষে ভাঙি বড় অবজ্ঞার বৈরি। বিশেষ করে ভাঙিভাঙি-আজিভাঙি ঘরের কাঁধনে এই প্রথম বিদ্রূপ উপভোগ করে নিয়ে।

ভোলের ভাঙে ওদের সকলের মুখ হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল, এতক্ষণে বাঁধন আসার ভাঙারে এসে এখা পড়লো। অন্যদের পাড়ার ইতোমধ্যে পরিচয়ের পরীক্ষার পক্ষে ভাঙাভাঙি যথেষ্ট হয়, কিন্তু উপায় নেই,—এ ভাঙা ভোলা-পরিচয়ের ভাবখানা যাদের ভোলাবাড়ি, সন্ধ্যা সকলেই মেয়ানন, একসঙ্গে এসে ভুবনেশ্বরী। এমন ভোলাবাড়ি সম্পর্কে [illegible] মনে মিলনের মনোভাব [illegible] মুখের মুড়কির মতো মিষ্টি ভোলা, বাঁধা, ভাঙির মাটি, ভোলেভোট, কাপড়ের টুকরো, সেলুলো এরা ভোলেরোলের মধ্যে মিলিয়ে দিল। এরা যেন সহজে মনে পেতে আসন করেছে এদের—তাদের ভাবের ওপর,—তাদের মন ভোলার সঙ্গীতের মিলে।

এমন সময় ভাঙিমকে নিয়ে পূর্ব এসে দাঁড়ালো। ভাকে, চলুন বলিমদিন—এই ভোলার ও এসো...

ভোলার?

ভাঙিমদের ঘরে ভাকলা পাওয়া ভোলে। ভোলেরা ভালো। ওদের ওখানে ছেড়া-পা [illegible] একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

ভাঙিমদের ঘরে এসে ওরা উঠলো বটে, কিন্তু একটি অভাবনীয় নতুন সমস্যা দেখা দিল। ওরা লক্ষ্য করেনি, ঈশান ভোলে আলো ছায়া মাখা ভুল উঠেছে। বাঁধনের ইতিমধ্যেই অন্যের বিশ্বাস ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মলিনাদি চিন্তিত হয়ে বললেন, পূর্ব-বাবু, ওদিকে দেখছেন? আমার উঠতে সাহস হয়?

আজ ও বাঁধার ঘরে আর ভোলা কথা ভুলিনা না।

চালার ভাঙতে ভোলে একখানাই। ভাঙেমটিতে সন্ধ্যার গল্প-বন্ধুদের বাসা ছিল, সেটি এখন ভার ভন্যান্য আসার। এদিক-ওদিক পা বাড়াবার উপায় নেই, সন্ধ্যাটাই ভন্যদের সমাকীর্ণ। পাশেই একটা ভোলা,—সেই ভোবাটাও একটা অদ্ভুত পাতার কাপড়ার ছায়াময়। চালার আছে, অথবা ভাসার ভোলে নেই নেই। ভিজবে এমন ভোলো সন্ধ্যা দেখা যাচ্ছে। যাতে মনে হয়, একটা ভবস্থা ভোলাও কিছু ভাস্ত। এমন একটা-দুটো বাড়িমের ভাবখানে মানুষের বাসা ভোলে ভার যে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা হয়ত ভোলে সেবার না নজরে আর-সকলের মনে আসবাসা বলেই থেকে যেতো। সুতরাং ভোলার ভন্যে ভৈরী না-ও টাকে আসার জন্য, ভোলাকে দাঁড়িয়ে বাঁধে বাঁধে ভলিনাদি ভাবাকুলে নিশ্বাস আর ভরলেন।

ভূপের প্রায় ভোলে ভাঙির তার ভোঁচকে চাইল কিসে নিজ ভিরাজিল—এতক্ষণে ভলা ভোল। পাশের দিকের পায়ের ঘর থেকে ভন্য গলা বাড়িয়ে ভাকলো,—বাবু তে, চাল ভ নাকি?

ভোলেরা সবাই মিলে ভূপের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। মাঝে বাড়ির ভাল, এক হাঁড়ি জল এবং দে উঁচাই দু-একটি সরঞ্জাম। ভূপের মুখে ভোলের একজনা ভলনা ভাঁধার উপর। চোরাকাঁটার ছড় এবং পাঁজরের কয়েকখানা সোনালুবর্ণের অস্থি ছাড়া তার শরীরের কোথাও ভাস নেই বললেই হয়। ভোলেরের দেখে ভোলকা একটু উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে তখনকার কাশি আক্রমণ করে নিল।

মলিনাদি ভন্তভাবে বললেন, থাক থাক, তুমি [illegible] না করলেও হবে, আমরা বলছি।

ভূপো বললে, সাত মাস ভরে ভাস্ত না, ভাঁধার ভাবার। [illegible] ভন্যে নয়।

[illegible] ভূপ। ভোলে বললে, ভোলের ভল বাবুর ভাঁধে আর যাবে না যা খেতে। ভোলেরা সব বন্ধ ভাঁধে আছে। ঘর-বাড়ি-আমাদী।

কথা বাড়াতে ভাইছে ঘরের ভেতের সবুজ-পুকুর ঘুমিল ভোলা ভোল। ভোলেরা ভাঁধে ছুটে উঠলো। এখনি ভালাবির ভন্যে। এই ভন্যদের ভাবখানে আজকে মিলে বাস ওরকম ভাবের ভোবে না। ভোলার নিজে ভাসের কাছে নামতে হবে, ভাবভাবার ভোলাতে হবে,—এবং বলকাতার ভবিষ্যতের একটি রিপোর্ট পাঠানোও দরকার।

ভূপো আর নিজের ভবাবাটার ভর্মী নিয়ে বাঁধার দিকে ভাঁধের ছিল একান্ত-ভাবে। বাঁধা এক সময় ভোলে বললে, কী ভোলের ভর্তাসাই?

ভূপো বললে, ভোলার ভুলের ভোজটা একটা ভলের ওপর তুলে দাও তা হা!

ভোলা?

ভলবাধিভন্ত ভর্মীউপর ভূপো ভূপল ভূপে এক ভোলার হাসি হাসলো। তার ভোলের দৃষ্টিতে ছিল ভোলন ভোল নিমাতু ভাঁভিনিবেল, ভলনক এক ভুবন নিঁদুরটা। ভোলের ভোলুভোলের সালা আরো কিছু, ভুবন ভরের ভন্যা চলতুর হাঁজন, কিন্তু সেই নাটকীয় মুহূর্তে বাইরে পূর্বির গলার ভাওয়াজ পাওয়া ভোল।

ভাঁধনাদির সঙ্গে ভাঙা এবং ভাঁধ পিছনে বাঁধাও বেরিয়ে এলো। পূর্ব এসে ভাঁধির করেছে ভিছু চাল ভাল, সন্ধ্যা এবং কিছু ভন্য। ভাঁধির ভোলুলি ভ ভা ভা। পূর্ব বললে, ভাঙে ভাত ভুটির খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

আজা বললে, নৌকা ভাঙারে ভাকল, পূর্বিবাবু?

পূর্ব বললে, নৌকা যাবে না, আজকের ভোরো খাবার। ভাঙাড় এখন ভোরোলের পৌঁছতে রাত ভুটো। আমার সাহস নেই।

ভাঁধির বললে, আপনাদের কিছু ভন্য হবে না, আমি ভন্য এনে দিচ্ছি ভন্য থেকে।

পূর্ব বললে, তোকে ভাত ভরে নিয়ে ভল ভ নতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

ভাঁধির সহাসা বললে, ভরে! ভবে ভ সেই বর্ষা থেকে! এতে আমের কিছু, হয় না ভন্যা।

বালকের ভোখ দুটিতে ভেলের ভোল-নিদুপার ভবুঝা ভখানো—বড় ধারায়। তার দিকে একবার তাকিয়ে বাঁধা বললে, নদীর ধারে আমাদের নৌকাতে যে, আমরাই চল আসছি।

ভবস্থা মেয়েরা অবস্থার সঙ্গে ভাবনা ভানিয়ে মেয়ের ভোলার ভোলে ভোল।

বাঁধা এক সময় চালার ভেতে বললে, কি হয়েছে ভন্যাবাবাই? এর ভন্যতে উঠে বললে যে?

ওই যে মা—পুকুর বললে, দেখো ভোখ, ওই ভিনিষে পারে?

পুকুল পড়ে ভেখছি। ভোল ভন্যে হয়েছে! বলে বাঁধা এসে সামনে বসলো।

কিন্তু পুকুলটিকে পরীক্ষা করতে নিয়েই সে ভোলাতে বললে, এ কি এ যে আমার মুড়ি।

বুড়োর চোখে কাঁপছে ঘরটা। তবু হাসিমুখে সেই পুতুলের মাথাটি একটু নেড়ে বললে, হ্যাঁ, এইবার চলন আসে। ওটার গুণোও হয়ে গেছে মা।

বীণা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ইতিমধ্যে আভা ও ধলিনাদির ওয়েটিংরুমও বুড়ো যেন ফুঁয়ে ফেলেছে। চোখের কোল, ঠুঁটের ভিজে খোসলা, কণ্ঠের সেলবন্ধ, অবশে বিলীয়মান হাসির আভাস—সেটি পর্যন্ত। খোপার একটি পাশ,—তাও এসেছে নতুন হয়ে। কালো রেখের ঠক খুলে আভা তার ওষ্ঠের ছোপ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল—সেই অপরূপ কপালকুণ্ডলাটি আবার বুড়ো জীবন্ত করে তুলেছে। এই বুড়োটা গ্রহের বুদ্ধি-সাজিয়ার জীবনযাত্রার প্রতি ধলিনাদির কণ্ঠে সমবেদনার দৃষ্টি বুড়োর চোখ এড়ায় নি।

বৃষ্টি এসে পড়ায়ায়—ঘরখানার এরই মধ্যে চাপা অন্ধকার নেমে যাচ্ছে। এমন সময় আভা একটি মোমবাতি জেলে ঘরে ঢুকলো। তারপর ওরা একে একে সবাই এসে জড়ো হোলো। বৃদ্ধ বিদেশীর চারিত্রার ওরা সবাই মুগ্ধ—অবাক্ত এই ভাষাহীন শিশুতে রচনার সকলে বিমূঢ়াবিষ্ট। বুড়ো বলল, কিছু নয় মা, এ সবই পরে—ঠোটা জলেই পারে। হাতের কাজ যে ও নয়।

পূর্ব বললে, পুতুল গড়া হয়ত সহজ, কিন্তু ওর মধ্যে প্রাণ এসে দেওয়া কি যায় তার জন্য?

প্রাণ:—বুড়ো পূর্বর দিকে তাকালো। অন্ধকারে তার চোখে অপরূপ কৌতূহল, কণ্ঠে জিজ্ঞাসা। বললে, প্রাণ তোমার্দের দেখা-যায়?

কেন, এই যে তুমি গড়েছ, এ এমনিতে জীবন্ত।

বুড়োর বোঝবার কথা নয়। তার হাতের গড়া পুতুলে কোথায় থাকে প্রাণ, অথবা জীবন্ত। তিন পুরুষ ধরে পুতুল গড়ছে, কিন্তু এমন কথা কারুকে বলতে সে শোনে নি। এরা মানুষের লোক, তাই মেঘের দুর্বোধ্য ভাষার মতো হয়। বুড়ো একটু অবাক হয়েই তাকায়।

বাইরে অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছিল। কাঁচের পুটি পুটি এসে, একপাশে বসে। রোকসার জন্য এদের জানা ছিল। সুতরাং এক সময় আভা উঠে ওদেরই জানা বিছানাটা পাতে। রায়পত্র বলে, কাঁচির, এই বিছানায় এসো ভাই। কর্তামশাই, তুমি যাবে কি? তোমরা শুজনে অনুপ-বিনুপ সারির ছেলের মেঁধ।

অনেক ঘরের কথা, অনেক অযাচিত আবদারের) বুড়ো এই অভিমাত্র জনপ-মনুষ্যের অন্ধকারে পড়ে কেমন যেন ধাঁধিয়ে যায়। কাঁচির ওদের বুড়োর অমনা করে না। অনেক আগেই বিছানায় গিয়ে ওঠে। বীণা বুড়োর নিশ্চলতায় একটি উলোহিত হয়ে উঠেছিল যে, বৃষ্টির মধ্যে নিজে নিয়ে সে ঠকুনো ও নাটের আলাদের আয়োজন করে আসে। বুড়ো কেমন একমনে চুপ করে বললে, উঠোনে মোটা দুই-তিন সাপ ঢুকে যেতায় না, একটু সাবধান—

বীণা কথাটা বললো না।

একটি রাত্রির ব্যবধানে। কিন্তু সত্যিই অনেক দূরে ফেলে-আসা জীবন-পরিবেশের বাইরে। অথচ বললে ভুল বলা হবে—যেমন অতীতের নিশ্চিন্ত রোমাঞ্চ গ্রহিতা ও সৌন্দর্য এখানে নেই। ঘুমন্তের বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ছবির মতন-নিশ্চিন্ত নয়। তাদের ঐ ঘোমাও নেই, ঘোঁটাও নেই সোজা, জীবনের সঙ্কেত ঘোমাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা বিবর্তিত জনপদ-জটিলতার মাঝখানে যদি কয়েকজন সহমাত্র-চারীকে জলসা করা যায়—তবে এই এমন-পুরুষে যেমনে পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার পর সমস্তটা বুড়োর মতো জমাট,—আলোর ঝাড়ে, ঘোমার ঘনায়, পরস্পরে, পোকায় এবং ঘুম-ঘুমে অন্ধকারে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে, অপরাজেয়ের মনের চেহারাও বিশেষক হয়ে এলো।

আচারাদি এবং অনুষ্ঠানিক ভক্তিকর্ম সেরে ফিরে ওরা সবাই এসে বুড়োর কাছে বসলো। বুড়ো বললে, হেঁটমা এই পথ দিয়েই বৃষ্টি ঢুকবে, মা?

ধলিনাদি বললেন, বুড়োর আর একটা পথ আছে। তবে আজকের ইচ্ছে, এই পথ দিয়েই ফিরি,—হেঁটমাদের ঘর একবার দেখে যেতে পারবো। কেমন, সেই ভালো না?

বুড়ো বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, আমাদের গরীবের ঘর মা—তোমাদের কষ্ট হবে!

বীণা বলে, ওকথা বলতে নেই কর্তা-মশাই, দেবদূতের গরীব!

ধলিনাদি বললেন, আচ্ছা বলো আমরা যদি এই গ্রামে এসে কিছু কাজ করি?

বুড়ো বলে, কাজ? কি কাজ মা?

এই গরীবেরই কাজ। তোমরা রোগে ভুগছ, ভাত-কাপড় পাচ্ছ না, জলের অভাব, পথঘাট নেই, হাট-বাজার বসে না—

বুড়ো অবাক হয়ে তাকায়। ওদিকে খকির হাঁপ ছাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে। এদের কথাবার্তায় কি যেন একটা অনুসন্ধেয়তা সে খুঁজে পায়। কিন্তু স্পষ্ট করে সে কিছু বুঝতে পারে না।

ধলিনাদি বললেন, আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ধরো, তোমাদের এই গ্রামে একটা আলাদা নিয়ে আমরা কয়জন বসলুম, এখানেই আমাদের লোকের দল গড়ে তুললুম। সুতো কাটবে, তাঁত বসাবে,—মাঝিপাড়া প্রথম পঞ্চায়েত আমরাই চালাবো।

পূর্ব বললে, ধরো, তুমি পুতুল গড়তে পারো,—তোমার মতন লোককে নিয়ে যদি পুতুল গড়িয়ে চলন দেওয়া যায়, তবে তা সবসা পারে। তুমি নিজে চালাবে ব্যবসা।

বুড়োর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। কিন্তু সে মুখ আর থাকে। একটা অন্তর্মুখিত দুঃখের এসেছে তার জীবনে,—সব এরা জানে, এরা জানে, তবে এই অযাচিত মমত্ববোধ, কেন না এই কুহক, এই মোহজাল—বুড়োর মুখে মস্তিষ্কে এসব যেন বলতে পারছে না। কথার ভাষা খুঁজে সে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় গলার ভেতর হৃৎপিণ্ডটা স্পন্দমুক্ত হয়ে যেন উঠে আসতে চায়। এই গাঁয়ের ছেলেরা ফিরবে? বুড়ো আবার মালিক হবে! তার নাতির আর যেন চাকরি থাকবে না! তার এই বুড়ো চোখ যেন খড় ছাওয়া হয় নি, নতুন করে ফিরছে পথে সে আজ তিন বছর: তোটা চোখের পরু কাঁচির একটা বড়ি, খুশের গন্ধ, শীতজলের বিছানা—বুড়ো হাত এই ছোট্ট আঁধার পুরে আসনে যন্ত্র মত করে কাঁপতে লাগলো।

তার গলায় অস্ফুট কান্না উঠে এলো এক সময় এবং সে এমন ঘরেই আসতে লাগলো, যেন তার পাঁজরের হাড়গুলি বেশিক্ষণ সে বাড়া জন্য সহ্য করতে পারবে না। কাঁচির তাড়াতাড়ি উঠে এসে বুড়োকে দুই হাতে জাপটে ধরলো।

পূর্বর পাশে বসে রোহিণী ভয় হয়ে ওঠার এই ঘটনা দেখতে লাগলো। রোগ আর দারিদ্র্যের এই দৃশ্য নতুন নয়। ওরা অনেকের লোক। রোগের দুঃখ উদ্গীরিত দরিদ্র মানব-আর সঙ্গে ওদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ,—তবু আজ কঠিন হতে রোগের এই প্রভঞ্জনাত্মককে দূর করবার জন্যে ধাঁড়িয়ে উঠেছে। ওরা কাজ জানে, সেবা জানে—,—রোগের প্রাণের ঠাকুরের তোষণ জল কর যে পড়িয়েছে, সে ওরা জানে।

ধলিনাদি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চক্ষু ঝাপসা।

তিনি বললেন, কর্তামশাই, তুমি আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এসে তোমাদের কাজে লাগতে পারি,—জীবনের এত অসহায় যেন বন্ধ করতে পারি।

কী বলে মেরেটি! এ কোন ভাষা। কোন্ দেবতার আশীর্বাদ! বুড়ো অন্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। তার সারাটা জীবনে এমন ঘটনা থাকলে ছেলেমেয়েদুটিকে কোলে নিয়ে সে কাঁদতে পারতো।

ধলিনাদি, আভা ও বীণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পরদের এই চলাচলায় ঘোর-ভঙ্গে ঘর ভাঙিয়ে কাল ভোরে ওদের নৌকায় উঠতে হবে, মুক্তোরপাড়ার লোক সৌহার্দ্যে ওদের এত দেরি হবে, ওরা ভাবে নি। সেখানে ওদের অপেক্ষা করছে। রায়পত্র ভেতরে আসছে,—সংবেদনাতারা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেই একটিবিলম্ব অবসরে এই একান্তবাসের

পথ দিয়েই ওরা ফিরবে, অন্যপথে যাবে না। এই পথে ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা করা চাই। যেমন করে হোক, যুদ্ধের এই অনাচারের বিরুদ্ধপ্রতিক্রিয়ায় যেসব সাহসে ওরা ভুলে রয়েছে, ছোটখাটো একটি কারখানা গড়ে তুলে, এদের এই মরমোন্মুখ জীবনযাত্রার কিছু প্রতিকার করবে। এই ওদের প্রতিশ্রুতি।

বিছানাপত্রগুলি ওরা ইতিমধ্যেই ঘর করেছে, ঘরের ভারে যেন কুঁজো সেই। একটিমাত্র চালের হুকে ঝোলানো বিদেশের জন্য একটা ওভারকোট নিয়ে ওরা একটু দাঁড়াবে, এমন সময় বেজে উঠল, কফির ঘুঁটি ঘুঁটি এসে একসঙ্গে বাজিয়েছে। সে যেন কিছু বলবে।

পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে বললো, কি যে ভাঙল?

কফির নিশ্চিন্ত ভাবে জানালো, তাকে একটা জায়গা নিতে হবে।

আজ বললে, জায়গা? জায়গা জুতো সব পাবি, কফির! এই যে, এইটে পায়ে দিয়ে যা তখনকার!

আজ তার পায়ের চটিজুতো এনে কফিরের পায়ে কফিরের দিয়ে সামনে তার ঝিনুক মেপে নিল।

মণিমালি বললেন, কাল সকালেই আমরা চলে যাবো আমি। কিন্তু কফির যাবেই আবার আসবো, এই পথ দিয়েই আসবো। এই টাকা কটা তুমি রেখে দে, কফিরের পড়ার চালাস, বেচিস?

কফির ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, আবার আসবে তোমরা?

নিশ্চয় আসবো,—পদ্মফুল কটা কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আর দেখিস, কত কাল রেখো তোমরা। ঠিক আসবো বলে গেলুম।

দশটা টাকা নিয়ে কফির অন্ধকারে ওভারকোটের চালার দিকে চলে গেল। বীণা বললে, কী চালাক ছেলেটা! আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাবো কফিরের জন্য।

পূর্ণ বললে, বুড়োর যে অবস্থা, বাঁচলে হয়!

এ কথা এলে কফির বুড়োর পা ঘেঁষে বসে পড়লো। বুড়ো বললে, কি রে যাদু?

জাহাজে ওরা মেরে গেছে। তোমার পদ্মফুল কিনবে। এই নাও টাকা!

বুড়ো বললে, এত কিসে?

কফির বললে, ওরা আবার আসবে,—এই পথ দিয়েই যাবে!

সত্যি বলছিস, আসবে?

হাঁ, অনেক আসবে। এই, তোমার জন্য মেরেছে যে—এত জন্য!

হবে না? বুড়ো পদ্মফুল বাসেই যেন উৎসব চলন হয়ে উঠলো। বললে, বাজবে না বুঝি? কি একটা হয়ে গেল যাদু, সিঁড়ি? কফির—কফির বলতে পারিস.....কি যেন... কি যেন হবে গেল একটা।

আসলের চলন উৎসবলাভী বুড়ো ওই ভাবেই প্রকাশ করতে গেল। কিন্তু শরীর সায় দিল,—উৎসবের সাধ্যে না পেরে বুড়ো আবার শুয়ে পড়লো। অসমান হাঁসফাঁস করছিল।

কফির শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমোয় নাই বলে তার চোখটা অন্ধকারেই চকচক করে উঠলো, মাদারাই সেই চাটাই পদ্মফুলের একার অপেক্ষাকৃত সঙ্গে বিশ্বস্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ো শরীর ভেঙে পড়েছে, ঘাড় উঁচু থাকছে না, চাদর আঙুল চালাতে চাইছে না, কোনরে একটুকু জোর নেই—কিন্তু তবু সেই জরাব্যাধিগ্রস্ত উৎসবলী বৃদ্ধ শরীর তার সেই কাজ্জ্বলিত্বের ভেতর থাকতে পারে নি। আজ যেন আজ সন্ধ্যা কাজটুকু আজ সারাই তার শেষ করা চাই।

কফিরের ঘুমন্ত্রুর চোখ আবার ধীরে ধীরে বুজে এলো। ওদিকে মোমবাতিটুকুও একসময়ে চারা শেষ হয়ে এসেছে।

এখানকার সবাই জেগেছে, এ গ্রামে কাজ আরম্ভ হবে। কত কাজ, কত বাসনা, কত প্রতিষ্ঠান। কফির সব ভাবনার ঘরে বেরিয়েছে। এই বাঁশবাগানের ধারে বসবে কারখানা, পাকানকলাগুলি উঠিয়ে ওর, শিব-মন্দিরের ধারে ওদুরের দোকান। নৌকায় করে জাহাজে সবুজ মেরে, কত মাপড় আর খাল, টিনের খেলনা। হাটবারে চলন্তারী পালা হবে, মোটরলারি চলবে। তাদের টিনের ঘর উঠবে, পাকুড় হবে ঘরে, তার ঘরে জারা, পারে জুতো, তাদের আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

কফির নিজের হাতে তাদের জন্যদল রেখেছে, ডোবা থেকে পানা তুলেছে, ঘর-দোর সে পরিষ্কার রেখেছে,—ওরা আসবে। তার দাদারাই আর উঠোন পরে নি, পরে হয়েছে মেহমান হয়ে,—ঘরে রেখেছে কফির। কফির কি একটা খেলনার মতো ঘরের মাঠের দিকে ছুটে যায়। ওরা এবার আসবে, এই ওদের পথ। কুমারপাড়ার মেলা অনেকদিন আগে ভেঙে গেছে,—লোকেরা ফিরে যাবে এই পথ দিয়ে। কত মালপত্র কিনেছে কত লোক, কত লোক পালন করিয়েছে, কত লোকের অবস্থা ফিরে গেছে।

না, আজকেও ওরা এলো না। খেলা শেষ হয়ে গেল, নবীন ঘরের পথ ঘুমের দেশ্যুদ্ধিয়ে ভরে গেল—ওদের লোকা দেখা গেল না। সত্ত্ব দিনের মতো ওরা ফিরবে বলে গেছে, কিন্তু এক রাতের বেশী হয়ে গেছে। হয়ত কফির কফিরের কথা ওদের মনে নেই। কফিরের আশা পায়।

আরেকদিন একখানা মহাজনী নৌকা দেখা যায়। ওই মস্ত নৌকায় ওরা আসছে কি? হাঁ, ওই নৌকাই। অত ঐশ্বর্য আসবে বলেই এত দিন দেরি। জনমানুষ ভরা, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সম্পদের ভরে ঢলো-ঢলো—ওই অত বড় নৌকা! ওরা আসবে, অপরিচিত বিদেশের মতো এসে পৌঁছবে ওরা—জমজমাটির আকস্মিক আবির্ভাবের মতো আবির্ভূত হবে ওরা—তাই তো এত দেরি, এখন অবধি আসছে প্রতীক্ষা!

কিন্তু মহাজনী নৌকা পার হয়ে চলে যায়। আসে সন্ধ্যা, আসছে রাত্রি। কফির ঘাটের বুড়ো ঘাসের জন্যে বসে থাকে। আলো তার ঘরে ঘরে। পাঁচে সে কাঁপতে থাকে।

মণিমালি বলে গেছে, কফির, দুই পরের মেয়ে কফির, পাঁচের কাজ করবি, সকলের মতো তুই শিখি। মণিমালির সেই আদেশ অর্থ অর্থ পালন করেছে। বিছানাটা নিয়ে এসেছে সে মাথায় করে, নিজের ঘরটিকে চেয়েছিল বিদায় দিয়ে এসেছে পাকান-খালায়। ঘরের চাল-ডালগুলি দিয়ে সে ঢেকে দিয়েছে, নতুন চালগুলি দিয়েছে ঘাসের মেয়ে। আজ একা নিজ, সম্পূর্ণ নিজের। কিন্তু ওরা এসে ফিরলে কফিরের ঘর, তাদের কলাপ্ত ছাপিয়ে উঠবে বলেই আজ এমন নিঃস্ব হবার সাধনা হয়েছে। সব-কিছু হারে দেওয়ার পরের ব্যথা, তাই কফিরের আজ এত আনন্দ!

বেলুন ঘুরে নিয়ে কফির বসিয়ে ছিপে ফিরে আসে।

ঈশানকোণে দেখে আজ আসবেই। কতো ঢেলা দিয়ে জল সেচে মাদারাইয়ের কাঁথা ফিরে যায়, কিন্তু পালাই ইয়ের সাড়া নেই। বুড়োর শিথিল দেহটা বেরেছুরে ছড়িয়ে থাকে—মাঝে মাঝে একটু নড়ে, এই মাত্র। এই দু-মাস ধরে বুড়ো ঘরে মাঝে কফিরকে রেখে ঈশানীর ঢলন করেছে,—কফির জানিয়েছে, ওরা আসবে, এই পথেই আসবে। বুড়ো অনেকদা ভরসায় অধীর আগ্রহে। ওরা আসবে, বুড়ো বিশ্বাস করে, কফির পথের দিকে চেয়ে থাকে। পদ্মফুল-গুলি ওরা নিয়ে যায় নি। সেই চারটি পদ্মফুল। ঈশানালি, বীণা, আজ আর পূর্ণ। নিষ্পত্র সূর্যের সহাস চারটি নিষ্পাপ পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। ওদের মধ্যে চলে প্রতিজ্ঞা করা আছে, ওরা ফিরবেই, নিষ্পত্রের বন্ধু, নিষ্পত্রের সেবক, ওরা পরাজয়ক্লান্তের মহাপ্রাণ। ওরা আসবে, আসবে,—ওদের ফিরে আসতেই হবে। রক্ত মৈত্রে ওদের চলবে না, প্রাণ ছাড়া ওদের আর কোন কাজ নেই,—এই ওরা যন্ত্রের চালা, এই বাঁশবন, এই গাছগাছড়া, আর এই বুদ্ধুদাধী শব্দ সে ওদের আসতেই হবে। ওরা আসবে, ফিরে আসবেই একদিন!

কফির আবার, কফিরের, ঈশানীর পদ্মফুলের সেই উৎসবুটীরের আলোপাশে চলে বেড়ায়। আবার এক সন্ধ্যা ছড়ায় আসে, বাজারের পাশে ঘরে তুমি পাকাটালির উপরে হাত বুলোয়। বুদ্ধুদেরের সান্ধ্যা ফিরে এল, তুমি কত আসবে বেশ? ঠিক আসবে ওরা!

বুড়োর সাড়া নেই সে, নড়ে না। এমন সান্ধ্যা সে দেখেছে এসেছে ফিরের পর ফির, বুড়োর পর বুড়ো, কাল কালান্তর। বুড়ো চোখ বুজেই সে দেখবার চেষ্টা করে—কিন্তু দেখতে পায় না, চোখ তার ঝাপসা হয়ে এসেছে। একটানা ঘোলাটে রং ঘনিয়ে।

কৃষ্ণার সঙ্গলনা দিতে গিয়ে এক সময় বিমান বলা বলে, ওরা জানবে সাহারাই, খবর পাঠিয়েছে।

বুড়ো আবার হতাশায় ভেঙে পড়ে। কৃষ্ণার ভয় চেহারা দেখে কাঁদ হয়ে ওঠে। বুড়ো মেয়ে তার তপ্ত মস্তকের স্নেহের বাঁধন খুলে একাকী দাঁড়িয়ে উঠতে চায়। কৃষ্ণার মাথা হয়ে আসে, না, না—উঠতে হবে না, ওরা চিঠি দিয়েছে, নিশ্চয়ই আসবে।

বুড়ো যেন কৈফিয়ৎ দিতে ব্যস্ত হয়, কৃষ্ণার আর্তনাদ হয়ে ওঠে। এই দু' মাসের মধ্যে তার লালসাইয়ের দুশ্চিন্তার কথা যে মনে হয়ে যেতে, সেদিন কৃষ্ণার একবারও ভাবতে পারে নি। বুড়ো আবার মাথা বাঁচিয়ে কৃষ্ণাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করে। সে যেন বলতে চায়, কৃষ্ণা, মাথা, আকাশে বাতাসে ভয় নেই, যে কটা দিন আমার বেঁচে আছি দিয়ে যাবে। তোমার ভালোর জন্যে তুলে দিয়ে যাবো।

কুসোরপাড়ার মেলা লোকে ভুলে গেছে। এক আধজন যারা এই পথ দিয়ে যেতো, তাদের মুখেও আর কিছু শোনা যায় না। পূর্ণ আর মল্লিকাদির ঘরটিতে আর কেউ উঁকি পড়ে না। কৃষ্ণার কাছে আছে তাদের চেহারা এক টুকরো মোমবাতি। এইটুকু সে দেখেছে পথ ঘাটে। ওরা যেদিন আসবে এই মোমবাতির অবশেষটুকু জ্বালিয়ে কৃষ্ণা এদের আলো দেখাবে। অন্ধকারে ওরা পথ চিনবে।

কিন্তু আসবে কি ওরা? ওরা ভুলে গেছে আমাদের ওখানে।—বহু দলছাড়া মানুষ। ওরা ভাসা লোক, এদের অনেক আছে। ওরা পরীবের দুঃখ ঘোচায়, অন্যের সেবা করে, ওরা দান করে, দয়া করে। সমাজ চেতনার মহালগ্নার অন্তরালে ওরা ছুটে যায় দুঃখের সমুদ্রের অন্ধকারে,—সেখানে সমুদ্র কাঁদিয়ের মতো দুর্বোধ আর কঠ [illegible] রের রোল ভেদ করে মেঘমন্দ্রে [illegible] ওরা এদের হৃদয় বলেই [illegible] বড়, সেখানে তাল পায়ের [illegible] কৃষ্ণার চালাঘরে,—[illegible] আসবে, সেখানে ওদের দেখা [illegible]

[illegible] কৃষ্ণাকে। আজও [illegible] সেদিনের মতো। বুড়ো

আশায় সেদিন বাঁধলি। কৃষ্ণাকে বড় হতে হবে, মানুষে তুলে ধরতে হবে। জীবনকে সে পড়ে তুলবে,—একদিন সে মস্ত বড় হবে। মল্লিকাদি তাকে আশীর্বাদ করে গেছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে কৃষ্ণা একদিন তাদেরই খুঁজে বার করবে।

আকাশ ভরে আসছে মেঘে আসে। বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কায়। তপ্ত ভীরু ধরণী উত্তেজনা পেলে। সাগরের বালুকণা যেন ধানবেষ্টা মৌমাছি হোলেছে। ঝড়ের আগে চারদিকে বাকি কয়েকটি ঝিনুকিয়ে হয়ে উঠে চলে যায়।

বুড়ো যেন অথাধ সমুদ্রে ভুল যাচ্ছে,—হাত বাড়িয়ে ছাই সে আকুল হয়ে ধরতে চাইছে অকূল মূর্তি। বুড়ো মাঝি অনেক ঝিনু,—তার ঝেড়ে মাতামাতি এমন বিশ্বয়। বুড়ো কাঁদে না,—কম্পিত বিছানার ওপরে সে যেন উপবৃত হয়ে উঠতে চায়। সে শিল্পী, সে ভক্তা, সে পুতুলের মতো ভাল চাঁদটা করে, চাঁদিয়া বানিয়ে ছেড়েছে।

কেনারাতে কৃষ্ণার সেই অর্ধসমাপ্ত ঝেউ-বাঁটুকু আজ বাড়ে ঠকাতে বাকা হয়। বুড়োকে দেখে সে ভয় পায়ে, বুড়োর মুখের বিচিত্র আর্তনাদ মনে মনে তার বক্তব্য ওঠে,—বুড়োর ভূতুড়িকরাল চক্ষু যেন ঘর-সমাজের মতো ভয়ঙ্কর! সহসা কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে, দাদাভাই, ও দাদাভাই.....

আকাশের বুড়ো বিকটাকার ভয়ে কি যেন বলে চলেছে মতো।

কৃষ্ণার চেঁচিয়ে বলে, কোথা যাবে বুঝি দাদ ভাই?

বুড়োর দুঃখের গহ্বর থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে অস্পষ্ট ভাষায়। বুড়ো ভাবে, ফিরিয়ে আনবে!

বুড়ো যেমনতর সমস্ত বাধা আর বাধন দুই হাতে ঠেলে এক লম্ফে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, হঠাৎ দুঃখ বুঝেছে বিছানায় পড়ে গেল। তারপর একেবারে নিঃসাড়!

কৃষ্ণার আর্তনাদ ভয়ে ওঠে, দাদাভাই—!

সাড়া নেই। অনুভব করে কৃষ্ণা আরও ভয়ে। বুড়ো একটি নড়ে ওঠে এবার। এখনো। মরে যায় নি, এখনো ওরা এসে দেখা হতে পারবে। মোমবাতির শেষ অবশেষটুকু এখনো ফুরোয় নি।

সহসা আকাশ ফাটা চিৎকারে এসে ঢোকে। বৃষ্টির ঝাপটা ঘরে আসে। ঈশ্বরের চাবুক একটা জোর সপাং করে মাটি ছড়ে পড়ল।

কৃষ্ণার চীৎকার করে, দাদাভাই.....ওই যে এসেছে ওরা!

বুড়ো চির হয়ে পড়ে। কৃষ্ণা কেঁদে ওঠে, ওই যে, ওই যে ওরা এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না?

মুহূর্তের আগে বুড়ো ব্যাকুল হয়ে কি যেন খোঁজে। কৃষ্ণার হাই হাই করে বলে, দেখতে পাচ্ছ না? ওই যে তোমার সামনে। তোমার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে, দাদাভাই।

বুড়ো বিশ্বাস করে না। কৃষ্ণার ভাষা-ভাষি আর কিছু না পেয়ে সেই হারানো হৃদয়ের পুতুলের 'পাঁচ' দুই হাতে তুলে ধরে, তারপর বুড়োর ঘোলাটে জল চোখের সামনে ধরে বলে, এই যে... এই যে এসেছে ওরা.. চেয়ে দেখো দাদাভাই!

পুতুলদুটির ভিজে চোখ তুলে বোঝাবার বুড়ো কাঁদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, ওরা এসেছে! অন্ধকারে যেমন জ্যোতিলেখা দেখা যায়, যেমন দুর্লক্ষণের ঘটে, মুহূর্তের আগে যেমন অবান্তর দেবতার আবির্ভাব দিব্যজ্যোতি দেখা যায়,—বুড়ো তেমনি যেন দেখতে পায়, ওরা এসেছে তার চোখের সামনে। ওর এসে দাঁড়িয়েছে,—ওরা মিথ্যা স্নেহাকাঙ্ক্ষাকে ফাঁকে ফাঁকিয়ে যায় নি। ওরা হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুতুলদুটির কৃষ্ণার ঘরে থাকে বুড়োর চোখের সামনে। মুহূর্তের দুঃখে-চোখে শান্তি ও আনন্দের [illegible] যায়। যেমনতর নৈরাশ্য, [illegible] প্রতি কেমনো অভিযোগ, অথবা মানুষের প্রতি কেমনো অবিশ্বাস—কিছুই সে রেখে গেল না, এইটুকু সান্ত্বনা!

তারপর? তারপর সেই বুড়োদের অন্ধকারে কৃষ্ণা একলা বসে বসে ভাবে। মনে হয়, সমুদ্র একলা নয়, সে যেন ভয়ঙ্করীর মতো বসে আছে।

প্রবোধ কুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যাল আসলেই ছিলেন এক পরিব্রাজক-সাহিত্যিকের মতো। তাঁর ছেলে ওঠে। সে সাহিত্যিক হতেছেন বলে। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরেছেন। ফল-বিক্রি-করা লেখকের আড্ডাখানার পথে ঘুরেছেন। হিমালয়-প্রতিভাকে চিনে নিতে নিতে, তার ছিনিয়ে নিতে নিতে গেছেন। কিন্তু এই হিমালয়-প্রতিভার যে মনোলোক চিরন্তনের সিদ্ধস্থল, সেখানকার হিমালয়ের মতো তিনি যে মানবাত্মা লোকসমূহের ছবি আঁকতেও সক্ষম, সে-প্রমাণ মেলে তাঁর কথা-উপন্যাসে।

[redacted]র সকলের চেয়ে [redacted]কারবার তাঁর। হিমালয়ের মতন অনন্তের চড়াই-উৎরাইকে ঘিরে তাঁর পথ-চলা।

এখানে এসে তাঁর মৌলিক প্রতিভা খুলেছে হয়। তাঁর পরিব্রাজকের নিরাসক্ত মনোভাব মনে সমস্তরের ছোট-বড় দুঃখ-সুখ, ব্যথা ফেলেনি।

সেই কারণেই মনের [redacted] বড়ো। তাঁর বিচিত্র। কারণ হৃদিস ওদের থেকে পাওয়া যায়। জীবনরসপুষ্ট হতে ছোটো-খাটো ঘটনা-হাসির কারণ দেখা যায় ওদের থেকে।

এটা যেমন-এর সাহায্য হামেশাই তাঁকে করেন: আমার কথাও একদিন ছোট নদীর। এটা দুঃখ-কথনের প্রতিনিধি করেন: আমার কথাও মুখোশহীন জীবন-সম্বন্ধে নিয়ে মন্তব্যহীন। এদের বিষয় মনোরঞ্জন সমাজের পরিবর্তিত পৃষ্ঠপটে জীবনের খুঁজে পাই আমরা, কখনও বর্ণিত আর কখনও বিষয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে।

বাংলা ছোট গল্প মানুষের ওঠানামার দেখবার যে মনোরম চরিত্রবিধান করেছে তাতে: এর চরিত্রায়ণের মূলে রয়েছে করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

প্রবোধকুমারের বাস্তবমনস্ক তাঁর বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি বাংলা ছোটগল্পকে নতুন ঐশ্বর্যে দীপ্ত করেছে এবং বিশেষ করে রোমান্টিক কল্প-মায়ার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে অনেক-খানি অবধি।

এই প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর-চর্চার একেবারে প্রথমদিকে যখন অধিকাংশলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লেখক সৌন্দর্যান্বেষণে, প্রতিভা যদি প্রকৃতির দীপের মতো মনে, তবে সে আত্মভোলা হতে যায়। অন্তত বলতে গেলে আত্মভোলা এখানে। কলমে ফেলে ঠিক মৌসুমের একটা রূপী, যে নাকি কলমের আলপনা করে ছুটতে ছুটতে অনেকটা বেশ নিজের খেয়ালেই চরিত্রের নামক বহু-সম্বন্ধের মুখে নিমুখেন হয়ে গেল। অন্তরে এই নিমুখেন-ধারার কাহিনী আঁকতে গিয়ে প্রবোধবাবু সততার পরিচয় দিয়েছেন লেখক এবং সে পরিচয়কে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন নায়িকা চরিত্রের মুখরোচক বিশ্লেষণের দীর্ঘায়ি সৌন্দর্যে।

তাঁর [redacted]রের মুখে-মনে পরিবর্তন, মর্মে-মর্মে [redacted]। একদিকে মানসিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক সমন্বয়দৃষ্টির এক অন্যদিকে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উপযুক্ত মুখরোচকের এমন মধি-মনস্ক যেন বাংলা ছোট গল্পে সচরাচর দেখা যায় না।

এছাড়া রোমান্টিক বিশ্লেষণ হিসেবে 'মুখোশ নিয়ে' গল্পটিও ভুলে যে যেতে পারে। এ গল্পটিতে ঠিক যেই মনস্ক একটি মুখোশ পরবার আগে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে নায়ক হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলো আসলে সমাজে, সংসারে, প্রকৃতির ও মোহনলে।

গল্পটির আরম্ভ বিশ্লেষণের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এখানে: এবং সে গল্পের প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো বিলম্বিত করছে একদিকে হিমালয়ের এবং অন্যদিকে দেবী-প্রতিমার মতন্ত হয়ে।

হিমালয় কলোনাক্ষা দেবীরানীকে, আর ঘিরে কাল প্রতিমাকে। এদিকে [redacted]-রূপী পরম চাকরীকে নিয়ে: আর [redacted] বাসন্তী ফুলে রাখল হিমালয়েরই [redacted]: এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের এই ফুলে-ফুলে ভালোবাসা মেখানে গিয়ে ঠেকল হল, আমরা তাকে মনের পুরো বলি। আসলে এখানে হিমালয়ের মাঝিতে দেবীরানীর আঁকড়ানি হবার সুযোগে এই গল্পের ওপর [redacted]-পত্রে ইতিহাসের প্রলেপ হলিয়েছেন লেখক।

গল্পের কলে প্রলেপ হলোরও [redacted] রকম আয়োজন চোখে পড়ে। এখানে [redacted] এক বেলওয়ে স্টেশনে দুই পুরোনো প্রণয়ীর সাক্ষাৎকারকে ঘিরে রোমান্টিক পরিবেশ রচিতে তুলেছেন প্রবোধকুমারই এবং পরিবেশটি রচনার ঐশ্বর্য ও কলনার দিগন্তরে হয়ে উঠেছে অনবদ্য। কিন্তু তবু বলবো, সব রোমান্টিক গল্পেই বিলিষ্টতার দাবী করতে পারেন না আলোচ্য লেখক: এবং কেন পারেন না, তা বলতে গেলে একটি উপমার আশ্রয় নিতে হয়। উপমাটি অবশ্য দিব প্রায় আজ থেকে বলা সাহিত্য সম্মিলনের প্রবোধকুমার সান্যাল সভাপতি হিসেবে প্রবোধকুমার সান্যাল নিজেই অবশ্য করেছিলেন। সাহিত্যের কী থাকবে, আর কী [redacted]-শীর্ণ পাখীর মতো ওদে পড়ে যাবে, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লৌকিক বলেছিলেন,—দেবীরানীর দিনে প্রকৃতির আসল। কিন্তু শেষের প্রবীণদলের আমাদের দিয়ে দেখি, অনেক অনাবশ্যকে নিয়ে গেছে; [redacted] করেছে। সাহিত্যের [redacted] ঠিক তাই। অনেকটা যায় থাকে, কিন্তু অনেক কমই থাকে না।

[redacted]ঠিক কথা: থাকে-না এবং অনেক হওয়ার সাপেক্ষে প্রবোধকুমারের

সব রোমান্টিক গল্পই ঠিকে আঁকতে ভিন্না সন্দেহ। সন্দেহ কম, রোমাঞ্চকর, এবং সকলের ভূমিকা-অভিনয় জনাকে নিয়ে।

কিন্তু সন্দেহ বা কিছু কিছু চরিত্রের অন্য থাক আপাতত। আপাতত বলা যে চরিত্রগুলো অনবদ্য, তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মনে হয়, যেখানে বাস্তব-অভিজ্ঞতার গভীরতার ছবি এঁকেছেন প্রবোধকুমার, সেখানে তাঁর অনেক ছোটগল্পই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-উৎসবে চিরকাল আলোক ছড়াবে। 'মিছ', 'তৃতীয়া', 'সিংহাসন', 'এই দুঃখ' ও 'সর্বংসহা' এই শ্রেণীর ছোট গল্পের বিশিষ্ট উদাহরণ।

'মিছ' গল্পটিতে জীবনস্রষ্টার রূপক করে প্রবোধকুমার মনুষ্য পরিবেশন করেছেন। এককালের হিংস্র ও দুরন্ত পল্লী-মেয়ে টুনিকে তিনি আধুনিকের উপযোগী মানুষের বহুরূপে এঁকেছেন। তাঁর অভিযোগ অনেকদূর টেনে নি এই কারণে যে, টুনির অশিক্ষিত-অসংযত কৈশোর যেমন, স্থির-সংযত যৌবনও তেমনি একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপ চিত্রিত। এছাড়া নিরুদ্দেশ আমোদ-আসনের পথ খুঁজতে টুনির যে সে বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক বলে কিছু। কেননা, কৈশোরের খামখেয়ালী বিকিরণী যে, যৌবনে বাঁধনহারা হলেও যায়া পেলে সে তো কল্যাণিনী হবেই।

তৃতীয়ার জীবনের কঙ্কাল সেই সত্যটা আছে। প্রবেশ নামক একটি মানুষের জীবন-পটভূমিকে ঘিরে এই সত্যকথা মুহূর্তের মতো বিদ্যুৎ করে তিনে আমাদের। কারণ, এখানে তৃতীয়া সম্পর্কিতার খামখেয়ালী চঞ্চল যেমন, হতভাগা প্রবেশের জীবন-কল্পনাও তেমনি অসম্ভব [illegible] প্রবেশ যেন মুখরথার সেই বক্ষ [illegible] নারি সম্পর্কে ভোগ করতে চায় না, [illegible] রাখতে চায়; ঐশ্বর্যকে খরচ করতে [illegible] জমা রাখতে চায়; যে নারি মনের [illegible] যৌবন থেকে যেমন করে ভোগ [illegible] চায় তার স্ত্রীকে।

[illegible] এক প্রচণ্ড ঢোকে পড়ে [illegible]। ওখানে যৌথ বাড়িতে [illegible] নিয়ে কলকাতায় [illegible] বাসা নিয়ে দুজনকে যেমন তার [illegible] তেমনি অন্যদিকে করা যায় গ্রামের [illegible] ছোকরাই দখল করেছে। [illegible] অধীনস্থ; আর এই অভাবে বিজয়া [illegible] মিলনের এ এক ভাঙাচোরা [illegible], সর্বহারা। লালিমাকে সামনে রেখে [illegible] 'মিলনীর' দুঃখ-নিবারণের [illegible] অন্তরীক্ষ অনুভূতি সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে চিত্রিত।

সূক্ষ্মদর্শনী নয় কল্যাণিনী প্রবোধকুমারকে 'এই দুঃখ' গল্পেও খুঁজে পাই আমরা। এখানে দেখি, দুঃখটা আসলে সমাজনীতির সঙ্গে মানবনীতির, অধিকারের সঙ্গে ভালবাসার এক এ-দুঃখ করতে গিয়ে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে দুজনেই। [illegible] ভালবাসার দুঃখের পথে [illegible] করেছে তাকে। যা-কিছু এক-[illegible] ছেলেকে ঘিরে আজ গড়িয়ে [illegible] 'দুঃখ-মোচন' করার [illegible] পড়েছে। কিন্তু ভোলো [illegible] নীতির দিক দিয়ে অনীতিকে পরাজিত করতে পারেনি। দুঃখে যারই জয় হয়েছে আপাতত। এবং [illegible] অপমান ও [illegible] [illegible] ছেলেকে ঘিরে অন্তরঙ্গতার রঙ দিয়ে এই অন্তরে 'মনস্তাপস্মৃতি' চিত্রিত হয়েছে।

'সর্বংসহা' গল্পে আরও সেজন্য এর ভরসা। কিন্তু ঘটনার দুঃখে সমস্ত-পরিমণ্ডলে যথেষ্ট ব্যবহারনী এক নারীর মে-ও-ভাব ও বিয়ে-বেদনার অন্তরালে মুহূর্তে মতো উজ্জ্বল।

মুহূর্তে অবিশ্যি আরও অনেক ভাল প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের আসরে। 'শ্রোতিনী', 'পুতুল', 'আশ্চর্যগিরি' ইত্যাদি গল্পে অবলম্বিত মানুষের যে বিশ্বস্ত চিত্রগুলো এঁকেছেন তিনি, মুহূর্তে তাদের আর কোন বস্তুর সঙ্গেই ত তাদের তুলনা করবো!

'শ্রোতিনী' গল্পটিকে চেনা-জানোয়া-সাজানো একটি শ্রোতা নারীর জীবনযাপন করা যায়। [illegible] মুহূর্তের জীবিত ও মৃতের' কাব্যিনী মনে প্রধান অভিযোগ যে, সে মরেনি; আর এ-নারী ঘোষণা করল যে, সে থাকেনি; শ্রোতিনীর মতো নিরালম্ব ও নিরাধার হয়ে থেকেছে। এবং মানুষকে ভালোবাসার বদলে সারাজীবন ধরে সে, অবজ্ঞা ও অপমান কুড়িয়েছে। শ্রোতিনীর ভূমিকাভিনেত্রী স্বামীর জীবন-ব্যবহার প্রবোধকুমার সাধারণ-এর এক অসম্ভব সৃষ্টি। যার কেবলি কেবলই করে আমাদের: যার অবিচলিত ভালোবাসার পাকে জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের পরিবর্তিত করে।

'পুতুল' গল্পে পাওয়া [illegible] এক দুঃখিতে আবিষ্কৃত। এখানে মানুষই আসলে নিষ্প্রাণ পুতুল। আর যেন পুতুল প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত। অর্থলোলুপী মনুষ্যত্বহীন সন্দেহই এই জীবনকে মেখানো হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে, সাধারণের নিরপরাধ স্থান হল এ পৃথিবীতে, চরম অসম্মান ও অবহেলার মধ্যে পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হল। অথচ অজ্ঞাত-অজ্ঞাত বাংলার এক পল্লীকুটিরের [illegible] বাঙ্ময় ও হতভাগ্য মনে নিরপরাধ নিষ্পাপ মনস্তাত্ত্বিকতার পরিচয় করে. আমাদের এক দুঃখের মনে দেখতে পাই, ফকির আর বৃদ্ধপ্রকৃতির মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে যাদুই নিজের হাতে গড়া পুতুল খেলায়। ফলত, এরা সেই চরম—মরণের অনেক পরিচিত প্রতীক করেছে মানুষ। এরা সেই একমাত্রের অন্ধ অভিযাত্রী, যারা একদিন আমাদের ভয় করা বিরোধিল।

প্রায়-অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, মানুষ বিশ্বাস করে এ-কথা এবং এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যেন অন্ধ-পুতুল জীবনের সত্যাসত্য-স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

পুতুল ঠিক সেই ধরনের মুহূর্তাশ্রিত একটি গল্প; যা জীবনের সত্যসুন্দরের [illegible] গভীরতাও খনন এনে দেয়, যা একদিকে জীবনের বেদনা ও হতাশাকে নিবিড়; এবং অন্যদিকে জীবনসত্যসুন্দরের সহজ-দর্শনের দেওয়ালে।

পতনের মুহূর্তে নিয়ে বিশ্লেষিত 'আশ্চর্যগিরি' গল্পের নায়িকা মুহূর্তে। কিন্তু ট্রাজেডী এই যে, তার জীবন-পরিমণ্ডলটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার আগেই অন্তর্ধান ও বিশ্বাসের আঘাতে ভেঙেচুরে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ-ধরনের কাহিনী এর আগেও হয়তো পড়েছি আমরা। কিন্তু ছোট-গল্পের কারুকে যোগাতে গিয়ে ভাঁড়িখানাকে এমন করে আর নাম দি কেউ। ভাঁড়িখুরিতে দাঁড়িয়ে দেবতা-সাক্ষী করে হিংস্র-আদিম মানবপ্রকৃতির আক্রোশের ছবিটিও এমন করে কেউ আঁকেননি।

আরও জীবন ও চরিত্রের আশ্চর্য-সুন্দর সব ছবি আঁকতে আঁকতেই এগোচ্ছেন প্রবোধকুমার। কোনো কোনো ছোটগল্পে ধরে, অবশ্য ও মধুময় মুহূর্তাশ্রিত দাঁড়িয়ে-থাকা চিরকালের মানুষকে তিনি তুলে ধরছেন। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য 'অমাবস্যিনী', 'কল্যাণী' ও 'আশ্চর্যজন'। 'অমাবস্যিনী'তে বিদেশী কন্যা তার ভৈরব-জীবন হারাকালকে নিয়ে জীবন্ত। আর জীবন অপবিত্রীয় এক বিশ্বাস্তা নিয়ে অসহায় ও ক্লান্ত। এখানে জীবন-মধুময় মুহূর্তাশ্রিত দাঁড়িয়েছে মানুষ এবং মাঝে মাঝের ভেবে কল্যাণী পল্লী কুমি-মধুর সঙ্গে পাশা দিতে উঠে তেই হতভাগ্য মানুষেরই শাশ্বত প্রতিনিধি।

সন্দেহ নেই, ঠিক এ-ধরনেই আর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প হল 'কল্যাণী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নতুন অন্ধকার [illegible]-গল্পটি লেখা। এবং এ সাধারণ [illegible] যে, এর নায়িকা পর্যায়ের ধরনের বাঁধনা বিধবা ছোকরি আইনিন ধরনে সৌদামিনী পথে পাশ্ব ও নিস্তরঙ্গ জীবনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যে আনন্দ, কৃত্রিম ও বিলাস-মধুর জীবনকে বেছে নিল, তা একদিক থেকে দেখলে কল্যাণসম্ভব বলে মনে হলেও অন্যদিক থেকে, অর্থাৎ মুহূর্তের কলকোলাহলে বেশ ও সমাজের পরিবর্তনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। গল্পটির নায়িকা ছোকরির পরিণতি বেদনাবিদ্ধ করে আমাদের এবং আমরা স্বিধাহীন হয়েই যেন স্বীকার করি, জীবনের কাছে ছোকরির দাবির প্রতি এতটুকু উপেক্ষা প্রদর্শন না করেও এই বেদনাবোধ অস্বাভাবিক লেখকের ক্ষতি।

'আশ্চর্যজন' গল্পে কৃতী লেখক বেদ-বিজ্ঞানের বেদনা ও বিক্ষোভকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বেদ ও মধুময় যে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে, এ-কথাটাই এখানে বিশ্লেষণের উপায়ে তুলে ধরেছেন তিনি।

আলাদা লেখকের বিশ্লেষণীর পরিচয় বহনযোগ্যমান গল্পগুলোতেও মুদ্রিত হয়। এই শ্রেণীর গল্পের সহজতম বিশ্লেষণ 'আকাঙ্ক্ষিতের ঘর', 'ঐশ্বর্য', 'অন্ধ' এবং 'অন্ধকার-রাত্রি'।

'অর্ধাঙ্গিনীর বই' গল্পের আসল সমস্যা একালের সঙ্গে সেকালের নয়, খুব-নয় একনলীতারের সঙ্গে পশ্চিমা-ঔষধ আবিষ্কারেরও নয়; সমস্যা আসলে দুজনের মনের সঙ্গে দুজনের, সমাজের মনের সঙ্গে সমাজের। এই সমস্যার চিত্র অসাধারণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

এ ছাড়া অসাধারণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন 'ঔষধ' গল্পটিও। এ-গল্পটির বক্তব্য হল, আসল ঔষধের অপরাধটি টাকা পয়সা বা পাইপ-তাই নয়,—দুঃখ,—দুঃখবিলাসের মাঝে ঐ দুঃখ। এই দেশের মস্তো জিনিসের অভাবেই প্রচুর বিয়ের অধিবাসী হলেন ও দুনিয়ার জীবন যাত্রিলক্ষ। 'যাত্রিলক্ষ ঔষধের' এমা প্রচারক'। কিন্তু এদের সমাধান সমস্যা ও কিন্তু অবশ্য ঠিক এর উল্টো। ব্যাপার হয়েও মস্তো ভয়। অসল, যাত্রিলক্ষ নয়, অসাধারণ ঔষধই এদের সমস্যা। এই সমস্যার চিত্র আঁকা অসল কথায় সার্থক-ভাবেই পরিস্ফুট করেছেন লেখক। এবং এ ছাড়া অন্যান্য গল্পের জীবন নিয়ে অনুশীলনের যে সুযোগ তিনি পরিস্ফুট করেছেন, তা সত্যিকারের অনুরাগ আসলকের হয়ে আসবে। এ-গল্পের অনুরাগী অবশ্যই হয়েছে যাবে, কিন্তুরে কিন্তুরে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে অন্য যা কিছুই ভোক না কেন, সত্যিকারের অন্যায় হবিন ভোলে না।

আশীর্বাদ ভঙ্গী হয়ে পারে কি স্ত্রী-সমস্যাকে ঘিরে লেখা সার্থক গল্প, সমাজী-স্ত্রীর সমস্যাটিও। গল্পারম্ভের মধ্য দিয়েই তার [redacted] আমাদের শেষ এ [redacted]

অন্যান্য আলোচনার অনেক বেশি পরিমাণে চোখে পড়ে মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে লেখা প্রবোধকুমারের গল্পগুলোতে। এই শ্রেণীর গল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'দুর্দিন-মান'। এখানে পাই শান্ত শ্রেষ্ঠী ও নিরুদ্বিগ্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক-সমাজ-শ্রেষ্ঠ দুর্দিন-সংকটের ছবি। অন্ন-বস্ত্রে নিদারুণ টানাটানি আরম্ভ হয়ে; এবং এই মধ্যবর্তীদেরই নাম এখানে দুর্দিনমান'। এই গল্পে দরিদ্রের চাবুক-খাওয়া লোকী ও অসহায় মানুষের যে করুণ ছবি এঁকেছেন লেখক, তা একদিকে যেমন দুঃখ-অভাবের বিপুল-বিচিত্র রূপের সুন্দরে সুবাসিত, অন্যদিকে তেমনি অতীত-দুর্দিন সম্পর্কের আকর্ষণের দুঃখ-বিলাসী। আশীর্বাদ সমস্যা নেই, সেখানেই আমরা, এখানে এসে সে অবশ্যই জীবন-অন্বেষণের অন্যতম একটি প্রান্ত এখনে অন্যান্য বিশ্লেষকদের অনেকেরা।

অন্যান্য বিপুল-শ্রীতি প্রবোধকুমারের গল্প-প্রকাশের গল্পেও চমৎ আছে। কিন্তু সেখানে ঘটনা এত এক সময় চোখ ধাঁধিয়ে দেয় পাঠকদের, আসল জন-বস্তুটিকে ফুটিয়ে তোলার অবসরে তার কাছে পাঠকদের দৃষ্টি প্রায়ই পৌঁছয় না। এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ হল 'রহস্যময়ী মহাদেব', 'ঐতিহাসিক' এবং 'শিবের অসীম বিষ'।

> হয়ে যেমন একটা অসুখ, অমনি পরিবেশ। প্রাচীন ঘরানার সৌখিনদারের সিন্দুকগুলি আজির ভিতর থেকে আমরা সেগুলি আজিরে যেমনই এঁকার চেষ্টা করছে। গল্পকারের অনেক-খানির পরিচয় আমাদের সেই মহলালের সৃষ্টি, আর আমরাও অন্তরিতার মধ্যে সেই প্রাচীন যুগের নিদর্শন। ওদের যুগে আজ আর কথা নেই।"

নিদর্শনার চিত্র আজ ঐতিহাসিক'-এ। আর 'শিবের অসীম বিষেরও আজ নির্বাচিত ছিল। তবে ঠিক আটোসাটো গল্প নয় এ: বরং যেন যেন টিলেঢালা। গল্পটির মোড়ার দিকে মনস্তাপী-বিজ্ঞান আজিনীর বিস্তার আর একটু মোটা হলে ভালো হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মোটো মোটো প্লটনিদের পরিচ্ছদের প্রবোধবাবুকে খুঁজে পাই আমরা। 'পৃথিবী হাঁড়ির' গল্পটিতে পাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও বঙ্গ-ভারতের ছবি। তবে এই ছবি আঁকা কথা নয় এখানে: আঁকা হল ক্রেতন ও বিশদি জীবনের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতি-নিয়ে।

এই অনুভূতি-নিয়ে সামান্যতম আলোড়নের লেখা দিয়েছে প্রবোধকুমারের গল্পেও। কখনও ছোনা-জানা জীবনকে ঘিরে, আবার কখনও দূরের পটভূমিকায় লেখা দিয়েছে।

ছোনা-জানা জীবনকে ঘিরে আঁকা সুন্দর একটি গল্প 'প্রদান'। সমস্যা এক সরকারী অফিসারের কৌতূহল, মনোভাবের ও দিয়া-সম্পর্ক এ গল্পটি আমাদেরকে কেন্দ্রাভিগ। অসুখের অবশ্যই মোটা রেখা নেই। গল্পটি তাই শুরু থেকে শেষ অবধি অনুরূপ ধীর মসৃণ বিন্যাসের মাধ্যমে।

বিজ্ঞানী অন্য এক দৃষ্টিতে প্রকাশিত স্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'ধীর' গল্পে। যুদ্ধ [redacted] ঘরে আর পাওনা নেই,—জীবনের নিষ্ঠুর অসুখ ধীরে ধীরে প্রতিচ্ছবিতে যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে ধরা দিল তাই গল্পটি। অসুখ ঐতিহাসিক এই 'ধীর'।

'ধীরের পর অসুখ অসুখ'। এ গল্পটিও লেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট-ভূমিতে। এতে পাই ভদ্রলোকদের প্রবাস জীবন-ঘরে-ঘরে এক যুদ্ধের সঙ্গে আফিসারা-পরিবার এক বাঁধন পরিবারের সম্পর্কের চিত্র। এই সম্পর্কে যুদ্ধকালীন হয়ে উঠেছে যেন অবশ্য; বাঁধনরা সাধনা করতে ভোলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধটি প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। এই প্রত্যাখ্যান ও আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব নিয়ে এ যুগের মূল্যবোধহীনতার চিত্রটি সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত।

সন্দেহ নেই, এ ধরনের দুর্ঘটনার আগে অনেক আগে প্রবোধকুমারের ছোটগল্পে। কিন্তু তবু বলবো, ভোরো একটা বিশেষ যুগের মধ্যটির নয়, অথবা অসুখ জীবন-স্রোতেস্বিনীর সামনে দাঁড়িয়ে মহাজীবনের অনুসন্ধানেরই রবি আনন্দ। তিনি যেন 'বলাকার' রবীন্দ্রনাথের মতো, 'যে আমি হারায়'-এর ভোজন যোগার-এর মতো ধরতে চান, 'যেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য যেথা, অন্য কোনখানে।"

এই 'অন্য কোনখানের' সন্ধানে যেরিয়ে প্রবোধকুমার বৃদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমীক্ষার ভার হয়েছেন। তবে জীবনকে তিনি যে দেখেছেন কিছুটা উদাসী ও নির্লিপ্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের।

প্রবোধকুমারের এই দেখার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে নিজস্ব ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার উপর নির্ভরশীল; গল্পের সমস্যা-অসমস্যারও উপর নয়। এবং এর ফলেই 'অসাধারণ', 'রাই', 'রোমিও', 'বিদেশিনী' ও অনুরূপ ভাতীয় গল্প লিখতে পেরেছেন তিনি।

প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য নিহিত আছে তাঁর উপমা-নির্বাচনে, ভাষায় এবং সংলাপে।

উপমা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় তিনি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এমন উপমা তাঁর অনেক আছে, যেগুলো হিমালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ বাঙালাদেশের অধিবাসীদের পক্ষেই অসম্ভব বলা। যেমন,

> "খড় একটা নিশ্বাসের [redacted] ভিতরে ফোঁপার মতো আটকিয়ে নিরোধিল; দুঃখের তীব্র বাতাসে তল যেমন ওঠে।"

[আলেয়ার আলো]

প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের ভাষা বলিষ্ঠ, কাব্যময়ী ও ব্যঞ্জনাময়। অন্যান্য অনেকের মতো তাঁরও ভাষার ভলভাবে প্রভাবিত হবার কারণে তাঁর ভাষা ভোঁতা নয়।

এছাড়া সংলাপ-রচনাতেও অসাধারণ দক্ষতা তিনি; তিনি অনুসৃত আসলটি-পিঠ-সমস্যা। পরিবেশ যুগের পাত্রপাত্রীদের মুখে উপযুক্ত ভাষা উপযোগের ক্ষেত্রে পাঠানো সাহিত্যে তাঁর সোলর খুব অনেকই আছে।

কিন্তু তবু বিশ্বাসেই তেমন খুশি হতে পারেন না তিনি। তাঁর আধ-আধুনিক ছোটগল্পগুলো পড়লে মনে হয়, গল্প লিখে এখনও যেন তিনি নিজের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ। অর্থাৎ, এখনও সোনালি সেই প্রতিশ্রুতি অনুশীলনের তিনি। অন্তত; ছোটগল্পের ভালো-লাগাটিকে নিয়ে নতুন অসুখের সন্ধানে তাঁকে ঘুরতে হবে।

ফেরিওলা

বুদ্ধদেব বসু

ফেরিওলার হাঁক শুনলেই নীলিমার মন রাস্তায় ছুটে যায়। বারান্দায় গাড়িয়ে হয়তো ডাকে—এই এসো—তোতলায়। কি হয়তো চলন দিয়ে ফেকে পয়সা। পিঠের ঝোলা নামিয়ে একটি অচেনা জীব সিঁড়ির ধারে এসে বসে; নীলিমা বারান্দার আড়ালে গাড়িয়ে কত জিনিস যে দেখে-ফেরে গণে। চলে আসার জিনিস কিনতে আধ-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ফেরিওলারা অতি ভালো লোক, কথা খুব মিষ্টি, তাছাড়া তাদের সঙ্গে আলাপ করা মুশকিল নয়। প্রথমে যা চাইলো তার প্রায় অর্ধেক দামেই হয়তো জিনিসটা নিয়ে যায়। তাও কাঁদিয়ে।

'ও জিনিস? ছিটের জামা, তাদের শাড়ি, ফিতের ঝুড়ি, সিন্দুর, আলতা, চুলের কাঁটা, কত কী। আর বাবলুর জন্য পুতুল, আর এটা-ওটা। কতগুলো লোক আছে, তারা এই ধা-ধা রোদে চিরকাল ঘুরে ফেরে যায়—ঢে-মাই সাধারণ মজুর আলাদা।' পিঠের উপর বোঁচকার ভারে শরীরের উর্ধ্বাংশ ডানদিকে ঝাঁকানো—ঐ বোঝা নিয়ে এত বড়ো শহরের কোথা থেকে কোথায় তারা চলে যায়, নীলিমার ভাবতে অবাক লাগে।

এদিকে শান্তনু ফেরিওলা পছন্দ করে না। তার বক্তব্যটা হলো, জিনিসের দরকার হলে নিউমার্কেটে গিয়ে দাম-টাম কম ফেলে নিয়ে এসো—হালালা ঝুটঝামেলা। ফেরিওলা, জাপানি খেলো জিনিস, তার [redacted]—জিনিসের উপরেই তার লক্ষ-[redacted]লো তার।

[redacted] দাম-টাম-এর অভাব হলেই [redacted] শান্তনুর মনে চললো তালো [redacted] আসার বসে থেকে-থেকে [redacted] জিনিস হয়তো কখনোই [redacted] আড়ালে। সংসারে কত জিনিস [redacted] বন্ধুবান্ধবের যার কী দরকার।

মা খুব [redacted] ডাক ডোকানো চাই সবাইকেই। [redacted] একদিন, নীলিমা সেদিন তার ফেরিওলার কাছ থেকে বড় পয়সা করে মাঝ গজ মাকিন কিনেছে, শান্তনু খুব ভেঁকিয়ে বললে, 'ওগুলো মশারি হবে?'

নীলিমা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলে, 'দেখেছি তো দেখেছি, তুমি চুপ করো।'

শান্তনু সাবধানে বললে, 'পয়সা নষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! এদিকে ডালিমের ওয়াড়গুলো সব ছিঁড়ে গেছে, তা নিয়ে পরামর্শদান করতে তোমাকেই ডাকি।'

'ও, এ নিয়ে বালিশের ওয়াড় হবে বুঝি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ অভাগিনীর একটা দেখিয়ে।'

'ঐ মোটা কাপড়ে তোমার শেমিজ?' আবাকে যদি বলতে—

'তোমাকে বললে শেমিজ কিনতে যে হবেই তোমাকে দোকানে। তোমার দুটিখন দেড় জো ঐ পর্যন্ত। হয়তো আর-কখনো সিল্কেরেও আবদার।'

'ভালোই তো। ভালো জিনিস তো ভালোই। তোমার শেমিজের জন্য আমি খুব চমৎকার একটা কাপড় কিনে আনবো, দেখো।'

'থাক, থাক, আমি পরিবারতন্ত্র, আমার ওসবই মনে। তুমি আর তোমার মেলে মতো পাড়ো বাবুগিরি করো।'

নীলিমা তক্ষুনি ফেকেতে আলমারি বিঁধিয়ে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসে গেল।

শান্তনু একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বললো, 'এই মেয়ে উঠলো, একটু বসলে কল নিয়ে। ও-রকম করো বলেই তো মাথাব্যথা ছাড়ে না।'

'ও আমার মাথা—তা ধরলেই বা কী, না ধরলেই বা কী? তোমার মাথা ঠান্ডা থাকলে বাঁচি।' চললো অবশ্য মনের ঘটর-ঘটর। শান্তনু আর কী করে, রবিবারের দুপুরবেলায় নভেল হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ।

দুজনের কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। শান্তনু যা বলবে, নীলিমা তা করে প্রতিবাদ করবে; তারপরে একগাদা কথা। জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে দু-জনে একমত।

সকালবেলায় একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে—আতাফল চাই! আতাফল!

তক্ষুনি শান্তনু বলে উঠলো, 'ঐ যে তোমার ফলের বাঁশি।'

নীলিমা বললে, 'ঠিক মনে করেছো। আতাফলের কথাই ক-দিন থেকে ভাবছি। তুমি ভালোবাসো বলে আনি?'

'এসব যাচ্ছে তালাই আমি খাইনে।'

'তা খাবে কেন। মনে আছে আমো পেয়ালা চা খেলেই খুব হলো! আমি অফিসটা, আপিস থেকে এসে খাবে।'

আতাওলা এলো, ন-টা পয়সা নিয়ে গেলো। শান্তনু বলে, 'সত্যি আমার এক-এক সময় ফেরিওলা হতে ইচ্ছে করে।'

'যাচ্ছে সুখে কিনা। এই রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে ক-পয়সাই বা রোজগার। আহা—এদের আবার নদী-পত্নী! তোমার সব মেলে পড়ে আছে—বছরে বৃষ্টি দেখাও হয় না।'

শান্তনু আবার একটা চিঠি লিখতে সুরু করেছিলো; অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হুঁ।'

'তোমার যাদের চোখেমুখের পয়সার পড়ার চাইতে এদের মুখে পয়সা বেশি ভালো। এরা যে কী অসম্ভব গরিব ভাবতে পারো না।'

'হুঁম বলো তো?'

'সেদিন এক বুড়োর কাছ থেকে কিনে নিলুম। আমাকে বললে—এ পয়সার সন্দেশ আমার কাছ থেকে নেয়, আপনিও খেয়ো, মা?'

'ও, তোমার মতন পুষ্টি হলে বুঝি!'

'আরে কী—আর পারিনে, মা, ছেলে-মেয়ে খুব্বতে, কিন্তু কী করবো। বাড়ীরা সব বলেন—কত মেয়ে তো সিন্দুর ছেড়ে যায় কিন্তু তোমার মতো ঘোরে আর-কেউ হাঁকে না। আমার ডাক শুনেলেই চিনতে পারেন তাদেরা। ছেলে ও আর পথ করে হাঁকি, মা, ছেলে-মা-হাঁকলে কেউ তো ডাকবে না আমাকে। এবারে কিন্তু পয়সা জমলেই দেশে চলে যাবো। —আমো, লোকটা হিন্দুস্থানি, দেশ মজফরপুরে, বৌ করে ঘরে গেছে, এক ছেলে আছে খুব্ব। বলছিলো, [redacted] টাকা জমাতে আরো দু-বাস বাকি [redacted]। আহা—ছেলের জন্য মন কেমন করে না। আমি বলেছি এর কাছ থেকেই সব সময় সিন্দুর কিনবো, কিন্তু বছরে বারবেরের জন্যই সিন্দুর লাগে।'

শান্তনু বললে, 'ও-রকম কত আছে।'

'এত খাটে, কিন্তু কী পায়? কিছু না।'

দু-জনা মিলে একটা হাসোমিয়াম-বাঁশী কিনেছি। বাজলে খুব মুখী!'

শান্তনু গম্ভীর হয়ে বললে, 'মা-কিললেই কি ছেলেরা মা? এমনি করে কত পয়সার অপব্যয় করো।'

স্ত্রী যে বলে। ছেলে বাঁশি নিয়ে বাজাতে সুরু করবে, ছেড়ে দেয় যদি বাঁশি হাত থেকে।

'এ নিয়ে তো ছেলের পড়াশুনা বাঁশি কিনছে। 'ছেলেটা দু-দিন ম্যাকলাস্কি করে, তার পরেই হয় ভাঙে, নয় ছেলে দেয়। এর পরেও তোমাকে কি আরও পাঁচ!'

স্ত্রী আরও কতকগুলি বিদ্রূপ ঐ রকমই। তা দু-আনার বাঁশি আর কিনেছি। এর পরেও বাঁশের বাঁশিতে—'

'এর পরেও এর পরেই তবে ক্ষান্ত হয় না।'

'তা, হবে তো হিসেব দিয়েছে। তবে এর মধ্যেই হলো! আজ যে কতগুলো অপব্যয়, ছেলেগুলোর জন্য কতে কত খরচার সব পাওয়া যায় তা জানো?

'খরচাও যেমন, পাওও তেমনি।'

সে তো ঠিকই! সেদিন তের টাকা দিয়ে হারমোনিয়ম কয়ে ছেড়ে বসলুম ছেলে-ছোকরা ছেলেটি, সামনে ছিলো তোমার চার টাকার জন্য কোথাও ফেলো। আশা লাগিয়ে, তার কি সুরের ঘটিকার! তোমাকে পাঠালে দিন বলে-কয়ে এই জন্মাষ্টমী কেলাতে পারতুম না। আর্টিস্টিতে যাবার তারা অবস্থা হবে, তবে তো! তাও আরো সুবিধে—বাড়ি রাখা যায়, আত্মের-আপদের দিয়ে যায় লাগে না।'

মাস্টারবাবু নিজেই বাঁচিয়ে বললো। ওদিকে তার পড়ার যে বাজে খরচ হয়ে যায় তা তো ভাবেই না। খাতাকা কত কিনু ছেলে—কোন্ কলেজে লাগে না সে-সব।'

'কলেজ কোনো লাগে আর না লাগে তুমি তার কী জানো! তাদের এখন ছোটো-খাটো জিনিসের ব্যবহারের কত হয়ে—তোমার পার্সোনাল [redacted] সেই জিনিস-গুলো তুমি তো [redacted] রাখো না।—'

খরচা — হাতা, খুন্তি, সিল-নোড়া ইত্যাদি। হরে জানায়, এবারে একটা পাল নিজে বাধিত হই।'

'এই তো—সেবারে পুরী থেকে ফেরবার সময় ষ্টীম স্টেশনে একটা জাঁতি কিনে-ছিলাম বলে তার অপরাধ। অথচ কি সুন্দর জাঁতিখানা, কি প্রয়োজন কাজে আসছে।'

নীলিমা উঠে গিয়ে পান সেজে নিয়ে এলো। এবার পরে বললে, 'আচ্ছা ঐ বুড়ো কোঁচওলা বলে কী। ও আবারের সময় জিনিস চেয়ে—সাবান, পাউডার, এসব কি তোমার সিনারেটে, 'তারপর আসের দেবে দাম নেবে। আমার তেমন সাবান-টাবান বাড়ি তার বাজারগুলো সেলে ও ঠিক সেই জিনিস এনে দেবে। তোমার সিনারেটের একটা প্যাকিং-টিন নিয়ে দেবে।'

মান করে থাকতে সিনারেটে আবার সন্ধ্যেবেলায় মাস্টারবাবু একটি উৎসাহিত হয়ে বললেন। 'বলো কী!'

নীলিমা বললে, 'তুমি যদি বলো ওকে ঠিক বলি। বাবা, তোমার ঐ মাস্টারকে আনার বা চোর! বাকিতে যেমন দেয়, দাম নেয় তেমন। ওদের তুমি এ-মাস থেকে ছেড়ে দাও।'

'কেন। তোমার কোঁচওলা নিয়ে সুবিধে হলেই হলো।'

'ও নিয়ে পস্তুল নিক না। কী বলো?'

'তাহলেই তো। আমার সিনারেটে তবে আসবে?'

'আসবে তো কাল নিয়ে আসবে।'

আর সাঁঝা পয়সা নিয়ে নিক মাস্টারবাবু আপিস থেকে ফিরে এলে, টেবিলের উপর আস্ত দু-তিন সিনারেটে, আর তার সঙ্গে এক সেট রবি-বর্মার আপসারী ছাইদান—একটা বড়ো মানুষ উপর চারটে ছোটো-ছোটো বাটি। নেহাৎ কম না।

'কত দাম নিলে?'

'সাঁঝা অনেক বলেছে—একশো সিকি নি। সুন্দর না? তোমার পছন্দ হয়েছে? আর লজ্জাও হবে।'

মাস্টারবাবু বললে, 'হুঁ।'

নীলিমা মাস্টারের মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললে, 'তোমার পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেবো। আসলটা তো তোমার সওদার।'

সাঁঝা বলছে, ছেলের জন্য দু-আনার বাঁশি বদলে বাজে খরচ বলে হয়েছিলো, নিজের জন্য এই পাঁচ আনার আসলটা ঠিক ওদের তা মনে হলো না। সোজাসুজি বললে, 'আচ্ছা, তোমারো যখন—'

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমি উপহার দিলুম তোমাকে এটা।'

'ও, একটা যখন সস্তা, তখন দুটো টাকা আমাকে বাজে দিতে পারো। বড়ো উপকার হয়।'

'আমি বাঁচব মানুষ, দু-টাকা উকোনার পারো। দু-আনা চার-আনা পর্যন্ত দেবো।'

'বেশ, সেবার আসল দুটো টাকা দিয়ে-ছিলে।'

'তবে আজ তাহলে! দু-দিনের কথা বলে দুটো টাকা নিয়েছিলে, আর ফিরিয়ে দিলে না। ছোঁয়া?'

মাস্টারবাবু হেসে বলে, 'তোমার থেকে হা-ই। তোমাকে যখন বাড়ভাড়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিলুম তখন তাকার বলতে পারতুম।'

নীলিমা বললে, 'ওসো ভালোমানুষ, দয়া করে আমার দুটো টাকা ফিরিয়ে দিতে ভুলো না। আমার কোঁচায়ও নিক্ষ নেই।' একটি সাইডবাবুর কোঁচা দুলিয়ে করে নিয়ে নীচুতে যেতে বাজার-খরচ দু-চার পয়সা ফেলে রাখে, তাকে মাঝে একটা দু-আনি কি সিকি, তার একটি আধুলি বা টাকা। কোঁচাটা এক-এক সময় ওজনে খুব ভারি হয়ে ওঠে, কিন্তু তার আসল তার বিশেষ-কিছু হয়, কেননা তার পরিবারে বেশীর ভাগই উপকরণ। তবু সেটা অনেক সময়ই ফেলে বাঁচার এমন সময়ই আছেই আছে বলে তার উপর এত বেশী টান-হেঁচড়া চলে সেটা নীলিমার পছন্দ হয় না। সকালে উঠে দেখে ফেলের বাজারের পয়সা নেই, তুরা অপেক্ষায়; নীলিমা আঁচলে নিয়ে কোঁচা, ফেকে-ফেকে পয়সা বের করে—তুরা কিনু দেখতে পায় না, কিন্তু কখনও পথে ফেলে দিলে তো আসে। সাইডবাবুর ওজনিষ্ঠে পাশাপাশি হয়েছিলেন এক মুটো ছাড়ার পাশে চাকরের হাতে বিয়েও ফেলে খারাপ লাগে।

কিন্তু হয়তো বাড়িতে হঠাৎ কোনো আত্মীয়রা বেড়াতে এসেছেন, নীলিমা তাদের বসবার ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে একটি আধুলি উপার করে আনে, হিসেবটুকে অবশ্য চুরি হয়।

একবার সেই কোঁচা থেকে দু-মুঠো টাকা খসে করে মাস্টারবাবু আর ফিরিয়ে দেয় নি। নীলিমা অনুযোগ দেলেই সেটা দেবার।

মাস্টারবাবু তার দেয় কথা বললে, 'আমি তো ছেলের কোঁচার ওজনেরই আমি—আর সন্ধ্যাতি তোমার কোঁচওলার।' ঘরে বসে সিনারেটে খেয়ে মাস্টারবাবু বেরোবার বেশ তৈরিই থাকছিল, এর মধ্যে এক কাণ্ড। সকালবেলায় চা খেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে, এক বন্ধু বসেছে আধুনিক মেয়ে-দের বিয়ের্ত্ত দু-পৃষ্ঠার সাধুভাষায় কিন্তু আলাদা যদি কাজের পারলে দশটা টাকা পাওয়া যায়। বিয়েবাড়ীর আসরে তার অবশ্যপ্রয় নয়, কিন্তু দশটা টাকাও বাড়া যায় না। কিন্তু,তেই লেখা এগোয়ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট আসর পুড়ে যায়, এদিকে ঘরের বাইরে নীলিমা অধিবাসন করে সামে একরু-একরু করছে। খানিক পরে তার মনে হলো এ কোনো কোঁচওলা না-হয়ে যায় না। রাগে তার মুখ কালো হয়ে গেলো। আর সারা এ-বাড়িতে একটি নিরিবিলি ঘরে কাজ করে। সব সময় বাজার বসেছে। এদিকে সে সস্তা টাকার জন্য আশা মুখে করে। ওদিকে নীলিমার কাণ্ডটা লাগে। ঠিক আধুনিক বিয়েতের আরম্ভ করার মতোই তার মনের অবস্থা এমন সময় নীলিমা ঘরে ঢুকে মিনু গলায় বললে—'খোকা ঐ কোঁচওলা টাকা চাইছে।'

'আমাকে কেন বলতে এসেছো ও-কথা?'

'কাকে বলবো তবে? শোনো ও কাজে এত জিনিস নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না—টাকা না-দেলেই চলবে না ওর।'

'যাই বলে একদিন চাই ওর? এই মুস্কিলে?'

'বড় পিড়াপিড়ি করছে। গরিব মানুষ —ঠিকই তো, এত সিগারেট ও খেলেই বা কোত্থেকে। সবসুদ্ধ ন-টাকা তেরো আনা হয়েছে।'

'এক আনের পেছু, কোথায় পাবো টাকা?'

'আমি তো জানি।'

'আমে তাহলেই তালো করছে। বড় ছাড়ার মেয়ে ঘরে-ঘরে এসে জোটাবে—কী মোকদমা করা করো এক-এক সময়।'

মেয়ের কথাটা হৃদয় করে আমি মিনু গলায় নীলিমা বললো, 'কাল আসবে তবে ও? পারবে তোমার করতে?'

কাজের দিকে দোকা দুই সাইডের আধিপত্যের দিকে তাকিয়ে মাস্টারবাবুর গম্ভীরটা যেন তুলে গেলো। চেয়ারটায় বসে বিরক্তি, 'তোমাকে তোমার করবো? তুমি জানো না আমার অবস্থা? এখন আমাকে

যার ওকরে ছুটেই হবে তো—আর তাওয়া-মাত যাচ্ছই বা কে মেখে আসছে?'

নীলিমা হাত ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টায় বিরক্ত হয়ে বললে, 'ও তো আসছিল বাসের পেছন পেছন, এ-রকম হবে জানলে—'

'হাঁ, হাঁ, তোমার ফোরিওলার তো এতক্ষণই। মেয়েমানুষ, তোর, ঘাড়ির মেয়েদের ঠকিয়ে দু-পয়সা কমাই তো এসে গেলো। আর তুমিও তেমন। ফোরিওলা ওকরা ছাড়া আর কি সব সওদা করবার উপায় নেই?'

'সবরকমই আছে।'

'আসবারও তো। আরো কিছু দেবে যা, হাতে পয়সা নেই, তবু কত চালাক ছেলে এক ঘণ্টা ধরে জিনিসপত্র ঘেঁটে ফিরিয়ে যাও। লজ্জাও করে না। আমি তোমাকে বলছি, কখনো আর এ-বাড়ির ফেরিওলা ওকরা পাবে না।'

'হুহুঁহে' বলতে উঠলো নীলিমার চোখ। বেশ, আর ডাকবো না। এ বাড়ি তোমার, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছা সব বুঝে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো, যত দিনিস আমি এদের কাছ থেকে কিনি সবই তোমার আর তোমার ছেলের জন্য। সেখানে যা-যা হলেই চলে, তা-ই। এই ন-টাকা ছেড়ে আমার মনে পড়ি টাকাই তোমার নিমাইয়ের হাত, তা মনে রেখো। আর মাসের—তাও তোমার। আর কয়েকটা কাজের লোকের—তাও—'

'থাক, থাক আর হিসেব শুনতে চাইনে। একটুনি বিয়ের কনে আসছি ওকে।' এক টেলায় চেয়ারটা সরিয়ে শান্তনু বাইরে দিয়ে দেখে, ঘুড়োমতো একটা লোক সামনে দুয়ে একটি মনোহারি দোকান সাজিয়ে বারান্দার কলে যাওয়া মেয়ে হাওয়া খাচ্ছে। তাকে শান্তনুর মুখ থেকে হিন্দী বেরিয়ে গেলো, 'এই ভাগো! যাহার যাও। আমি নিতেলো।'

শান্তনুর সঙ্গে তার [illegible] প্রথম সাক্ষাৎ হলো এইরকম। [illegible] তার কুঁকড়ানো মুখ তুলে অবাক [illegible] শান্তনুর দিকে।

[illegible]? [illegible] সেই ছোকরা? [illegible] তাকিয়ে।' বলে শান্তনু [illegible] তিনদিন পা ফেলেও দিলে।

[illegible] কথা বললে না; মাথা [illegible] শান্তনু তার সব সওদা [illegible] বাঁধলো, তারপর মাথে করে [illegible]। মেয়ে ছেলেরা সিটি দিয়ে।

শান্তনু [illegible] এসে বললে, 'আপদ গেলো। কখনো আর ডাকবে না যেন বিদায়।'

কথা বলতে গিয়ে নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো। চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'খুব তো বীরত্ব করে এলে। যা এটা আমার টেপর করলেই তাড়ানো যেতো। ও ছেড়ারা তো কোনো দোষ করে নি।'

নিজেরও একটা বেশ আছে, তারই জোরে শান্তনু বলে উঠলো, থাক, আর উপকার লোককে মুখ বন্ধ না-করে নিজের স্বার্থটাকে একটু-আধটু বড়া করতে শেখো।'

নীলিমার কখন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, চাপে-চাপ ঠোঁট বললে, 'এটাই তো তুমি জানাতে চাও যে, তুমি কর্তা, তুমি মনু! এ তো কথাই মুখোমুখি যে আমি তোমার দাসী ছাড়া আর কিছুই নই—তোমার সব খুটিনাটিই আমাকে টেনে চলতে হবে। আমার নিজের বলে কিছু আছে নাকি? আমি তো সেইরকমই চলি। তুমি যা ভালো মা-করে তা না-করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পারবে, আমার নিজের বলে কিছু আছে, নিজের খেয়ালে একটা টাকা কখনো খরচা করেছি? তিনটিন আনা, দুটিন-কাটির দু-চার পয়সা যা কমাই তা-ই নিয়ে কখনো-কখনো একটা-একটা ঝিনি বলেই তো তোমার এত রাগ। ঐ ছেড়োকে তোমার নিমাইয়ের জন্যই ঠিক করেছিলুম — সব সময় হাতে পয়সা থাকে না, অসুবিধে হয়—'

'জানি, জানি আমি নিমাইয়ের খেয়ে টাকা ওড়াই, এ-কথা কত আর শোনাবে। আমার বাবুগিরির মতো ঐ তো এক নিমাইয়ের। যা তুমি যা-ই বলো নিমাইয়ের মা-বলে আমার চলবে না। এত খেটে রোজগার করি এই সামান্য একটা বিলা-সিতাও কি আমার জন্যায়?'

'থাক, থাক, আর শোনো না। তুমি এতা ভাবলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে নিয়ে কত ভাবিস হয়েছো, এ-কথাটা বলি-নি শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, তত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধের সব গেলো, সবই জানি আমি। কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত ভবিষ্য স্বার্থ কেন দিলে আমাকে? তোমার জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে অসম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে আমি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না-হলে তোমার চলত না, চলতেও না। ভুল, ভুল। আমরা পরস্পর মুখে-মনে খেলাঘর সাজাই, তা হলো কী?' কলতে-বলতে নীলিমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে শান্তনু হঠাৎ লক্ষ করলো খাঁচার ভাঁটা সবা বড়ো-বড়ো। পাখিদের মতো হয়ে গেলো বাবলুর, মায়ার দু-বাড়ি জল ফেলে এসে হাইকে-ডাকে কেন্টকে জাগিয়ে তুলে, খোয়াতে কিছু তার নিয়ে পাখিদুর আর কোই চালিয়ে উঠোনে নিয়ে ছাড়া করলো। নীলিমার সঙ্গে আর একটা কথা বললো না।

দিল্লী একটা কাণ্ড ঘটে গেলো।

আপিস থেকে ফিরে ঘরে এসেই শান্তনু পকেট থেকে একটি বন্ধ চাকার কোট বের করলে, 'এই নাও তোমার ফোরিওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ো।' ছেলে বললে কথাটা, হঠাৎ চাঁদের সুরে, যেন সকালবেলার ঘটনাটা এই একটুখানি হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়।

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

'তোমার কাছেই রইলো।'

শান্তনু আবার বললে, 'নাও।'

নীলিমা নিলে মোটকা, আপনার আলমারীর দেরাজে রেখে দিয়ে বললে, 'চা খাবে এখন?'

আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম, নীলিমাই বলে-বলে করেছে এ-সব। বিশ্বের পেই জনে আছিলো শান্তনুর, চুড়ান্তের থেকে মুক্ত বললো।

একটু পরে বললে, 'তুমি খাচ্ছো না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটু নিশ্চিন্ত থেকে মুখে নিলে নীলিমা, আর সেসালো তা ঢেলে নিলো। হয়তো সে ভেবেছে, হয়তো দুপুরের সে খেয়ে আসও কিছু খেতে পারে নি।

এদিকে অসম্ভব আপিসে পৌঁছেই এ-লোক করে সেই প্রথম নিয়ে মেয়ের হাতে পাঠিয়ে দশ টাকা আনিয়েছে; লাঞ্চের সময় খুব ঘিরে দেখেছিলো। তবু ভালো এর কিছু খাই নি, তাহলে মেটাটা ভারি হবে। এমনি করে মোটমা উপার্জন ও খরচ করে থাকি নিয়ে এসেছে, কিন্তু নীলিমা একবার জিজ্ঞেস করলে না ভোমার দেনো।' কথাগুলো সব মনে-মনে সাজানো ছিল; বলা হলো না। চোখ মুছেই কাটলো সে রাত, কাটলো তার পরের দিন। অপিস থেকে ফিরে শান্তনু জিজ্ঞেস করলে, ছেলের ফোরিওলা টাকা নিয়ে গেছে?'

'না, আসে নি।'

'আসে নি? কাল আসবে বোধ হয়—টাকা যখন পাবে, না-এসে যাবে কোথায়? কিন্তু শান্তনুর মুখে একটা উৎকণ্ঠার ছায়া পড়লো। চার দিন ছেলে গেলো, খোকা এলো না। শান্তনু বললে, 'নীলিমা কেমন হলো? আসে না কেন লোকটা?'

'কী জানি।'

'জানবে কেমন করে? তোমার তো আরো সব ফেরিওলা আছে — তাদের দিয়ে একটু খোঁজ করাও না।'

নীলিমা[illegible] গেলো।

'শান্তনু ওর [illegible] শুনতে পাও না?'

'হাঁ, পা তো।'

'কাল মন দিয়ে সোনার চেষ্টা করো।'

কিন্তু পরের দিনও খোকার সেই চড়া হাঁক-শোনা গেলা না একবারও। তার পরের দিন রবিবার। শান্তনু সারা দুপুর খোকাকে পাশে না। প্রায়ই ছোট-ছোট বারান্দায় যায়, মনে হয় খোকাকে খুঁজি দেখবে। কিন্তু কোথায়।

এক মাস কেটে গেল।

'কী আশ্চর্য,' শান্তনু হঠাৎ একদিন বলল, 'খোকা আর এলোই না।'

নীলিমা বললে, 'এলো না তো।'

'কী হলো ওর বলো তো?' খোকা আর দেখালো শান্তনুকে, চমকটা খোকা আমার সোনালো। হয়তো মেয়ে ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে—কী বলো?'

'হয়তো মেয়ে।'

হয়তো মেয়ে। হয়তো গাড়ি চাপা পড়েছে, হয়তো জ্বর হয়ে মরে গেছে—কি হয়তো আসবারই আর কোনো পয়সা কী-কী শোনাবার পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় ফাটকের চালে সিমুর ছেকে ফেরাচ্ছে, সেদিন যাবার পয়সা করতে এসেছে চার বেরী। কে জানে।

বুদ্ধদেব বসু

জ্বালী মুখোপাধ্যায়

•

[illegible] নিজের গল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—'আমি সম্ভবত আদৌ স্বাভাবিক গল্প লেখক নই। আমার উপাদানটা পাই আমি। কল্পনার চাইতে স্মরণের দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে সমাহিতির দিকে, উত্তেজনার চাইতে অনুভূতির দিকে। এমন গল্প আমি অনেক লিখেছি যার কাহিনীটুকু মুখে বলে শোনা যায় না। এমন গল্প লিখেছি যাকে কাহিনীরূপে গুছিয়ে বললে ভোঁতা হয়ে যায়। পর-পরাগীর আলাপ আলোচনার মধ্যে আমার চিন্তাকণিকার [illegible] পাতা ছড়িয়েছি।'

স্বাভাবিক গল্প লেখক আমরা যা বোঝাই, অর্থাৎ যিনি ঘটনার গল্প, যার আরম্ভ আছে, মাঝে আছে এবং শেষ আছে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাহিনী শেষ সেই গল্প হয়ত লেখেননি। বুদ্ধদেবের মনে হয়ে তিনি যে গল্প লিখেছেন তা এক নতুন ধারা ও নতুন রীতির সন্ধান দিয়েছে আধুনিক সাহিত্য-পাঠকদের। তাঁর যে গল্প একদিন ভালো-লাগা, মন্দি করেছিল আজ সে গল্পটি তিনি লেখার সময়ের অনেকটুকু আগে নি সেই সময়ে হয়ে উঠেছে গল্পের ঘটনাই বুদ্ধদেব বসুর গল্পের যে সাময়িক পরিচয়ের উপাদানে তাঁকে পাঠকের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে আর এক ইতিহাস আছে। ইতিহাস বাঙালী সমাজের ইংরেজী লেখা-পড়ানো সমাজের মানুষগুলি তাঁর অভি-পরিচিত এবং তাদের বাড়ির, ঘরের, আলাপ, বিলাসের, আচরণের, পাকচক্রে, আবহ, সেকেলী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনী বুদ্ধদেব বসু যে অনায়াস নৈপুণ্যে ফুটিয়ে-ছেন তাঁর ছোট গল্প তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। সমাজে সব শ্রেণীর লোক আছে। ইতিহাস এবং সমালোচনা নাই সমাজের সমস্ত বিভাগ সাহিত্যিকের নজর। যেহেতু ঔপন্যাসিকের পক্ষে সেকেলে মানুষের জন্য হলেও সেই সূত্রে সে সাহিত্যের সমাজে ইতিমধ্যে হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। বুদ্ধদেব তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন এমন কথা লিখে এদের সুখে দুঃখে কথা ও বেদনার ছবি এঁকে। এইদিক থেকে হয়ত বুদ্ধদেবকে তাঁর বাকি ও মৌলিকতা মনীন্দ্রলাল বসুর কথা আলোচিত করে থাকবে। কারণ তিনি যখন বিদেশের তখন বাংলার গল্প উপন্যাসে মনীন্দ্রলালের জন্মই হয়। সেকেলে নাম শাশিক লিখে-ছিল মনীন্দ্রলালের ৪৪-এ। উপন্যাস হিসেবে ফেরা-আইন সেকেলে অসমান্ত। বুদ্ধদেব বসু এই অসমাপ্তির ঐতিহাসিক সমাজের সামাজিক রূপে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু এই সব নয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'অবাক' ও 'নতুন পাতা' এই গল্প দুটিতে যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তা কিন্তু সমাজের অন্যের গল্প, ভিন্নধর্মের গল্প। অবাক্ষার মতো বেকার, ভিক্ষুকের মনের বেদনা অথবা নারীর যে অভ্যর্থনা ছিল আজ সমাজের কাছে সেগুলোর আর মূল্য আদৌ নেই, বুদ্ধের বাল সম্ভবের একটা কিন্তু ভদ্রলোকদের কাছ থেকে এই ভেবে উপেক্ষাকৃত, আর তার স্ত্রীর মনে কত আশা। সে আমাদের সমাজ দেয় ভেবার মতন্ত্রীর খবর এনেছে। স্বামী প্রশ্ন করে—কী খবর? স্ত্রী বলেন—ছবি। ভেবে পাচ্ছেন আমাদের এই সমাজে।

অনুপমের (মেকার নায়ক) মুখের কিন্তুক্ষণের জন্য শ্যাম হয়েছিল, আনন্দ সামলে নিয়ে সে বলে ওঠে—এ বাঁচোয়ার। সে এসেছিলাই হয়তো—আমার জন্য না নিয়েও ও পারবার না—ইত্যাদি।

ভিক্ষুকের মনকে হয়ানো তখনটা ছিল একটা বাস্তবিক।

সমের মা' গল্পটিতে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়েছেন লেখক। ব.র্ষাই মুলো এক নাটকীয় ৪৮-এ সমস্ত কাহিনীটি পরিবেশিত। প্রথম মুলো আছে দুঃখবাদের ঝলমলানি। পরস্পর পরস্পর পরিচয় মহলা ঝর্ণার আকস্মিকতার বাস্পস্তরণ। আমাকে স্ত্রী আসছে ছোটোলোক, স্বামী বলছে সেও স্ত্রীর মেয়ে মুখ দুঃখিতে। স্থিতীয় মুখে—স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছে স্বামী। স্বপ্নে বিয়ের বাসরের রঙ লাগিয়ে পড়ে বন্ধুবান্ধবের কথায়। স্বপ্ন দেখে। তৃতীয় দৃশ্য—স্ত্রীর স্বপ্ন—সেই স্বপ্নে স্বামীর লালসাক্রান্ত অন্তরকেও আকৃতি করা পড়ে আর চতুর্থ দৃশ্য—আজকে বন্ধুদের সঙ্গে। সেই আজকে বন্ধুর চার্দনা করতে আসছে ভিক্ষিরে যাও, ভিক্ষিরে যাও, আমি জানাতে চাই না। বুদ্ধদেব অজস্র ভালো গল্প লিখেছেন। কিন্তু আমাকে যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচন করতে হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় এই গল্পটিকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে।

তাঁর আর একটি গল্প বাসরঘর আলাদা। এই গল্পের কাহিনীটিও নাটকীয়। স্বামী-স্ত্রী বন্ধুরে বসে অতীতের কথা আলোচনা করছেন, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত একটি স্মোক-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আলোচনায়। স্ত্রী অনিতা উঠেছেন মনে যে মুক্ত সুষমা সম্বন্ধে তাঁর স্বামী ছিলেন। ধীরে ধীরে অতিমন্ত্র ঘরোয়া-ভাবে তখনটা স্বামী বলছেন অতীতের ইতিহাস, সুষমা নামের বিবাহ তিনি উপেক্ষা করে বিয়েছিলেন। কিন্তু সুষমা বিয়ের পর স্বপ্নের আড়ি আবার সময় যখন সমাজকে প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ানোর তখন তার চোখ দুটি ঝলসে।

নায়কের মনে হল বিয়ের আগে সব মেয়েই কাঁদে—কিন্তু মেয়েটি অন্তরে কাঁদে নি—আপনার মনে এই ছিলো—।

সবটুকু শুনে অনেকের স্ত্রী বললেন—, সাঁচা দুঃখ বড়ো বোকা ছিলে।

এই গল্পটির মধ্যে একটি বন্ধুর মনের সন্ধিতে যে ছবি লেখক এঁকেছেন তা অনেক সাহিত্যে বিরল।

'অমৃত' মিত্র - সাহিত্যী বোস—আর মুখুজ্জে 'এমিলিয়ার প্রেম' প্রভৃতি গল্পের মুখুজ্জের কাহিনী আর এক জগতের সংবাদ এনেছে। অমৃত মিত্র আর-জয়সালোচনা জাতীয় গল্পের। সে রীতি-মত কেতাদুরস্ত গল্পের। মোহনের সে ইন্দ্রিয়ে দেওয়ার। সে মোহনের পিছনে নয়, মোহনের আগে পিছনে ঘুরতে শুরু করে। কিন্তু প্রেমিক-বিচিত্র গতি-এই আছি আছি আর অমৃত মিত্রর আছে আপত্তিজনক। কিন্তুর মিত্রে এসে হাজির হল মুখুজ্জে। তার গল্পের বিষয়ের সাধারণ মোহে মুখুজ্জে। কিন্তু মুখুজ্জে মোহে সাহিত্যী মোহের বাহুল্যতার জন্যে তাকে বন্ধ দিতে হল। তবু তার জীবনে মুখুজ্জে একটা স্বপ্ন, সে স্বপ্নের স্পর্শ এনেছিল।

'মেঘ স্বপ্নের মতো মুখুজ্জে একটি হাত অমৃত টেনে নিলো নিজের হাতে—চেপে ধরল মুখের উপর, মনে মনে বলল মুখুজ্জে ফেরারা, এখানে থাকো। আমার কাছে থাকো।'

কবিতের স্বপ্ন, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। লেখক এক অসামান্য কৌশলে অমৃত মিত্রের জীবনে মুখুজ্জের স্বপ্ন সঞ্চার করেছেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন তুলিতে এমন একটি রোমান্টিক কাহিনী পরিবেশন মুখুজ্জের মনেই নিজস্ব রীতি। 'আজকের নয়' মুখুজ্জের মনের আরেকটি বিখ্যাত গল্প। এখানেও নায়ক প্রফুল্ল চলচ্চঞ্চল মুখুজ্জে। কিন্তু নায়িকা মমতা 'প্রজাপতি-পলের উপকরণের অকুলান ঘটত না কখনো। মনোরঞ্জনের বিপরীত সে ছিল অন্তর্মুখিনী। সেই মমতাকে কি করে বিয়ে করল প্রফুল্ল তারই ইতিহাস সে বলছে মুখুজ্জের কাছে। গল্পের প্রথমেই বলা হয়েছে অমৃতার ওয়াইলনের কথা 'জীবনের চেয়ে আর্ট অনেক বড়ো—'. তাই ভালোবাসা, ভালো-বাসার পাত্রীকে জয় করাটাও আর্ট। প্রফুল্ল সীতা নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিল মমতাকে। বিশ্বামিত্রকুমার ও প্রভা যেন রাম ও সীতা। রামের অভিনয় চতুর্থ অঙ্কের পর আলো উঠে গেল প্রফুল্ল, এল স্বপ্ন দৃশ্য। এখানে বন্ধুত্বের ছেলে মেয়ে রামের আর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভিন ঘণ্টার অভিনয় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে করলো। আলো জ্বলল, মোহ ভাঙলো, ফিরে এলো বাস্তবের কোলাহলে। কিন্তু কিছুই ভোলা যায় না। ওকে ভাবতে হবে। উঠে দাঁড়াতে দেখে একটু সময় লাগলো ওর। আলোতাব—কিন্তু ইচ্ছে করেই ওর চোখের দিকে তাকালো না।'

তারপর টাকসিতে সুধোষ্ণ মুখে প্রফুল্ল ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে ডেকেছিল—সীতা।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মমতা। প্রফুল্ল মমতাকে নিয়ে করেছে। তার কাছে মমতা তাই 'হাজার ছোক মেয়ে'।

এই কাহিনীটির মধ্যে সেই চিরন্তনী নারী প্রকৃতির আবার অবতারণা এক মধুর চিত্রণের মধ্যে। প্রফুলের মতে সব মেয়েই সমান।

এই কাহিনীটি মুখুজ্জের বন্ধুর প্রথম যুগের রচনার এক প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।

আরেক শ্রেণীর গল্প মুখুজ্জের বন্ধু লিখেছেন সেই প্রথম যুগে যার বেশী আলোচনা হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠাচিত্র 'মনের মতন' ও 'মেজাজ' বাংলা সাহিত্যে এক অনুপমনীয় সৃষ্টি। মানবিক চিত্তবৃত্তির বিভিন্ন তন্ত্রী নিয়ে এতো সংক্ষেপে এত স্বাভাবিক কাহিনী আর অল্প সংখ্যক লেখকই লিখেছেন। 'মনের' গল্পটিতে সেইকালে 'বিচিত্রা' পত্রিকার ইয়োজীতে অনুদিত হওয়ার বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মনের পর্যবসান প্রভাত মেঘ কল্পের পর্যবসানের সকাল। প্রভাকাল তখন অন্য মানুষ।

'মোহের বিনিময়ে—তাহার জন্য, গা-ঝাড়া, চোখ জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গসমেত তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, মুখ ফিরিয়া নিয়াছে মেয়ের ইন্দ্রিয়ত্বলির দুর্বলতা ও কর্ম-বিমুখতা। অনেক সব অসমাপ্তগুলি খোলা—অনেক হাজা রৌদ্র আসিয়া ঘরের মধ্যটায় পড়িয়াছে।'

এমন সময় সুধা চা নিয়ে ঘরে এল।

"প্রভাকর তাহার হাত দুইটির আগুন ঠোঁটিয়া বলিল—আজ চা—তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো, সুধা।"

দুর্বল একখানি হাত দিয়া সুধার কটি বেষ্টন করিয়া বলিল—কাল সারারাত তারা বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখছিলাম—যেন তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

সুধা সন্ধ্যার মুখের উপর পরিপূর্ণ একখানি দৃষ্টি রাখিয়া একটু হাসিল মাত্র।"

অন্তর্বিমুখ প্রভাকর এখন যেন মানুষ।

'মেজাজ' গল্পটিও মেঘাচিত্রের অন্তর্গত। এই গল্পের নায়ক একজন লেখক। তিনি লিখতে বসেছেন এমন সময় এলো পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে।

ফলে মেজাজ গেল বিগড়ে। গল্প মাথায় উঠলো। তখন প্রায় সাতটা বাজে। এর পর যতগুলি ঘটনা ঘটে গেল সবই গল্পের নায়ক লেখকের কাছে বিরক্তিকর। তাইপো টুকুর ওপর মেজাজ বিগড়ে গেল। লেখক ভাবছেন—'এই ভিখেরীর লোকগুলি আসিয়াই আমার সর্বনাশ করিয়া দিয়া গেল।'

ফলে টুকুর ইংরেজী পড়া বলার সময় হয় না। সে বিরক্ত হয়ে বলে—'বেরো টাকমাকে বলবে, তিনি ছেলে এমন করে বলবে পড়ার ক্ষতি দিয়ে করবো।' ফলে মা ভাগলেন। বৌদির মুখ বিরস। লোডশেডিংএ ছেলে হল। পরে ফাউন্টেন পেন চুরি হল। ইত্যাদি অনেক ঘটনা।

কিন্তুটা শেষটা চুরি হয়নি। বাচ্চাটা বলেছিল সেটা সেটা অন্যায়ে বিক্রয় করছে। তাই মেজাজ তখনই পরিবর্তিত। বৌদি আদরে সে বলে—

'মেজাজ তো বৌদি, আকাশ কী যদু, আর বাচ্চাটা কী সুইট!'

ছেলেদের ছেলে তোমার টুকু। মা, আজ তোমাকে চলচ্চায় নিয়ে যেতে পারি—' ইত্যাদি।

—দুঃখের বিষয় মুখুজ্জের বন্ধু এই জাতীয় গল্প তাঁর পরিণত বয়সে আর বেশী লেখেন নি।

আরেক শ্রেণীর গল্প লিখেছেন মুখুজ্জের বন্ধু যা বাংলা সাহিত্যে নতুন লেখা হয়েছে। সেই গল্প হল নাবিকের জীবনের ইতিহাস। বিদুৎপাকরের কাহিনী এই জাতীয় গল্প। মুখুজ্জে সাহিত্যে অনেকের মালিক এই বিদুৎপাকরে। তিনিও একটু লিখে-টিকে থাকেন। তাঁদের ধীরে ধীরে জানা যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস।

বিদুৎপাকরের যাবার সময়, একটি অর্ক লিখে গেলেন। লেখা দেখে, সেই অর্কে লেখা আছে তাঁর পূর্ব জীবনের নাম পার্থসারথীকুমার বিশ্বাস। যে নামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

মুখুজ্জের 'প্রেমের বিচিত্র গতি' নাটকীয় ভাবনায় রচিত। উত্তরকালে যে তিনি নাটকীয় রীতির উন্নয়নে প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন এই সব গল্পই অনেককাল আগে তার ইঙ্গিত দিয়েছে। 'আকাশে যখন সাত রাঙ্গ কুটলো' গল্পটিও প্রায় একই আঙ্গিকে লিখিত।

'মুখুজ্জের জন্য' আরেক জাতের গল্প। কয়েকটি ছেলে, হাস্যোজ্জ্বল পড়ুয়া ধারা কি একটা লিখিয়ে দেখে ধরতে পারেনি। অনেক চাঁড় জমে গেল। অবশেষে মুখুজ্জের ওপর ভার দিয়ে সবাই চলে গেল। মুখুজ্জে সবাই চলে যেতে এদিক ওদিক তাকিয়ে-পাওয়া মতো কাগজটা নিয়ে বাড়ি পালালো। মুখুজ্জে তা খুলে দেখলেন একটা ম্যাগাজিনের পকেট কিন্তু ম্যাগাজিনটা মা লুকিয়ে রাখেন।

পরদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। সব বাড়িতে বাড়িতে মুখুজ্জের মা বলে দেন পাঠানোর কথা যেন না। পকেটের মালিক ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত তাই ফিরে যান।

মুখুজ্জে কিন্তু পাঁচশো টাকার খুশী হননি। সে প্রশ্ন করে—পাঁচশো টাকা কি অনেক টাকা—মা?

মুখুজ্জে কিন্তু পালালো—সে আর ধরতে পারবে না।

'পকেটের (মুখুজ্জের মা) তাকিয়ে দেখলেন। দেখানে মুখুজ্জে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানে রোদ্দুরের পালে পালে ধান পড়েছে।—সন্দেহ।'

এই জাতীয় গল্পই একালে আর দেখতে পাই না।

অব্যক্ত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছেলেবেলা কাটিয়া গেছে।

চরিত্রিকে পাহাড়ের আর অরণ্যের মধ্যে ফিরে গিয়াছে, তাহাদের ধারার উপর যে প্রভাব এত বৎসর বিস্তার করিয়া সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইয়া, প্রেরণা করিয়া তুলিয়াছে। আর তিনি ফিরিলেন হাওড়া, জীবনে যেন অকারণে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়া।

একদিন বহু বছরের পরে এই গ্রামে সে [illegible] আসিয়া পড়িল। কলিকাতার [illegible] কলিকাতার মেয়ে, কলিকাতার ছেলে-মেয়েদের যে সব আবশ্যকীয় ধারণা এতকাল তাহিয়াছে: স্কুল, কলেজ, অফিস, বাড়ি—সবই ঐটুকু সীমারেখার মধ্যে। তার বাহিরে, বন পেরুলে, জীবনের চাহিদা খুঁটিনাটি দিয়াছে চিরকালের মত সেই একটি পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া—কলিকাতা। আজ এই চল্লিশ বছর পরে সে প্রথম তাহার চিরকালের অভ্যস্ত পূর্ণচ্ছেদটিকে নিজের হাতেই তুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি তাহার পরে বিরাট বিস্ময়, প্রশস্ত কৌতূহল, প্রবল জিজ্ঞাসা।

সমস্ত রাত্রি সে বাংলোর বারান্দায় আসিয়া বসিল। নিজনি, ঘন নিজনি; যেন পলক পাতি, পলক বিদ্যুতের মত সেই গভীর নিজনতা তাহাকে বিরিয়া ধরিয়াছে। শব্দ আর অধিক আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু দুটির চিরে আর খোলিবার আর নাই, সে-সব সে পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে; আজ তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল—

দূরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া নিজের জীবনের একদল অভ্যস্তপরিচ্ছন্ন কথা ভাবিতে লাগিল। বেয়ারা যেন বৈচিত্র্য নাই, সব আনিয়াছে চিনিয়া আনিয়াছে। পাহাড়ের ছেলের সাহিত্য আলিয়াছে, দুর্দি-ন্দুর, শরৎ নিশায়; স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। কলকাতা ছিল যেখানে অফিস আসিয়া সমস্ত ছাইয়াছিল, আজ তাহাই নিতান্ত একটা কথা মনে হইতেছে। সমস্ত পড়া অসমাপ্ত রহিয়াছে, বিষয় বস্তুটার—সবগুলি অফিসে চলিয়াছে: হাতেও সেই সব দুর্দিনের লাইব্রেরির বই—কবে কখন নিয়াছেন, যা মাস নিয়াছেন, তাহার নিজের হাতেরেখে ঢুকিয়াছে—তাহার একটি, একটু; ফিরে যে হইবার, কিন্তু সমস্তের অন্তিমে সেই একটিমাত্র অবহেলা। চিরপরিচিত সেই অসহায় এবং সেই সকলের অসহায়—বাঁচিয়া আকাশের প্রসন্নতায়ে এবং নিয়া সুখে ছেলেমেয়ের আড়ি এবং বাঁচিবে অনুরোধের; সবই সেই এক, পরিবর্তনহীন!

আজ দুটি মিলিয়াছে। খুব দুর্বল, স্নেহে মন ভরা, তাহাদের বলিয়াছেন ছেড়ে না খেলে চলিবে না। তাই জোর করিয়া চিরপরিচিত, চিরঅভ্যস্ত সমস্তকে পিছনে ফেলিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, নূতনের অন্বেষণে, বৈচিত্র্যের মধ্যে।

এখানে তাহার অসমাপ্ত কাজ আছে—ছেলের অভিপ্রায়ের। বিবাহ করে নাই, ভালো করিয়াই পড়িয়া থাকে। খুব,—তাহার মিলিয়াছে অনেক।

সমস্ত রাত্রি সে বারান্দায় বসিয়াছিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার অন্তর অন্য কিছুরই অনুসন্ধান করে নাই। এই একেবারে নূতন পারিপার্শ্বিকের অভ্যাসের অভিজ্ঞতা তাহার হইতে নিজে করিয়া লইয়াছে।

ইন্দিরা বলিয়া দিয়াছে, পৌঁছাই চিঠি দিও। কখনও ভাইতে যাও নি—ঠিক বিপদে পড়বে, কে জানে!

স্নেহময়ী! সমস্তের আকাশের হইতে তাহাকে বাঁধিয়া করিয়া আনা যেন যা। খুব বেশী—অনুভিত্তও নেই।...ছোট ছিলবাটির টানিয়া লইয়া কাজল কথা খুলোইয়া সে লিখিতে বসিল। সমস্ত তাহার মনে হইল এই তাহার প্রথম সত্যকার চিঠি!

অনুভবের তাহার ভাষাভাবেই—চিঠি লিখিবার অভ্যাস বেশী হয় নাই। যা-যাহা ছিল তাহার সব-তাও বহু একটা হয় নাই। বহু প্রথম যৌবনে প্রেমপত্র লিখিবার মোহে, কি একটা চিঠি সে লিখিয়াছিল, আবোল-তাবোল, যা-তা—সে কথা আজ মনেও নাই। তাহার একেবারে এই চিঠি—

কি বলিয়া সম্বোধন করিবে সে ভাবে। 'প্রিয়তমাসু' লিখিবে?...চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ইন্দিরার পরিচিত বহুদের দুর্বিনীত মূর্তি, বহু যেন সম্বোধনে কাঁপিয়ে ফেলিল। না, 'প্রিয়তমাসু' আর লেখা যায় না। তাহার চেয়ে 'কল্যাণীয়াসু' বহু ভালো। আজ সকল অবস্থাতেই কল্যাণীয়া—

সে 'কল্যাণীয়াসু' লিখাই পর শুরু করিল। লিখিল,—

কল্যাণীয়াসু—

আমি নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গাড়িতে বিশেষ ভিড় ছিল না, কিন্তু আমি মোটেই ঘুমাইতে পারি নাই। সমস্ত রাত্রিটা এমন অদ্ভুত [illegible] অনুভব করিতে যে, অবাক হইয়া চাহিয়া বসিয়াছিলাম। তাছাড়া, তোমার ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে হইয়া খুবই খারাপ লাগিতেছিল।

এখানে কাজকর্মটা ভালই, চারিদিকে পাহাড় এবং খুব নির্জন। বাবার বাংলোটিও একেবারে নদীর ধারে। গল্প ও গ্রন্থ সব সময় পাইবেই থাকেন—তবে চশমাখানি খুব ভাল করিয়া করিতেছে। মোটের উপর আমার পারিপার্শ্বিক আরামের জন্য কোনও ত্রুটি নাই। আমার জন্য ভাবিও না।

এই পর্যন্ত লিখিয়া সে কলম থামাইল। আর কি লেখা যায়?...অনেক ভাবিয়াও বিশেষ কিছু আমার আসিল না। তখন সে খুব করিয়া—তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে এবং তুমি রোজই চিঠি লিখিবে। ছোট খুকীকে সাবধানে রাখিও; বেশী যেন ঠেলা না লাগে। খোকনকে নিয়মিত পড়াশুনা করিতে বলিও। সন্তোষের ছেলেমেয়েরা, মেজ বৌদা সব কে কেমন আছে জানাইও। তোমার নিজের শরীর খুব সাবধান, বেশী অত্যাচার-অনিয়ম করিও না। কারণ একে তুমি পড়িলে আর কে দেখিবে? ছেলেমেয়ে ও বাড়ীর সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও—।

এই পর্যন্ত লিখিয়া সহসা সে যেন নিজে নিজেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

এইবার ইতিহাসের সম্বন্ধে কি লেখা উচিত? সে আবার হাতে কলিমা একটি লিখে চলিয়া যাইতে লাগিল—

মনে পড়িয়াছে লাবিদ ফিরাকের সম্বন্ধে কথা। সমকালীনতা সম্বন্ধেই বহু ইতিহাস কথা, তাহাদের মধ্যে কোন প্রশ্ন-সমাধান? তাহার পর একটু একটু করিয়া চরিত্রগুলির পরিচয়-পরিচয়ন হয়ে সে ফেলে আসে মিলিয়া গেল। সে আছে পরিচয়হীনই, সে কখনো পরিচয়ী, তবুও সে সেই ফিরাকের সমস্যাগুলি একটা . আসে। বলিষ্ঠতা বহু বাড়িয়া উঠিয়াছে, বহু সে মুখের একান্ত সমিতিতে আসিয়াছে, তবুই যেন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু আলিবার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে: সে আছে, সে আসিয়াছে কিন্তু এই পর্যন্ত।

কিন্তু আজ সেই সময়ের হইতে মুখে আসিয়া তাহাকেই কথা আসিতে একটা যেন খোলসমুক্ত করিয়া উঠিল। আজ সহসা মনে হইল—সে ইতিহাসকে অনুসরণে এবং সে কথাটা সে আজকে জানাইতে চায়। সে লিখিতে চায়—'এবং তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিও।' সমস্ত মুখকে আজ কিসে যেন ভরে হইল, হাঁ এইবার সে চলে, মুখ করিয়া বলিতে চায়, আমি যেখানে আসিয়াছি।

কিন্তু কি? তাহার আসার কথা পর্যন্ত যেন পরে হইয়া উঠিল। দিনে দিনে ভিন্নতিতে তাহাদের সম্বন্ধ এমনিই হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ আর তাহাকে প্রশ্ন প্রশ্ন-সমাধানের মত ফেলার আসিয়া একথা লেখা যায় না। সমস্তের মুখে-মুখে, নিমুক্ত পরিবেশে সে একান্ত আপন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সে আজ যেমন করিয়া মুক্ত করিয়া আজকে লিখিতে তুমি আমার অভিনন্দন জানিও?' সে বড় সংকোচের কথা। আর এই তিনটি বছর পরেও? ছি।

সহসা যেন তাহার মনে হইল আজার লজ্জা আজার সেই হইতে পরেও হইল যাইতে বলিয়া আজার এই চিঠি লেখার বিরুদ্ধতা প্রকাশ করিতেছে। একথা তোমাকে আসে নাই, তাহাদের তবুও যেন সেই কথা কি একটা বলিয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে যেন সে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে—তাহাকেই!

'তুমি যেমন করিয়া আজ তোমাকে চুমাইবে, লিখিবে—এবং তুমি আমার—'

কিন্তু আজকের তাহাকে সে কথাগুলিই হয় নাই একটও।

কি লিখিবে, 'আন্তরিক অভিনন্দন'—তবুও আন্তরিক) তাহার আজ আর এই আজকের আজকের যেন আজকে পরিচয় করিবে—সে আসিয়া যেন করিল। ইতিহাস পরিচয়-মুক্তি, আজার পরিচয় সহসে আজি-আজি নেই। আজার আজ আর তোমার সম্বন্ধে কিছু আছে কি? সেই সমাধি, তোমাকেন্দ্রিক সমাধি, আজকের সমস্ত সাহসের বিরুদ্ধে তোমার কবিতা-তবুও আজ আর আমার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

তবুও সহসা আজকের মনে হইল, সে যা বলিবে: সে হয়ত মুক্তির ইহা মুক্তই-তিনি লেখার বাধা পর, ইহাই নিশ্চয়। তিনি তোমার নিজেই সে হয়ত মনোযোগে নিয়া পড়িবেই না, একজন যেন মুখোমুখি আজার হাতে নিয়া বলিবে—আমার বলিবার কিছু নেই আর, আর আমার তোমার তোর আজকে একজনের সোনালীকে' আজকে বলিল। আমার নিজে হবে।

এ আজকালকা আজকালের মধ্যে যে বিশেষ কিছু আছে, সে একজনও সে-কথা আসিবে না, তুমিও সম্ভব নয়। আজকের আজকের কবিতা-আজকে নিজেকে আসিয়া আজ সে মুক্তির করিয়া তোমা নিজেকে করিবে চায়, এ-কথা তোমার আসিয়া ইন্দু আসিবে? না—সে আজকে তোমাকে কথা মুখোমুখি। কিন্তু মুক্তই আসিবে—মুক্ত আসিবে নয়?.....সে নিজেকেকেই আসিয়া লিখিল, 'এবং তুমি আমার আসিবে আসিবে।'

মুক্ত পরিচয়ের মুক্ত আজকেরে মুখোমুখি তখন অবসরের আসিলেছিল। পরিচয়ের উপলব্ধির তোমার আজকে মুক্তির নিজের আজার করিয়া আজকে তোর আজকে মুক্তই সম্বন্ধে পরিচয়ের হইয়া উঠিয়াছে।

Our Latest Publications

A HISTORY OF INDIAN JOURNALISM

A critical note on the history of Indian journalism from Palassay to the trial of Surendra Nath Banerjee in 1883. A valuable document to all students of Indian journalism. 10.00

Che Guevara

DIARY IN BOLIVIA

(Nobember 7, 1966 — October 7, 1967)

Introduction by Fidel Castro. 2nd edition 4.00

E.M.S. Namboodiripad

KERALA YESTERDAY - TODAY and TOMORROW

Revised edition 6.50

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12, Bankim Chatterjee St., Cal-73
Branch: Nutan Sarai, Durgapur 4

by Dr. S. K. Dasgupta's

A Study of Alexander's Space Time & Deity
(A Thesis approved by the University of Dacca)

Some Problems of The Philosophy of Religion
(Post - Graduate & Hon's)

Metaphysics At A Glance
(Pass & Hon's students of all Indian Universities)

অধ্যাপক অধিকারীকুমার চক্রবর্তীর। **বর্তমান যুগের ধর্মচিন্তা** ২·০০

অধ্যাপক শচি ভট্টাচার্য। **বাংলা ঐতিহাসিক নাটক** ৮·৫০

(বাংলা নাটক সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে একটি অপরিহার্য)

ডঃ অমল চৌধুরী। বাংলা গদ্য প্রসঙ্গ ৫·৫০

অধ্যাপক চক্রবর্তীর। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ১২·০০

প্রবোধ বেলুড়ের সম্পাদিত। প্রফুল্লকুমার সরকারের কাব্যগ্রন্থাবলি ৪·০০

(শ্যামলকান্তি ও সাহিত্যিক সমগ্র আলোচনা)

অধ্যাপক বিশ্বনাথ সম্পাদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা।

শচি ভট্টাচার্য। নিজ নিজি মুক্তির আলো (কবিতা) ৫·৫০

সাহিত্যশ্রী ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রশান্ত চৌধুরী

আমাদের সুমুখের বাড়িটার বুটকু বলে একটা খোকা ছিল। তার হজম-টজম ভাল মতন হত না। সেদ্ধ, ঝোল আর পোড়ের চালের ভাতটুকু ছিল তার বরাদ্দ। কাজেই ভালটা-মন্দটা খাওয়ার তার বড় লোভ ছিল।—সে যখন গল্প শুনেত, তখন পক্ষীরাজ ঘোড়াটার আকাশে উড়ে যাওয়া, কিংবা সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যার জেগে ওঠা, কিংবা মূলোর মতন দাঁতওলা রাক্ষসগুলোর বিদ্যুৎঘটে কাণ্ডকারখানা,—কিছুই তাকে তেমন করে মশগুল করে তুলতে পারত না। সে কেবলই অন্যমনস্ক হত, ছটফট করত।—শেষ পর্যন্ত যেই না গল্পটা রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের বিয়েটা পর্যন্ত গড়িয়ে যেত, অমনি তার চোখদুটো বড় বড়। তখন, যাঁরা তাকে গল্প শোনাতেন, সেই পিসি-খুড়িরা সেই বিয়ের নেমন্তন্নে কি কি ভাল-ভাল রান্নাবান্না হয়েছিল তার খুঁটিনাটি লিস্টি দিতে থাকতেন, আর বুটকুটা চোখ ড্যাবডেবিয়ে সেই হরেক-রকম মশলাদার গরগরে খাবারের নামগুলো শুনতে শুনতে ভরপেট খাওয়ার নকল উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এক সময়।

ঐ বুটকুর মতন এক ধরণের উপোসী লোভী পাঠককে কোনও একটি বিশেষ নকল উত্তেজনায় ক্লান্ত করে দিয়ে তাদের ঘুম পাড়াবার জন্যে কলম ধরার দায় পোয়াতে হয়নি কোনোদিন গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে।—এ সৌভাগ্যে যত না তাঁর নিজের, তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের, অর্থাৎ তাঁর পাঠকবর্গের।

আবার, যে-রচনা লেখা হয় to force the public to re-consider its morals —ঠিক সেই ধরনের ঘুমভাঙানো গল্প রচনার দায়িত্বে কবে কোমর-বাঁধার পরিচয়ও বড় নেই তাঁর গল্পে।

কিন্তু হারাধনের গোঁফ নেই, কিংবা তার মাস্টার ঠিকেলো মত—এজন্য বলার জন্যে রাজকন্যের আত্মহত্যার আশঙ্কায় দেওয়া হয় না, সেজন্য গজেন্দ্রকুমার তেমন ধরনের গল্প লেখেননি খুব্ বেশী তা বলা গেলেও নিশ্চয়ই তেমনি তাঁর গল্পের প্রকৃতির আন্দাজ দেওয়া হল না।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের পরিসরটা বড় ছোট,—এমন কথা অনেকেই বলেন। সেই ছোট সুখ ছোট ব্যথায় ভরা যে-জীবনটা ক্রমাগত চলছে চলছে আর চলছে,—সেই আপাত-বৈচিত্র্যহীন চলমান জীবনের যে পরম মহেন্দ্রক্ষণটি হঠাৎ কখনও পলকের জন্য বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসে উঠেই লোক-লোচনের অগোচরে হারিয়ে যায়, তাকে দরদী দৃষ্টিতে চোখ মেলে দেখে কলমের কালিতে ধরে রাখতে চান যাঁরা, ধরে রাখতে পারেন যাঁরা, গজেন্দ্রকুমার তাঁদেরই একজন

সত্যিকারের গল্প-উপন্যাস যাঁরা লেখেন, জীবন সম্বন্ধে সত্য দেবার দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না ঠিকই। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের তফাৎটা এক জায়গায় বোধহয় এই যে, উপন্যাসে এই সত্যের পরিণতি দেবার দায় যতটা থাকে, গল্পের সে-দায় নেই।

উপন্যাসে আমরা জীবনের একটা সম্পূর্ণ গোটা কাহিনী চাই। গল্পে স্লাইস্ অফ লাইফ,—জীবনেরই একটা খণ্ড-মুহূর্ত। উপন্যাসে যদি চাই পুরো গোলাকার গোটা মালাটা, গল্পে ছোট এক টুকরো ফুলই যথেষ্ট। কিন্তু সে-ফুল শুধুমাত্র যে-কোনও একটা ফুল হলেই চলবে না, সেই ফুলের গায়ে থাকা চাই যুগে যুগান্তের সেই আঁচড়ের চিহ্নটুকু —যাতে করে তাকে সম্পূর্ণ জীবনের যে মুক্তোমালা, তারই একটা খুলে আনা ফুল বলে চেনা যায়। যাতে বোঝা যায়, এ-ফুল জীবনের মালা থেকে খসা।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে আমরা পাই সেই ফুল, যা মালাটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আমরা পাই জীবনের সেই খণ্ড-মুহূর্তটিকে, যা আমাদের ভাবনাকে টেনে নিয়ে যায় সমগ্র জীবনটার দিকে।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে আমরা পাই একটা ক্লাসিক আবেদন যা অনুভূতি, বিচিত্র প্রেরণা বা কল্পনার একটা আকস্মিক প্রকাশ, মনস্তাত্ত্বিকের একটা ধরিত্র কৌতূহলবোধ।—এটা যে সবসময় একটা সুনির্দিষ্ট জীবন-দর্শনের অনুবর্তী হয়ে উঠেছে তা নয়। এঁদের ধারও সেই কিছু। নিজের অন্তরঙ্গ অনুভবসম্পর্কে তাঁরা সেই অন্তর্মুখীন করেছেন। আর তাইতেই সে গল্প ধরে উঠেছে। সার্থক গল্প হয়ে উঠেছে।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যা-গল্পই; না-গল্প নয়। জন নায়ক বস্তুটির সম্বন্ধে তিনি বরাবর সচেতন। কিন্তু তাই বলে জন নায়ক পদার্থটিকে ব্যক্তিত্বের আস্ফালন দিয়ে তার খোঁয়াড়ে কাহিনীকে জবরদ্ কব্জায় পক্ষপাতী তিনি।—আমার গল্পের রাজরাজড়া ছোটলোকের মতো জীবন-প্রবাহটার সহজ ঘুরিয়া জটিল আঁকাবাঁকা পথে-বিপথে ঘোরাফেরার ঘুমেঘাসে অভিযানে সাজো-সাজো রবে বেরোবের হুজুগ তাঁকে। জীবনের সহজ আকর্ষণের প্রবাহের যে আনুগত্য গল্পের লেখককে উপাদান থাকতে পারে, সে-বোধ তাঁর পূর্ণমাত্রায়।

যা চোখ মেলেলেই দেখা যাচ্ছে, তা সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে আলাদা করে আর নেতা সন্ধানের দরকার নয়। যত সহজে তাকে দেখা যাচ্ছে, তত সহজে যে তাকে চেনা যাচ্ছে তা:—সেই খবরটাই তো তার অন্তরঙ্গতার।- চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তাকে সাজানো ভাল করে বুঝেছে,—ভুল বুঝেছে যার কিছু তার বিশেষ করে নজর দেবার কিছু নেই, তার সম্বন্ধে বিশেষ করে আর কিছু জানবার

সেই,—তাকেই দিয়ে আমাদের মতন টেনে, আমাদের ভাবনা টেনে, তার সঙ্গে আমাদের সুদূর দেখা-হওয়ার নয়, চেনা-হওয়ার সৃষ্টিরহস্যটী করেছেন গল্পকার সত্যেন্দ্রকুমার। আর তখন, সেই নিতান্ত সাধারণ ছেলেটি হয়ে ওঠে অসাধারণ হয়ে উঠে আমাদের মন কেড়েছে।—গল্পকার হিসেবে এইখানেই সত্যেন্দ্রকুমারের সার্থকতা।

কে এই সাধারণ, কিংবা কী এই সাধারণ, যা অসাধারণ হয়ে উঠতে চায় সত্যেন্দ্রকুমারের গল্পে?—কখনও তা একটা চিঠি, কখনও তা একটা ছোট্ট ঘটনা, কখনও তা শুধু একটা বিশেষ মেজাজ, কখনও বা আর কিছু।

সত্যেন্দ্রকুমারের গল্প আইসোরে জীবনের বেড়া টপকে না উঠাও হয় ডেপাল্ডহের বাটে, না পালায় মুক্তকুটীর কলা-গলির মোলকবাঁধায়। সংসারের বেড়া ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। শুধু যেন ঘরে ঢুকি সোহাগির এক টুকরো পড়ন্ত আলো এসে লাগে তার ছোট্ট কপালে;—গরীব-ঘরের কালোকোলো মেয়েটার চোখে তখন যেন ওই কিসের বৃষ্টি অপরূপ রহস্য!

সত্যেন্দ্রকুমারের কোন্ গল্পটিকে আপনি তাঁর প্রেষ্ঠতম বলে চিহ্নিত করবেন বলা আমার পক্ষে যেমন কঠিন, ঠিক তেমনি সহজ একথাটা বলা যে, তাঁর 'বিজয়িনী' গল্পটি পড়ে আপনার নিশ্চয়ই ছোট্ট মেয়ে টুনু-কে দেখতে ইচ্ছে করবে।—যে-জন্মদাতা মাকে পাবল না ছেলেকে নিজের হেফাজতে, কিংবা পাবল না আকর, দিতে পারল না খাঁওচা-পরা, এমন কি নিজের পিতৃত্বটা পর্যন্ত স্বীকার করতে না পেরে হারিয়ে-যাওয়া একটী অচেনা মেয়ে বলে পথিকের দিয়ে যে জন্মদাতাকে নিজের হাতে মেয়েকে জমা দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার, তারপর গা-ঢাকা দিতে হল,—সেই অক্ষম জন্মদাতার জন্যে বাস্তহীন যে-মেয়ের ছোট্ট বুকের মধ্যে ব্যথা উথলে ওঠে,—পরের বাড়ির কাই-ফরমাস খেটে বড় হতে হবে যে ছোট্ট এক রাত্রি মেয়েকে ভাবতে পারে—"...যাঁর সহিতই সে কেন দিন অন্যত্র চলে যেতে পারে...লেখাপড়া শিখে চাকরি পায় যেতেও—সেই দিন সে বাবাকে খুঁজে বার করবে আবার। তাঁকে এনে নিজের কাছে রাখবে, তাঁকে আদর দেবে।"—তেমন মেয়েটিকে দেখার পরে কি সংজ্ঞা দেওয়া যায়?

'ভাবনা, ও প্রসাদ'-এর হিন্টার রাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের ঘটনা পোড়াকার ইচ্ছে হয়ত আপনার নাও হতে পারে,—কিন্তু গল্পটা পড়বার পর আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, একটা চৈত্র ছোকোরোর লোক-উৎসবের ঘটনা-বিশেষের সিদ্ধান্তই সাধারণ ঘটনার একটা রমণীয় গল্প হয়ে ওঠার এমন আশ্চর্য অবলীলার ঘটনার এ-পারে থেকে ওপারে ও-পারে নিয়ে দাঁড়াল।

গল্প যে কখন কীভাবে জমাট বাঁধে, চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ, সুর, মেজাজ কখন কার হাত ধরে যে সে ছকের ও-পারে গিয়ে পৌঁছতে পারে, কে বলতে পারে তা আগে থেকে?

সত্যেন্দ্রকুমারের 'অবাক' গল্পের সংসারের সাধারণ একটি কথা এই প্রথম এসেছে চোখে, একলা। পাহাড়ে ঘেরা এসেছে চির-পরিচিত আইসোরে সংসারটাকে। চোখে এসে সে এই প্রথম চিঠি লিখতে বসেছে বাবা সেই মরিশাসকে,—চাঁদিমালের এত কিসের গভীর্যপরিচিতার মধ্যে যে শুধুই চিরাচরিত একটী সম্পর্কের অনুভব, যে তার ছেলে-মেয়ের মা।—কিন্তু নতুন পরিপার্শ্বিকের অভ্যস্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে একলা নিজের মনের মুখোমুখী হয়ে বসে কী যে ঘটেছে,—হঠাৎ সেই মরিশাসের মধ্যে চিরাচরিত নতুন করে ফিরে পেতে চেয়েছে সে কাকুল হয়ে। তারপর লজ্জিত হয়েছে।—শুধু ক্ষমা চেয়েছে 'প্রিয়তমাসু' দিয়ে,—শেষ পর্যন্ত লিখেছে 'ভবদীয়াসু'।—শেষ কথাতে চেয়েছে 'ভালবাসা' জানিয়ে,—জানতে পেরেছে সম্পর্কবিশিষ্টটুকু মাত্র।

সত্যেন্দ্রকুমারের সকল গল্পের প্রায়কেরই একটা নাম আছে। কিন্তু 'অবাকে'র এই কথাটির কোনও নাম যেন নি। লেখক 'শুধু অপেক্ষা' বলে। এই 'শুধু' যে আপনি, আমি;—নির্দিষ্ট একটা নাম দিয়ে তাকে কি আপনার-আমার কাছ থেকে আলাদা করা যায় নাকি?

এ-গল্পের সুরটুকে আমার মৌয়াজ্জম একটা বাসনা পাহাড়। আর শেষকালে আমে,—"পাহাড়ের উপত্যকার মেঘলা অবকাশ দুঁড়িয়া গিয়াছে, তাহার কঠিন বন্ধুর দেহ এখন চোখের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।"

গল্পটি অনবদ্য।

'আদিম' গল্পের প্রধান চরিত্রের অধিবাসী নাম আছে একটী,—ব্রজেন্দ্রনাথী। যদিও তার একথার কিছু বেশিও হতে পারে। ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে। সংসারের অথেও একজনমাত্র ছিলেন,—ছোট্ট অন্নদাময়ী; তিনিও গেলেন আইসোরে। বৃদ্ধি এই শেষের কিছু-বিসর্গও টের পায় না। ঘোর তার অন্ধকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আছে শুধু আদিম একটা 'সোনা' ঘাস। সেই সোনার সে তার সেই শেষ নাতিটির হাতেই দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার চুরি করে কিনতে দিয়ে কিনের বাজার পরে গিয়ে বৃদ্ধি ঘুরে আটকাত। শেষ অবধি বৃদ্ধির। সেই অন্তিম মুহূর্তে বৃদ্ধি ছাড়ল খুঁজে বলল তার এতদিনকার বহু আদরের নাতি অন্নদাময়ীকে।—আমার অন্নু, সে কোথায়? —তারপর তাকে ফিরে না-পাওয়ার শোক-টুকু নিয়ে বৃদ্ধি মরল।—গল্পটিও ফুরোল। ফুরোল বটে, কিন্তু সে কি শুধু একটা বিশেষ বৃদ্ধির কথা বলেই ফুরিয়ে যেল? আর কিছু না?

অনেক 'দিন ধরে ভাবিল-বাসন' করতে করতে আমাদের মনের সুখের অনুভূতি-গুলো কেমন অসাড় হয়ে যায়,—তাকে শুধু একটা আদিম জৈবিক ক্ষুধার দৃষ্টি।—হঠাৎ একেক দিন কিসের ঝাঁজের ওলোট-পালোট হয়ে যায় সব। তখন হঠাৎ সেই হারানো অনুভূতিগুলির জন্যে আমাদের মন-কেমন করে। কলুবেলাখীর অন্ধের বাজার হতে একদিন মনে পড়ে যায়, আমার অনেক ভালবাসার সোনালিয়া অন্নদাময়ীকে অনেক দিন দেখা হয় নি; সে কোথায়?—কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার সময় নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে।—'আদিম' গল্পটি পড়ে আমার যেন এই কথাটাই মনে হয়েছে বারবার। লেখক যেন গল্পটিকে পৌঁছে দিয়েছেন প্রবাহ থেকে প্রবাহের অতীত অনুভবে।

'একটি ছোটকথার কাহিনী'তে লেখকের এক নতুন রূপ, নতুন রসের আবাদী। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে সন্ন্যাসিনী সোনাবাঈ তাঁর গায়ের ছোটকথাটি এক ভিক্ষুকের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তার যে-কথা কাহিনী নিবেদিলেন;—এ হল ইতিবৃত্তের কথা। লেখক এই ইতিবৃত্তের কথাটা জানিয়ে দিয়ে গল্প শুরু করেছেন তার পর থেকে।—তিনি বলেছেন, ছোটকথা শেষে কি হল সেই ভিত্তিহীন, তাই গল্প। গল্পের আরম্ভটা যেমন চমকপ্রদ,—গল্পের মাঝখানের কল্পকারখানা তাও চেয়েও বেশি। গল্পটি পড়লে যেন 'ঈশপ ফেবল্'-এর কথা মনে পড়ে।—ইতিহাস যেন ঘোড়ে এসে তার হাতের লণ্ঠনটা বাঁধিয়ে দিল বৃদ্ধকথার হাতে। বৃদ্ধকথা তখন হল আধুনিক শিল্প-এর রূপ নিয়ে, 'আমিন' গ-এর চ-এ, আমিনরজনীর মর্মান্তিক অনুপ্রেরণায় উজ্জ্বল গতিতে।—তারপর? বৃদ্ধকথা ঘুরে এসে তার পালা শেষ করে যেন সেই কথি ধরিয়ে দিল বাসন্তী বৈরাগী-বাউলের জীবন-দর্শনের হাতে।—শেষ হল রূপকথা যোড়। গল্প ফুরোল এসে সেই শেষ লাইন, যেখানে লেখা আছে,—"এই পথ, আর এই পথে পাওয়া ভিক্ষায়—এই তার ফল, চল ভাই।

'অনুরূপা'—একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। কী অভিনব বিষয়বস্তু! অথচ গল্পের চলনটা কতই সাধারণ! অসমবী জহুরীর যেমন অন্ধকারের মোড়কে হীরে মুড়ে এনে খুলে দেখায়,—এ গল্প তেমনি দেখালো!—গল্পটি তার অভিনবত্বে চমকটাকে কেমন 'চান ভাইন' করতে করতে একটা প্রশান্তির মধ্যে এনে শেষ করেছে।

সত্যেন্দ্রকুমারের শ্রেষ্ঠাদের গল্পগুলির মধ্যে 'সাধারণ' গল্পের চেয়ে ? চোখা গল্পটির নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়লেও, এ-রসের গল্প তাঁর আরো কিছু আছে, বেদুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া এবারে আর সম্ভব হল না।

লেখকের আরো কিছু ভাল ভাল গল্পের সঙ্গে দু-এক আঁচড়ে গল্প কিছুটা পরিচয় ঘটিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল কঠিন ধারা; 'আর্-এর-এস', 'নিরঞ্জনচন্দ্রিকা', 'ঈশান', 'কাঁটার কাইলেটের ইতিহাস', 'পশ্চিম নিবাস', প্রভৃতি গল্প-গুলোর সম্বন্ধেও কিছু বলি। কিন্তু জেরও কিছু বলার আমার সেই আর। এবারের মতন এইখানেই থামতে হচ্ছে।

আদিম

আশাপূর্ণা দেবী

বুড়ো বেনী দিয়ে পড়া প্রভাস ঘোষাল ফুলের মালা জড়ানো, হাতে আরো একগোছ মোটা মোটা কমল, ঝিঁঝি ফোলের পড়ীর অনেকগুলো টিনের ভাঙলটা অবহেলায় পিছে ফেলা, পায়ের জুতোয় আর কুর্তার আস্তিনে শ্রীনিকেতনী সিল্কচাদুর—আত্মিয়াবাড়িতে একখণ্ড মিথুনে মনোমত কুলাঙ্গনী কলকুরী, বাড়ী থেকে মোর যেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মতো ছেলে বাড়ীতে ফিরে এলো।

উঠেই আসতে হয়, অনেক ঘোরে বাড়ীটা উঁচু।

প্রবীণ বলে ফাইবলো বেশী।

হিসেব বলে না। উপরে-নীচে এখানে-ওখানে পর আর বাড়ীর মোড়ে বাঁধা।

কলকুরীকে দেখে প্রবীণের একবারে পুরোনো স্নেহগুলো সেখের পালক ঝেড়ে ফিরে, সাহারা বালুর প্রস্তরমূর্তী হৃদয়খণ্ড হয়ে ফেরে যায়ে। তার চালচলা-দেখার এরূপ অসংখ্য অবিচারে কখনো ওঠে নি।

কলকুরী এর স্পর্শিত ছাদটা উপরের ঘরে আরো ফেন বড় ঘরের মেয়—ঘরে আসার দেরি আলানো ফেন যে? কী দুশ্চিন্তা! ফোন ফোন।

—আমা যাচ্ছের এমন সরাল হৃদয়ের পর ইতস্তত করা সম্ভব নয়। সামান্য অসম্ভাবে ফোনটা তুলে নেয়।

ছাদিটি বাসটা ফোনাতে ফোনাতে দিবা স্প্রাচিত ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে কলকুরী।

আর তুমেই প্রবীণের চৌহিলের আলমপত্র উলট-পালট তছনছ করতে থাকে। কবি ফোনার কিছু লিখে রাখিয়ে রেখে গেছে কি না।

এ বাবা। পাতের তলা এ যে চিঠি। কলকুরীকে ভয়ে আগে তুলে। আর প্রায় দুই-আড়াই মো প্রায় চিঠিপত্র বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-এক ছত্র বা পাঠায় সে আর চিঠি নয় সেখানেই পাতসরা কুশলবার্তা।

আরে এ যে রীতিমতো সাহিত্য!... চোখটা টেনে নিয়ে ভয়ে পড়ে পাতাটা তুলে ফেলে কলকুরী, আর পড়া যায়।

বাবাকে, এবার আবার কি লিখছে প্রবীণ!

"—আজ ফেলে ফেয়ের চিঠিটা লিখছি কলকুরী—আজ অনেকদিন ফেলেই থাকি হাত, কিছুতেই ফেন ভাবি না মুখ আনতে চায় না। তবু এই ফেলে থাকা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয় ভাতে দুনিয়ে থেকে আরো কুল কবি আমরা। দুনিয়ে থাকি তাই পৃথিবীর নিরন্ন ক্ষুধা আমাদের আক্রমণ থেকে বাঁচে। আমরা যখন সাত্ত্ব দিন ফুলে প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে মরি, তখন ঘুণায় কলকুরে ফোন পৃথিবী নিশ্চল দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকে।

যাতে কবি দুনিয়ে না পড়ে আমার মতো জানলায় এসে বসো কলকুরী, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে। আমের পাঁচিল কতো ফেতে যাবে ফোমার। আরো আশ্চর্য লাগবে সুদীর্ঘকাল ধরে মাটিটা দুনিয়ে বন্ধ করে এসেছো বলে।

তুমি কি জানো কলকুরী, মাটির অন্ধকারে অবলে যে মর্মর ধ্বনি ওঠে সে ধ্বনি কিসের? তুমি হয়তো আজও ভনো না ফেলো, আমি জানি।.....

পাতার পাতার বাতাসের লীলাচঞ্চলতার চুম্বন চলতো সে মন, সে ধ্বনি কোটি কোটি অসহীর আত্মার কিসফুস আর্তনাদ। প্রতিদিন প্রতিমাসে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্কলুষ আক্রমণে যে সব মুক্তাত্মারা আশা-আকাঙ্ক্ষার ভয়ঙ্কার মাটিয়ে রেখে এই সোভাসম্পদময়ী ধরণী

থেকে অন্তরে স্খলিত হয়ে পড়ে যায়ে—অনন্ত সূর্যের অভিশাপ ওঠেই, ফলে ফলে উঠে আসে তারা, অন্ধকারের আলাপচারিতা অন্তরে। উঠে আসে—ফেয়ে-যাওয়া পুরনো পৃথিবীর মুখে। উঠে এসে অবাক হয়ে যায় তারা! ফোনায় বিলীন হয়ে যায়! নিরাকারে স্পন্দিত হয়ে যায় পৃথিবীর দুর্বোধ্যতাকে...এসে মিলতে পারে না কিছু, মুখের পর মুখ নিয়ের পুরনো আলপাইকে। বুঝতে পারে না—ফোথায় হারিয়ে ফেলো, হাকে হারিয়ে ফেলার মতোই অন্তর্হিতরা? জানতো না—অন্তরাত্মারা পৃথিবী হারিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেরে মুখে ফেলে ফাঁকির সন্ধান ছিল। নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে ফের আসবারী মতুনের জন্য।.....

আজকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এতো সময় পৃথিবীর হাতে নেই।...

মুখের ফেয়ে ঝুলা মুখ অপরাধে ঘরে ঘরে ফিরে ফেতে হয় অনেকে অনেকে। পাতার পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ওদের হতাশ হাহাকার। ফেন আশা কুটে কুটে সাজা তুলতে চায় অবয়বহীনারা প্রস্তরীভূত বক্ষপঞ্জরে। বুঝি মনে পড়িয়ে দিতে চায়...'আমি ছিলাম' 'আমি ছিলাম'...ওদের ফেয়ের এই সোভাসম্পদের উপর ফেনো আনা অধিকার ছিলো আমার, এমন নিবিড় ঈর্ষানীলো আমাকে ভুলে যেও না। এক সময় ছিল ফিস করে কথা করে ওঠে নিজেরা নিজেরা। নিঃশ্বাস ফেলে বলে — ভুলে ফোছ আমাদের?...আমরা নেই? তখন হয়তো অন্ধকারের মনো অধ্যানী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু একটা অনুচ্চারিত 'হায় হায়' স্থির হয়ে থাকে।

আবার আরম্ভে এসে পড়ে নতুন দল।

আবার তাদের আরম্ভাস্ত নিঃশ্বাসে পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর শিহরণ। সারা রাত্রি ধরে চলে এই আনাগোনা, এই আত্মাজ্ঞাতি।

নিরুপায় অন্ধকারে সমস্ত রাত ধরে সহ্য করতে হয় অসহীর আত্মাদের এই অসহ্য আক্রমণ। ফোনো আলো ফুটেছে যখন অন্ধকার দৃষ্টি, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

ফোনোরকমে আলোর আভাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, শুকনো পাতে জীবিত প্রাণীর

রাজো এ ভাবের অবতারণা হবেন। বুঝতে পেরে প্রাণ খুলে বিলায় দেয় তারা।

আমার এই অদ্ভুত কল্পনার কথা শুনে তুমি কি হাসছো কল্পুরী?...তাহলে —চিত্রের আলোয় চি অন্ধকার অন্তর্হিত হয়ে না?...

ওটে দৈনিক। ওটো!

সে রাত্রি সাধারণত আড়াইটের ট্রেনটা-চালানোর। তখন কেউ কিন কিন করে কথা করে ওঠে না।...কল্পুরী, বিদ্যের আলোয় তুমি যদি অজানার অটিলতার ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন যে শব্দ তুমি শুনতে পাবে, সে নিঃসন্দেহই তোমার নিজেরই পায়ের চলে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন অসহায়ের মৌন অজানা শব্দটার মুখে ছেয়ে আসবে তোমার দিকে। সমস্ত রাত্রির আধা-রাত্রির ইতিহাস শুনতে পাবে না তার মুখের কোনো রেখায়।

কল্পুরী, অনেকের এতো কাছাকাছি কখনো থেকেছো তুমি, যেখান থেকে জানলা খুললেই অনের গন্ধ পাওয়া যায়? গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছো অজানা-অচেনের সভ্যতার ইতিহাস?

না না!

নিশ্চয় তুমি এসব দেখো নি কল্পুরী, নিশ্চয় শোন নি এসব! যদি শুনতে পেতে— তাহলে পরীক্ষায় একটা অতিরিক্ত ডিগ্রী আর কিছু পরিমাণ বেশী নম্বর আহরণের আশায় ইট-কাঠের অক্ষরে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে এমন মূল্যবান উপন্যাস রচনা থাকতে পারতে না। তোমার এই উপন্যাস কী হাস্য-করই আজ লাগছে আমার কাছে! আকাঙ্ক্ষার পরিধি কতো ছোট হয়ে গেছে আমাদের, তাবলে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না কল্পুরী?

পড়ে হাসছো?

কিন্তু সত্যি বলছি, কেন জানি না মোর মনে হলেই এই অদ্ভুত কল্পনার কেন পেয়ে বসে আমাকে। কী হাস্যকর লাগছে নিজেকেই!...কী মূল্য আছে দৈনন্দিন জীবন-প্রয়োজনের সঙ্গে এর?...

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেল এখানে—চিঠিতে যদে লেখবার উপায় নেই। বৈচিত্র্য হলে বলতো। আজও মনে হয়, হয়তো এর সমস্ত সেই ঘটনারই প্রতি-ক্রিয়া। সত্যিকার একটা পরীক্ষা না এলে—

পাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে কল্পুরী। না, এর কোথাও কিছু লেখা নেই। নিশ্চয় রাত্রে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, তারপর ভোর না হতেই ঘুমটোলেন চাকরী জানায় রাখবার জন্যেই এ উপন্যাস।

মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে কল্পুরীর ঠোঁটের কোণে

আহা বেচারা! এ কি জানতো সত্যি ট্রেনগো লাইন থেকে ছিটকে এসে পড়ে কল্পুরী এর জীবনের ওপর ছায়া ফেলে!... নিশ্চয় আবার আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দু-চারটে সিগারেট ধ্বংস করে নিয়ে মৌজ করে বসে জমাদার চিঠিখানা শেষ করতো আবার তখন ঘুমে ঘুমে। ঘরের জানলা খোলা রেখেও কল্পুরীকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি বলেই বোধ-হয় এমনে অদ্ভুত রসের আমদানী করতে সুরু করেছে প্রদীপ!

'অজানা-অচেনের সভ্য ইতিহাস'!

চৌরঙ্গী বাঁধুস্ট্রীটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আর একবার শ্রেষে ওঠে কল্পুরী। আহা বেচারা রে! অভিজ্ঞতাহী-ওয়ালা এতোখানি লম্বা-চওড়া পুরুষ আজকাল বিদ্যুৎ ডিভিশনী কী অবস্থা এ করে ফেলো!...তা' বয়তো সমস্ত দিন ছোট-সিটে এসে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ফিরা যায় রাত্রে জানলা খুলে তলদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বঞ্চিত আকাশের অভ্রুপ রাহস্যের সুরটে ভরে।

মন্দা খারাপ! কিন্তু খাটে যাওয়া ঘটনাটা কি?

পাতাটা চশমা দিয়ে চেপে ভাবিতি মাথাটা লুকোবে লুকোবে ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে কল্পুরী। বাজা চাকরটাকে ডাক দিয়ে প্রশ্ন করে—ওরে বীরেন্দ্র, তোমার সাহেব কখন ফিরবেন জানো?

পাহাড়ী ছেলেটার জন্যে এখন একটা পরীক্ষা প্রশ্নকারিনী কল্পনা জুটেছে কিনা সন্দেহ। তবে সে বিলাসিত কৃতকর্মে এক-গাল শ্রেসে ভাঙা বাংলায় যা বলে সেটা কল্পুরীর পক্ষে খুব মূল্যবান হয় না। সন্ধ্যার আগে প্রদীপের ফেরবার কোন আশাই নেই নাকি।

আচ্ছা এখন সরে যেতো এখানেটা।

আবার অনেকক্ষণ একলা ঘরটা সাহেবে একা থাকতে হবে কল্পুরীকে। চেয়ে এলে এইটি হতো না! ঘরগুলিতে অন্তত কিছু বেরিয়ে, অবাধ আসতে সেখানে অনেকক্ষণ প্রদীপের ঘরে এসে শেষে পড়তে পারলেই হয়ে যেতো। অন্তরঙ্গতার সৌজন্যে দিনে-রাত্রে প্রদীপের সেই ঘরোয়া কল্পনা করতে পারতো কল্পুরী।

তা নিজেই বসে কি এর কারণটা করে আসছে? সেই ইচ্ছে হলো আবারে উঠে চলে এলো! ইজার এসে পড়ার সম্ভাবটাই মনে হোচ্ছে, অন্তরিকেটা ভেবে দেখে নি তো!

এতোক্ষণ কি করছে সে? সমস্ত আমার মেয়ে নিয়ে দিব্যি বিভোর একটি হয়ে গেছে?

ভবে ছি, অনন্দন!

ভবে?

অন্তরের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতাবে ভবের মাঝে মাঝে!

উঁহু, ভুল করো বাবা!

তাহলে?

প্রদীপের ঘর-সংসার ছড়িয়ে ঘরে নতুন করে মোহাতে বসবে? 'পুরীবিহারিণী' হলেও কল্পুরী যে ঘুরিনীশ্বরার অযোগ্য নয়, একথা প্রমাণ করে দেবে প্রদীপের কাছে?...থাকলে থাক, যে অজানা অচেনা থাকে! সন্ধোর অন্ধকারে যখন আসবে, পৌঁছিয়ে দেবে একেবারে। তবে কি ওর অন্তরঙ্গ মৌ-কামনা প্রকাশ করবে বসে বসে? আবো কি কি উদ্ভট পাগলামীর নমুনা সংগ্রহ করতে পারা আর তাই বেকারে!

ধুত্! ভুলুরী সোজাবে না!

সব থেকে ভালো, ঘরের ইজে আলিসা করে খাবারদাবার সেরে এই চাকরটার সঙ্গে গল্প জমানো।...হোক না বয়সে-ছোট, তবু কৃতার্থ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কিঁধিল জলীয় মোলায়েম করতে করতে মৃদুস্বরে বলে—

—এই বীরেন্দ্র, তোর সাহেবের ঘর-বাড়ী সব তো এক রকম আমার হাতে রেখে গিয়ে, বল তিনি কবে?

বীরেন্দ্র ঘাড় হেলিয়ে বলে—জানি, মেমসাহেব!

মেমসাহেব! কে তোকে বললো শুনি?

—কেউ বলেনি। আমি বুঝেছি।

—বেশ করেছো। যাও এখন চায়ের জল দাও দিকি? হুঁ, তাদের ছোটর এখনো কিছু ফেরে-টেরে পাওয়া যাবে নো?

—নো! —বেয়ারা সজোর ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় বন্দুকের।

আরো অন্ধকারের সুর ছেলেটার কণ্ঠে!

কল্পুরী হেসে ফেলে বলে—খুব বাঁচালাম। তা কি খেতে দিবি এখনকার? তোদের ভাঁড়ারে?

জবাব সহজেই দেয়া যায়। খুশির গল্প উপন্যাস পড়লে এমনই হয় বোধহয়। পাহাড়ী ছেলেটা কল্পুরীর ছোকুত কথার অর্থ বুঝুক বা বুঝুক, তবু উপন্যাস ছোকরার অভাবে ওর সাহসেই নিজেকে কলসে তুলবে কল্পুরী।...আজো মুখের কতো ছেলে উঠবে অবশ্যই, দেখে উঠবে এক লাইন থাম। কথা বলতে হবিয়ে-হিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

প্রদীপ অনুপস্থিত। তবু সারা বাড়ীতে তার উপস্থিতির যাদুমন্ত্র ঘটেছে। এ বাড়ী কল্পুরীর, এ সংসারের ওপর অধিকার

ফরীদের বাবা কল্পুরীর, আসছে কি সন্ধ্যে বেলায়।

সত্যি। খেয়ালও নিয়ে ওদের ছেলে এলেই হলো ফরীদের সঙ্গে।...বাইরে আসর নিয়ে, বাইরে হলো আবার ছেলে আবার!

কী লাভ হবে তাতে? কী জীবন হলো এক-এটা বাঁধ নাই দিলো? ফরীদ ওস্তাদ, না কল্পুরী নিজেই ওস্তাদী?

ভেলা ছুল আঙুলে বাড়াতে বাড়াতে কল্পুরী হঠাৎচঞ্চল হয়ে ওঠে—কই বল দেখি?

ছেলেটা মহাবেগভরে বলায়—ছেলে-ছেলে আবার নিজের ছিল আসল যি আর্টি—ওস্তাদ কল্পুরী আসল সেই সাহেবের বাড়িতে। তারপর বাঁধ ভেলাসাহেবের মুহূর্তের মাঝে আসর বসবে, ঝিকিয়ে সন্ধ্যে আসবে হবে।...আর্টিস্ট তেমনী নয়, হাতে নিয়ে এই আসর বসে ঝিন্দাহারীর মৌজে খাস নিয়ে আসছে যা তেমনী।

—ঝিন্দাহারীর মৌ? সে আবার কে?

সমাধান খোঁজবার ভঙ্গি করে কল্পুরী। কিন্তু কৈছে খুঁজে খোঁজবার মত সমাধান খুঁজে পায় না, অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ঝিন্দাহারীর মৌ।

সেই যে ঝিন্দাহারী, সাহেবের খুঁজে ভেলাসাহেব সাথে আসবে আসবে, সাহেবের গাড়ী আর কল্পুরে সাথে করছে, সে নাকি গজলা — সাহেবেরই সেই কল্পুরের মুলিয়ে। তারই মৌ?...সাহেবের ছোট খাটাকে পুলিশের কাছে নিয়ে কথা বলবার আর এক অফিসার-ভুইয়েরা একসঙ্গে করে নিয়েছে বিদায়।...ওই মনের মধ্যে একটা ছোট ছুলে নিয়ে একা আছে সে এখন—ছুলটা লোহার, ভিন্ন ভেতে, ভেতের ছুলটি ভেজা।

আজ একবার কথা নিতে পারলেই কল্পুরীর আসর পূর্ণ হয়।...এমন কি এ এমন মনে রাজা করে নিতে ভেতে পারে পর্যন্ত। খুব ভালো রাইট এ। অনেকদিন রাজা মালে ছুলি ছুলি ভেতে যায় সাহেবের আসর, সাহেব না ভেতে আসিক অনেক এই আসরটি খুব মনমুগ্ধকর।

আঙুলের আসর ভেজা ছুলের ভেজা এটো এটো আসর, লাল হয়ে উঠেছে আঙুলের ডগা।...কিন্তু মুখটা? মুখটা আসর মনে হয়ে উঠেছে ভেজা কল্পুরীর? আসর ভেজা ছুলটাকে ঠেলে এর অফিসারটা কি ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে পারে নিয়ে? এ মনে আসছে—উঠেছে পড়ে আসা ভেজাটাই আর্টিস্টের একটা। ছুলের মুহূর্তের ভেজা মাড়ীর আসরে আর্টিস্টে।...এই আসর আছে?

আসর মনে অফিসারকে এইটুকু মুহূর্ত নিতে পারে কল্পুরী—এ — এই ঝিন্দাহারী মুহূর্ত ভেজা ভেজা?

ছেলেটা আসলে সাহসভার আসর করে, বাঁধও আসছে কাছে, আসতে বাধা কিন্তু কল্পুরী আসর নিয়ন্ত্রণেই সাহেবের নিজের ভেজাসাহেব, আসর আসতে বাধা নেই। পুলিশ আসে আর্টি কল্পুরে সাথে আসছে নিয়ে ঘটাৎ মুহূর্তের মুহূর্তে হয়ে বাধা ভেজে ঝিন্দাহারী, এর মৌও আসছে সেই কথা পুলিশের আসছে, কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসের আসকারে সাহেব এর ছোট ভেজে আ-বিড়াল ভেজে আর ভেজে মুহূর্ত আসছেন।

—এর? কিসের এর! আসছে আ-বিড়াল আসবার আসে? আর্ট কিসের আসে ওঠে কল্পুরী।

ছেলেটা হতাশ আসে দুই হাত উল্টে আসে—কি জানি ভেজাসাহেব। এ পাগলটা ভেজ যে আসছের ভেজে ভেজে সাহেবের আসবার ছোট ভেজে আর পাহারা নিয়ে ভেজে আসবে! এর ছোট মুখটা কিসের ঠিক আ-বিড়ালের আসে। আসে আসছের আসে আসবে।...মুখের ভেজে উঠে সাহেব হঠাৎ আর ভেজে—

ধীরে ধীরে বাকশক্তি হারায় কল্পুরী।

আসর্যিআসে আসে — আ এর মৌ পুলিশের আসে নিয়ে কথা আসছে ভেজে ভেজে?

ছেলেটা ভেজে কল্পুরীর আসবার আসে হয়ে আসে। নিজে নিজান্ত নিজের মতো আসে—আ আসলে সাহেবের নামে ভেজে হয়ে যা?

—হয়েই যা। উপর স্বরে আসে কল্পুরী—সাহেবের ফাঁসি হলে এর কি ভেজাসাসে নিজের? এর নিজের আসবী খুব ভেজে ভেজো—

ছেলেটা নিজের ঠোঁটটার উপর একটা আঙুল ঠোঁকিয়ে ভেজাসে আসে ইশারা আসবার কল্পুরীকে। চুপি চুপি প্রতিধ্বনি করে—সাহেবের ফাঁসি হলে এর আসবী ভেজে উঠেছে?

এক ঝিঁড়ে মনে ভেজের উপর সাধারণ আঙুলের আসর আসে না। কিন্তু কল্পুরী ভেজে ভেজে আঙুলের নামটা আসে ফুরাস হয়ে না? আর একটিবার আসর ফাঁসি হলে ভেজে পারবে কল্পুরীর আসবী। সে সংবাদে প্রাণে না আসে সে নিজের আসবী-ইজ্জত রাজাবে আসছে।

আর আসর মুখ আসে মুখ আসে আসবে আসে আসে কল্পুরী—আই-আ ঘটাবে—

আসছে মুখে আসছে ফরীদ—ওস্তাদই তো উচিত।

পাগাড়ী ছেলেটা চুপচাপ মুখ তুলে এক নির্নিমেষ তাকিয়ে আসে কল্পুরীর মুখের দিকে। তারপর আসবীআসছে তুলে চলে যায়—মোসলধারায় জল নিয়ে।

মাত্র কয়টা আসেনের আসছে হয় না, ভেজা ভিজতেই আসেই এসে পড়ে ফরীদ। এতো-আসের এক ছোকরা আর্টিস্টী কি মুখ ভেজে নিয়েছে কল্পুরীকে, সেই আসবাসছে হয়ে আসে নিয়েছে ফরীদকে।

ছুটে এসেছে ফরীদ গাড়ীআসের বাওয়া গাড়ী নাম সার্থক করে। ছুটে এসেছে ভিজে আসন আর উপাসছে আসে-আসে আসছে আসছে। নাম নিজেকে আর আসেকে রাখতে রাজী নয় সে, ছোকরা ঢাকরটার সাহসেই কল্পুরীকে প্রায় ঝিঁড়িয়ে ধরে আর কি!

কিন্তু আশ্চর্য!

কল্পুরী কী ঝিঁড়ি আর কী নিষ্ঠুরাস!

আসেই ঝিঁড়ি ঝিমধীরে এর আসে আসে আসবীকে উপহার ভেজে আসেই. কি এই ভিজে পাহারের ভেজে ছুটে এসেছে কল্পুরী? মোসলধারা আসছের মতোই কী আসছে আসে-আসে আসছে এর নামা উপাসনে ভেজে মুখটা।

—কি হলো কল্পুরী? শরীর আসাপ আসছে?

—শরীর? ভেজে ওঠে কল্পুরী—আসর্য আসছের আসলো লাগছে। পাহারের হাওয়ায় এক্সাঁন ভিজে ভেজে আসছে।

ফরীদ আসিত স্বরে বলে—এসে বাঁধ ভো আসর মুখে ভেজে কল্পুরী? কী আসছে পাগছে তোমাকে! 'খুশি' আসে ভেজে আসছে না।

কল্পুরী আর একবার হাসির ঝিলিক ভিজে ওঠে—হাত ভেজে আর্টিস্ট আসবার নিজেকে মুখে মুখে তোমার পার্টির ঘুশিটা কিন্তু আসলে মুখে ভেজে যাবে।

—এ! খুশি আসার ভিজেই পাহারো খুশি?...ভাকে ওঠে ফরীদ।...এসব আসার অপরাধীন পাগলামি। ভেজাস ভেজে? নিজে-ভিজেস তোমাকে, কিন্তু পাহারার না। খুশি এসেই সব ভেজে ভেজেছে?

—আসার হয়ে ভেজে না?

কল্পুরী ঝিঁড়ি আসেকে আসে—ঝিঁড়ে আসে আসছিলের পাহে ভেজে হলো ভেজে? আর আসেই ঝিমধীর, ভেজী আসছিলে আসবো না।

আসুল ফরীদ এ আসলের মীমাংসায় আসতে পারে না।

এমন হঠাৎ উঠে পড়লো কেন কল্পুরী? একেত্রে যদি তো একটু সুযোগের অপেক্ষায় ফিরে যেতো? কেন নিজেকে? কেন এত অসহায়ভাবে প্রসাধনীর কৃত্রিমতায় নিজেকে ভরিয়ে তুলতে গেল—কী মজা মনোলাল বলো তো? ভেবেছে কেন? তিনি না ফিরে নিশ্চিন্তে হয়ে থাকবে আজ?'

থাক সে। এখন আর মনোলালের চেহারা ভাবে লাভ নেই।

ঘটিটা তো হয়ে আছে—সমস্ত শরীর সমস্ত আত্মা, তবুও কিছু অভিমান আর ভুল বোঝার মধ্যে পরিসমাপ্তির আশ্বাস নিয়ে। এখন চাই সামান্য আভিজাত্যের পালা।

তা সেটা উজ্জ্বল পদক্ষেপে চলে। অন্তত আর সৌন্দর্যের যে ভঙ্গী নিখুঁত অভিনয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন।... সে খাওয়া সারা হয়ে গেলো পরে আর।

প্রদীপ বলে—চলো কল্পুরী, বেড়িয়ে আসা যাক একটু।

—বেড়াতে? কোথায়?

—যেন-জলদে যেখানে তোমার খুশি। আজ সব তোমার ইচ্ছেয়—

কল্পুরী ভাবে। হেসে বলে ওঠে—আমার পছন্দটা তোমাকে অভিনয়ভাবে উজাড়, তাই না?

প্রদীপ একটু থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপর অবাক হয়ে বলে—ঠিক বলেছো কল্পুরী! সত্যিই, অভিনয় যেন অভিনয় আমাকে আকর্ষণ করতে পারে। কেন বলো তো?...নিজেই বুঝতে পারি না আমি কেন এমন হই। কতদিন—আমাদের ইচ্ছে মতে বেরিয়ে পড়ি, দেখি কি জানো মনোলালো আছে ওখানে। কেন কিছুতেই ওকে ভুলে থাকতে পারি না আমি! তুমি বলতে পারো কল্পুরী, কেন এমন হয়?

কল্পুরী! গম্ভীরভাবে উজ্জ্বল মেয়ে কল্পুরী—মুখের পাহাড়ী মেঘেরা অনেক নিচু মনোলাল মুছে যায়।

—এত মজার? ও আমার কি একটা যা খুশি উজ্জ্বল হলো? ওকথা বলতে নে—

—আমার এখনি। চলো চলো। দেখে আসি—তোমার মনোলাল আছে কিনা।

—দূর হাই! প্রদীপ ছেলেমানুষ লজ্জা ভরে বলে—কি যে পাগল হাই-পাল যাকে কথা লিখে মেয়ে তোমার ভালোবেসেই ফিরছে ফিরেছি মেয়েকি।

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়।

ফুলপাতের চলে মোলায়েম পরশের কাঁকে কাঁকে মোলাও হলো মোখাও আর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...পাতের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধ উঁচুতে মুকুলো পাতা পড়িয়ে যাওয়ায়।

আলো কিছু কিছু জ্বলা হয়েছিলো, তখন কম হয়ে গেছে।

নির্বাক দুটি প্রাণী যেন কোন অজানা বন্ধনে বন্দী হয়ে মানুষ মতো একসঙ্গে পাশাপাশি।...

হঠাৎ এক সময় চুপচাপ একটি, প্রদীপ কল্পুরী বলে ওঠে—মেয়েই অভিনয়ের জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু চুপ করে থেকে স্নিগ্ধ স্বরে বলে—বোধ করি আমিন কোনো সন্দেহ তোমার পথকে জটিল করে তুলছে কল্পুরী। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো, আমার পথ হারাবে না। আমার চুপচাপ আছে।

—কই? কোথায়?

একটু, দুর্বল আর কাতরভাবে তোমার কল্পুরীর গলা।

—বন, বলে দেবো হবে কেন? সে হবে নিজের ভিতরে।

উজ্জ্বল দিতে দিতে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে কল্পুরী। সন্ধ্যে বলে—আমার তোমার এখানে আসো ছিলেন?

—আসো মন আছে। মুখেনো পাতা ফেলে ভাত ছাইছে...এটি এটি পাথর মুছেনো তোমে?...কী সর্বনাশ!—হইছে এটি—

পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ছুরী পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কল্পুরী প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দেখতে পাচ্ছো না। ওখানে কি যেন একটা মুখো আমোদার মতো মনে হচ্ছে?

—কী ভয়ানক! ও যে মনিহারীর বৌ! ওই তো পাতা ফেলে ভাত ছাইছে। কিন্তুক মতো বিচ্ছি মোশাকাপড়া পরে আছে মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে আমার তোমার আছে।...এখন মনোলা আমোদার, মুখে মনোলে দেখতা।...ও আমার প্রাণদাতী মা জানো? আমা—এখন পরিচয় করিয়ে দিই, পরে সব বলবো।...ওরে ওই বৌ! এ—মনিহারী বৌ রে—

পরে পরে মুখোমুখি যেন খানিকটা এগিয়ে যেয়ে ভয়ভয়ে।

সাড়া পেয়ে আন্দুলের ভাঙ্গ থেকে উঠে আসে মানুষটা। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথার উত্তর দেয় না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে-থাকা দুটো মানুষের দিকে।...

আলোর সাথি একটুকে পাওলো, মোলায়েম যেন খানিকটা হাত ফেলে দিয়েছে। সেই মৃদু মোলায়েম সাদাসাদাসি স্থির হয়ে থাকে মুখোমুখি চোখ।

মুখে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।... অস্পষ্ট হয়ে যেয়ে নিকষ শাড়ী, এলোমেলো চুল, অলঙ্কারী কল্পুরী আর শান্তিনিকেতনী ঘটনা...অস্পষ্ট হয়ে যেয়ে মৃদু আবছায়ে আলোর গায়ে মেখানো ছিটের চালি, পড়ানো...সেলাই। অস্পষ্ট হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশ।

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মৃদু মুখোমুখি চোখ।

কি আছে সে-চোখে?

প্রভু-পত্নীর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা?

স্বামীর ভালবাসার প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা?

না। সে-চোখে আছে শুধু অবিশ্বাস অসহায় নিস্তব্ধ ভয়, অথবা ভাষা নয় আপনে।...অন্ধকার আলোয়ায় যারা আমাদের না সেই মুখোমুখিনী অবিশ্বাস প্রতিপক্ষদুইজনের চোখে যে-আলো ছিলিক মারতো সেই আলো।

পরিবেশটা সহজীর করে তুলতে প্রদীপ দৃষ্টি বলতে চেষ্টা করে—কি যে ভয়া ভাবিয়ে?' কিন্তু বলা দিয়ে ওর স্বর ফোটে না। কেন এসেছিলো তোমনি ফিরে যায় মনিহারীর বৌ, শুধু অন্ধকারের একটা সেলাম জানিয়ে।

কেবার পরে হলকা হাসির ঝলকানিতে কল্পুরী বলে—ঐ কী ভয়ানক চেহারাটা ওর! কেন ভয়পাইলো! আমিনে তোমার কল্পুরী সঙ্গে ছিলো না! আমলে—ছুরিটা বা কাঁপিয়ে ফেলে পুরো করে বসতাম।

চমকে ওঠে প্রদীপ!...কে বললো ওকে?

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। ও তাই! তাই এই ভালবাসার কল্পুরীর! কিন্তু কেন স্থির ফোটেনো। ঝলসীতেই বলে—হবে ওর ধারণাটা নিতান্তই ভাবা করতে হবে, নইলে আসলে আসার তো ছিলো না কল্পুরী? আদিম পৃথিবী সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে এই সভ্যতার আদিমে এসে পর্যন্ত মানুষের হাতের কাছে পাথরের টুকরোর মোলায়েম ছিলো!...চলতে যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে সে-অস্ত্র কাজ হয় না তা তো নয়?

আশাপূর্ণা দেবী

অজিত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আসরে আশাপূর্ণা দেবীর সহজ এবং অবাধ আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালে, — পারুলদি অনুপমবাবুর পরিচয়ে। তারপর এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর ধরে অজস্র গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর অজস্রের আবৃত্তিপথে আমরা হোঁচট খেয়েছি এই দীর্ঘকালে। সংখ্যায় তারা ছিল, পঞ্চাশটি নয়,—অনেক শ। সব গল্পের কথা লেখিকার নিজেরও আজ মনে নেই, এবং অবশ্যই যেখানে কোন একটি গল্পকে হুবহু নিজের মনে চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে হতে পারে। এবং ঠিক সে কারণেই এই অল্প পরিসরে আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সম্ভারের একটি সুষ্ঠুপাঠ আলোচনা এবং তার সঠিক মূল্যায়ন, তাঁর লেখার শৈলীর ও বিষয়-বৈশিষ্ট্যের সমস্ত দিকে আলোকপাত করাও আমাদের পক্ষে এক দুরূহ কাজ। তবে আমরা যে প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প নিয়েই আমাদের আলোচনার পরিসরটিকে সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

নিছক একটি কাহিনী-নির্ভর হলেও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলিকে ছোটোগল্প-আখ্যা দিলেই তাদের সঠিক সংজ্ঞায়না হয়। প্রথম জনে আমরা দুঃখ এবং এ জাতের গল্প-গুলিকে অবশ্যই পারিবার। নিছকই পরিচয়ে আজ একটি বিশেষ অনুভবের চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনুভব-চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টাই এখানে প্রধান। এবং দ্বিতীয় জনের গল্প একটি অনুভূতি বা আবেগকে প্রধান করতে চায়নি। আমাদের গল্প হয়েছে যে কারণে তাদের কাহিনী-নির্ভর হলেও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলি ঘটনাপ্রধান নয়। অর্থাৎ কাহিনীকে অবলম্বন করে গল্প গড়ে উঠলেও কাহিনী যেন কখনো সবার গল্প হয়ে দাঁড়ায় নি। ফলে, এই অনুভূতির আর তাঁর গল্পগুলিকে সার্থক ছোটগল্পে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছে। আর তা না হলে আশা-পূর্ণা দেবীর গল্পগুলি এমন অপরূপ অংশুমালায়, নিসর্গকল্পনায়, রসসঞ্চারে বা জীবনতত্ত্বের উপর বিচিত্র আলোকপাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত না। এছাড়া লেখিকার ক্ষমতার গুণে গল্প, কাহিনীর বৃত্তের সীমা-রেখাকে অতিক্রম করে পরিমণ্ডলে ইঙ্গিত-মূলক হয়েছে। এবং সমাপ্তির কালে দ্রুত এবং আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ফলে গল্পের দুরূহ বিষয়বস্তুটির সৌন্দর্যের প্রকাশকে সম্ভব করেছে।

এই প্রসঙ্গে লেখিকার 'আকাশ-আর্তি' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পের নায়ক সুবিখ্যাত বন্ধুরা ভেলেনদীর অধিবাসীর আকাশী প্রজাপতি হয়।' আকাশ কাছে প্রথম থেকে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল প্রজাপতি। তখন তার বয়স ছেলে-ছোকরার মত। আসতে আসতে প্রজাপতি এসে উঠল আমার উপন্যাসের আকাশ-চারণের বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ এক চা-বাগানে। এখানেই গল্পকারের কাজ হল তার।

গল্পটির পরে আকাশ প্রজাপতি ফিরে এল তার নিজস্ব বাড়ির পরিবেশে। খেওড়া-বনটির বাড়িতে ফিরে সেদিনে এসে দাঁড়াল প্রজাপতি। তাকে দেখে হাই-হাই করে ছেলে উঠল বুড়ি। প্রজাপতি দেখল বুড়ির পরনে ধান বুড়ি, বিছানার সাদা। বুড়ি বুঝেছিল আকাশ-আসনে ফিরে গেল প্রজাপতি। কিন্তু বুড়িকে ভুলল না। মনে মনে পাঠাই করে চিঠা পাঠানোর আকাশ তাকে।

তারপর দিন কেটেছে। প্রজাপতিকে অপেক্ষারী করে ফিরেছে বুড়ি। আকাশ থেকে ঘাসের ফুল, ঘুঙুরে লেজের জন্য পাই-পাই করে অনুভবের জানিয়েছে।

একদিন আকাশে ফেলেই বুড়ির দুঃখ-সংবাদ পেল প্রজাপতি। ইতিমধ্যে বনবিহারে বুড়ি-বয়েক ছেলেবেলেও হয়েছে তার। সাদী সুরবালা ফিরিওয়ালী মেয়ে। প্রজাপতি পাঠাল সামান্য কটি টাকা সম্বল করেই বুড়ি ছেলেকে বাবুদের করেছে সে। তারা চাকরী পেয়েছে। বড় ছেলেটার বিয়েও বিয়েছে সুরবালা।

বছরে দশ দিন ছুটি প্রজাপতি। এক দিনে সে প্রায় প্রৌঢ়। তবু বাড়ি আসার আগে বনটা ঘোরা তার ঘুম হয় না। মাথার চাঁকে হাত বুলোয় প্রজাপতি। আর বুলোয় আশা লোমগুলোয় বাড়ি আসার আগে নবযৌবনের উপাদান অনুভব করে।

আর সত্যিই তো। আসলের চা-বাগানে কি হাল প্রজাপতি। ছেলে ডিগ্রিটা প্রজাপতি একটা ডিগ্রি। ডিগ্রিটের বাবিল আর সম্ভব অধিপতি খেল পাতা। কয়টের সেবাগানের মাঝে সেখানে একটা হাঁড়ি টাঙানো আছে। তাতে চিরজীবনের কাটের আলুমের কালি। দিনান্তের একবার মাত্র, ভাত আর মুরগী একসঙ্গে সেদ্ধ হয় মনে হয়ে আর সবার সবারিহনে। তাকে মাসী ছাইকার বাসির সেদ্ধ বুড়ি খামার। চাকরীজেহাদি, বেমারী আসবাবী বাসির। ওকে মনে মনে কল্পনা করে প্রজাপতি। বুড়ির সময় দুঃখ ঘুরে বেড়ায় মোরগটা। সেদ্ধ মেলে পায় না। খাদ পায় না স্বর্ণসূত্রের। অথচ প্রজাপতি হাতের ঘুরোয় স্বর্ণ আছে।

বছরে দশ দিন সেই স্বর্ণের সিংহাসনে বসে প্রজাপতি। বউ সুরবালা যত বয়স, ছেলে-মেয়ের আত্মীয়ের বাবুদের মত চারপাশে ঘুর-ঘুর করে। আর খেয়ে বসে সারা প্রজাপতি বন বিহঙ্গের হাসি হাসে।

হঠাৎই অন্যরকম উঠল। কেন বিহঙ্গিনির আকাশে পাড়ে আছে- প্রজাপতি? ছেলের

...হয়েছে, মেয়েদের বিয়েও হল। তাহলে কেন মুহূর্ত মুহূর্ত বিদেশে কাটাচ্ছেন। কথাটা মনের মধ্যেকার মত লাগল একটার কানে। স্বর্গ হতে বিদায় মেওয়ার ' হয়েছেন নেই? কথাটা এতদিন কেন তাকে দি মনেনী। তারপর আকাশের সূর্যের একটি মেঘোজি ও মুহূর্তের সাথি করেছেন দেখিনা। 'তুমি নিশ্চয়ই—সাদা-কোটা মিউটিন ফুলের গন্ধ টেনে কেন দিব-বিদেশ ঘুরছে। উঠোনের দিব গাছটার পাতা বাতাসে বিভিন্ন করছে। সাওয়ার ঘরের মুক্ত পরিবেশ হালকা জোৎস্না একটি আলোর রেখা টেনে দিয়েছে, আর এই আকাশ-বাতাস, গাছ, ভাঁটি ফল ঘরের দেওয়ালগুলোর পর্যন্ত কেন একটি মোহময় স্নেহজাল বিস্তার করে অবর্ণীয় মিলনি জানাচ্ছে,—জানো, ঘরের?

মত ছেলেও বলল,—আমারও ঠিক করেছি, আমাকে আর ছাড়া হবে না।' তাই মনেনী এর পরবর্তীলাপত্র সই করল। ছেলেকে বিল সেটি পেলেই করতে।

কল্প যদি এখানেই শেষ হত তাহলে তাকে নিছক একটি মুহূর্তের ঘ আকাশ-মুকুলে সমাপ্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। কিন্তু আনন্দময়ী দেবীর কল্প এখানেই শেষ নয়। শেষ হয়েও তা শেষ হয় নি। সমাপ্ত হলেও তার সুর সমাপ্তির ওপরও রেখে। এবং কল্প ধীরে ধীরে কিভাবে বাস্তবায়ন হল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এর পরেই। কল্প তথায় তা হল,—

সকালের দিকে চিত্রিতদার সেই অপরিচিত মহিলা। বিকেলের দিকে সে ঘরে অস্থির হয়ে উঠল। একবার সে মুহূর্ত ভেবেছে। চিত্রিতদা কোথায় পৌঁছে করবে ফোন্। যদি না পৌঁছায়! ফোনপাশী কি ভাববে তার সম্বন্ধে? এবং হঠাৎই তার সম্বন্ধে ফোনা করল মহিলা। এখনই সে আসতে বলে।

ঘাওয়া-দাওয়া ফেলে প্রায়-পাগলের মত ছুটলেন মহিলা। ট্রেনে চেপে সে দুটির নিয়ন্ত্রণে ফেলল। আর এখনই, মুহূর্তেই মহিলাটির ফোনা বাসিয়ে ফেলেছিল সবাই। তল সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত আনন্দময়ীর মাতৃত্বের সেই মহানের আর ফেলবিন ফেতে পেত না মহিলা। একটা আহারের মত সে নিশ্চিন্ত এখন।

সৌখিনের আর একটি সার্থক মো-কল্প 'মুক্ত'। কাহিনী-আরম্ভী হলেও কল্পটিতে একটি অনুভূতি বা আবেগ সুন্দরভাবে ফুটেছে। ফ্রেডারিকের বন্ধু হরিনারায়ণের বাড়িতে এসেছিলেন শিবানন্দ। স্কুল-মাস্টারী করেও যেন সুন্দর বাড়িতে ফ্রেডারিক হরিনারায়ণ। ফোনাফোনা বাড়ি, গাড়ি, ফ্যান, এমন কি বাথরুম পর্যন্ত ফ্রেডারিক হরিনারায়ণ। তার মুক্তের প্রত্যেকটি ফোনা আকাঙ্ক্ষাকে কেন পরিতৃপ্তির হাসি।

আর শিবানন্দ! পড়াশুনার বিরোই এর তিন ডাক্তারি এসেও মুক্ত। জীবন-কর মুক্ত বই বিদেশেন তিনি। অনেকের আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষা। তি-তিন ফ্রেডারিক। কিন্তু তবুও শৈশবের এক টুকরো আকাশ আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন নি।

মুক্তদের বাওয়া-দাওয়া ফেলে বিদেশের দিকে নিজের বাড়ির পথ ধরলেন শিবানন্দ। বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীরা দারুণ, তারা তাঁর একটি যদি পরিবর্তে বিদেশের তাঁর হাতে। ধনাঢ্যবাড়ুলা বাড়িতে স্থায়ী সদস্য দেখা হতেই তা নিয়ে একটি ভাবিত্ব কল্পনা শিবানন্দকে বিচলিত হতে করতে হল।

এর পরই আসে সেই অনুভূতি যা জীবনদর্শনকে উপলব্ধির আবেদন সৌখিনা। সহজেকে তা এইভাবে তার মেতে পারে।...আকেলাতেও মুক্ত আসে নি শিবানন্দের চোখে। আশ্চর্য! নিজেকে সকল দিব দেশ তাঁর পরাজিত সৈনিকের মত মনে হচ্ছে? ইতিহাসকে কি দেখে মত মুক্ত করেছিলেন তিনি? তাদের মুক্তে আকাঙ্ক্ষাই বন্ধুর মোহাসের মোহাসের শিরোপা পরে কাজলা মোহমুক্তোর হারাই যার যার তাঁর চোখের সামনে ভেসে এল। এই হারাই আসে-পাশে তাঁর হাতেই ভেসে হাত মহিলাই পর্যন্ত ভেসে আশির ওরা মুক্তের। এবং এই মুহূর্তে তাঁর কাছে সকল আপাতদৃষ্টিই খুব তুচ্ছ মনে হল।

কিন্তু কল্প এখানেই শেষ নয়। এর পরও আছে কিন্তু বাকী।...ধীরে ধীরে একজনা মই মেয়ে ঘরে আসার মতামত নিয়ে এলেন শিবানন্দ। স্ত্রী যে মেয়েদের মুক্তের আকাঙ্ক্ষা তা ধরিয়ে। ছেলেদের মত মনের শান্তিতে থাকা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি। রাত্রা ভেঙে এসে-পড়া আলোর শিবানন্দ পড়তে আরম্ভ করলেন।

কল্পের মুহূর্তেই খুব সুন্দর একটা প্রতীক ব্যবহার করেছেন সৌখিনা। বন্ধু হরিনারায়ণের ঘরে ঢোকে দেখে সকলে মুখ ঘা শিবিরে এসেছিলেন শিবানন্দ। ঢোকে। এই বিদেশযাত্রার ঔষধিই বিরোই কল্পের মুক্ত। মুক্তিকার প্রতীক এই ঢোকের চার পাশেই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর বৈদেশিক জীবনের প্রসার। এবং এই মুক্তে শিবানন্দের অসার অপরিচয়। শিবানন্দ যাদ করেন তার নিজের মুক্তে,—যেখানে রাস্তার আলোর মতই তার পড়াশুনো ছেল। কল্পটির মাধ্যমেই এখানেই সার্থকতা।

কিন্তু সৌখিনার অন্য কল্পটি সাধারণ কল্পটিতে নারীমনস্তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করা যেন মুক্তের কাজ। প্রত্যেকটি অবস্থান-ঘাসের ভিত্তিতে এই মুক্তাকাঙ্ক্ষা জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচন করতে অবশ্যই সতীনের সম্ভানের সম্পর্কে সীতার মনে একটি পরাজয়ের সীমাহিন অস্থি যেন লুকিয়ে ছিল। তৈরী যোগিন সীতা অভিনয় করে, সৌখিন সীতা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে নি। ছেলেটার খাবারে বিষ মিশিয়েছিল সবশেষে।

সেজন্যে স্বামীর সংসার করতে এসে মুক্তা সতীনের সন্তানকে মেরে ফেল করতে কিন্তু তারা সৌখিনার এক টুকরো আকাশ করতে পারেন নি।

মুক্তদের বাওয়া-দাওয়া ফেলে বিদেশের দিকে নিজের বাড়ির পথ ধরলেন শিবানন্দ। বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীরা দারুণ, তারা তাঁর একটি যদি পরিবর্তে বিদেশের তাঁর হাতে। ধনাঢ্যবাড়ুলা বাড়িতে স্থায়ী সদস্য দেখা হতেই তা নিয়ে একটি ভাবিত্ব কল্পনা শিবানন্দকে বিচলিত হতে করতে হল।

এর পরই আসে সেই অনুভূতি যা জীবনদর্শনকে উপলব্ধির আবেদন সৌখিনা। সহজেকে তা এইভাবে তার মেতে পারে।...আকেলাতেও মুক্ত আসে নি শিবানন্দের চোখে। আশ্চর্য! নিজেকে সকল দিব দেশ তাঁর পরাজিত সৈনিকের মত মনে হচ্ছে? ইতিহাসকে কি দেখে মত মুক্ত করেছিলেন তিনি? তাদের মুক্তে আকাঙ্ক্ষাই বন্ধুর মোহাসের মোহাসের শিরোপা পরে কাজলা মোহমুক্তোর হারাই যার যার তাঁর চোখের সামনে ভেসে এল। এই হারাই আসে-পাশে তাঁর হাতেই ভেসে হাত মহিলাই পর্যন্ত ভেসে আশির ওরা মুক্তের। এবং এই মুহূর্তে তাঁর কাছে সকল আপাতদৃষ্টিই খুব তুচ্ছ মনে হল।

কিন্তু কল্প এখানেই শেষ নয়। এর পরও আছে কিন্তু বাকী।...ধীরে ধীরে একজনা মই মেয়ে ঘরে আসার মতামত নিয়ে এলেন শিবানন্দ। স্ত্রী যে মেয়েদের মুক্তের আকাঙ্ক্ষা তা ধরিয়ে। ছেলেদের মত মনের শান্তিতে থাকা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি। রাত্রা ভেঙে এসে-পড়া আলোর শিবানন্দ পড়তে আরম্ভ করলেন।

কল্পের মুহূর্তেই খুব সুন্দর একটা প্রতীক ব্যবহার করেছেন সৌখিনা। বন্ধু হরিনারায়ণের ঘরে ঢোকে দেখে সকলে মুখ ঘা শিবিরে এসেছিলেন শিবানন্দ। ঢোকে। এই বিদেশযাত্রার ঔষধিই বিরোই কল্পের মুক্ত। মুক্তিকার প্রতীক এই ঢোকের চার পাশেই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর বৈদেশিক জীবনের প্রসার। এবং এই মুক্তে শিবানন্দের অসার অপরিচয়। শিবানন্দ যাদ করেন তার নিজের মুক্তে,—যেখানে রাস্তার আলোর মতই তার পড়াশুনো ছেল। কল্পটির মাধ্যমেই এখানেই সার্থকতা।

কিন্তু সৌখিনার অন্য কল্পটি সাধারণ কল্পটিতে নারীমনস্তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করা যেন মুক্তের কাজ। প্রত্যেকটি অবস্থান-ঘাসের ভিত্তিতে এই মুক্তাকাঙ্ক্ষা জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচন করতে অবশ্যই সতীনের সম্ভানের সম্পর্কে সীতার মনে একটি পরাজয়ের সীমাহিন অস্থি যেন লুকিয়ে ছিল। তৈরী যোগিন সীতা অভিনয় করে, সৌখিন সীতা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে নি। ছেলেটার খাবারে বিষ মিশিয়েছিল সবশেষে।

সেজন্যে স্বামীর সংসার করতে এসে মুক্তা সতীনের সন্তানকে মেরে ফেল করতে কিন্তু তারা সৌখিনার এক টুকরো আকাশ করতে পারেন নি।

উপেন সীতা। বিকৃতমস্তিষ্ক আবাসমর্পিত একটি ফল ছেলে। কল্প ছেলে একটা আকাঙ্ক্ষিত নিবন্ধ অবে ছেলেটা। ফোনাফোনা মুক্তের-ফেরাদের মত ভাবাবেগীন আচরণের। স্বামীর উপেন প্রতিযোগে নিজে ফেলার পাশে নিজের মোনার আকাশ করল সীতা। উপেন নিশ্চিন্ত মুক্তো আকাঙ্ক্ষাকে সাপাটে অবে প্রশ্ন করল,—আমার ফিনে-ফেলাটার কি হবে?

কিন্তু সীতা আগের মত নয়। নিশ্চিন্তের কথায় সে কথা দেবে না। সকলকে আর ফেলেটা ফিনকার করে। আজ ফেলেই হাত, পা আর সাঁতের কথেক আকাঙ্ক্ষায় ফিনকার করে সীতাকে। বন্ধু সব সজা অবে সীতা। সাঁতের সাঁত চিনে আসে, আমার হয়েছে একদিন মুক্ত হবি পুরী, এ আমি ফিনকারে দেখাই পারি।

আকুল আনন্দার নিশ্চিন্ত অপরিচিত। ফিন-রাত্রি সীতার সকল তার কথায়। কিন্তু সীতা আনন্দময়ী। নিশ্চিন্তের কথায় সে কথা দেবে না। ফিনুতেই না।

আকাশের সেই অনাবিল পূর্ণিমা-রাত্রি। ফেলের পাশের ঠোলা ফেলে পড়ে নিয়েছিল সীতা। কলাল ফেটে গড়। আর সৌখিনী আকাশের ফিকে ফিনে কি যে কথন সীতা। পর ফিনে সকলকে নিশ্চিন্ত ফেলল ফেলেটা মরে কর্তা হয়ে কথেছে। আকাশ অপরিচিত, আকাশবাণি পূর্ণের সীতার ঠোটে নিশ্চিন্ত হাসি। স্থির কলায় সে মুক্ত আকাশে,—আকাশটার কি আছে? দুটি আকাশে পূর্ণের কাটাটা কে না সরাতে চায়?...'

আনন্দময়ী দেবীর কল্প সৃষ্টি হয়েছে সকলের দৈনন্দিন জীবনের মুক্তকে কাটাকে ফেলে অবে। পরিবর্তনে তা এক মর্মস্পর্শী ফ্রেডারিক ফিনা আকে আকাশ-বাতাসের ইঙ্গিত। কাটার কাহিনীটি ফিনকার, আকাশের আকাশ জটিল ফিনে-ফিনেকার এবং ফিনকুত চরিত্র বর্ণনা তার কল্পগুলিকে এক আকর্ষণ বাহিরার উজ্জ্বলে করে তোলেছে। কল্পগুলি আকাশ হয়েও তার ফ্রেডারিকে এক মুক্তের সতোর প্রতিফলন।

আনন্দময়ী দেবীর কল্প পড়ে একটি সুন্দর উপমার কথা মনে আসে। তাঁর কল্পগুলি ছাড়া-ডানা পাখি বা নিমন্ত্রণের মত। আকাশকে যদি কাহিনী বলে কল্পনা করা যায় তবে প্রথমেই মনটি তাঁর আকাশ ফিনকার। কিন্তু নিজের মনোবৃত্তি যেমন বাসা ছাড়িয়ে উড়ে-মুক্তে আকাশ, তেমনি তাঁর কল্পও কাহিনীর আকাশ ভাঙে পরিণতিতে বাস-মাসুরী এবং ইঙ্গিত-মুক্তক হয়ে ওঠে।

আর তাই কল্প শেষ হবার পরই মনে হয় তাঁর নিমন্ত্রণের আকাশও।

প্রাগৈতিহাসিক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] পড়িয়াছিল। অনেক মাসের প্রবল বাদল-বৃষ্টির পৌনঃপুন্যে মহাদেব পর্বতের অধিকাংশ মাটি ধুইয়া গিয়া বড় বড় পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে ওখানে দেখা যাইতেছিল কিন্তুত-কিমাকার বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড। তাহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ঝরনার জল জমিয়া ছোট ছোট পুষ্করিণী সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর নিকট দেখিলে মনে হয় যেন কোনও অতিকায় দানবের পায়ের ছাপ। ঝরনার জল ছাড়া আর কোথাও জল নাই। সমস্ত পর্বতটা রুক্ষ ও শুষ্ক। কোথাও একটু ঘাস পর্যন্ত নাই। কেবল পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটাগাছের ঝোপ। সেই ঝোপের মধ্যে বাস করে বন্য জন্তু। তাহারা ছাড়া আর কোনও প্রাণী এখানে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ঝরনার ধারে বসিয়া ছিল কিন্তু। তাহার বয়স বারো বছর। সে একাকী বসিয়া ঝরনার জল পান করিতেছিল। তাহার পিছনে একটা বড় পাথরের আড়ালে ছিল তাহার বাবা কিন্তুত। কিন্তুত তীর-ধনুক লইয়া শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। ঝরনার ধারে আসিয়া সে দেখিল, কিন্তু একাকী বসিয়া আছে। তখন সে তাহাকে ডাকিল না। নিঃশব্দে পাথরের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ঝরনার জল পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে ঝরনার ধারে ধারে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। কিন্তুত তাহাকে অনুসরণ করিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না যে, তাহার বাবা তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

কিন্তু ঝরনার উৎসের কাছে আসিয়া থামিল। সেখানে একটা বড় পাথরের চাঁই ঝরনার জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই পাথরের উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পর ঝরনার জলে পা দুলাইতে দুলাইতে সে গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিল। কিন্তুত তাহার গান শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল, কিন্তু গান গাহিতেছে।

কিন্তুত ভাবিল, কিন্তু বড় হইয়াছে, উহার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কিন্তুত কাহাকে বিবাহ করিবে? এই পর্বতে তো আর কোনও মানুষ নাই। তবে কি কিন্তু—

কিন্তুত আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতর রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সে ঝরনার ধার হইতে একটা বড় পাথর তুলিয়া লইয়া কিন্তুর মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

কিন্তু ঝরনার জলে পা দুলাইতে দুলাইতে গান গাহিতেছিল, হঠাৎ তাহার মাথায় পাথর পড়িল। সে ঝরনার জলে পড়িয়া গেল। তাহার পর তাহার দেহ ঝরনার জলে ভাসিতে ভাসিতে নীচে নামিয়া গেল।

কিন্তুত তখন ঝরনার ধার হইতে নামিয়া আসিয়া কিন্তুর মৃতদেহ তীরে তুলিল। তাহার পর তাহাকে কাঁধে লইয়া পর্বতের অন্য দিকে নামিয়া গেল।

কিন্তুত যে দিকে নামিয়া গেল সে দিকে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু ও সাপের উপদ্রব সাহিয়া সেদিকে কেহ যাইত না। সেখানে একটি ফাঁকা জায়গা দেখিয়া কিন্তুত কিন্তুর মৃতদেহ নামাইয়া রাখিল ও মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে কিন্তু খুঁড়িবার একখানা কোদাল তৈয়ারি করিয়া লইল। খুঁড়িতে সময় লাগিল। কিন্তুত সে তিতিক্ষা দেখাইল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া সে একমনে খুঁড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কিন্তুর মৃতদেহ সে যেখানে শোয়াইয়াছিল, তাহার পাশে একটি গর্ত তৈয়ারি হইয়া গেল। তখন কিন্তুত কিন্তুর মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া সেই গর্তে শোয়াইয়া দিল। তাহার পর মাটি দিয়া গর্ত ভরাট করিয়া দিল। তাহার উপরে অনেকগুলি বড় বড় পাথর চাপা দিয়া কবরটিকে সুরক্ষিত করিল।

কবরের কাজ শেষ করিয়া কিন্তুত ঝরনার ধারে ফিরিয়া আসিল। সেখানে বসিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তাহার পর ঝরনার জলে স্নান করিয়া সে গুহায় ফিরিয়া আসিল।

গুহায় ফিরিয়া কিন্তুত দেখিল, কিন্তু নাই। তাহার মনে হইল, কিন্তু বোধ হয় ভয় পাইয়া পালাইয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া আসিবে। কিন্তুত কিন্তুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু ফিরিল না। কিন্তুত তখন কিন্তুর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তুর সন্ধান সে পাইল না। কিন্তু কিন্তুত ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কিন্তু গুহায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তুত কিন্তুকে কিছু বলিল না। কিন্তু কিন্তুর সঙ্গে কথা বলিতে চাহিল না। কিন্তু কিন্তুত কিন্তুর সঙ্গে কথা বলিতে চাহিল না।

কিন্তু কিন্তুত

নাড়িল। ভিখুর জন্য একখানি ছাত ও কয়েকটা পুঁটলি বাঁধা ছাড়া আর পুঁইলাড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলো সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার জোয়াই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মই-এ সোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপর খড় বিছাইয়া নরম করিয়া তাহাকে সোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি করে প্রাণ ভিখুর সে দুঃখ এই আরামটুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক ফোঁটা ঔষধ বিনা খাওয়াই একমাস দুঃখের অবস্থায় কাটাইয়া সে ঘরে ফিরে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটি সে মাটিতে পাতিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকু তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

ঘরের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মরে মরো বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

সেদ্রাম সে সময়ে বাড়ি ছিল না। ভরতের সঙ্গে তাড়ি খাইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেদ্রামের বোন গিয়া ছিল ঘাটে। সেদ্রামের বৌ ছেলেকে ঘুম পোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটি হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু সেদ্রামের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। সেদ্রাম বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় সেদ্রামের মনে হইল, এমন বেয়াদবীর জন্য ভিখুকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা কষাইয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়াও নেশার ঝোঁকে ভিখু ঠিক পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে, অবস্থা যত কঠিন করিয়াই তোক, সত্যই একেবারেই নয়। ভিখু তাহার বাঁধানো মাটি খাঁড়াতে খন করিয়া বসাইয়া রাখিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে ভিখু সম্পর্কে কথার আদান-প্রদান হইয়া গেল।

শেষে সেদ্রাম বলিল, 'তোর জইন্যে আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, নিয়া যাইরে আমার বাড়ির মেইক্ষে,—হুঁয়ে হুঁ।

ভিখু বলিল, 'আমার তোমাকে একটা মাত্র বাইশা মারিয়াছিলাম, তুই দুটা মারলদ্। আমে আমার মাত্র মিলাইয়া দে, তবে মাত্।'

তোর মাত্রর খবর জানে কেডা রে?'

'মাত্ রে আইলম, সেদ্রাম, ভাল চালেত। মাত্ না দিলে মা বাড়ির ভেতো-ভাতার মতো পলায়া তোর এখখান কোৎ-ই দুকান করিয়া ফেলদ্। এই তরে আমি কয় রাখলদ্। মাত্ পাবি' আমি অখনি মাত্ দিয়া।' কিন্তু মাত্ ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কাবু করিয়া ফেলিল। সেদ্রামের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিতে উঠিতে পারিল না। সেদ্রাম ও তাহার জোয়াই তাহাকে মাটিতে মাটিতে জখম করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর লুকাইয়া আনা যা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু খুনের মতো সেদ্রামের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাকী সমস্ত বিষয় ছৈ ঠে ছাইয়া দিল।

সেদ্রাম কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ! ঘরকে আমার পাঁয় জ্বালাইলো কেডা। হায় সর্বনাশ।'

কিন্তু পুলিসের ঠেলাঠেলির ভয়ে মুখে ফোস্কা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। ভিজেলপুরের পাশে একটা নদী আছে। সেদ্রামের ঘর জ্বালাইয়া দিয়া আসিয়া একটি ছেলে ভিক্ষা চুরি করিয়া ভিখু নদীর ছোকে ভাসিয়া গিয়াছিল। লাশ ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। একটি চাপা বাঁশকে হাতের মতো করিয়া বহিয়া আনিয়া সে সমস্ত রাত ফোনরকমে লোকের ঘুম সিয়া রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু ছোকের টানে সে বেশীদূর আসাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে জ্বালাইয়া দেওয়ার শোধ লইতে সেদ্রাম হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, ঘরের জ্বালানোর নিজের অপরাধের কথাটা ভাবিবে না। পুলিস বহুদিন ধরিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, বৈষ্ণব সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সেদ্রামের কাছে খবর পাইলে পুলিস আসে-পাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ মিল মইলেট মতো লোকের মুখে মুখে সেখানেও তাহার নামে 'খুনের কথা। কিন্তু ভিখু উধাও হইয়া গিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন ছোকরা জানুষের আগে ফেলে আসা খাইয়া একদল দুর্বল পরাণীকে তাহার কাবায় আকৃষ্ট হইয়া আসে। ছোট ছোট মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছাইয়া সে ঘাটে ছোকা নামাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। অভ্যাস মোতে সে অবচেতন সোঁকরেছিল। একটি পয়সাও তার সঙ্গে নাই যে সে মুড়ি কিনিয়া খায়? বাজারের রাস্তার দুধারে যে লোকের সঙ্গে দেখা হইল তাহাদেই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, দুটো পয়সা দিবান কর্তা।'

তাহার মাথায় জটাবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধুসর চুল, চোখের উজ্জ্বলতা মাটির প্রতি ধূলায় ছোপ্ড়া নয়নজুড়া আর দাঁড়ির জঙ্গলে লাল লোলুপমান হাতটি দেখিয়া অনেকের দৃষ্টি ফিরাই লইল। কেহ কেহ তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—'একটি পয়সা দিলেন মাত্? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—'একটা দিলাম, তাতে হল না—জ্বালা।'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটি গাল দিয়াই বসে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরও চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া চাহিয়া সামনের মুড়ি-মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েকদিনের ভিতরেই সে পূর্ববর্তী বন্ধু পুরাতন অবস্থাটার এই প্রকাশ্য বিদ্রূপের আইন-কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেষ্টনের তলানী ও জমা তাহার জন্য ভিক্ষারীর মতো আহার হইয়া গেল। পরদিন এমন সে এক্ষেত্রেই সাজ করে না, মাথার চুল তাহার আগের মতো জটা বাঁধিয়া গলা গলা হইয়া ঘাড়ে এবং তাহাতে অনেকদূরের উপ-পল্লিবের দিনের পর দিন যত্নবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু অনে অনে ধরণের মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু মাথার চুল আটকা ফেলিলে তখনো পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটা ছেড়া ন্যাকড়া খোঁজ পাইয়াছে, কাঁধের কত ভিজেটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যে মানুষ খুজোটার সময়ও কোঁচটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তার ঝুলানোর সময়ের জোরাল বিজ্ঞাপন। এই অবস্থাটি লক্ষিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোঁচার তলদিকের হাতটি তাই সে কখনোর কাছ হইতে ছিঁড়িয়া দান নিয়েছে। একটি ভিজের মগ ও লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সন্ধান হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের আশে-পাশের রাস্তায় রাস্তায় একটী ফেরিওয়ালা সাহেব ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে। সকালে এক পয়সায় দুটি পাইয়া খেলে, দুপুরে বাজারের খালিক অফিসে একটী সেলুন বসিলেই সেখানে দুটিকার কাঁচিহাতে নাপিত উহাদের উদ্দেশে হেঁকে হাঁকিয়া তাদের ডাকা করে, আপিস বাজারের সেরেস্তাদার প্রভৃতি সেলুনে ঢুকে, সেরেস্তাদার ঢুকে। সেই ফাঁকিয়া পাইয়া যে যাহারেই সেখানে বিনা পয়সায় আয়নায় সিঁথি কাটে।

সায়াহ্নে দিবা শ্যাম ঠেলা' শ্যাম ঠেলা' ফেরিওয়ালার সঙ্গে সে বাহির হয়। সেই যখন একটী পয়সা। আমার দিনে তখনকার দিনের। সেই যখন একটী পয়সা—'

অনেক প্রাচীন বৃদ্ধিমান'দের 'ফিকিরাং ঠেস ঠিকে' সোনালী অক্ষরে আছে। সাত দিনে কিন্তু সমস্ত দিনা হাজার সেই হাজার সেরে বাড়ানো হয়ে।

এখন অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক বৃ-বীর জনে সন্ধ্যা হইয়া উঠিয়াছে। অনেক কলেজই কিন্তু বাসিক বাড়ি পয়সার আয় চালাই কিন্তু বাসিক আই আনার ভাড়া করিয়াছে। তাহা সে অবশ্যই বৃদ্ধির বহরে। বাসাবাড়ির বৃদ্ধ এক অতি ফাঁপা কিন্তু পুরা একটী ফাঁকা সে সন্ধান করিয়াছে। সেলেন বাড়ির ঘরের আশা হইয়া চুরি করিয়া ছাদে বড় বিছানাটা অন্ধকার উপর ফাঁকাটী পাতিয়া আসর করিয়া সে ঘুমায়। রাতে রাতে অন্ধকার বাড়িতে কিসের কাঁচকে কিন্তু সে অনেকক্ষণের জোর কাপড় পাইয়াছে। তাই পড়ুটীল ফাঁকির বাসিন্দের মত তাহারা ভয়ে। তাহা অনেক জনেরা আরামে পাঁচ করিতে থাকিলে পড়ুটীরা পুলিসরা একটী কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

দুপুরে বাড়িয়া এক দেড়ী ফাঁকির আইয়া কিন্তু'বিনের আসে কিন্তুর ঘেরে পুরোর আশা কিনিয়া আনিল। তাহার রাতি পুলিস উঠিয়া চেহারাটি অন্ধ সকালের হাতের ও পিঠের মাংসপেশী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অন্ধকার বাড়ির উপরওয়ালা ছাদে এসে তাহার ঘেরের উপরে অনেকক্ষণ হইয়া পড়িল। আরাম পুলি আসিয়াছে অনেক-ক্ষণই সে এখনো কিনে চায়, কিন্তু কিনে যে পয়সায় তাহার ঘেরের সীমা আসে না। পরে সেখানে না বাড়িলে তাহার রাতি উপরাদির পরিবর্তে সে অপরাধ খাস কিন্তু আসে। এক পয়সার কিনিলে 'আপিস বাবু'রা পয়সার সেরেস্তাদারে বাড়িতে ছোট। অনেক আসে ঘেরেরা স্নান করিতে নাপিতে কিনে চাহিলে হলে আসার আসে কিন্তু পড়িয়া। ঘেরেরা তার পয়সায় খুশী হয় এবং সাঁজের অনেক বাসিন্দে আসে না, বাঁধ বাঁধিয়া করিয়া দুর্দিনীয় হাসি হাসে।

আসে সন্ধ্যার সময়ে সে ছাদেরই আসে। আই-এস-বাবু এই মিনুদের জনিয়া আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উপর আসে-আসে অনিবার্য আর তাহার মন হাহাকার করে।

আজিও সোকালে আসে আসে আসি কিনিয়া সে হয়া করিল, টাকিয়ে টাকিয়ে বাসির আসে নিয়া উপরে আসি বাসন করিল, তার মাঝে মাঝে সব বাসিয়া অনেক আসে দুপুরের বাড়ি ছোট হইয়া সকলকে বাসিয়া কাসিয়া টাকা ও পয়সা দুটিয়া আসাআসি উপর হইয়া যাইত। অনেক ঘেরের সামনে আনাইকে বসিয়া বসিলে তাহার মুখে যে অন্তর্দাহের ভাব দেখা দিত, পুরোর অন্ধ হইতে কিনিবি কিনে অন্ধ দুটিতেও যা ঘেরের করিয়া আসিয়াছে করিয়া উঠিত, অনেকের আসিবার সে দৃশ্য দেখে আর সেই আসিবার পোষার ঘেরে উপরাবলাকে দেখা অনেকে আর কি আসে? পুলিসের ভয়ে রাত হইতে রাতেরবেলা পলাইয়া বেড়াইয়া আর আসে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী কিন্ত। তাহার অনেক আসেরেই আর আর বসা পাইয়া ঘেরে আসিয়াছে। কিন্তু অনিবার একবারের বেশী পুলিস তাহার সমান পড়ে নাই। অন্ধ বাসনীর সঙ্গে পরমানন্দ শ্রীশাই 'অন্ধকারের ঘোলাইয়ে ঘেরের সে চুরি করিয়াছিল সেইবার। সাত বছরের জন্য তাহার জেলে হইয়াছিল। কিন্তু দু বছরের বেশী কেহ তাহাকে ঘেরে আই-কাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক অনিল সন্ধ্যার ঘেরের প্রকাশ কিনাইয়া সে পালাইয়াছিল। তারপর এখন সে পুরোন-বাড়িতে অনেক বেশী কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুরুষ আসে একাকিনী পুরোন অন্ধ অন্ধ চাপিয়া অনেক যায়, রাতের বেলা পুলিস পাইয়াছে। অন্ধের ঘোষে অনেক নিজ মোসাহেবি হইয়া সন্ধ্যে কিনাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাজিরায়। তখন পরে অন্ধের ঘোষে হাজিরায় ঘেরিয়া আসার পর সে কিনবার কিনেই বল করিয়া দুরে দুরে তার তাদের সেবাদাসি করিয়া ঘেরেদী-ভাবে তাহার সেবাদাসির নাম এখন তাহার সমান নাই। তাহারা এই সেদিন ঠৈতুণ্ড সমাজে ঘের তাহাদের পলায়ে সে দাসের এক ঘেরেকে বৃদ্ধাবি করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি কারিল তাহার কিন্ত, এখন কি হইয়াছে!

তাহার দুরে করিতে যাহার তাল লাগিত সে আর কিনা আ কিন্ত চাঁদিয়া ঘেরে পরমানন্দকে একটু চিকিৎসারী ঘেরেদের মতে অনের অনেক সৈয়দের করে। ঘেরের পরি এখনো ঘেরেদি অন্ধের আসে। সে পরি তাহার করিবার উপরাদি তাহার নাই। কত পরীর তার সমাজে টৈতন্য ঘোর সমাজেরা এক পরিয়া ঘোষেরী 'হুমায় কিন্তন। কিনেরদের কত পুরুষের পুরে ঘেরের যাহে এখন। এদিকে, বাজারের একটী অন্ধ হাতে তাদের সমাজে দুর্বাদি কিন্ত পাড়িয়া একদিনে অন্ধকারের হুকার পরিবারে কিন্তু বাসির চালাইয়া নিয়ে সে চুপচাপ পড়িয়া যাহে। তাদেরকে অন্ধকারে হাত দুলাইয়া কিন্তুর আসেপাসের সীমা যাহে না। সমস্তে সমস্যা বাঁধে দুর্বাদ সমাজীর অন্ধ-কারে একজন দুরের পরী আর এখন একটী ঘোমাসা পরীর কিন্ত পুরে একটী হাতের আড়ালে সে যে বাঁধিয়া যাহে। এখন কলাপ্ত আসুরের দুর?

কিন্তু এ দুর্ঘটনা সে সহ্য করিতে পারে। আসুরেরেই নিবৃত্তি। এখন কিন্তু আর আসিতে পারে না।

বাজারে দুটিকার মুখেই একটি কিন্ত-কিনী কিনা করিতে বসে। বয়স আহার বেশী নয়, ঘেরের বাঁধুনিও আছে। কিন্তু একটী পায়ের হাঁটুর নিচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার বক্ষকে টৈতন্য যা।

এই আসের ঘোরে সে কিন্তুর ঘেরে বেশী ঘোরাফেরা করে। সে কথা বাসিকে সে কিনের মতন সাজিতে দেয় না।

কিন্তু অনে অনে তাহার কাছে গিয়া বসে। বলে, 'বাসি সাজবে না, নয়?'

কিনাসিনী বলে 'পরে! অন্ধে নিজে আসি নয়।'

কিন্তু সাজে বলে 'সাজা তবে, অন্ধে নিজে ঘোরাসিনী সাজাইয়া ন। আসি সাজ্‌লে ঘেরে আর কিন্তু বাসিয়ে আইবো না, —আসিস? আসি ঘোরে সাজ্‌বে।'

'আসি আবার ঘো।'

'আজ্‌? আবার না আজ? আজ্‌কে, পরশু, আমাকে সাজ্‌বে, পরশে পরশি পাসি দিয়া বসি হইয়া আইয়া আবার। না আজ্‌ দুই কিনের ঘেরে?'

আর সন্ধ্যে ঘুনিবার ঘেরে কিনাসিনী নয়। বাসিন্দী তাহাকথাটা শুনে পড়িয়া সে বলে, 'পুনির যাবে দুই ঘোরে বসে ঘোরাইয়া দিবি, আসি দুই তখন পরশু ঘোরাবে?'

কিন্তু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা অন্ধে, সুখে স্বাস্থ্যের ঘোর ঘেরার। 'কন্তু কিনাসিনী ঘেরেরেই আসী হয় না। কিন্তু কন্তু মনে কিনিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নবীনে ঘোরের আসা বয়, পরিসের আকাশে বায়ু-সন্ধ্যে আকাশের ঘেরা যায়। কিন্তুর চালার পাশে আকাশাকাশে চাঁপা-কলার কাঁদি শেষ হয়ে আসে। কিন্তু আসি কলা কিনিয়া পরশার ঘোষে দুপুর সোই কিনিয়া ঘেরে। তাহার অনের অনো ঘেরা অনেই ঘোরাঘো ও অন্ধই হইল ওঠে। কিন্তুর ঘেরের উত্তাপে অন্ধ উঠিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না!

একদিন সকালে উঠিয়াই সে কিন্ত-কিনীর আসে যায়। বলে, 'আইয়া ন, আ সাজাই তন্ত্‌।'

কিনাসিনী বলে—আসে আইবার পর নাই? আ, আজ এত কিনে, আসার অনের হাসি আ কিনা।'

'আজ? আসি আজকের আসাকা কি?'

'তোর সাইয়া হাসি আইয়া আসা আসি আসবে, দুই, আই? আসি তো উহার সঙ্গে যাইবি।'

ওদিকে তাকাইয়া হিন্দু দেখিতে পায় তাহারই বন্ধু জোয়ান মাঝিগুলা এক জন হিন্দুস্থানী খালাসিকে হুকাতে আসন করিয়াছে। তাহার জাম রাঙটার মতো ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে। বিদেশ বন্দরে এই অংশটুকু সাহসে মেলিয়া ধরিয়া সে আজার নামে সকলের বন্ধু প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে তাহার একটা ক্রাচিস পা।

হিন্দুস্থানিনী আবার বলিল, 'মরদ্ হে? যা, পলাইয়া যা, হেথাকি খুন করিয়া ফেলাইবো। ফাঁসি যাবার।'

হিন্দু বলে, 'আরে মেগী, খুন আমরা নয় হালাই করেছে। উহার মতো বদমাশ লাইন-মেরে আমি একা বারোজন ফাঁসিয়া দিবার পারতাম, তা জানস্?'

হিন্দুস্থানিনী বলে—'পারস্ তো হামা, উহার সাথে লাশ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উহারে তুই রাখতম মে। আমার কাছে চ।'

ইরে সোনা! তোমুকে খাবা? যা সেইকা পিয়াইছিলি। তোর মরদ আর খাতির কিরে মালার পুত্ত? উহারে রাখতুম কোন? উহার মতো কামান তুই? তর কাছে তোর? ভাবিব তো ভাল, নাইলে গলা কাইলাম।'

'হিন্দু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। হিন্দুস্থানীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটা কিরম?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এত ভাব পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

হিন্দুস্থানিনী কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসে। 'তের লালতে আইয়স্? যেই ও বুড়ীর কাছে যা।' হিন্দু তাহার কাছে ঘেঁষে হইয়া বসে। পরসার বদলে তাহাকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা বুলির মতো ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মটরদানা কলা বাহির করিয়া হিন্দুস্থানীর সামনে ধরিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

হিন্দুস্থানী উৎকণ্ঠায় খোলা ছাড়াইয়া ফেলিয়াছে, কলা আস্বাদন করে। খুশী হইয়া বলে 'মিঠা হুয়েসে চাস? পাচী কল আরে, —পাচী। তুই কলা দিয়াছস নাথ কইলাম, এ্যাতে রাগ।'

হিন্দু উৎসাহ লাভ করে না। অনেক একটা কলা দিয়া খুব শস্তা দরে খুশী হওয়ার মতো মেয়েমানুষ সে নয়। বন্দরের পাশে খুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের ভাষা বুঝিতে না পেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরে যেন গাল দিতেছে। পাচীর সর্দারীর নাম বলিয়া তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল—'ইদিকে খুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হুইছে! লাগির এক-ধাক্কে শিরাটি ছাড়া দিবে।'

খুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। হিন্দুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে লম্বা একটা পুরুষ বাঁশের মারামারিটা আর হইল না।

মিস্ত্রের ছোকরা সাগ্রেদ তলায় ঢুকিয়া যাওয়ায় আগে হিন্দু বলিল যা, তোর হিসাব অরতোঁছি।'

বসির বলিল,—'তের উপর সাথে বাতচিত করলি আরে যাইয়া হিন্দু আসোয়ার কিরে।'

এই সময় হিন্দুর উপলব্ধি করিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে তিলার্ধকাল পথিকদের মতো তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। হিন্দুকে একবার যাহারা একটি পয়সা ভিক্ষা দিয়াছে পুনরায় তাহাদেরই কাছ ভিক্ষার প্রয়োজন তাহাকে অনেকেই বোধ করে না। সকলের ভিক্ষারীর স্বভাব নাই।

কোমরবন্ধে হিন্দুর সেই থলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সা সে বাড়াইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নিচে থাকা কষ্টকর হইবে। সেখানে লোক আসিবামাত্র ঘেরা বেঞ্চের ভেতর বসে একখানা আড়ার চাই। মাথা গুজিবার একটা ঠাঁই আর পরোক্ষা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী, ভিক্ষারিনীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জন হাতার বেড়াবে করিয়া আসিতেছে এখানে কষিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই খুরত সে সেটা করিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আর তাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আর বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, বন্দরে খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া এক হাতে সম্ভব নয়। পাচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। অপমানের ভাবনার বিরুদ্ধে হিন্দুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। যাহার চালার পাশে হিন্দু রাত্রির সুখী পারিবারিক জীবনটি তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন হিন্দুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খড়পাতা ঘর ঝুলিতে ঝুলিতে যাকে মনে হয় পুরিবীর সমস্ত পুরুষকে ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর হাত থাকে নারী আজ একা সব সফল করিতে না পারিলে তাহার পূর্ণতা হইবে না।

অনেক কিছুকাল হিন্দু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কড়ি কোমরের কাপড়ে গুপ্ত করিয়া বাঁধিয়া হিন্দু তাহার চর ছাড়িয়া দাঁড়িয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতেখড়ি দেওয়া একটা নৌকার সিকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া সিকাটির একটা মুখ সে ছোঁচা করিয়াছে! এই অস্ত্রটির সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া লইল।

অন্ধকারে অন্ধকারে আকাশতরীরা তারা তখন দিগন্তিক করিতেছে. উদাসীন পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে অন্ধকারের জনহীন জগতে মানুষ মধ্যে অন্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক নিয়া বিচিত্র কৌতুকে রাত্রির হইয়া হিন্দুর সহসা অবগুণ্ঠনটি উদাস বোধ হইল।

নদীর ধারে ধারে আর মাইল দুইটা গিয়া একটি সম্ভ্রান্ত পল্লি মিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বা দুই তিন রাস্তা শহরের বুকে ছোট ছোট আলোকমালা নিয়া শহরের অপর প্রান্ত দিয়া পৌঁছাইল। শহরে ঢোকার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া মুড়াইল ওধার এই রাস্তাটাই পাশে পাশে মাইলখানেক বহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

হিন্দুদের পরিত্যক্ত রাস্তার ঝুলিকে কাঁধে ফাঁকে দুএকটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর বাগের ফেরে ও রাস্তার মাঝে জনমানবহীন পতিত জমার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জমহের ধারে খানিকটা জমি লাক করিয়া পাঁচ-সাতখানা খুরে তুলিয়া করেকটা হতভাগা মানুষ একটি বস্তিতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। ভোরে উঠিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, পাচী গাছের তলায় পড়ে জ্বালাইয়া ভাত

...ছিল, বাঁশির টানে আসিত, তবু পাঁচী পরাণের কাছে আসিতে পারে নাই।

...মনের মোহে বাঁশির সঙ্গে ভাসিত। পাঁচী কিন্তু কিছু করিত না।

কিন্তু একদিন ওদের শিয়রে শিয়রে আসিয়া যম দেখিয়া গিয়াছিল। অসময়ে ওদের শিয়রে নিয়া মেঘের ফাঁকে কল পাখীর যে বিদ্যুৎফল বহু বর্ষে ঝরিয়াছিল। তিনজনই কুপোকাৎ, পরাণের বাঁশিটি পাঁচী নিজের হাতেই কল করিয়া মেঘ করে, সুরে ঠোকরাইয়া ভাসিয়াছিল। বাঁশীর সন্ধানে এখানে সেখানে নারীর নিজ বুকের নিজের হাতেই নিখাঁটি বাঁশির করিয়া সব করিয়া বাঁশির। ওরে আর ঘুমের করিল। বাঁশিতে ভাসার আসার ছিল, ওরের নিজের সেইটুকু আসেরও আসার।

অসীম মুহূর্তে নিজের বাঁশির বাঁশিতে নিজের সমস্ত সাধনা দিয়া একটিমাত্র আসরে মুহূর্ত মোহনীয় আসরে আসে নিজের আসা নিজেই সে প্রাণ ছিল আসন্নের নিজের মুগ্ধতায় ছিল। আসরের আসার আসরে বাঁশিকে হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। নিজেই মানস মনে বুঝিবার চাঁদ পরাণও কিন্তু আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। এক হাতে সমস্ত বাঁশিকে আর চাপিয়া ধরিত।

পাঁচীকে বলিল, 'তুল আসে'। ছিনাবি ও মেয়েও মরীচি মেলাসে।'

পাঁচী ঠোকরাইল না আসে মোহনীয়ে আসিল।

কিন্তু আসা আসার বাঁশির, 'একটুকু আসরের মন, আসর চাস ও একদম তুল মরীচ আসে।'

বাঁশির নিশ্বাস হইল মোহ কিন্তু আসরে আসা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

মন নিয়া বলিল আসেনাই আসরীয়া সে, পাঁচী?

পাঁচী আসরা আসিলে কিন্তু পরম দুঃখিত সঙ্গে নিজের কাঁধে চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে আসন মোহনীয় আসুরীকে বাহুলে করিয়া সবের আসার সাধ্য ছিল না। পাঁচীর বিশে আসরীয় সে বলিল—মোহসে? কেন আসে মুখে আসল মোহসে? আসা পাই পাই করিয়া বলিলাম, বিয়াবাই মোহে ছিনাবীয় আসে আসীর নারবা মো, আসার মেও। পুরীসে বিয়াবাইর আসীর মোসে। এস ছিনা, নিয় মোহসে কিন্তু। মেন মো মেন, নিয়ারী আসার মোহসাই মেন বিয়াবাই—' বাঁশিতে মুহূর্তের সাধনে আসরের আসারী এমনার সব করিয়া কিন্তু আসা মুগ্ধতায় মুগ্ধতায় হয় হয় করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা চক্ষু হইল বলিল, 'মৌহিসে মোসা আসে মো! আসে কথা আ আসুরাবাসীয়া মরীয়া। মোহসেও কিন্তু আ: সমস্ত করীয়া,—আঁ?'

পাঁচী আসিতে আসিতে বলিল, —'কি করিব?'

বাঁশির মোসা সমস্তে আসি'ঃ পাঁচী আসেক কথে আসিলাম আসিয়াছিল। কিন্তুর সময় চমকে সে আসুরায় আন করিয়া। কিন্তু কিন্তু আসিয়া চুমের মুখি চাপিয়া বাঁশিকে চুমান করিতে পর পাইল না।

বাঁশির সমস্ত জীবনের সমস্ত আ মর, মৌনার আসুরিতে একদম মৌনার মৌন। একটা আসুরাকে ইচ্ছা করিয়া কিন্তু পূর্বে মৌহার মেয়ে মেলী মৌনাসিন করিয়াছে। আসু সে মুখী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পাঁচুরিল বরীয়া আসার পাঁচী। আসরার না চাইস থাকতে মেলা করি। আমিক আসে নরীসর চাঁদ মৌনো. আসেসে আসেসে পরাণটু পার হয়ে।'

পাঁচী পাঁচুরিল বাহির লইল। আসরার কিন্তুর হাত ধরিয়া মোহনীয়ে মোহনীয়ে মনের বাহির হইয়া আসার নিয়া মৌনিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া কিন্তু বলিল, 'আসরাই চাঁদ মৌনো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আসরা আসু আসে?'

'সময়। মহুর আ চুরি আসুরে। বিয়ানে ছিপাইপুরের সাধনে আসরার বাঁশি মৌহিসে বাঁকুস রাইতে একদম সময়। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক মোসা পথ হাইস সময়।'

পাসের ঘা নিয়া আড়াআড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পা বলিল, 'পরাণ কি দুই বাসা পাসু পাঁচী?'

'হ', বাসা আসার।'

'পিঠে আসার?'

'সার্থক আসার?'

'সাসুর, আসু।'

কিন্তুর গলা জড়াইয়া বাঁশির পাঁচী আরার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। আরার মোহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া কিন্তু মোহে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে বাসের মোহ আসরা আসোর নিয়েছে পড়িয়া আসে। দূরে গ্রামের গাছ-পালার-শিয়র হইতে অন্ধকার চাঁদ আসমান উঁকিয়া আসিয়াছে। উপরের পৃথিবীতে আসে আসরার।

হয়তো এই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আসে। কিন্তু যে বাসরাহীকে আসরার মাসুসে' হইতে সমস্ত বাঁশির মোহের আসরাসে মুগ্ধতায় কিন্তু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে আসরারে আমরা আসরাসের আসোস আসেশেকীয় মনে মোসা আসিয়া মরীয়ে তারা ঐতিহাসিক, পৃথিবীর আসোস আজ পর্যন্ত আমার আসার পর নাই, মোসাসিস পাইসেও না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধাংশু ঘোষ

'আত্মার অন্ধকার' লেখক-জীবনে মোট পঞ্চান্ন লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত দুশ পাঁচটি। এছাড়া শেষ কয়েক বছরে এমন কিছু ছোটগল্প জন্ম করেন যা একই সময়ে রচিত অথবা প্রকাশিত বিভিন্ন উপন্যাসের অংশ। লেখার পরের কোন্‌গুলি মূলত গল্প হিসেবে আলাদা পর উপন্যাসে সম্পূক্ত এবং কোন্‌গুলি মূলত উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটগল্প রূপায়িত হয়েছে, তা নির্দিধায় বলে দেওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। লেখার গল্প-গুলোকে যোগ করলে বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সংখ্যা সম্ভবত দুশ আঠার। এছাড়া তিনি ছোটদের জন্য অনেকগুলি গল্প লিখেছেন।

আশ্চর্য লাগে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আঠাশ বছরে ছোটগল্প লিখেছেন মাত্র আঠারটি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কল্লোল যুগ বইটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও 'কল্লোল'-এর অন্তর্ভুক্ত বলতে চাইলেও, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারীভাবে 'কল্লোল'-এর লেখক নয়। তবু একই সঙ্গে এই দুজনের জীবন-ভাব বিচিত্রায়। অবশ্য এই দুজনের এমন বাইরের মিল নেহাৎ কাকতালীয়। আসলে এই দুজনের লেখার মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট মেরুপ্রতিম।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর আবহাওয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ার অমিল প্রচুর। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথকে যে মানসিকতা দিয়েছিল, তাঁদের আবহাওয়ায় কোনো বড় লেখকের তেমন মানসিকতা অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ বারবার নিজেকে নতুন পরিবেশে অন্তরঙ্গ প্রমাণ করলেও, বারবার নিজেকে হেডমাস্টার চুড়োয় স্থাপন করলেও, মৃত্যুর আগের দুটি দশক তাঁকে প্রায় বিরোধী পরিবেশে নিঃসঙ্গ দিন্তে হয়েছিল এবং সেই পরিবেশে তাঁর মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে নতুন লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই নতুন কালের লেখকদের জন্যে অরাজনীতিকতার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনাহীন। তুলনাহীন এই কারণে যে, প্রথম কিন্তোরী জগদীশ গুপ্ত যতই সাম্প্রতিশীল হোন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তরে, বিশেষত দ্বিতীয় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমতুল বিচরণ করেননি। কল্লোল-এর লেখকদের বাস্তবতাবোধের সঙ্গে, তাঁদের জীবন যন্ত্রণা-বোধ, নাস্তিকতা, বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত সোনাটা, হেলিওট্রোপ, সাঁওতাল পরগনা পটভূমিকা ইত্যাদির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের বাস্তবতাবোধের মৌল পার্থক্য অনুধাবন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তখন স্বাধীন ভারত, ভাষার ভিত্তিতে নতুন রাজ্য ও পরিবেশের আবির্ভাব মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কের সম্ভব করে তোলার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষী চেষ্টা আসল ও উপাদান আমার—তাই পাশাপাশি হালকা মেজাজ রোমান্টিক মানসিকতা তাঁর বিভূতি জগতের—এই সমস্তের তাৎপর্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে ধারে না।

'কল্লোল'-এর লেখকদের যৌবনের উপাস এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষার উপাসকরা তাঁদের লেখক-জীবনের প্রাথমিক পর্বেই অন্তরঙ্গ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বড় লেখক তাঁরা 'কল্লোল' উঠে যাবার পর আরো অনেক দূরে এগিয়েছেন। অনেক জটিল পথ পার হয়ে এসেছেন। তাঁদের পরিণতি অনেক পরের ব্যাপার। তাঁদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরত্বটা হয়েছিল 'কল্লোল' উঠে যাবার পর। সমস্যা কারণেই তাঁদের প্রথম পর্বের উপাস ও উপাসকরা তাঁর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও পেয়েছিল, কিন্তু মূলতই তাঁর লেখার বিদ্রোহীর ভঙ্গিও ও নিঃসঙ্গীর সঙ্গের ছিল। ফলে এই দ্বন্দ্ব তাঁকে গ্রাস করেনি; তিনি গ্রাস হয়েছেন অন্য আলোয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, একুশ বছর বয়সের রচনা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নিশাকান্তের রাত্রি' প্রকাশিত হয়েছিল সমসাময়িকতার সাথে সম্পর্কহীন 'বসুমতী'-তে।

বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা-ভাবনা-নির্ভর সৃষ্টিমূর্তি জগদীশ গুপ্তের। একই ধাতু উভয়ের প্রাথমিক গঠনে। দ্বিতীয় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য প্রায় অন্য এক লেখক। প্রাথমিক গল্প-গুলি থেকে দূরে, অনেকের সম্পূর্ণ। তবুও জগদীশ গুপ্তের বিষয়ে তাঁর নীরবতা থেকে এক অন্ধকারবোধ জাগায়। শুধু অন্ধকার-বোধ, অস্তিত্বের বিস্ময়ই নয়। কিন্তু এই সময়ের সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের সমস্ত এমনই-সুনির্দিষ্ট যে তা ঐতিহ্যের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধকার-সাহিত্যে' উপন্যাসের সাদা' রূপের পরিমার্জিত সংস্করণেও জগদীশ গুপ্তের অন্ধকার ছাড়া তেমন কোনো ব্যঞ্জনার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ ১২১৮ থেকে ১৩১১ পর্যন্ত মোটামুটি ছোটগল্প লিখেছেন। গল্পগুলি ভাবধর্মী, সমাজমনস্ক আবেগের ফসল। তাঁরা উপমা-নির্ভর, ভাষা গদ্য প্রকৃতিবর্ণনা, গ্রাম-জীবনের-মানুষ বাস্তবতার বদলে এক সুদূর করুণ-মধুর স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে। ১৩২১ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি অবশ্য অন্য জাতের। সেখানে বাস্তব প্রতি-বেশের ওপর সামাজিক মূল্যবোধের অভিঘাত থেকে উদ্ভাসিত বিশ্লেষণ, উপমা ও প্রকৃতিবর্ণনা অনেক কম, গল্প-গুলি বাক্‌নির্ভর বলে নক্সা-বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যময়। উপন্যাসেরও মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় সূত্র থেকেই উদ্ভাসিত। প্রথম, তাঁর প্রথম পর্বের ছোটগল্পে উপন্যাস, প্রকৃতির আধিক্যতা। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটির আদিম প্রকৃতি আদিম মানুষের প্রবৃত্তির সাঙ্কেতিক তাৎপর্য পেয়েছে। মনে হয়, নিশাকান্তের অন্তর্দাহের জন্য যে-অন্ধকার বিস্তৃত বিস্তৃত হয়ে আছে, প্রাগৈতিহাসিক গল্পের জন্যে তা

উপন্যাসিকদারী, তার জীবনের আঁকড়ে থাকার জন্যেই প্রবৃত্তি সর্বাধিকভাবে প্রকাশের অন্তর-অন্যায়ের ইন্দ্রিয় দান করে। বাঁচিয়ে না। সে বিদ্রোহেই বাঁচিয়ে রাখে। যেমন পদ্ম যে অন্যায় বাঁচে না সেই রকমভাবে, মানুষ সে বাঁচিয়েই।" এই ধরনের অন্তর নিশ্চয়ে. প্রাণি, সমাজ সাধনের জীবনমন্ত্রের সঙ্গে ভিন্নের জীবন-মূল্যের মূল্যের স্বাভাবিক মিল থাকলেও, তার পুরোপুরি মেতে অন্যায় মূল্য আছে বেশী ভিন্ন। মন্ত্র ভাষা ব্যবহার, যে-অন্যায় আজন দেয়ে ভিন্ন বাঁচায় চায়, সেখান থেকে ধারও পাশিয়ে যেতেছে। এই মূল্যের মেয়ে মেতে থাকার চেয়ে ভিন্নে স্বাধি-নর্দিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অন্য-সমাজনে হাতের ও শিল্পের অন্যেপলী নাচিয়া উঠিতে লাগিল।" তখন তনা ভিন্নে, তখন আজ অন্যায়ত সমাজ সে বাঁচিই করে। নারী-সমাজটীর এই বিদ্রোহের জীবন আর তার ভাষার মধ্যে না।" তখন বাঁসিয়ের ভাষাতে অন্যে ভিন্নের চোখে ভিন্নে অন্যায় মূল্যে জন্যের ভাসিয়ে ভিন্ন আমূল চেতন করে।

ভিন্নে ভিন্নতার মানুষ, ভিন্ন সমীক্ষণে কলাটির চাদ্ অন্যায়ী পাড়ী তার থেকে অনেক উদ্ভাসার। তাদের জীবনে অন্যায় নতুন ঘটিনার আগমনে, সেখানেও একই আধির প্রবৃত্তি। এখন মৌলিন চাদ্ একমনে পাড়ী ও অন্যায়ীদের আধিপত্যের ভাসন দেখিয়ে আসছে; বেশী মন্ত্র খুব কমন নাচিয়াছে। বাসির ঘটনার পর ঝঁকের ভিন্নে-চাদ আর আগমন আসছে হইতে গেল; প্রকৃতির যে এক আয়াসী আন্দ্য,... বিদ্রোহি মত, বাড়ীর এই-একমন প্রকৃতিটী অন্যের চাদরটীর উপির অন্যমনে আসুর হইয়া বাঁচিয়াছে।"

উপন্যাসের প্রতি বাসির অন্যের-অন্যায়ের ঔপন্যাসিকতা, তার অন্যের সমাজন নিরাসক্ততা 'অন্যায়' পাঠকের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায় না। তবে উপন্যাস একেবারে নেই, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। আছে এবং সেখানেই আছে—তার চরিত্রগুলির সমাজের অন্তিত্বার'। সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতার সাধারণ সমাজ নতুনের ভিন্নে নয়, কিন্তু উপন্যাস। সেখানে মানুষ সমাজের অন্যায়ের ভিন্নে নয়, ভিন্নে নয়

স্বাভাবিক এবং এই অসুখ, বলা বাহুল্য, মোটেই মারাত্মক ছিল না। উনিশ শতকের শেষার্ধে আরও অনেক শিল্পীরা নিজেদের নিয়ে চোখ ফেরালেন, সমাজে নিজেদের ভূমিকার ব্যাখ্যা খুঁজলেন। আত্মবিশ্লেষণ শুরু হল। এই কারণে তার আগে, উনিশ শতকের শেষার্ধের আগে, পৃথিবীর সাহিত্যে শিল্পীচরিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। অন্তর্মুখী হয়ে শিল্পীরা প্রথমেই খুঁজে নিলেন নেপথ্যকে, নিজের মনের খবর কতটা জানা যায়, অন্য কারো মনের খবর ততটা জানা সম্ভব নয় এবং যে-কাহিনীর প্রধান চরিত্র শিল্পী সেই কাহিনীর প্রতি পাঠকদের আকৃষ্ট থাকে, কারণ শিল্পীর মনের সৃজনশীলতার রহস্য সম্বন্ধে পাঠকদের অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। কিন্তু শিল্পীরা সব সময় সরাসরি অ্যাডভেঞ্চারে জন্মে না; অনেক সময় মুখোস পরে আসেন। তার ফলে আর্টিস্টিক অসুবিধে কেটে যায়, একটু দূরে থেকে নিজেকে বিশ্লেষণের উপকরণে সুবিধে হয়। তখন ঠাঁই কাপড় খোলা সম্ভব নয় বলে শিল্পী সারা রাত ধরে হিসেবনিকেশের ছাত চালাতে জানেন।

মনে রাখা দরকার, 'শিল্পী' গল্পটি লেখা হয়েছিল বাঙলা দেশের অন্ধকার দুর্দিনে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের জল পরে। ওই সময়ের চিহ্ন রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে। যেমন 'পীঁজরিয়ে খায়নি কেন', 'সাড়ে সাত সের চাল' ইত্যাদিতে।

মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্দা ও দেশবিভাগের পর দেশের মানুষে, বিশেষত দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের একদল করে বিশ্বাসঘাতক, আমূল বদলে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের ছোট-গল্পগুলিতে নতুন চরিত্র দিয়েছে এই বিশ্বাসঘাতক। তিনি লক্ষ করেছেন, একদল মানুষের ভাবনা-বাসনা-সংস্কার অথবা এক-কথায় মনের গঠন একলাফে পরিবর্তিত হয়েছে যা বিশ্বাসের সমাজেই সম্ভব বলে আমাদের ধারণা ছিল। এই জাতের লোকরা অনেকগুলি গল্পের নায়ক। 'পীঁজরিয়ে খায়নি কেন' গল্পের মোক্ষী, 'আজকাল পরশুর গল্প'-র ভয়ঙ্কর এবং আরো অনেকের মন থেকে পঁচিশ বছরের পুরোনো ধারণা, পুরোনো সংস্কারগুলো একেবারে ঝুরে ঝুরে পড়ে গেছে। তাদের বউরা যেন বেঁচে থাকবার জন্যেই ঠাঁকিয়ে সবার সিয়ে বাড়ির 'সস্তা আর্টিস্টের' ছেলেও তারা বউদের ঘরে ঢোকার, শরীর অধিকার দেয়। 'হারানের নাতজামাই' গল্পের জগমোহন জন্যে তার বউ ননীবালাকে ঠেলা করে, জানতে চায়, সে ফুরণের সঙ্গে শুয়েছিল কিনা। ননীবালা বলে, 'শুই নাই।' জগমোহন বলে ওঠে, 'মেরেও নাই। বেউলা সতী!' তখাপি নির্দিধায় বলা যায় ননীবালা ফুরণের সঙ্গে শুয়েছে, জগমোহন গল্পের শেষে জন্যে ননীবালা ঘুমটি ফেলে দিতে হাত বাড়ালে জগমোহন সমান হেসে লাফিয়ে এসে ননীবালাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'খুব সাবধান!যা কথা কইবেন।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন, এই লোকগুলো আত্মবিশ্বাসের এক নতুন মালমশলা পেয়েছে। ওরা বলে, 'বন্যাত্রাণ সমোর পরেই পেয়ে, মানুষের চেয়ে সোনা ভাল এসেছে পিথিমিতে, মানুষের জাত, মাটির জাত। যে মাটিরে সে জাতের লোক, বাস্।' আর সব বেজাত কলাই। কেন? না, তারা ফ্রন্টের ছাটিছ। না, যারা খাটে তাদের আর দুটি করে যায়। চোর বেজাতের দেবতা বলে মোরা মানি না, 'মোরা সনজাত।' লিফটে বাড়িয়ের ওয়ে এই নাই ভেদটুকুন।

এই শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-সংগ্রামে দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ গল্পের প্রধান উপজীব্য। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, এই গল্পগুলিতে শুধু শুধু মিছিল, স্লোগান আর মারমুখো জনতা। উপমা, প্রতীক, স্মৃতি, স্বপ্নের আবহে এইসব গল্পের পাত্র-পাত্রীরাও ফিরেছে। তবে 'চোর-ডাকাতের প্রতি তাদের মনে ভারি ঘৃণা। ঘৃণা তাদের কাছে একটি 'প্রচণ্ড মহৎ মনোভাবের'। তাছাড়া একটি সুদীর্ঘ মিছিল অথবা কোনো ক্ষুব্ধ জনতার খুটিনাটি বর্ণনার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ কম। তিনি ধরে ওই মিছিল থেকে, জনতা থেকে একটি বাড়িকে বেছে নেন, ফুস দেন তার মনে এবং নির্মম-নির্মোহ বিশ্লেষণে উদ্ঘাটন করেন অন্তর্লোক। অন্তর্লোক উদ্ঘাটনের পর দেখা যায়, এই লোকগুলোর বেঁচে থাকার বাসনা প্রচণ্ড, তারা টাকার বেআব্রুনেটের সামনে ভয়ে কাঁপে না, তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করে, কারো অনুকম্পা প্রার্থনা করে না।

ছোট বকুলপুরের বাড়ী' গল্পে নিবারণ ও আমা স্টেশনে সপরিবার সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করার সময় সিগারেটের ও তাদের সম্পদের ঔজ্জ্বল্য যা খায়, তারাই প্রায় ভয় পেয়ে যায়। হালদারের বিধ্বস্ত ছোট বকুলপুরের গ্রামের জন্যে লেখক আমাদের নিয়ে যান না, শুধু তার প্রান্তে পৌঁছে দেন। কারণ, এই গ্রাম নিয়ে গল্প নয়। গল্প নিবারণ ও অন্যান্য নতুন মানসিকতা নিয়ে। যে ঘরে পায়িয়ে ছুরা ছোট বকুলপুরের গ্রামে পৌঁছতে পারল, তার পায়ের্যাম মনের মনের ছোয়া নিয়ে। বলা, যার আত্মার ভাষায় নতুন পাড়ি হয়...জেমন ঘরে হত...যদি না 'ভগবান মুখপাত্র একচোখো জানা' হতেন।

ইদানীং কিছু গল্প অথবা গল্প ধরনে লেখা হচ্ছে—এরকম ফেলনা পুনরো অথবা অকাজের। এই ফোকলার 'ধরে লেখা' বলতে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি লেখা বোঝানো হয়নি, তেমন হাসকর ব্যাখ্যার অবতারণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের দিকের অনেক গল্প গভীর অর্থে দ্রুত লেখা। গল্পগুলির লেখকের ঝিরতাবিরের উৎকুল নাজির। কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাসের প্রবণতা অথবা ভাব-বিলাসের ঝুকাপ্প নেই। যাদের জীবনে অবকাশ নেই, শুধু বেঁচে থাকার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম, তাদের নিয়ে লেখা গল্পের গতিও অতি দ্রুত। 'নেড়ী' গল্পটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই গল্পের তারার জীবনে যা ঘটছে, ঘটেছে, তা নিয়ে একটা মোহময় ছোয়ায় উপন্যাস হতে পারতো। কিন্তু লেখক এই গল্পে সেই ছায়ারের অনেক কম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আলোচনার সুবিধের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে সাধারণত দুই পর্বে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, যাঁর দুই পর্বের গল্পগুলি স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অন্তর বিন্দুতে পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়।

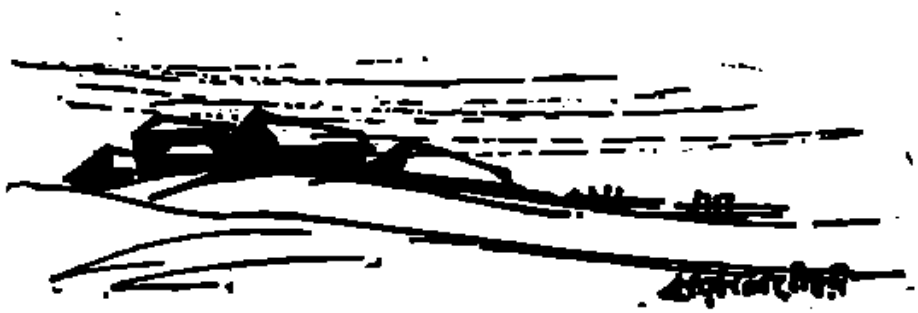

ফসিল

প্রবোধ ঘোষ

সোহাগ সেই অঞ্চলগুলি, যেখানে কাঁটার কাঁটার সাড়ে আঠারোটি দরজাইল। তবুও সেটিও সেরা, যাদের ঘন্টা বাজে। মহারাজা ঔরঙ্গজেব, শোভা, সোভাসিং, সোজাসুজা, আরাকান সব আছে। এক কুড়ির উপর মহারাজার উপাধি। তিনি হিন্দুকুলপতি, তিনি মহাপাল, মহাপাল ও মহাবিক্রমজিৎ। হুকুমুদ্দে আগে এ-এলাকে বিস্তৃত পরতীয় প্রথার অপরাধীকে শূলে চড়ানো হতো, এখন সেটা আর সম্ভব হয়। তবু কখনো আজকাল অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ করে মোষাদি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক রাজার কেল্লাটা বটে, শুধুমাত্র তার পাথরের সাদা দেয়ালটা আজও আছে। কেল্লার ফটকে বসানো হাতির প্রকাণ্ড কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভিতর পায়রার দল পরমসুখে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে কুকুর কুকুরেরা, বিড়ালে। দেয়ালে দেয়ালে শুধু পাথরি আর অরবারির ঝাড়, যেখানে সেখানে ঘাসের মতো ডালা আর ঘোড়ার ঘাস।

সাদা আছে, সেক্রেটারিও আছে। কাঁচে ঢাকনি আর ঘোরানো চেয়ার ও কম্পুক ডিজাস দেখা যায় দপ্তরে। যেমন দুই হাতের দুই জরুরে অঞ্চলাদের বৌদ্ধ প্রতিমার মস্তকে মহারাজা প্রকাশজন করছেন। সেই অপূর্ব মনুষ্য পাসনের তালে রাজ্যের অর্থক প্রজা সরে পঞ্চায়ের দুর্ব রক্ষিতালের ছিনির আরবাজার কুলির কাজে নিয়ে।

সাড়ে আঠারোটি দরজাইল অঞ্চলগড়—শুধু মেজরানির আর কর্নাটনলার ছাড়া। দুকে ঢোকতে মাটির ঢালা আর সেরা পাচাড়। কুমি আর কীটেরা দু ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো কলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—আশিটি সেরা মেয়ে—ছুটি, বর আর জলের জন্যে।

প্রত্যেক বছর স্টেটের কসল বিক্রয় আর কীল ও কুমি প্রজাদের মধ্যে একটা সুখের বন্যে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য কসল বাড়তে চায় না। কিন্তু অর্ধেক কসল দিতেই হবে। মহারাজের সুসজ্জিত সোনালি সৈন্য আছে। হেডম্যান পরানিক ওজনারের মুখাবয়বে ধড়-মাদারের মতো মুখোশ। নির্ভরিনু সেটের এই সেবকদল কীটপতঙ্গের উপর মহারাজার কৃপার বৃষ্টি। তাদের বো আর খোল ঢাক বাজানোতে ভুল নেই। ছুটি দশ-বারোর হাই-ই।

ডাঁসলদের জমজমা সেপাই ডাকে। ঢাকপুত্র বাঁধের আগে তার মাটির মাথে আসবাবিদের সন্ধিলিপি বসিতে হয়। এক-ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ডাঁসলদের অপরিচয়ের জন্যে লাঞ্ছিতরাও ছেড়ে কথা বলে। তারা দলে দলে রাজা ছেড়ে সোজা গিয়ে ভর্তি হয় কোন বাস্তুহারা-শিল্পীদের কারখানে। ছেড়ে যাবার সময় নিজে যাবে সন্তানেরা, ছেলে জামাতারা, ছেলে নিজের। ডাঁসলেরা ফুলও আর ফিরে আসে না।

শুধু নজরে চাষ না করি প্রজারা। এ-রাজ্যে রাজের সাধারণদের বাস। ঘোড়া-নিমের ছায়ার তলায় ছোট-বড় এমন ঢালা মাটির ভাণ্ড, কালোমের আর অন্তরদুলের চারার এক-একটা ঝোপ, সালসা মতো সুগন্ধ মাটিতে। রাতের বেলা নাকি ঐসব ঝোপে ফোটে এই মাটি। বেহারার মতো চাষ করে, বিশ্রাম করে আর মরও যায়। অন্তরদুলের মতো এই তিনশত আবর্তনে তাদের নিম-সন্তান মুকুলপাতি মুখপাত করে। এমনি-এমনি হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্চলগড় ছেড়ে পরাজয় একেবারে নিরাপদ নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সমবেতদের দুকুরবার হুকুমের উপর শুনতে হয়। পরবার থেকে বিতরণ করা হয় ছিঁড়ে আর খুড়ে। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা খাদে আসেন। মাটির নিচে ভূকম্পন নিয়ে পথে বের হন প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। দুটি জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা নয় হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অধিকাংশ অধিবাসের প্রবেশে না হয়—সব মাদুরেই লাঠি। যেখানে কলরা আর জয়ধ্বনি, সেখানে লাঠি চলেছেই, আর ২-একটা ভয়ানার মতো কাটেছেই। ছিপ্ত মাতীদাস বা রামলীলা—সবই লাঠির সাহায্যে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেইজন্যেই উপহার করতে অভ্যস্ত। লাঠিতন্ত্রের সাথে স্টেটের সাদর আদায় উশুল আর তাসিল চলিয়ে যায়, কিন্তু মেইটুকু হাঙ্গিল তাতে সাধিক সোরম ফাটুই ভাবা যায় না। মহেন্দ্রবন্দনার চাঁদা আর সোনো পিতের খরচ। ক্রমবর্ধিত মাশুল আদায়ের জন্যে সিন্দুকের ফুলো আর সোনার পরিমাণ ছুরে ছুরে হাত দিতে হয়, আর সিন্দুকও খালি হয়ে যাচ্ছে।

অঞ্চলগড়ের এই ঐশ্বিক অদৃষ্টের এক সন্ধিক্ষণে দরবারের ন-এক্সেটের পদে নিযুক্ত হয়ে এল নতুন একজন আইনবদীশ চৈন-সেন্ট। আমাদের মুখার্জিই এল ন-এক্সেন্ট হয়ে। মুখার্জির চেহারা খুব—যেমন লেখের মতো তেমনি স্টেটের কাজে অটিয়ে-ঝাঁহা-রাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়াল। চেম্ব মুখার্জিই হয়ে গেল পীর আগাগো সচিবেন্দ্রের আর সচিবেন্দ্রের হাঁস শুধু সাঁ করতে।

অঞ্চলের মুখার্জি আদর্শবাদী। ছেলে-বেলার ইতিহাস-পড়া মার্জিনী ছেলে-ছাত্রীর স্বপ্নটা আজো তার চিত্তের পটে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অল্পবয়ী হলেও সে অভিজ্ঞ সাহসবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সমবায়ী, সে কখনো পরাজিত হয় না। যে কলাকুশল, তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জি তার প্রতিভার প্রাচুর্যে পরমশূন্য উজাড় করে দিল তার স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্চলগড়ের আর সবাই ছিল যেমন তারের একেশ্বরে—একটিকে যেমন আছে, অন্যটিকে তেমনি হয়তো। প্রজারা তার পায় কাঁপও করে। মুখার্জির

নির্দেশে বন্ধ হলো লাঠিবাজী। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে ফৌজদারি করা হলো। স্টেটের জরিপ হলো নতুন করে, সেলামি নেওয়া হলো। এমনকি মরচে-পড়া কামানগুলোকেও পালিশ দিয়ে চকচকে করে ফেলা হলো।

ম-এজেন্ট মুখার্জিই একদিন আবিষ্কার করল, অঞ্জনগড়ের অপরিসীম সম্পদ। কলকাতা থেকে জিওলজিস্ট আনিয়ে সার্ভে ও সন্ধান করিয়ে একদিন বুঝতে পারে মুখার্জি, এই অঞ্জনগড় রত্নগর্ভ, এর রানিটে গড়া পাঁজরের তাঁজে তাঁজে আছে আয়রন অ্যাসকেন্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ঐ কথাটা মাটির তাড়সুদ্ধিই লাখ লাখ টাকার ইজারা করিয়ে নিল মুখার্জি। অঞ্জনগড়ের শ্রী ফেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিস্তীর্ণ মোরালিজারী স্টাইলের পাকাবাস। ম্যানেজার, সোপারিন্টেন্ডেন্ট, কার্ভার আর ফোরম্যান সাহিবদের বিভিন্ন পরিকল্পনা। সরকারী গায়েজে বাঙ্গী বাঙ্গী জার্মান লিমুজিন, সিডান আর ট্রাক্টার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—বিরামহীন বক্ বক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেহারা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সাজাই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে বীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ব্যারাক, পাকা-বনানো ইবারা, বাথরো, কেয়ারি-করা ফুলের বাগিচা, ক্লাব আর জিমখানা। কুলি কুলিরা দলে দলে ব্যারাক ছেড়িয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুখি বলি দেয়, হাড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় জমল ফোলক সিটিতে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটলেন—নতুন নতুন সোলো রাউন্ড তৈরী করতে হবে, আরো একশো বিঘা জমি খোল করে পাহাড়ের ঢালুটাকে বাড়াতে হবে। সাহেবদের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালিয়ান বাল্ড-মাস্টার হলেই ভালো।

অঞ্জনগড়ের মার্চেন্টরা চৌবিলের উপর ঝুঁকিয়ে মুখার্জি বিজেস হয়ে ভাবে তার ইনিসেশন স্পিকটার কথা। উপর থেকে লক্ষিণ সমাজদারের কথাটা কানে এল। মাঝে মাঝে বিলেত-করা কড়া গ্রাজুয়েটের অনুখুলনো বড় বড় ভাষা। অঞ্জনা মনীর সমস্ত উদ্যম চলে যায়। অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের মুখের ভিতর থেকে চালিয়ে দিতে হবে—অনুভূতী লিড্ড হতো। প্রত্যেক কুলি প্রত্যেক মাস্টারসুদ্ধ এক বিঘা জমি দিতে হবে বিনা সেলামিতে আর পাঁচ বছরের মতো বিনা খাজনায়। আইন আর আমল, তাদারক একটা নদি, বছরের এই তিন কিস্তি কসল তুলতেই হবে। উপরের পাটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক, বাঁকিতে ধান, যব আর মকা, ব্যাস—

তারপর বীরে বীরে একটা থাম্প, তবে একটা ইমারতি আর কারখানার দিল। প্রত্যেকের সে অভিজ্ঞতা আর নেই। এই যে শুরু আয়োজন। সিলভার কুলির আঁচড়ের মতো এক-একটি পরিকল্পনার সে অঞ্জনগড়ের বুক চিরিয়ে দেবে। সে চেঁচিয়ে দেবে রাজাশাসন লাঠিবাজী নয়, এও একটা আর্ট।

একটা মুশল—এইটাকে মহারাজের সম্পত্তি জবাব—কতি নেই। মুখার্জি উঠল। দেখা যাক, বুঝিয়ে বাঝিয়ে মহারাজার আপত্তি ঠেলাতে পারে কিনা।

মহারাজার কাছে মুখার্জি এগিয়ে যেতেই মহারাজা তার লালসাটী বাড়ির ঘোমটাকে একটা নির্মম ঝোড়ক দিয়ে মুখার্জির সামনে এগিয়ে দিলেন মুঠো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ ধরণীর আর ধরণীরাজের ঈশ্বর মহারাজ। আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেব বলেই আমরা বাঁচি। অতএব এ-অধম ভৃত্য, যা কলুষে তার উপর যেন ভসিলদারের জুলুম না হয়। আমরা নগদ টাকায় খাজনা দেব। আইন-সম্মতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি ধরণীরাজের অনুগত ভৃত্য। কুর্মি ও সমাজের তরফে মুশল মাহাতো, বজলব থান।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার সেরেস্তা এসে আমাদের খনির ভিতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের ঘরের মেয়েদেরকেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে। আমরা মনে করি সেরেস্তার অত্যাচার আর বে-আইনী কাজ করেছে এবং যদি কলি মহারাজের পক্ষ থেকে নালিশ এ-ব্যাপারের সুরাহা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান শিবরতন।

মহারাজা বললেন—দেখেছ তো মুখার্জি, ব্যাপারের সাহস।

—হাঁ দেখেছি।

চৌবিলে মুসি মেরে বিরক্তি প্রকাশ করে অভিভাষণ প্রায় ফেটে পড়লেন—মুশো, শালাদের মুশো কেটে এনে ফেলে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি; দুদিন দুরাত দেখি।

মুখার্জি মহারাজকে শান্ত করে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

মুখ মুশল মাহাতো মাসখানেক পরে মরিশাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকি জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং মুকতরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা, একটা নতুন আশ্বাসের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা মুশলের কাছে গিয়েছে—নগদ মজুরী কি মিলিস। কমবাবাদ স্টেশনে যেন ফাদুলালের একটা বদলেরী ছোরা ট্রেনের কামরায় ফুলে যাও। বাস—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

মুশল বলেছে—ভাইসব, এই মুশলের মাথায় যতটা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততখানি সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর ঠকাবে বিশ্বাস নয়। নগদ নগদ নগদ। একহাতে দেবে আর হাতে নেবার কথা বলছে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে মুশলের সমঝে কথা চলেছে। কুলিদের মজুরীর রেট, ছপ্পা সেরেন্দী, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ-সবই মুশলের কুলিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও মুশলকে উঁচুতে বসাতে তোয়াজ করে—গ্রাম এল মুশলা। কল তো মাতাজাতি দিন তখন কথা করে দিচ্ছি। তোমার সব কুলিদের ভর্তি করে নেব।

মুশলা জবাব দেয়—আজ্ঞা সে হবে। তবে আপাতত কুলিসিদ্ধ কথা থাক কেরোসিন তেল মুকাক দেবার আর্জি রেখে।

—আজ্ঞা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দেয়। মুশলের আনন্দ দেখে একদিন রাজের কুলি একত্রিত হয়ে ঘোড়াসিদ্ধের জন্যলে। পাকল চুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে মুশল দাঁড়াল—আজ আমাদের মজুরের প্রতিজ্ঞা হবে।

এখন কি ভাবে কথা উঁচাতে। ভিতে গলা, কে আমাদের মুশলদা, আর কেইবা আমাদের সোলঙ্ক। আজ তার কথাটা চলবে না। সেই আর ইশ্বর, এর উপর যে কুমি চালাতে আসবে, তাকে আর কোনোমতেই ক্ষমা নয়।

আজ সন্ধ্যের আগে মুশলের সহিত কর্মচারীরা অতিরিক্ত উৎসাহে ফেঁপে ফেঁপে আওয়াজ ছাড়ছে—ভাইসব, আজ থেকে কাজকের চাল মজুরের জন্য, আর মজুরের চাল...।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দেয়—মানুষের জন্য। চকচকে সিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উঁচিয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে ফেরে ফিরে।

ঝোলাটা বড়ই খোপসে ফেঁপে না ফেলে, মুখার্জির কিন্তু ভালতে বাকি রইল না। এইটুকু সে বুঝেছে—এই মেয়েই বড় খাকে। সময় থাকতে চৌপট একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কিউরিয়া দেখাবে অন্য আর ইশ্বর অমোঘকাসে মজুর এইসব সরদারদের তাহলে সামলানো মুস্কিল হবে। দুদা একটা রক্তপাত হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজে একহাতে তরফারে লড়ে নেওয়া ঢের।

সেরেস্তারা এসে মহারাজাকে জানায়—কুর্মিরা রাজবাড়ির তলানে আর সোনো দিন বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; মহারাজ অসন্তুষ্ট হবে।

ডাক পড়লো মুখার্জির। মুশল মাহাতোকেও তলব করা হলো। জোড়হাতে মুশল মহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়াল। জোশিদ্ধের মতো জীর্ণ, মুশলা যেন ঠকঠক করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব শয়তানি করা। মহারাজা বললেন।

—মুজুরের মুজুরের মুজুরা আমি।

—চুপ।

—কি মহারাজ।

—বুঝ। মহারাজা ভীষণভাবে ভাবলেন। দুলাল মহতের পরামর্শের মতো স্থির হয়ে গেল।

মহারাজা বললেন—ভিক্টোরিয়া ফৌজিয়েদের সাথে তোমার সম্পর্ক রাখতে হবে। আমার কিন্তা মুক্তুমে তোর কুর্নি খানতে কুর্নি হয়ে থাকিতে পারবে না।

—ঠিক সরকার আপনার হুকুম আমার জাহাজে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল সন্তর্পণে করে চলে গেল। এবার আদেশ হলো মুখার্জির উপর্যু সিপাহকেটকে একটি আদেশ দাও, যেন আমার অনুমতি না নিয়ে আমার কোন কুর্নি-প্রজাকে কুর্নির বাইরে ধরি না করে।

অবিলম্বে দরবারকক্ষ থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মহতের আর্থাবিত পত্র। তৌহেতু আমরা সকল বন্দুকী পাই, যা পেলে আমাদের সেই চলবে না, সেইহেতু আমরা বাঁকির সাহেবের কথা মতো করতে পারা। আমা করি মহারাজ এতে যারা নেবেন না...আমারী মাসে আমাদের নতুন রিসিভের প্রতিষ্ঠা হবে। রাজস্বাবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করার সরকারের হুকুম হয়...আমারী পরিতের সময় কিন্তা ছিঁচকি তদন্তের ঘুড়ি আর সর্বাঙ্গ মাঝার জন্য অনুরোধ হয়।

মোটিশের প্রত্যুত্তরে সিপাহকেটের জবাব এলো—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হবে, বিবেচনা করা যাবে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জি? জানতে চাইলেন ফৌজদারকেই ডাকতে হবে। জিজ্ঞাসা করি, খাজা-কাটার সম্পর্কটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কিনা?

মহারাজা আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, মুখ একটা আঘাতের মত কথা বিশ্বাস করে তাঁর মনের ভিতরে ছটফট করছে।

মুখার্জি সবিনয়ে নিবেদন করে—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জি বুকের দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা?

সিপাহকেটের এই দুষ্ট উপনেতাই কুর্নি সমস্যার নাড়ানাড়ি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অরাজকতা। কিন্তু কি করা যায়?

দুলাল মহতের কৃষ্ণবাড়ির কাছে মুখার্জি এসে দাঁড়াল। বাস্তবিকই দুলাল বেশ হয়ে একটা ঠোঁকি টিনে মুখার্জিকে বলছে.. দিল। আমার পালাটা খুলে মুখার্জির পায়ের কাছে রেখে দুলাল বসল মাটির ওপর। মুখার্জি এক এক করে সব বুঝিয়ে বলে। শেষে একটা অভিমানের সুরে ছোট্ট পত্র মুখার্জির কণ্ঠস্বর—একি করলে মাহতো। সরকারের ছেলে তোমরা; কখনো ছোট্ট দেশ করে, কখনো করে বাস। তাই বলে পরকে ঠেকে ঠেকে ছুরির ইজ্জত যাই করে না। সিপাহকেট আজ যা তোমাদের ওকালা করছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে, তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই সরকারই তখন দু-মুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জির পায়ে হাত রেখে দুলাল বলে—কসম এজে-ই বাবা, তোমার কথা রাখব। রাজের ভুল মহারাজ, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরি। তবে ঐ সরকারটা একটু জলদি হুকুম হয়।

স্থিরতার প্রশ্ন না উঠলেও আপনারা না করে মুখার্জি দুলালের কুটকুলের ছেড়ে বের হয়ে গেল।—সত্য, তোমরা ভো করেই ছিল আমাকে দিয়ে, এইবার দেখা দিয়েছে বিশ্বাসের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোশাক বদলাবার কথা মুখার্জিকে ভুলতে হলো আজ। এক-টানা ঘোড়ায় করে বাজার এসে সিপাহকেটে আসিল।

সেখানে ঠিক বিকেলে, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ইতো করা করে মুলাকাত করবার কথা আপনার। আপনারের কারবারের জন্য যে কোন সুবিধা মহারাজের কাছে এ বেলা করলেই তো পেয়ে যাবেন।

বিকেল বলে—মিস্টার মুখার্জি, আমরা বণিকের নই, আমাদের একটা বিকেল আছে। নির্বাচিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। বরফার থাকে আছে। লড়ব।

—সব কুর্নি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা ভুল করে ফেলেছেন। স্টেটের এস্টিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো? ভৌকের মাথায় মুখার্জি আর ফোকের আসল করেনটি বার করে ফেলল।

এস্টিকালচার না বাঁচুক, ওরেলথ তো বাঁচবে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? বিকেল বিদ্যুতের মতো উত্তর দেয়।

রক্ত ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবতে মিস্টার বিকেল। কুর্নি ছিঁড়ির সঙ্গে বরবার থেকে একটু অনুযোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজা খুশি হবেন এবং আমাদের জমাদিকে নিশ্চয়ই ভালো হবে।

—সরি, মিস্টার মুখার্জি। বিকেল বাঁকা-হাসি হাসে।

নিরাহুতে বিরক্তিতে গলা হয়ে উঠল মুখার্জির কণ্ঠস্বরে। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে আফিস ছেড়ে চলে গেল।

রাজকেনা এসে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার হে বিকেল?

—মুখার্জি গাছে তুলে মই কাড়ল রাজকিশোরদা, ওরেলথ উপর দুলিয়ে দিয়েছি। কোনো চিন্তাই রাখা নি।

ঠিক করেছ। ওরেলথ তো ওর ঐ ইরি-গেশন স্কিমটার কথা। সময় থাকতে ভজুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক ঝেলাঝের মধ্যে পড়তে হবে। কারণ এখন বর্ষাটার মধ্যে, খুব সাবধান।

—কেন চিন্তা নেই। সোনা বিড়াল মহারাজা আমাদের হাতে। ওকে দিয়ে স্টেটের সব ডিজাইন ভজুল করব। পরদিন হরা বিকেলে করে রাজকেনা বললে—রাহাতো এসে দাঁড়িয়ে যে, ওকে ডেকে নিয়ে এস, আজ সেই কাজটা এখান সেরে ফেলা।

সিপাহকেটের অফিসের সেক্রেটারির কামরায় বসে রাজিতোষ্ঠল মাহতো। অফিসের একটা বিশ্রত আমলার মাহতোকে নিয়ে গিয়ে বিকেলের কাছে—এই যে মহাশয় তৈরী। সব কথা সেখা আছে এতে। সই করে দেন। আজই বিদায়ের আগে যেতে যেন।

সই করে মাহতো। মাহতোর পিঠ চাপড়ে রাজকেনা তাকে বিদায় দিল— তুমি এখন মাহতো, আমরা আছি। বাঁধ ভিজে-মাটি উঁচানো করে, তুমে হয়ে এল বন্ধ, আমাদের বাজড়া খোলা আছে তোমাদের জন্য, সব সময়। ভয়ে যাও।

বিকেলের কণ্ঠস্বরে বসে মুখার্জি খুব আকাশ-পাতাল ভাবছে। কসম খাওয়ার আর সময় চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মতো সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের প্রশ্ন লাগলা আর বোঝাপড়া চলবে না ও ব পাশায়। এইবার প্রথম হাতে তুলে দিতে হবে হার না পায়।

কিন্তু মানুষেরমুলের মাথায় বিকে নিশ্চয় খুঁচিয়ে দেয়ে সব। সবাই নিজের নিজের হুকুমে—একটা আর্থাবিনাশের উৎকট কল্পনা-উন্মাদনায় মত্ত আছে যেন। কিংবা সে নিজেই ভুল করছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান, খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার পূর্বাহ্নেই বসে আছে। মহারাজা ফৌজের চারদিকে পাহারাটি সজাগ হইতে করে। মুখার্জি ঢুকতেই এক-গাল অভ্যর্থনার অবসর।

—নাও এবার বসিয়ে ফেলে আমি চলেলাম। কুর্নিই অসো আর উপর আর সেটই চলা।

হতভম্ব মুখার্জি সচিবোত্তমের দিকে তাকায়। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল একটা চিঠি। পলিটিকেল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব জানছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, সরকার নিজেই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু: মুচকি হেসে বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সুর ধরে মহা-রাজ বিকেল ধরে উঠলেন। 'সত্যই খুব দুঃখ কথা। আমি সব জানি মুখার্জি'। আমি অন্ধ নই।

মুখার্জি—সব ও জেন আপনি, এ কথার অর্থ কি সরকার?

—হ্যাঁ, সব জানি। নইলে আমার ইজ্জত তুলো মাটি থেকে যে বেলিয়ারা শেষ চালের ভরসার এর সাহস হয় কোথা থেকে? কে তাদেরকে ভিতর ভিতর এই সাহস দেয়?

মহারাজা যেন পরস্পর করে ফৌজের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা দোষিয়া বাস্তবতায় যাজন করে তাকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জি তিন দিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেবা শুরু করে দিল।

পরে ফেকে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব এইবার আপনিই আমার ইজ্জত বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—কাই হোক, কুর্নিদের অপমান পাহেন্তা করুন ফৌজদার সাহেব,

আর আমি সিংহলেরকে একটা সিঁড়ির মধ্যে ফাঁসাচ্ছি। তেমন জায়গা কলকাতার মধ্যে এমন বহু কাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জি এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজের চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পিছনে কত-খানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে তা সম্বন্ধে হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিল। সত্যই তো, এমিলটা তার এতদিন চোখে পড়ে নি। তার ভুল হয়েছে। মহারাজ। সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানাল।— আমার ভুল হয়েছে সত্যবাবু। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমার যদি কখনো ডাকেন, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জি, কি যে বল। তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে। একটু কড়া হতে হবে। আমার লাখি আর সহ্য হয় না মুখার্জি।

শরীরের মধ্যে যেমন মধ্যে একটা বিহ্বলতা, একটা ক্লান্তি, যেন মুখার্জির হাত-পায়ের গাঁটগুলিকে শিথিল করে দিয়েছে। ঘুমকে ডাকতে ডেকে দিয়েছে সে। শুধু বিকাল হলে, বিটেস চড়িয়ে বাজার করার জন্যে নতুন আয়াটি চৌপরে সে সে সময়ে উপস্থিত হয়। সকাল সন্ধ্যাটা পুরো গায়ালপে খেলা করে মত খেলে যায়। জাইনে-বাঁয়ে বেপরোয়া অ-ড্রাব-লেস ছিট চালায়। কখনও করে এক-একটা ওয়েলেই ছোক উঠে যায় কালি হয়ে। মুখের [illegible] আর যাদের ছোবড়ে ভিজে চুপসে যায় [illegible] ওজন বেশ পায়ের ক্লান্তিতে। তবু [illegible] নেশার পাগল হয়ে মুখার্জি চান [illegible] ফাকলন ড্রাবাড়ে কা খেয়ে ক্লান্তি ভুলে [illegible] আড্ডাখানা করে। ঘুমের শেষ [illegible] বিশ্রাম করার নাম করে না [illegible] সেলো। সাদের চারদিকে [illegible] ছুটির বেড়ায়। বেলাবে [illegible] চোখ মুছে সাঁতারে [illegible] স্লীপ-পাস করে। [illegible] নেবে [illegible] অনুযোগ করেন—তত রাত্রি খেলা খেলছ [illegible]। সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিরিবিলি সুযোগ [illegible] ঘুমকলকাতের পাহাড়ের আড়ালে। [illegible] সন্ধ্যাবেলা করে লালে যাবার [illegible] করেছেন। সেদিনও একটা খবর নিয়ে এল।—ঘোল নম্বরের [illegible] বসেছে, এখনো কলছে। সন্ধ্যাবেলা ঘুমের [illegible] ঘুমে ঢুলি চলে পড়েছে।

—ছাড়ি মুখার্জি। মহারাজা অন্তরঙ্গতার হাত বাড়িয়ে উঠবার আগেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।— সত্যিকারের দোস্তার? সিগনিয়র ঘুমক। সিংহলেরের ছেলেকে এইবার খুন করব।

সত্যিকারের এলেন, কিন্তু ঘুমক কালো মায়ের ছেলের মতো তাঁর চোখ। বললেন—খুনকরবার?

—কিসের খুনকরবার?

—কিনা টিকিটে কুমিরা লকড়ি কাটছিল। জলদের ঝোপে বাঘা দেয়। তাদের মেয়েরা আর পাড়ার কুমিরা মেয়ে তাকিয়ে ছিলেরে।

—তারপর? মহারাজার চোখের ঘুমো ঝকঝক করে যেন উঠল।

—তারপর ছোকরার পিছে খুনী চালিয়েছে। ঘুমকা বাঘার ঘুমকাই ভালো ছিল। তা না করে চালিয়েছে ঘুমেরী মাথা আর সেই ছুরিকা খুনের। মরেছে বাইশজন আর যারেল পঞ্চাশ-জনের উপর। ঘোড়াদিনের জন্যলে সব ঘুমে এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে। মহারাজা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। এই চেয়ে সামনে পলিটিকলস এজেন্টের ঘুমিয়ারী চিঠিটা যেন চকচকে ঘুমটাকে বর্শার ফলার মতো ছেলে বেরুচ্ছে মনে হল।

—খবরটা কি রাখা হয়ে গিয়েছে?

—জলত সিংহলেই তো ছেলে ফেলেছে। সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জিকে ডাকলেন মহারাজা।—এই তো ঘুমপাত্র মুখার্জি। এইবার তোমার বাহাদুরী ঘুমিয়ে দেখাও, একটা ঢালাও বাজনাও।

একটু ভেবে মুখার্জি বলে—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মহারাজকে আগে আটক করে ফেলুন।

জন পঞ্চাশ সেপাই সঙ্গিন আর লাঠি ও লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে মৌজল মুলেসের ঘরের দিকে।

মুখার্জি বললো—আমার সরীর ভাল এর সরকার, কেমন পা ব্যথা ব্যথা করছে। আমি যাই। (

ঢোল নম্বরের সিটে বসেছে। আর্ক-টেরা খুব খাচ্ছে দিয়েছে। তৃতীয় সীজনে হাপটা ভাল করে টেপার কথা ছিল না, অথচ এই মুখার্জিরা। উৎসাহাধিক্যে পাথরের কুচি আর মুলোর সঙ্গে চলাচল থেকে যেন একটা আর্তনাদ ভেসে ভেসে বেরিয়ে আসছে ঘুম ঘুম ঘুম ঘুম। নরম পাথরের চিলাবাদুলে চাপের চোটে কুমকির মতো গুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরই মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সিটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হচ্ছে।

জনতা বাওড়া থেকে দলে দলে ঢুলিয়ে দৌড়ে আসছিল। মাঝপথেই মারোয়ারী তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজে যাও মুখ, কিন্তু হুজ্জুত নয়। খেলা যারেল হয় নি, হবেও না কেউ।

মহাচঞ্চল দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কলকল্প করছে। সিংহলেরা বলে—আটি দিয়ে ভয়াই করার উপায় নেই, এখনো দুর্দিন বসে থাকবে। তবে হাজিরা খাটা পুরিয়ে যাবেই, নতুন একটা তৈরী করে রাখ। অন্তত একদিন মাল কমিয়ে দাও।

মহাকলেরা বলে—তাতে লাভ কি হবে? কি মহারাজার পকেট পোড়ে দিয়েছে সব। অন্যত্র, খাটি মারোয়ারী, আকে বোঝাবে কি দিয়ে? জনদের সকালেই মহাকে কাজ-গুলি খবর দেয়া যাবে আর পাড়া ভরে আন্দোলন হবার পর দিন। তারপর আসবের একটি এমনে আমি করিই, একটা গণ্ডগোলাই বলাপও তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপারে।

সে রাত্রে ঢুলাবরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক বাতের আলো জ্বলে উঠলো পাথরের একটা অকোরেই। একবার ঢাক পড়লো মুখার্জির।

অন্ধকারে দূরে। মহারাজা, সচিবোত্তম আর ডোজনরা—ফিরলন, জাকবেনা, মুর আর প্যাটারসন। মুখোমুখি মেহগিনি টেবিলে খোলা আর ডিকেন্টারের ঝিলমিল।

সস্নিগ্ধ হেসে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন।—ব্যাপারটা বলা পড়েছে মুখার্জি। ডাক্তার সব থাকতে তুমিই বিপদ্ধ হয়েছিলে।

ফিরলন সাহ্য দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ঝামেলি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উত্তরের জন্য ভালো করতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, ডোজনরা সেটা মুখার্জির কাছে ঘাসে সংক্ষেপে শুনিয়ে দেয়। নিরুত্তর মুখার্জি চেয়ে ওঠে, ঝকঝকে হয়ে যায় মুখ, ভাসন্ত মুখ, হাতের চেয়ে মুখ পুরো অবসন্নের মতো ঝুলে যাবে।

ফিরলন মুখার্জির পিঠ ঠুকে এমন কি কাছে একটু লজ্জা হচ্ছে মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।

রক্তদুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার ঢোলনম্বর সিটের কাছে মোটরগাড়ি আর জনতার একটা ভিড়। ঢোলনম্বরের পার্টির ভিতর থেকে গায়োয়ানেরা কজনে ধরাধরি করে মহারাজের লাসটা টেনে নামাল। মোক্তারনিয়ের জনদল থেকে ঠিক বোঝাই লাস এল আরো। অন্ধকার খনির গহ্বরের মুখে মড়াগুলি তুলে নিয়ে লাফে-মরেরা ঘুরিয়ে দিল একে একে।

শ্যাম্পেনের পড়লো নেশা আর ঘুমের মৌরসী ঘুমাল কর্তৃপক্ষ মুখার্জির চোখ-মুখে। গাড়ির ঝাপসার উপর এলিয়ে মনে ঢোল নম্বর সিটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল আর কি। অনেকদিন পরের একটা কথা। লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা বন্দুকের, আনন্দময় প্রজা-তান্ত্রিকের ধন উত্ত ঢোলনম্বরে নিয়ে খুঁড়ি মেলে দেখছে কঙ্কালগুলি ফাঁসির। অবশ্য গঠন, অসিলিয়ন ক্লিনিকস ও অন্যান্য-চেলন তাদের সাত হিউমান শ্রেণীর সিদ্ধ-পুরুষের নিদর্শনের অভিজ্ঞতায়। আর যেন হাড়গুলি, গাইতা কঙ্কালগুলি যেহেতু-মত আর কিন্তুত হাড়িমার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর এমনি হতভাগা মানুষ যেহেতু একদিন আকাশিক যেন ভূবিপর্যয়ে যেহেতুন আর প্রানিটের মধ্যের সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কঙ্কালগুলি পাশা ফাঁসির; তাদের আকাশের এই এত লাল রক্তের যেন নাম নেই।

সুবোধ ঘোষ

প্রফুল্ল রায়

সুবোধ ঘোষের নাম জানবার আগে থেকেই আমি তাঁর মুগ্ধ পাঠক, এমন অনুরাগী যে ভক্তও বলা যেতে পারে।

ঘটনাটা মোটামুটি চমকপ্রদ।

উনিশ শ একান্ন-বাহান্ন সালে আমরা মফস্বলের কাঁঠি ছেলে সবে কৈশোর পেরিয়েছি। মেঘদূতের পা দিয়েই আর সবার মতো আমারও চলবার। অনুভব করলাম—কিছু করা দরকার। আমার এর আগে কলকাতা থেকে ছিল ন মাইল দূরে হুগলি নিস্তরঙ্গ বেকারত্বহীন এক ছোট্ট শহরে অভিনব কী-ই বা করা যেত? দাদা বুকশেলফ ভরে সেই পুরনো পত্রিকাই পা বাড়াতে হল। শরৎ-পেত্নীনো, অন্নদাশঙ্করের প্রতিভা বসুমল্লিক বিভূতিভূষণের জগা পঞ্চানন্দ্রুর সঙ্গেই—আরও অনেকের অনিন্দ্য সঙ্গে সেদিন ছোট ছিলাম। তার সঙ্গে একটা লাইব্রেরি বা খুলনের মোলবন্দা ছেলে পূর্ণ হবার না। অতএব অন্যদের অন্যেরা এক বিরল ধরে অনন্যই জন্মাতোয় আলমারি ভরিয়ে ফিলে মাইলস্টোন আমাদের হল—অবশ্য সময় পাঠাগার। কিন্তু যা না হলে এর অন্তরাত্মার এর সমস্তটা বিফল সেই বস্তুটি কোথায়? ঘরের দেয়ালে বাঁধানো ছবির মতো আঁকা থাকে 'সবার অলক্ষ্যে' কিন্তু কিন্তু দুর্লভ। সে সব বইয়ের খোঁজ আমরা বিদেশের উপন্যাস পাওয়া, ৪৪-চল্লিশ বলা, ছেলেরা ছেলেরা ঠকবার ছবি। পরে ছেলেরি এদের মুক্তিলাভার ছবিতা।

যাঁরা ছোটদের আর একটি 'লক্ষ' করতে বসে ছোটার। যাঁদের নাম, ছোটদের নাম—সমস্ত সাহিত্যটা উঁকে ছবিতাম। হিসেব তো ছেলেতে হবে।

ছেলেরা বন্ধুদেরের একজনা যাঁ দিয়ে বিদ্যা যাবার। নাম উঁকেছে ছিল ছেলি, লক্ষ্য-টক্ষ্য কিন্তু ছেলি। ছবি দুজন, সমস্ত-ছেলেদের অনেকগুলো পথেও ছোটা ছেলে।

একান্ন-বাহান্ন সালে সাহিত্য-চর্চাটা সম্পাদন অর্থি ছিলাম অন্তত উৎসাহিত। চর্চার ক্ষমতার দু-একজন যাঁ ছে না পরেও আমা যায়। কিন্তু ছন্দ-উপন্যাসের পরবর্তী পড়তম যে আমাদের ছোট সমাজে, আমার তাতে সেতু ছিল না। এটা আমাদের তা আমরাই কমতীমা। মেঘাত বন্ধুরা লাইব্রেরি নিয়ে মেতেছে; আমাকেও দলে থাকতে হয়েছিল।

যাই ছোক, মলাটছাঁটা বইটার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে চোখ পেলাম, সেটা ভবানী-ভা লেখকের যৌথলেখার সংকলন। আমা লেখক এক তাঁদের গল্পের নাম খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু সবার গল্পটির নাম এবং তার লেখক একেবারে 'নিরুদ্দেশ'। কোনো গল্প তাঁর খোঁজার কষ্ট পাড়াই নেই।

বইটার নাম কী লিখব, কলকারের আলমারি আর নাম বলব, তাকে এক পরিচয়হীন গল্পটার যাকি অনেকটুকু পড়ও পড়ে ফেলিছিলাম। কিন্তু পরিচয়ের না, অসীমানন্দের মতো চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর কখন আমার হবে মৌহি, জানি না।

মোটা গল্পটা মেই। সিনিক্যাল থাকতে পারে, আবহমান থাকতে পারে, আবার তার চাইতে বেশি থাকাও অসম্ভব নয়। সেই অসম্পূর্ণ রূপে একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার অনেক, অনেকবার পড়ে ফেলেছি।

সেসব দিনে মনস্তাত্ত্বিকতা আমার কাছে অনাবিষ্কৃত মহাদেশ, তার কিছুই প্রায় জানবার না। অবশ্য স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র, এমনকি বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কারো রচনার সঙ্গে এই লেখাটি মেলে না। সেই অর্থে মনস্তাত্ত্বিকই বা বলি কী! তবু মনে হয়েছে, এর ভাষা আলাদা, স্বাদ আলাদা, এর সারা গায়ে অন্য সৌরভ মাখানো।

আজ যা জানি-চিনি সেদিন তার সব চাইতেই আমার আকর্ষণের জোর। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুললেই ছোট চারপাশে তাদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হাত বাড়ালে স্পর্শও করা। কিন্তু এই গল্পটির নাম তুলসিদাস—একলা চলো রে ছুটি', ল-এজেন্ট মুখার্জি, দুলাল মাহাতো, মাইনিং সিন্ডিকেটের মার্চেন্টরা, নেটিভস্টেট অঞ্জনগড়ের মহারাজা — আমার পরিচিত ভূমন্ডলে তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

গোটা গল্পটা না থাকায় তার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেদিন আমাকে সব চাইতে যা চমৎকৃত করেছিল তা গল্পটির ভাষা। বার বার পড়তে পড়তে অনেক জায়গা কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাস্নির দিনে মহারাজা গাড়ে-আলপনা রাস্তার পিঠে চড়ে জনপ্রে নিজে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনের ছোয়ার রাত্রিমাত্র রাসলীলা গান হয়—রাজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ফলিয়ের প্রকোপে যা হয়—সব জায়গাতেই নাতি। যেখানে রাস্তা আর রাস-বৃন্দাবনি সেখানে নাতি চলেছে আর খু-চায়ে ভক্তাবার রাধা কাটেই। চিত্রে অবশ্যি যা রাসলীলা—এই লাঠির সাহায্যে পাঁও-বেশন করা হয়, প্রজারা সেইভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।' কিংবা নয় বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে, জাদুবস্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উঁচু কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি থেকে দেখছে কতগুলি বলিয়া। অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মসত্তাচেতন আমার শ্রেণীর বিভূতিভূষণের শিলীভূত অস্থি-কঙ্কাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচেনা সৌরভময় এই বাক্যগুলি সেদিন সারাদুপুর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার যে রসনাগ্রে নাড়াচাড়া করেছি! কখনও জোরে কখনও ধীরে উচ্চারণ করে করে কান পেতে কতবার যে তাদের ঝঙ্কার শুনেছি! তারপর বিকেলবেলা ছেঁড়া বই-খানা নিয়ে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছি, এই গল্পটার নাম কী? এর লেখক কে? কেউ জানে বন্ধুরা কেন, সেই মফস্বল শহরের একজনও তার সন্ধান দিতে পারেনি।

তিপ্পান্নর মাঝামাঝি কলকাতায় চলে এলাম। ততদিনে সাহিত্যের সঙ্গে আমার বন্ধুতা ঘটে গেছে। অদৃশ্য এক সিংদরজা

দুঃখ নিয়ে সে আমাকে তার বিশ্বয়ের ভাগও দিয়ে যাচ্ছিল। বাঙলা সাহিত্যের বহু লেখকের রচনার সঙ্গে তখনকার মোটামুটি পরিচয়ও হয়ে গেছে।

এত যা পড়েছি কিন্তু সেই গল্পটির সন্ধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য কলকাতায় আসার পর নিজস্ব খুঁজে যাচ্ছিলাম। একদিন অকস্মাৎ একখানা বই আমার হাতে এল। তার কী আনন্দ, যার পেছনে এতদিন ফালতু উপাধ্যায় ঘুরে বেড়িয়েছি সেই গল্পটি তার ভেতর রয়েছে।

গল্পটির নাম 'ফাঁসিল'। লেখক : সুবোধ ঘোষ।

সুবোধ ঘোষের নাম আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত লেখা তোলপাড় করে আনন্দে নাচালাম। বলতে দ্বিধা নেই সে-সময় তাঁর বই ছিল আমার সর্বক্ষণের চিন্তার সঙ্গী।

।। দুই ।।

'অমৃত' পত্রিকার এই সংখ্যাটি ছোট-গল্প সংখ্যা। সম্পাদকের 'অনুরোধ', সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করতে হবে।

সুবোধ ঘোষের খ্যাতি এবং কীর্তি প্রায় কিংবদন্তীর মতো। তিনি ঔপন্যাস লিখেছেন, [illegible] লিখেছেন, ভ্রমণ ও যৌথবাহিনী সম্পর্কে তথ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারতের ঔপন্যাসিক ঘিরে মনোহর ছোটকাহিনী লিখেছেন। এ ছাড়াও অন্য ছন্দের নাম বর্ণের উপন্যাস, উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে অজস্র রচনা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। তবু আমার ধারণা, ছোটগল্পই তাঁর প্রাণপ্রকৃতি। সেখানেই তিনি সর্বাধিক অকৃত্রিম, সবচাইতে সিদ্ধহস্ত।

।। তিন ।।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প সম্পর্কে [illegible] আলোচনার আগে বাঙলার ছোট-[illegible] দুপরেখাটি চোখের সামনে ধরা [illegible] তাঁর রচনার মূল্যায়ন [illegible]।

[illegible] ছোটবোন সকল গাছার মধ্যে [illegible] শ্রেষ্ঠ। সবার ছোট কিন্তু [illegible] সবচাইতে পরিপূর্ণ, সবচাইতে [illegible]। অথচ এই ছোট [illegible]

বাঙলা ছোটগল্পের আদি পর্বের সঙ্গে বাংলা [illegible] ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়ে আছে। [illegible] এবং রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য [illegible] ও তাদের রবীন্দ্রনাথই প্রথম [illegible] উপায় দেখিয়েছেন, অর্থাৎ ঘরোয়া পরিবেশকে [illegible] সোনালি [illegible] ভরে তোলা।

[illegible] ছোটগল্পের আদি পর্বের লেখকদের জন্য পথ তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সবচেয়ে [illegible] লক্ষণ করেছেন, পথের আলোর নৈসর্গ থেকে বৈচিত্র্যে, কৌতুক থেকে যৌবনে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর পরে বাঙলা সাহিত্যের অনেক ছোট বড়ো মাঝারি ছোটগল্পের জগতকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। তারা চরাচর ঘুরেছে, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর পরবর্তীরা এই কাজকর্মখচিত, এমন মৌকরার, সেখানে একটি নতুন লেখকের পক্ষে মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ নয়। তবু সুবোধ ঘোষ এসেছিলেন। 'বনফুলের মতো, সমুদ্র অনেকদূরের মতো। বিভূতিভূষণ বাঙলাদেশের দুটি সর্বাপেক্ষা মোহময় ছোটগল্প হাতে দিয়েছিলেন—'অযান্ত্রিক' এবং 'ফাঁসিল'।

।। চার ।।

বাঙলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ কেন স্মরণ করেছেন, কেন বলে থাকি বিশ্লেষণ এবার শেষ করা যাক।

তার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার, রবিমণ্ডলের মতো উজ্জ্বল চক্রপথে অনেকগুলি ছোটগল্প নিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। হেসে-চলা - ঈর্ষা-হিংসে বিদ্বেষ— অজস্রের মতো জীবন যাপনের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয় নি।

সুবোধ ঘোষের অবিস্মরণীয় লেখা থেকে আর তিনটি গল্প আমি এখানে বেছে নিচ্ছি। 'অযান্ত্রিক' 'ফাঁসিল' 'মোজাম্বিক'। প্রেমের গল্প, রহস্যরসের গল্প, ঈর্ষা-বিদ্বেষজীবনের গল্প অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু 'অযান্ত্রিক' বা 'ফাঁসিল' কিংবা 'মোজাম্বিক' সুবোধ ঘোষ ছাড়া আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনার বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণ এদের মধ্যে উপস্থিত। এগুলি তাঁর মনোভঙ্গির প্রতি-নিধিস্থানীয়। এদের মধ্যেই সুবোধ ঘোষের পরিচয় বাঙ্ময়রূপে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুবোধ ঘোষের আগে বাঙলা ছোট-গল্প ছোটমাটি রবীন্দ্রানুসারী। আদি-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকে মর্যাদার মনোলোকের সঙ্গে একাত্মতায় মেলে নিয়ে-ছিলেন আর সীমা খুঁজে যেন অতিক্রান্ত হয় নি। অবশ্য কয়েকজন লেখকও ছিলেন। ছোটগল্পের দেহে তাঁরা চারুতা এনেছেন, চারুচিত্রা ফুটিয়েছেন। কেউ কেউ বিষয়-বস্তুরও অভিনবত্ব এনেছেন। ফলে বাংলা গল্পে কলমাকুটি এসেছে, গাঁইকা এসেছে, বেদেরা এসেছে। বৈরাগ-বৈরাগী, ভিখিরী, ছেলে-আপি, ছোর-ডাকাত—বাংলা গল্প সর্ব-সমার মতো সবাইকেই কোল দিয়েছে। এত বিচিত্রতা সত্ত্বেও অবশ্যিত অনেকগুলিই বাঙালী লেখকদের চরণ স্পর্শে। যেমন্তু ছিল, ভয়-সম্ভ্রম, নৈসর্গলক্ষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিভূতিভূষণের অনেকটি গল্প বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের বাইরে এসে তেমন বিশেষ আত্মপ্রকাশের সুযোগ নি।

আরেকটা কথা, সুবোধ ঘোষের সুবিখ্যাত গল্প সবগুলিই মাঝারির সুর-সুরের আলো-আঁধারের প্রতিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই শতকের গোড়া থেকে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে ঢেউ উঠেছিল বাঙালী লেখকেরা সে সম্বন্ধে অনাসক্ত। সমাজের একটা বৃহৎ অংশ আমাদের ছোটগল্পে প্রায় অনুপস্থিত।

এদিকে সময় বসে থাকছিল না। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুনকাল এসেছে আমাদের, তার পাশে কল্লোলের হাওয়া সমাজবাদ সাম্যবাদের হাওয়া নতুন ধনিকতন্ত্রের হাওয়া, প্রগতীবী মনুষ্যের সঙ্কেতময়তার হাওয়া। সুবোধ ঘোষ এই সবকিছুকে করেছেন। শুধু ধরেছেই নি, বাঙলা ছোটগল্পের হাত ধরে একদল থেকে অন্যদলকাল পৌঁছে দিয়েছেন। লেখক থেকে তিনি শিল্পিকালের শিল্পী। 'অযান্ত্রিক' 'ফাঁসিল', বা 'মোজাম্বিক'—এই গল্প তিনটি বাঙলা সাহিত্যে স্বকাল-বিজ্ঞাপিকা রেখার মতো সুবোধ ঘোষ এদের মধ্যে ছোট-গল্পের আলাদা ভূগোল সৃষ্টি করেছেন, আলাদা আবহাওয়া এঁকে এদের ফলিয়ে তুলিয়েছেন, এদের ঠিক সময় করেছেন। যা আগে আর কখনো আয়ত্তের কথা বা কল্পনীয়ের হয় নি। অবশ্য এই অবদানও তিনি সহজলভ্য করে রাখেননি।

।। পাঁচ ।।

এবার সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাক।

(ক) সুবোধ ঘোষ আশ্চর্য পরিমিত-বোধ। কোথাও কোন অবস্থাই তিনি চলতে দেন না। সবটাই তিনি আয়ত্ত, স্থির। যে সংক্ষেপটুকু হলে মাঝারি-মাপের একজন লেখক হাজার পাতার বিরাটায়তন ফেলে বসতে পারেন, সুবোধ ঘোষ তাকে হাতের পাঁচটি লাইনেই ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর যে কোন গল্পের চেহারাটি অত্যন্ত ঝকঝকে, সংহত।

(খ) সুবোধ ঘোষের ভাষা আশ্চর্য ঝরঝরে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কল্লোল এবং কল্লোলোত্তর লেখকদের গল্পের সবাই ভাষাকে মুখপাত্র, সুতাকল এবং লাবণ্যময় করে তুলেছেন। সেখানে সুবোধ ঘোষের ভাষা পরিমান। পড়তে পড়তে মনে হয় একটি সরল মানুষ এর সেখানে বসে আছেন এবং চারিটি কথায় আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন।

পরিমানই শুধু নয়, তাঁর ভাষা ঘরোয়া, ইন্দ্রিয়ময়। চোখের সামনে সুবোধ ঘোষের যে কোন ঘরের একখানা পাখা খোলা থাকলে মনে হয় কাজকর্মরত মানুষ দেখছি।

(গ) বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষ রিয়ালিস্ট। কিন্তু তাঁর বাস্তবতার আখ্যান ভিন্ন। বাস্তবতা বলতে কথা কুয়াশা পরিমণ্ডলে একটি ছবি আলোকেই ফুটিয়ে থাকেন। সুবোধ ঘোষের 'রিয়ালিজম' তার সঙ্গে মেলে না। সবকাইতে যা জরুরী সবকাইকে যা প্রাণিক তাকেও তিনি সুষমা দিয়ে ঘিরে রাখেন।

(ঘ) সুবোধ ঘোষের লেখার আরেকটি লক্ষণ কৌতুকময়তা। কৌতুককে তিনি কখনই উচ্চহাস্যে হতে দেন না, শুধু আমার মতো বাস্তবানের গায়ে আলতো করে মেখে রাখেন।

।। ছয় ।।

বাঙলা সাহিত্যের সুকালা, সুবোধ ঘোষ ইতালীয় ছোটগল্প লিখেছেন [illegible]।

এই দেখুন এরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসার পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।

সানরাইজ

গুঁড়ো মশলা। ঘরে-ঘরে এত ছুরি কেন।
বাটা দিয়েছেন বিদায়। আরামের ভরে মৌ।

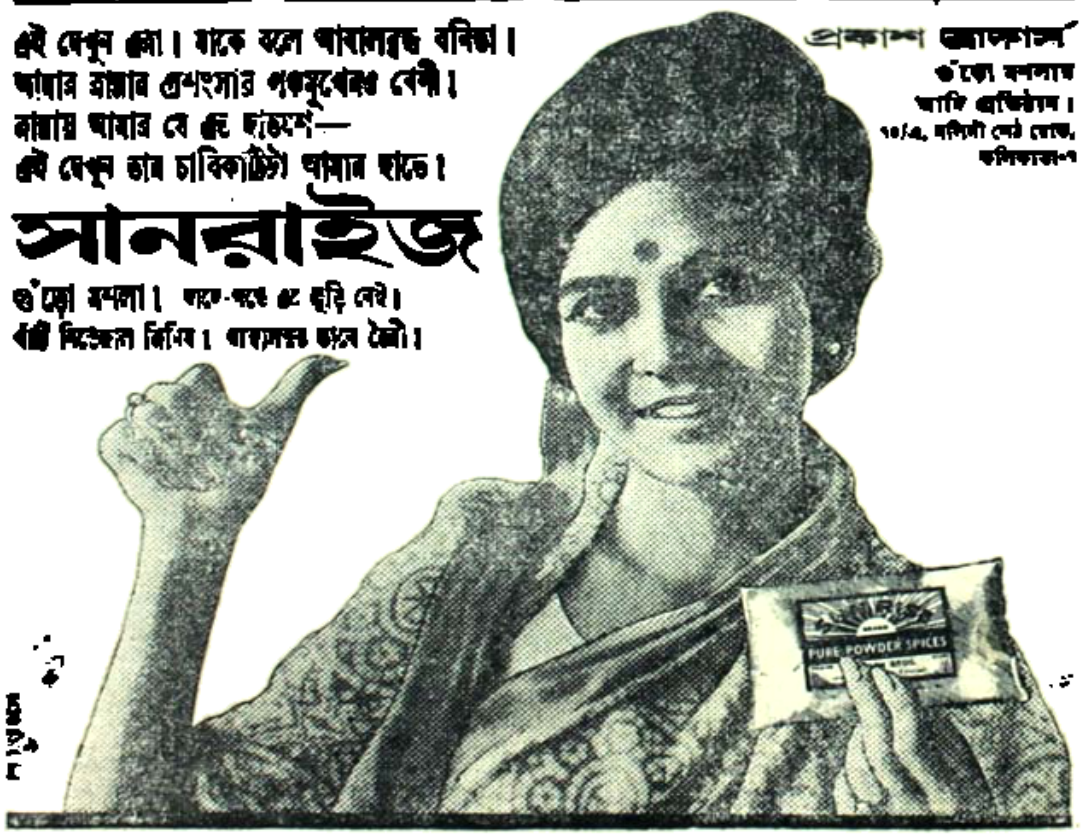

প্রকাশ ব্রোডকাস্ট
গুঁড়ো মশলায়
আদি প্রতিষ্ঠান।
১৩/এ, মতিলাল সেন রোড,
কলিকাতা-৭

ধরণী

বিমল মিত্র

এ গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম; কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকেই বাস্তবিক সুখদুঃখের মিশ্রণ জারিয়ে রেখে এসেছি। তা ছাড়া নিজের সুখ দুঃখের চেয়ে তো এখানে ওটাই বড় নয়, কারণ মিসেস চৌধুরীর দিকের অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে ফেরাবে দেয় করতে অনেকদিনের সেবাবে শেষ আমি করতে পারছো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কিনা, তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভাল আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য নাম রেখেছে...

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

মিসেস চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সেই কথা।

কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ ঘোরার পর রাস্তার ধারে দেখে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছি। দুঃখ না হোক, মিসেস চৌধুরীকে সুখীও বলা চলে না। আমাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে উনি সোফার ওপর উঠে বসেছিলেন। মুখে-আধা পান [illegible] মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে [illegible] দিয়েছে।

—একটা জরুরি বিষয়ে পরে তোমার কাছে এসেছি—তোমাকে একটা কথা লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কি হলো?

—তুমি কথা বার্তা লিখবে? তুমি অনেকদিন লিখছো, টাইপও, এ-ও তোমাকেই লিখতে—

—বলে ফেলুন—কী ব্যাপার?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমার একটা গল্প লিখতেই হবে—

—লাবণ্য কে?

—লাবণ্য তোমাকে সব কিছু আগে থেকে বার্তা—লিখবে?

অসম্ভব কথা লিখতেই হলো।

মিসেস চৌধুরী বললেন—বহু ঝঞ্ঝার পরে আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই থাক, আমরা চরিত্রহীন নই। আমার বাড়ীতে যারা আসে, আমি তাদের কাছে যাই—আমা কেউ আমাকে সতী সাধ্বী বলে না জানুক, আমাকে অসতী বলে জানে না। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলে কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে তাকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানে না? জানে বৈকি! সব জানে। আমার বিসের আয়রণ, আমার সেই চলে ফিরে—সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা—তাদের নাকের ওপরেই তো আমার কারবার চলছে—তবু কিছু বলে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী আমার আশা করেন না। তাই আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস চৌধুরীর আবেগাকুল চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। মুহূর্তে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই যাদের কেন তোমার হয়ে বলেই বলছি, আমার কেউ ঘুলাতাদিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমার ত্যাগ করেছে—আমি সব জানি, সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী সাধ্বী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তাই-ই। আমার সুইকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক ভোরবেলা আবিষ্কার করলেন—সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি—তা ছাড়া তোমরা তো জানো, এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ফুল বকতে শুরু করি,—

কথা বলতে বলতে যেন হাঁফাতে লাগলেন। বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার নিশ্চয়ই সংযমের তিন কাপ চা খেয়ে তবে আবার লেখা কাটে, আজ সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে এক কাপ চাও তো তিনি খাওয়াননি—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝবে এটা অসাধারণ ঘটনা।

তারপর লম্বা শ্বাস টেনে বললেন—তোমার চায়ের এখনো আছে—চা করবে—

সাঁইত্রিশ বছরে মিসেস চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে আঘাতে নেশার খোরাক পেয়েও ভুলে গেছেন তিনি—এমন কঠোর তার বন্ধন। নইলে মিসেস চৌধুরীর মত মেয়েমানুষ এই রাতে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন। অথচ সে আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অন্ধকার আকাশে তিনি যেন পথ-হারিয়ে ফেলেছেন। দূরে পথশ্রান্ত উপগ্রহের না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন! তাই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র ভরসা, গল্প লিখে আমিই একমাত্র তার প্রতিকার করতে পারি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে ফেলেন মিসেস চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আছে বলো? আরো যেমন কতজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এরের সঙ্গে আমার মিসের সম্পর্ক। কত রাজেন্দ্রাণী, ভারতী, গুজরাটি, বাঙালী আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ দু' ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারা রাত ভাড়া করে—

বিশ্বাস করেনিশ্চয় ঘর আমার, ভাড়া দেব —আমার কাজ কুরোলে চলে যাব, লাবণ্য ওদের কে একজন—আমার সঙ্গে এর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত ভাবাভাবি, তাকে নিয়ে এই গল্প ফেঁদে বসার চেষ্টাই বা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস চৌধুরী বলবেন—কিন্তু তা হলে কি তোমার ঘুমোবার অসুবিধে হবে? এই যে তোমরা ঘুমোবার ঘরে যাও, নিজের পছন্দ করে খাও-দাও, শুটিং করো, কখনও ঘরভাড়া চেয়েছি? ফ্রেঞ্চকোলের একখানে ভাবিয়া লিখেছি, তাই তোমাদের ঠেলেছি দিনি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ও সব হলো না—না ছোক, সকলের সব দিনিস হয় না, ওই বাড়িভাড়া থেকে যে ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার দেব জীবনটা একরকম কাটিয়ে দেব—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ কিসের কথা। কেমন করে কাটিয়ে দেবার মত জীবন তাঁর হয়। এ কথাগুলো অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—কুলচাইকে তুমি চেনো?

বললাম—চেনেছি—

—ওর মনে অনেক বড়লোক, যে এক-কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করতে বলেছিল, আমি রাজী হইনি—আমি বরং বড় ব্যবসাদার মেয়েদেরই বই না কেন, একবারে তো আমিও ওদের বই ছিলাম, তোর সকালে ঘুম থেকে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলেদের না দিয়ে—আজ না হয় তোমরা আমার দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ দিই, ভেবেছলো গালে ঘুরে দিই—

হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো।

বললাম—থাকগে, এসব কথা—আমার তৈরি করিয়ে—তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো—

—এখন? এত রাত্রে?
—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে।

গল্প শেষের পর আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, একটা তোমায় লিখতেই হবে—হবে ওই মেয়েমানুষটা শুদ্ধ বলে দিও—মেয়েরাই কখনো এইভাবে শেষ করে—কেমন?

ওদের গাড়ি-বারান্দায় এসে আবার বলেছিলেন—তাহলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা দেওয়া। পুলোহিতকে —মিসেস চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সুত্রধার—কখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি তখন মিসেস চৌধুরীর কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস চৌধুরী যেমনেই থাকুন এ গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে স্নেহ সে ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়।

কিন্তু তা আর হয়নি।

ট্রামে বসে সিনেমার সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চোরঙ্গীর ধারে গেলে লম্বা অর্ডার মাথা ঠোঁট রেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। দেখেছি—এই-ই বোধহয় মিসেস চৌধুরীর লাবণ্য। লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের লাভ সান্ধ্য পরিবেশনটিতে পুতুলনাচের আনন্দ পরিবেশে খুঁজিনীর দিকে চেয়ে চোখ আমার সজল হয়ে গেছে—এই-ই কি লাবণ্য? হয়ত নিরঞ্জনের উধার চেয়ে চতুর্থে সে লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আমার অন্তর্দৃষ্টিতে মনের খুশী মেটেনি কোথাও। মিসেস চৌধুরীর কাল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যর বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মত পুরুষকে তো আজো লোক সকালবেলা বাসে চড়ে আফিসে যেতে। টেনেবুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক। ট্রাইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। একখানা ভোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা ফ্লেট—একশো টাকায় একরকম চলে যায় বৈকি। আর লাবণ্য?

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মতো সাধারণিকে—পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস—

তা সত্যি! আমিও ভাবি, ও মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে যায়। মিসের করে ফেলের খরচ, ঘর ভাড়া, ঝিকিন, তারপর দু-একখানা কি সিনেমাতেও যেত না?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্য যেমন হলে কি হবেএকটা মানুষের ডিসটার্ব জন্যে সকলের ওকেই খুব পছন্দ হতো—তা লাবণ্যকে আমি কল্পনা করে নিতে পারি বৈকি। মিসেস চৌধুরীর কল্পনার সঙ্গে অনেক সময় ছায়ার মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একা লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিফটের সুইটের মেয়েরা ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে মনে মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আবার চলেছে মিসেস চৌধুরীর দিকে, সুখের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টা। জনো একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসবে—ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—!

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস চৌধুরী আবার সাধনা শুরু করেছেন। সেই আগেকার মতন। সাহেব, মেম, মোটর, লোকজন-পরস্পর দেখিয়ে সামনের নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। পরনে ট্রাইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—লিখুত্ত ঝরে গাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা শর্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে চাইলাম। জাঁকালো জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে—ভালো করে দেখা চাই। মিসেস চৌধুরীর কল্পনার সঙ্গে আজো এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যর পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরেছে। নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই ট্রাইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত।

সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল ফুটপাতের স্রোতে মিসেস চৌধুরীর কাছে গেলো নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রঙ-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিলে এর?

আরো পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও ডিটেল, চেনা-শোনা লোকান—মাত্র মাত্র দু টাকা করে নিলেই চলবে।

লাবণ্য বলছে—কিন্তু যেন ফিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বদলানো দরকার—ফিতে, ছেঁড়া—জুতো এক-জোড়া কিনলে হয় তোমার—

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চার্জটা পাকা হয়ে যাবে—তার আগে নয়—

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানো আমাদের দরকার—তা না হলে আর কতদিন মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে—গত মাসে ভদ্রলোকের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে।

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার কালো হয়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎহীন দিন-যাপনের ক্লান্তিতে তাকে যেন ক্রমশ এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন মুক্তবাতাসওয়ালা ফ্লাট। তিনটি কিংবা চারটি ঘর এমন কি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তারপর যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন সুদিন আসে, সেদিন...

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি—জানো—

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া?

—ভাড়া বোধ হয়, পঞ্চাশ—কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়। চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দুবছর ধরে পরিচয় হয়েছে।

অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে এমন করে আর মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চারদিনই এলেই তো হার পাঁচ কুড়ি টাকা চলে যেত। এক-এক মাসে পঁচিশ ত্রিশদিনও এসেছে। তবে মিসেস চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা ছাড়া ক' ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর আবার কতদিন পরে যেতে হবে! চলতে চলতে লাবণ্যর হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

অনেক কথা বলতে বলতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর মোটরগাড়ির শব্দ শুনীতির কথন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়।

একলা একলা মিসেস চৌধুরীর ঐ পুরনো পাঁচতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন সবকিছু থেমে যায়। সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেক্রেটারি বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস চৌধুরীর বাড়ির সেই সেলামী বন্দোবস্তটা আর সেলাম করলে না আগেকার মত।

মিসেস চৌধুরী বলতেন—ঐশানীকে থেকে বাসন্তী আসবে, ভেতর থেকে আসবে কল্যাণী, বেহালা থেকে আসবে টগর—কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে—ঠোঁকাঠুকি আজ থেকে যাবে শেষ করে আসবে—কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে—নিরঞ্জনের কখন ডাকবি ছিল না, ও-ই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।

ঘর-ভাড়া হয়ত অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন সুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অফিস আর মর্নিং শোয়ের সিনেমা দেখা। শোয়ের বন্ধুরা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোণাকোণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন। ডেকেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে সোলমাল কিসের—আমার তাস দিয়ো না তাই—

বাইরে থেকে মেম খানসামাটা বলবার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ছেড়ে উঠল মিসেস চৌধুরীর...অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেষ্টেজি এসেছিল। কুলদীপ শেষ। তবে ছুরি একেবারে—একদিন ঘায়েল করে দিয়েছি—হুঁহু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্—থ্রি ডায়মণ্ডস—

সেদিন অনেকক্ষণ পরে সেই কুলদীপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, লম্বাচওড়া একটা মোটর হর্নের সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দেখি কুলদীপ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর সার? আমিও ভালো করেছিলাম কিন্তু খবর পাবো। কিন্তু কুলদীপই প্রশ্ন করলে—মিসেস চৌধুরীর খবর কিছু জানেন সার?

কুলদীপ মেমের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও পাড়ায়—যেখানে ব্রেক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস চৌধুরী মা যান—মিসেস সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। হোকগে ভদ্রমহিলা। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে কুলদীপের। তিনটে আসল আর দুটো ডেমোল ফেমিজেটেড্ ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সাঁঝা সাঁঝা অমলার কবিতাটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সান্ধ্যাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যর অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্য চমকে উঠেছে কম না। বললে—একি, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার—

—তা হোক, তবু এলাম—মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাবো—আজ মন থেকে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছ? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস, ভাড়াটে—

অকালে চুল পাকা বন্ধ করা যায় কি?

যায়। তবে কলপ দিয়ে নয়, স্নায়ুর চিকিৎসার দ্বারা। অকালে চুল পাকার অন্যতম মূল কারণ, আধুনিক জীবন-যাত্রায় প্রচণ্ড গতি এবং তার ফলে স্নায়বিক উত্তেজনা। চুলের অকাল পক্কতার এই মূল কারণ দূর করার জন্য স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমিত করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্যালকাটা কেমিক্যালের আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সুরভি ব্রাহ্মরসায়ন কেশ তৈল—ব্যবহার নিয়মিত ব্যবহারে মস্তিষ্কের স্নায়ু ঠাণ্ডা থাকে। ফলে-এ সাথে স্নায়ুরাজ দারু আরও নানাবিধ আয়ুর্বেদীয় গুণ স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত করে, পুষ্টিকা আনে, কেশমূলকে সাহায্য করে এবং কেশের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনে।

বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯এ ঠিকানায় "ব্রাহ্মরস" এর বিস্তৃত বিবরণসহ পুস্তিকা পাঠাবার জন্য।

—সে একরকম বলেকয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে বোধহয়—আমার আবার, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যর সে দুঃখ-দুর্দিনের ইতিহাস। মেসের খাওয়া আপত্তি হলো লাবণ্যর সেইদিন থেকে। দুবেলা হলো সেকেণ্ড ক্লাস টামে চড়া। তিনদিন বন্ধ এক-একদিন নিজের অসহায়তায় দুচোখে ঘরে বেরে নিজে ঘরে ঢুকে দোরে মিসেস চৌধুরীর ঘরে খাওয়া বন্ধ করে। দুদিন যেতে পারলে এক-দিন অন্তর। তবে ঘুচিয়ে দেবে আর কেবা হলো না।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে বিশেষ অনুরোধ করে—আমার ঘরের ভাড়ার যেন পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্য ঠিক হলো তিন টাকা—তা-ও সব সময় নগদ দিতে পারত না—বাকি পড়ত—

কিন্তু ওদিকে টেলিফোনের আলন্তীর ওপর পায়ে চাকাই গাড়ি উঠেছে। ছেলেমার কলাণী মনুন একরকা হয়ে পড়লো। মেয়েমার উপরও দুদিন দুঃখ ভেঙে তিনি নেমেছে তখন পড়িয়েছেই। ঘরের গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস চৌধুরীই বা হাঁড়িয়েন কেন? ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে যেখানে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। ঘরের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস চৌধুরীর টেলিফোন সারা-দিনরাত এনগেজড্ থাকে।

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম, আমি। দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওঁকে এক ফাঁক উপহার দেবো। তারপর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাবো জায়গায় জায়গায়। মিসেস চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি, বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে লোক হয়ে ফুটপাতের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিসও সেখানে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার হলো—নিশ্চয়ই কোনও দোতলায়, কোনও ফ্ল্যাটবাড়ী হয়েছে। এবার মিসেস চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডাও জমলো বুঝি।

পালাবো কি যাবো না—ভাবছি। সেকেণ্ডে আমরা ঠিক ১৯টিতে পড়বো। জমাটী ভাবতেই ভেতরে ভয় হলো। ছি-ছি! আমরা কি বিপদের দিনে ওঁকে একটি করেই ফেলে পালাবো! সেইদিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো—মিসেস চৌধুরী কতখানি একলা। পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারাজীবন একজন অভি-ভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য।

মিসেস চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্যে আমার প্রাণ হুহু করেছিল সত্যি।

যাক্ সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম—আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কোঁচ ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিন্তু উত্তেজনার রেশমাত্র আমাও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বলেছি—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিসের হাঙ্গামা, কিন্তু—

পুলিসের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কোঁচ হেলান দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন—কিন্তু কী?

—কিন্তু ফেরওয়ার ফুটপাতের ওপর বাঁধন নাচ হচ্ছে—আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে সব ভয় নেই, পুলিস আমার কিছু করবে না—তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা—কিন্তু ওর জন্য ঝামেলা—

—ওর জন্য কী ঝামেলা?

—ওর লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য। কী তার পরিচয়।

আপনার হয়ত মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ অনুদিন থেকে চাইছে, দুপো পর্যন্ত গড়ও করতে রাজী—আমিই রাজী হইনি—দেবে কোন্ দিন না—

মনে আছে এরপরে আমি জিজ্ঞেস করে-ছিলাম—লাবণ্য কে?

আপনি সে প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি হেসেই কোঁচে হেলান দিয়েই বলে-ছিলেন—ফুলচাঁদ যদি রাজস্থানীকে চাইতো আপত্তি করতাম না—রাজস্থানীকে চাইলেও চলতো—ঈশ্বরের খেলাতেও কিন্তু অসবার ছিল না—আমি আধঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম—কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝে-ছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস চৌধুরীই কি জানতেন, তাঁর লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে।

হয়ত মিসেস চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যর মধ্যে। হয়ত সেইজন্যেই ফুল-চাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে!

তাই ফুলচাঁদের ঔদ্ধত্যের উত্তরে মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—দুপো কেন পাঁচশো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না—ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেন নি। ফুলচাঁদ, সেই জাত ব্যবসায়ী। সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে—তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচশোতে রাজি না হয় সাতশো। সাতশোতে রাজি না হয় আটশো—আটশোতে রাজি না হয়—

আলো কেন চেষ্টা করলে দেখতে পাবি—দেখতে পাবি—তেতলার থেকে লিফট বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন। পরনে লাবণ্য।

লাবণ্য কেন খুশীতে উজ্জ্বল—। বলবে—দেখো, একটু আগে সেই কোথাও বাড়িতে—

নিরঞ্জন বুঝতে পারবে না। বলবে—কেন, বাড়ি নিয়ে কী হবে?

EGO BRAND

পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট ইয়ার্ন

(ইকো-ফ্রেণ্ডলি সুতো)

আমাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব

আপনার সেবাদাসের জন্য—হাসপা, পাম, ইউনিয়ন পাকে নিয়োগপত্র

প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রতিযোগিতায় আমরা অংশগ্রহণ করতে চাইনা। তবে সমস্ত পরিচালনার জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আমরা দিতে পারি।

পরিবেশক:—

ইউনাইটেড ট্রেডার্স

৩০১, বউবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন নং—২২-৮৪৮০

—একটা তুলসী গাছ পশুত্তোষ—হিন্দু মেয়েদের বাড়িতে তুলসী গাছ রাখতে হয় যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পশুতলেই চলবে—এই ফ্ল্যাটবাড়ির পাশে—

—কিন্তু সেবার যত্ন কেমন্তো করবে?

—বাড়িওলার মেয়েটাই তো ভালো সন্ধানে। জানলা খুললে আকাশ দেখা যায়—

—একটা ঘাই কিন্তু কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সবুর করো, সবে তো চাকরি হলো—আসছে অঘ্রানে ঘরে নব—আমে বাড়িটাই ছেয়ে—

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—আড়া টাকা ভাড়া— যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন—কিন্তু—

কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, বাবসার আমার অনেক মেয়েকেই দেখে এসেছি—এখন এই বাড়ি ভাড়াতেই সবার চলছে একরকম, তা সেলামী কিন্তু দিতে হবে আপনাদের—

নিরঞ্জন ঘাবড়ে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এসব ঘটনা চোখে পড়ে। আগে জানতে পারেনি—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে—কত?

যেন অল্প-সল্প হলে দিতে রাজী সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তাই দেবেন—তার এক পয়সা বেশি নেব না—আমার কাছে সবাই সমান—

সাধারণীর বাজার পক্ষে নিম্নমুখী রকমই বললেন তিনি।

—তবু কত?

—পুরোপুরিই দেবেন—আড়া-তাড়াই ভালোবাসি না আমি—

তবু দুবোধ্য ভাষায় যেন গল্প করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে—

কুলভূষণও সেদিন সেই কথাই বললে—আইনেতে আমি না হয় হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্য-রকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধহয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন নিরঞ্জন চৌধুরী। তাই হয়ত দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন নি। তবু কিন্তু আপনাকে শান্ত হতে দেখা গেল না। আপনি যেমনি নির্বিকারভাবে চাঁক গিলতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়। হয়ত তখন সাড়ে দশটা। চাঁই ফাইল-ফাইল খুলতে করতে চোখে লাগছে। সারাদিন আফিসের খাটুনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়, আপনার ডাবারেই বসি—আপনার বিলত জীবন, আপনার পরিচ্ছন্ন আশা আপনাকে বাদ দিয়ে আপনার দিকেই সেদিন ফিরে যেন চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনওদিন।

আপনি সেখানে বসেই বেয়ারাটী চাপরাসীকে ডাকলেন—জগদী।

জগদী ভিন্ন লোকে এসে ডাইরেক্টরদের জগদীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আসনে মুখোমুখি হয়ে বসলেন। এবার সেই যেন হয় প্রথম আর শেষবার।

তারপর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে কুলভূষণের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো পৃথিবীর প্রত্যেকটি আদ্য পর্যন্ত বত মানুষের পদধ্বনি পাচ্ছেন, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের ওপর যদি আবার উল্কাপিণ্ড হয়ে তা ভেঙে। নক্ষত্রহীন আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত হয়ে যদি বিপ্লবোন্মত্ত হয়ে তা ভেঙে। তবু আপনার আশা অটল থাকবে।

লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর মেঘ ঘনিয়ে বাঁড় ঠেলে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করি মাসিমা—

মর্নিং শোয়ির আড়ালে আবডালে একলা আলেকা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হলো দুজনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি রাজি—

কথাটা যেমনই লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি যেমনই শুনলেন—ঘরের ভেতর ফুলেটাই সে কথা শুনে মনুষ্য বরানো সিগ্রেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর—আপনি যে আপনি—আপনারও মনে হলো বারান্দার চেইনে বাঁধা অ্যালসেশিয়নটা যেন ওর সেই ওপরা সেই ধরাণ ভুলবে কে'সে উঠলো।

ফলাফল—তারপর?

মিসেস চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেদিকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর? সেই প্রথম, সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে—তি স্কুল স্টাইলের মেয়েরা আর কোনওদিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে। মিসেস বললাম—তবে কোথায় গেল তারা—

মিসেস চৌধুরী বললেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও যোগ্যের অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে—টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি—বেহালার উমাকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কি কুলভূষণও না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়ত ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে—

—তাও হোতাম অনেকদিন। হয়ত অফিসটাকে দুখ দিয়েছিল নিরঞ্জন—আর ওদিকে আত্মীয়স্বজনের হয়ত আক্রোশের করেছে লাবণ্য।

নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি ভেবে মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুবই খুশী হয়েছিলাম। মিসেস চৌধুরী যেদিন বিদায় নেবার পর আমার সুটকেসের মধ্যে একটা চেকবুক আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ! সে আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা খুব জোরে উঠে তিন কাপের বদলে তিন—তিনকাপ—না কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম—

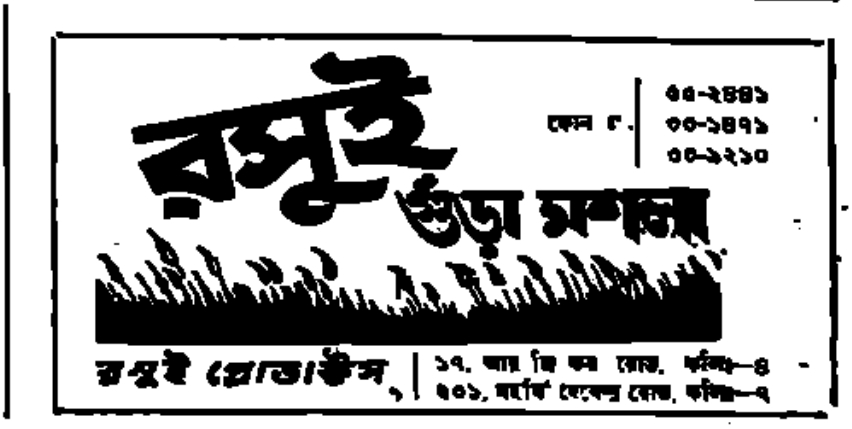

মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে বোধ হলো তিনি কথা বলবেন আর চোখ ফেরে নেন পড়ে ঘরি আলোয় মুখে ঠোঁটের নিষ্প্রাণ চোখের মণি দুটো সব মুছে মুছে একাকার হয়ে আছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ মিসেস চৌধুরী হঠাৎ সচকিত হয়ে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিলেন।

আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—আর পড়ে বললেন—তার পর একদিন পরে আজ সকালবেলায় এই চিঠি—চিঠি পড়ে আমি তো অবাক—

চেনবার নিশানা আর লক্ষণের বিচার বিশ্লেষণের চিঠি। পড়েছেন নি কালী সরকার রোড, ছোট্টো কথা সাহেব, আজকের ডাকে।

আমি মিসেস চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি—

বললাম—কী দেখলেন?

—দেখবার কিছুরই যেন হয় তেমনিই, একখণ্ড নিশ্চিহ্নে নিশ্চিহ্নে পড়েছে চলনের ছোট্টো। নিজেদের মাঝেও মধ্যের পাচারী, বাবার চৌপর। ছবির কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন যেখানে ছিল তারা সব যে জানে! আজ ছবির ওদের শূন্যতাকাতরীর আর আসবাবিবাদের অভাব নেই। বাড়িটাও ভরেছে, ড্রাইংরুমের পাশে একটা ছোট ঘুলঘুলী ঘরে ঢুকিয়েছে, সোনার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুলেলে আকাশ দেখা যায়—আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু তাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম—ঘুলঘুলীর স্পর্শের ফলক কোথাও নেই একটুকু—চলনের ছোটোর সব চেয়ে চেয়ে—কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না—আমি প্রস্তাব না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত আকাশটা ছোট ছোট করে ঘুরে এখন এই ঘরে বাড়ীটার সময় তোমার এখানে—

কথা বলতে বলতে মিসেস চৌধুরী যেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো এখনি যেন তিনি নিবে যাবেন—

বললাম—তা হোক, তবু নিজেদের উপায়তা আছে বলতে হবে—

মিসেস চৌধুরী হঠাৎ করে উঠলেন—তা থাকলে উপায়তা, কিন্তু কথন তুমি ওদের নিয়ে বিয়ে পারবে না—সেইটুকু তোমায় করতেই হবে—

কেন?

মিসেস চৌধুরী হঠাৎ নিয়ে বলতে লাগলেন—হাঁ, [illegible] ঠিক যেন সেখানটায়, নিজের ছেলে—নিজে এসব নিজেরাই দিয়ে পারবে না তোমার কথন—এই বলেই তুমি বলেছ যে—আমি মিসেস চৌধুরী হয় সাক্ষী—

বললাম—কিন্তু আমা তো হয় না—

—কিসের যারে, আলবৎ হয়ে, আমার মুখে ছেলে—ব্যবস্থা মতেও—বাসন্তী, কলকাতা, কিন্তু, সমস্তের মধ্যে—আর তা ছাড়া যদি কিছু কিছুই হয় তো ভূপিন আছেই এদের বিষয়-বিভবের ব্যাপার নিও—তারপর যখন থাকে, লাবণ্যকে কলকাতা, বাসন্তী আর ঠাকুরের পর্যায়ে আনিয়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে—ব্যবস্থা বাড়ি আর নিয়ে যাবার মতন..... [illegible]—না করবে? লক্ষ্মীটি, দেখবে [illegible] নিও—

আমার বিরোধ করলাম—কিন্তু কেন?

—তবে নাও আমার পর—আর কিছু নয়, একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমায় কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই—আর তা ছাড়া শান্তি-স্বস্তিটা না পায় বল— কথাটা বলো তো?

অতীতের সব কথার পুনরাবৃত্তি করে আর লাভ নেই আজ। শুধু বলতে পারি, কম আজ করে এ কথাটা বলবার জন্যে আমার চেষ্টার আজ অন্ত ছিল না। শুধু বাসন্তীদের অন্তর অনুরোধ করেছি—তেমন বিশ্বাস করেছে, তেমন করেনি। কিন্তু ধারণেরই সবোচ্চ চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি, এত অভাবনীয় বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। শুধু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখছি আজও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজও তো তেমনি সেরেই চলি। তাই সবশা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়—বিধবা ছবাকে আবার পাঠাতে হয় আমেরিকায়। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতোই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অন্তপক্ষের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে দিয়ে পালাবো আমিও আপনার মতোই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা স্বস্তি-স্বস্তিটা না পায় বল এই সাধারণ প্রত্যাশাকারীরও একটা উপায়ন স্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক—সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে।

সেই জন্যেই তো আলাপ্রিয়ায় যে, এ গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম।

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না—ছবাও একটা কারণ আছে বৈকি। সেই কারণটাই বলি। লক্ষ্মীটি, বিশ্বাস আমার বাধা দিয়ে হয়ে এসেও আমাকে তা বলতেই হবে।

সেদিন কলকাতার বাইরে সি-পি-র একটা মেডিসিনারী অফিস থেকে হয়েছিলো আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতির পদের ভার নিয়ে। সভা হলো।

সভার শেষ ভীড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওদের বেয়ারার অফিসার ক্লিষ্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভারি আতিথি-পরায়ণ। ছেলে ছোকরা। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ ঝোলা মেজ—ওদের সবার পরিচয়টা একটি সুন্দিপ্তে জানান হলো। [illegible] আছে। তা পরিবেশন [illegible] মিসেস মজুমদার।

ক্লিষ্টার মজুমদার বললেন—মিসেস মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—আই মেন্সে আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন—

মিসেস মজুমদার লজ্জারক্তমুখে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পড়ার আলমারিতে আমার বই-এর সঙ্গে আমার বই ক'টা দেখতে পেয়েছি। আগেই।

ক্লিষ্টার মজুমদার আবার বললেন—এখনকার মহিলা সমিতিটা ওঁরই তৈরী—আর আজকের যে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ওঁর চেষ্টায় হলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সুপারিশ করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হয়েছেন বলে মনে হলো।

হঠাৎ তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। ছবার চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একটি পাঁচ ছ বছরের ছেলে। সুন্দর মেয়েলী। ছেলেটিকে দিকে পাড়লাম। সভায় এই ছেলেটিই আমায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মার কোলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। আমায় এটি আপনার ছেলে বুঝি—কী নাম তোমার খোকা?

খোকা জানালো তাকে।

ছেলেটি কিন্তু আমায় বললো—শ্রীলাক্ষ মজুমদার—শ্রীলাক্ষ। বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো—ক্লিষ্টার মজুমদার একবার আমার দিকে একবার ছেলের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—এ নামও ওঁরই দেওয়া, এ নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, আমাদের দুজনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে—ওর নাম হয়েছে শ্রীলাক্ষ—

এদের দুজনের নাম নিয়ে কী অন্তর্নিহিত হবে কিনা জানি।

ক্লিষ্টার মজুমদার নিজেই আবার চৌধুরীর বিশ্লেষণ করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে শ্রীলাক্ষ—কিন্তু আপনি আর একটি সিদ্ধান্ত নিন—কি আর একটা সমাধান.....

আমি কিন্তু তখনও নির্বাক হয়ে বসে আছি।

বসে আছি মিসেস মজুমদারকে, এতক্ষণ তো নজরে পড়েনি। তাঁর চিবুকের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল অনুভব করছি।

বিমল মিত্র

চিত্রা দেবসূত্ত

অন্যান্য উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত মহান সাহিত্যের আকাশে শ্রীবিমল মিত্র নিঃসন্দেহে একটি ধ্রুবনক্ষত্র। আজকের বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের হৃদয়ে শ্রীমিত্র তাঁর লেখনীর যৌগিকের গুণে স্থায়ী আসন করেন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন—যে কৃতিত্ব সর্বকালের সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেরই থাকে।

এই ছোট্ট প্রবন্ধে শ্রীমিত্রের মত বহু সার্থকসৃষ্টিসমৃদ্ধ লেখকের সাহিত্য-সাধনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব নয়। যদিও আমার আলোচ্য বিষয় তাঁর ঘোটগল্প হলেও আমরা, বহু ও ক্ষেত্রে বড় জোর তাঁর গল্পের রূপ এবং বেখার ওপরই আলোকপাত করে ক্ষান্ত থেকে যায়। আমার প্রচেষ্টা সেইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শ্রীমিত্রের গল্পের অনন্যতাই পাঠকের কাছে তাঁকে অনাধিক করে তুলেছে। সহজ কথায় বলা যায় তাঁর অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ গল্প বলার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। তাছাড়াও ঔৎসুক্যকের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে আসরে নতুনত্বের সংযোজন ঘটিয়েছেন—যেটা পাঠককে আকৃষ্ট করে বেশী। মোপাসার মত ফ্লবেয়ারের এক সট স্টোরি ধারার প্রবর্তক হিসেবে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে শ্রীমিত্র অন্যতম প্রধান লেখক। তাঁর 'জেনানা সাবোর' গল্পে হেমন্তদার সাহেবের ঔৎসুক্য মধ্যে দিয়েই এ সৃষ্টির সন্ধানটি পাওয়া যাবে। 'জীবন বিন্দুটি', 'আপদ'—ভিন্ন স্বাদ জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এই জায়গায় তাঁর চাইয়াকর্ষণ আছে। সেখানে এসে গল্পের গতি থেমে যায়। অথচ তাঁর গল্পের জীবনের ঘটনাগুলো যে এই পরিণতিকে ঘিরে তোলা—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে মোপাসার মত তিনি সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সংগ্রহের গণ্ডীতে নিজে, দুর্নীতি দুর্বলতা বিকারকে তুলে ধরে তাদের অসঙ্গতি এবং বার্থতার কারণ-গুলোকে আলোচনা নিয়ে চোখের 'পরে-ছেন। মোপাসা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিসম্ভব ভাষায়কে ভাষাতীত অভিজ্ঞতার সন্তারের অনেক-গুলো ঘটনাকে বর্ণনার মধ্যে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যেন তাঁদের চাপিয়ে নিয়ে-ছিল বলে নিয়েছেন চরিত্রগুলোকে।

কিন্তু শ্রীমিত্রের বিশিষ্টতা হল তাঁদের সমাজের চরিত্রগুলির মত অসঙ্গতি এবং বৈষম্য সত্ত্বেও পাঠকের মনে তাদের প্রতি সহমর্মিতার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন জেনানা সাবোর' গল্পের মুজাতা বালা, মিসেস নন্দী, পুতুলদিদি, মিসি মিসি, বরফী গল্পের মিসেস চৌধুরী আমরা ইত্যাদি। এদের কারো জীবনসঙ্গীই সুখের নয়। তাদের চরিত্রের প্রবলতা অসঙ্গতিকে ঘুচে ছাপা নিয়ে চেনের পাঠকের ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু অসঙ্গতি ঘুচে গেলেই এদের প্রকৃত রূপটি বিলিক দিয়ে ওঠে। পুনরুল্লেখ অবান্তরিক হলেও আমার বলতে দ্বিধাবোধ নেই এক সট-স্টোরীর মধ্যে দিয়েই এই ধরনের চরিত্রগুলের প্রকাশ করা সম্ভব।

শ্রীবিমল মিত্র সমাজের গভীর, আর্থিক সমাজ অসাধারণ মানুষগুলোর অসঙ্গতিকে ধরবার নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন এবং নিখুঁত তুলির আঁচড়ে সুন্দর করে এঁকেছেন। তাদের অসঙ্গতিকে ফোটাতে গিয়ে তাদের.....নিয়ে করেছেন পরে চরিত্রগুলোকে বিকৃত করতে। যেমন বেলমাইয়া কুড়ি মিনিটের গল্পের ঠাকুর সাহেব আর রমলালাল, ভেজাল গল্পের জামাইবাবুর জনে জনে সবাই আমে আমে। যে আমাইবা নিয়ে কথা বলতে না পারায় মনে চঞ্চল হাসার টিনের সম্পর্ক ছেড়ে দিতে দুঃখ করেন নি, সেই জামাইবাবুর মনের সুপ্তবাসনা মনে অকপটে নিয়ে করতে পারলেন। চরিত্র গুলোর এই বলার দৃষ্টিভঙ্গীই একদিকে যেমন পাঠককে হতচকিত করে তেমনি যে সমাজব্যবস্থা এক অসঙ্গতির সমন্বয় বিকাশের নিকে ঠেলে দেয় শ্রীমিত্র তাকেই লক্ষ্য করেছেন। জামাইবাবুকে কিন্তু বিদ্রূপ করেন নি। তার এই সমাজব্যবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে জামাইবাবুর মত মানুষের মনো-সমস্যাটাই বড় পাঠকের মনে।

বহু জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে শ্রীমিত্রের। তাদের জীবনের বৈচিত্র্যকে সরলী আয়ত্তে নিয়ে অনুভব করেছেন। 'অন্যদের' গল্পের রায়সাহেব চরিত্রটি তাই বোধহয় এত সার্থক, এত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটি তাঁর অন্যা-ন্য শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক সৃষ্টি।

অনেক লিখেছেন তিনি, তাঁর জীবনের শেষা এই গল্পটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তী-কালের আর কোন সার্থক লেখাই তুলনা খুঁজে পাই না আমি। যে সততা, যে সংযম, সৃষ্টির যে বেদনা একটা বহৎ সৃষ্টির থাকে অনুপ্রাণিত করে, চালকে... রায়সাহেব চরিত্রটি তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পরবর্তী কালে তাঁর গল্প ঘুরেই কাল কাল হয় না। কিন্তু কাল লিখতে পারলেই তিনি সার্থক হয়ে ওঠেন। আমার যে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা তৈরী হল, সৃষ্টির মধ্যে অনুভব ধীরে ধীরে চলতে থাকে।

অবশ্যিকভাবে কোন সমাজ পরিবেশ (পাঠক ক্ষমা করবেন যদি সঠিক শব্দটি মনে করতে না পেরে থাকি)। অর্থাৎ পরিবেশ সমাজ মত তাঁর অসঙ্গতির ধীরে ধীরে

ছিলে পড়ে ঘুমাতে হয়। অবশেষে অন্ধকারে সে সন্ধান খুঁজিতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাধারণ সৃষ্টির মধ্যে মনে মনে আপন সৃষ্টিকে সন্ধান করতে হয়। অবশেষে চরম মুহূর্তটি এসে সোহাগে আপনি কাছে তুলে নিতে হয়। প্রকাশক কিম্বা সম্পাদক মশাই-দের আফিসের বাহিরে হয়ে পড়ে অজ্ঞাতকুলা কত কিছু এমনি নিজে হোলার প্রলোভন কত কালের না পাওয়া সৃষ্টি হয় নিরুপায়, অন্ধদের।

আমার মনের শ্রীমতি নিজেও সে সম্বন্ধে সন্দেহাতীত ছিলেন। তাঁর কাল না লেখার পরিণাম আজ এত সাংঘাতিক হয়েছে। পুরোনো সংসারের লেখক জীবন একদিনে সম্পাদকের ঘরে শ্রীমতি পাণ্ডিত্য নিয়ে উপস্থিতিতে দূরে মহাদেশীপত্রিকের ফেলে হাউসে। কিন্তু লেখকে নিজের বিশ্বাস নেই। লেখকে লেখকে ধারণা আজ এসেছে সম্পাদকের জীবিত। শ্রীমতি প্রত্যুত্তরে লিখলেন—আমাকে দুশ্চিন্তা লেখবেন আপনি। কাল লিখব না আজই যে এখনে চলে এসেছি।.....এ যে কী কারণ তা কেউ বুঝতে পারবে না। প্রত্যুত্তর হওয়া চলে আরবের কিন্তু লেখক হওয়া বড় অন্যায়। সৃষ্টিই যে অন্যায় তিনিও। হয়তো কথায় আর আটকে পাই না। এমন কেউ নেই যাকে নিয়ে কাল বলাই? আশ্চর্য, তবু লোক হাজার উপর থাকে যা আজকের কবলী লেখকেরা।

শ্রীমতির কাল না লেখার কাল তবু আজ সৃষ্টির কাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে এক প্রতিজ্ঞা এত আমার এত আশ্চর্যতার সত্ত্বেও তিনি যে পরিচয় কাল এটাই কাল আমার কথা। এই কারণ যি চলচ্চিত্রের অর্থাভাবের আর আজকি ছাড়িয়ে একদিন সকলে এসে লেখক কালের আমিয়ে আজকালকারের যে ভাবে অন্যান্যের সাহিত্যিকেরা বিশেষজ্ঞের তা শুধু জীবনের ক্ষেত্রে—কবলী হয়ে গেল।

কিন্তু একটিমাত্র আর সাধনাই এল না যি চলচ্চিত্রের। আজকে আজকে আজ কৃষ্টি করে যখন থেকে পারবার করে ফেলে গেল শুধু যি চলচ্চিত্রের চরিত্রের কাল নেই। তাই যে আজে ফেলে হাউসে আজকে অন্যান্যের সাহিত্যিকেরা লেখার চলনের আজার করে ফেলে করে। যি চলচ্চিত্রের যেন আজকালকার করছে, নিজেই নিজেকে ঠকাচ্ছে। আশ্চর্য চলচ্চিত্রের যেন লেখকেরাই অন্যান্যের চরিত্রে। এত কাল আমি চরিত্রের সত্ত্বেও শ্রীমতি নিজের বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে পারলেন না। আশ্চর্য আমার কথা শুনুন (সম্পাদকমশাই) আমি এ পারব না আপনি যে সাহিত্যিকের কথা লিখেছেন তিনি বড় ইচ্ছে কাল-চোখনা করুন, কলমেখোনা করে সাহিত্যিকেই ছোবাড় করুন..... আমাকে তাঁর বলে বেরোবেন না। আমি সাহিত্যিকেই চাই না।'

নিরুপায়ে একবারে সৃষ্টির অন্যান্যায় শ্রীমতির মত নবীন লেখকের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে। হয়ত সেই অন্তর্দ্বন্দ্বেই তিনি তাঁর চিরাচরিত পরিচয় ধারা বিশ্বাসি নিয়ে লিখলেন, আরোগ্যের এবং ইন্দিরার মত গল্প। কাল সৃষ্টির অনেক নিরুপায়ে পাঠকের সাধুবাদ জানাবেন তাঁরা। আধুনিক আরবের বাস্তব দৃষ্টিকে তিনি কৃষ্টিতে ফুটলেন আশ্চর্য করলার মনের। আশ্চর্যই সাম্প্রদায়ের এ যি চলচ্চিত্রের এত অন্যান্যায় ইউনিভার্সিটির প্রকারের তবুও অনেককে যেন নারীদের পরাজয় করে সমের প্রতিপালন করতে হয়, যেন্তি অন্যান্যের এত নির্ণয় আজকের-সর্বস্ব কবির সাধুবাদের যেন পরকার মুখে ইন্দিরা পরিচালকের কাহিনীর পরিচিত-এর মত অনুবাদে পরিচয়ের আশিসের করে রাখে, এই জিজ্ঞাসার এক সমাজবিজ্ঞানের এই বলীয়ের যেন্তি পরিচয়ের মনে আলোড়ন আনায়। আজকে, যে মত সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বেই হোক.....তবু সে আজকেই। তার নিজের মনেই পারা অনেক আজকে। কে জানে.....কখন সে প্রতিযোগের চলি-ধারা কিম্বা যেন ছেড়ে আসে, পুরিয়ে যাবার মত নেই আজকার আর আজিয়ের অবাস্তবের সন্ধানের।

শ্রীমতি একজন নবীন লেখক। তাই তাঁর এই অসম্ভব আর সমাজের প্রতি দায়িত্ব যেন তাঁকে সকল সাহিত্যসৃষ্টির মনে জিজ্ঞাসিত না করে এক মহাজিজ্ঞাসার আশিস করে তুলেছে। কী লেখেননি তিনি, কী লিখতে পারেন নি, আমার কথা বলতে পারেন নি...সম্ভবত এ জিজ্ঞাসাই তাঁকে মহাকালীপত্রিকের ফেলে হাউসে আজকে'খী করে তুলেছিল একদিন। যে মনে মানুষ যেতে পায় না, পড়তে পায় না, মাথাগোঁজার মত নিশ্চিন্ত আজকাটুকু পর্যন্ত নেই, আজকের সুযোগ নিয়ে যে সমাজ তাকে অন্ধ করেছে তাদের পরনের লোভের হাতে, শুধুমাত্র কল্পনার হাত ধরে নিশ্চয় পেতে সকল সাধারণের মানুষগুলো আজকালের আজ সৃষ্টির আর কোন দিশা খুঁজে পায় না —সেই অভিজ্ঞতা মনে সাহিত্যিক কী করেই নির্বাক চলে থাকবে?

কে জানে, শ্রীমতির আজকের এই সমস্যাময় মনের আজকালই যেন একদিন এই গ্রন্থের জন্মান নিয়ে লোকায় হয়ে উঠবে কী না।

রস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অফিসের মাত্রাধিক ছোঁয়াচের ভেতর থেকে হঠাৎ ছুটি পেয়ে ভারি মুস্কিলে পড়ে গেল ভোজালেক। ছুটি পাওয়ার কথা ছিল পরের সপ্তাহে। কিন্তু ছুটি পাওয়ার পর সে ভাবতে লাগল, এই ছুটি নিয়ে সে কী করবে। কোথায় যাবে। কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে।

ভোজালেক ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে সে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে?

ভোজালেক ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে সে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে?

ভোজালেক ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে সে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে?

ভোজালেক ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে সে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে?

ভোজালেক ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে সে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে? কোথায় গেলে ছুটির সবটুকু আনন্দ সে পাবে?

মাটী, নিমকমাটী, খড়িমাটী—কিন্তু কোনও সুবিধা হয়ে উঠল না তাঁর। তিনে তো আর সাহসে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেবের, মনের টান আর কম থেকে আসল খাঁটি নিতে কোথায় কতখানি সময় করে যে সোনাকে যাবে সেই ভাঁজ।

কিন্তু সময় টান বার না মোতালেব, ঘরিতের সুচনাতেই পাড়ার চার-পাঁচ বুড়ি মেয়েমানুষের কথোপকথন শুনে মোতালেব, যত বয়স যেমেই যাচ্ছের সংখ্যা বাড়ছিল, এমন ছেলেমানুষির বাসনের মেড় বুড়ি যায় যেন। হয়ে যায় ছোট হাঁড়ি দেখে চল নামিয়ে দিতে হবে। আর্থিক ঝুল আসিবে, আর্থিক তার, মেহনত কম নয়, এক-একটি করে একখানি চল যাচ্ছের সুক্ষম রস আলবুলি মেয়ে মেয়ে আসে মেয়েই মেলতে হবে, আসিকলার যায় ভুলে ভুলে আনেই করে নিতে হবে ভাল। আরশল সেই বয়সালো ছান যাচ্ছের আলা চোঁয়া ছেড়ে তার ভরে নল পুতরে হবে সরু কাঁচ ছেঁড়ে। সেই নলের মুখে লাগেই করে কাঁদতে হবে ছোট হাঁড়ি। তবে তো রাত ভরে টুপ-টুপ করে রস-পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক মেহনত। সুকনো গাছ থেকে রস কেউ করতে হলে আগে যায় যেন করতে হয় গাছের, এতো আর যায় মুখ নয়, গাছের মুখ নয় যে, যেটার যাদে মুখ সিলেই ছেলে।

অবশ্য কেবল থাকিলে জানলেই হয় না, আগে উঠতে নামতে জানলেই হয় না, খুব ভালা চাই হাতের, যে থাকলো ছান একটি, চালকার লাগলেই ছিটকি দিয়ে রস ছোটে মানুষের গা থেকে। হাতের মুখে সেই ছানের ছোঁয়ার খেজুরগাছের ভিতর থেকে মিষ্টিরস চুঁইয়ে পড়ে।

এতো আর যান আই নয়, গাই আই নয় যে, আগিল পৌঁছে গাছের ডোড়া মুখে খেতে নিলেই ছেলে। এর আগে খেজুরগাছ আই, আইতেও হবে আবার হাত বুলোতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক-ওদিক হলে, বছর মুকতে না মুকতে গাছের পকা-ফকা হয়ে যাবে। তবে মুখ দেখতে হবে গাছের, সে গাছের খুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, মেউয়ের পৈঠা হবে, কিন্তু ছোটার ছোটার সে গাছ থেকে হাঁড়ির মতো রস কখনো আর তুলে।

খেজুরগাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা, মোতালেবকে নিজে হাতে শিখিয়ে ছিল মজফর মুধা। রস সংগ্রহ এবং তত্ত্বাবধা আর বিধি-নিষেধও যেন মনের মানুষের মত আর নামাজ-রোজার মত ছিল নিত্য-নিয়মিত আলা আলাই মুধিয়ে এসেছে, সে খুব থেকেও রস খেজুর মজফর হাতের ছোঁয়ায়। আলা খেজুর গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়বে আর হাঁড়ি, মজফর হাতে পড়লে সে রস মধু, হাঁড়িতে উঠবে। তবে হাতে খেজুরগাছ ছাড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকত পারতেন। পাছাই ভেল ত্রুটি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। মজফর মুধা মোতালেবের সাক্ষাতে বলেছিল মোতালেব, শিয়রে শিয়রে খুরের, আর কতক সঙ্গে সঙ্গে, সাক্ষাতে দু-চারজন আরো ছিল তাদেরকে—নিকনাতে-দের মকবুল, কলাইদের ইসরাইল। কিন্তু মোতালেবের মত হাত পাকেনি তাদের। মজফরের আসন আর কেউ নিতে পারেনি আর কখ।

কিন্তু কেবল মাত্র কাউলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি মাত্র থাকলেই তো হবে না, বাঁশের খাঁখারির ডগায় ঘুন্সিতে রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। গুড়ের মানুষ মাত্র থেকে কেবল একটি পেতে আনতে পারে—কিন্তু উনান ছোটে জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালি গুড়ে পরিণত করবার ভার মোতালেবের উপর, গুড় কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় তোলে পরমার কাঁচা রস যখন পাকা হয়ে মেবে—তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজুরের মেহনত। কিন্তু মজফর মুধা ঘরে কাড়ুনিতে সেই মানুষ সেই মোতালেবের। মোতালেবের মা মরেছিল। দু বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেব এসে দাঁড়াল মানু খাতুনের কাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'আসলো আছো নাকি মানুবিবি?' ঘরের ভিতর থেকে মানু খাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা? আমি মোতালেব, ভুইয়া পড়ছ বুবি? কলে কইয়া উইঠা বসি আপনী একবার ভুইলা দিবা, কতকা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মানু খাতুন উঠে ঝাঁপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কথা, তা তো জানি। মনের জ্বাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মানু খাতুনের। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে, কিন্তু মেলে চাইর আনা কইয়া পয়সা দেবা দিলাম, তার কম পারব না, খতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেব হিসি করে বলল, গতরের আর মোর কি বিবি। খতর তো মনের হাত কইলা কইয়া চলে, মনের সুখই গতরের সুখ।'

মানু খাতুন বলল, 'যা যাই কও তাই কও মেলা, চাইর আনা কম পারব না এবার।'

মোতালেব এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, চাইর আনা আমা বিবি, যদি মোল আনা ছিনিয়ে চাই, তাহলে হবা তো দিতে?'

মোতালেবের হাসির ভঙ্গিতে মানু খাতুনের মনের মধ্যে একটি, মেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার জন্য তামাসা মইয়া গেছ দিলা, কামের কথা কও মেন কও, সইলে যাই, ঘুই দিয়া।'

মোতালেব বলল, 'দেখাই তো। সাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যই কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মানু বিবি, না চাইলে চাইয়া এই শীতের লম্বা সাইত কাটন যায়?'

ইসারা ইঙ্গিত বোঝে এমন মেয়েমানুষ মানো সেখানে ভরে খুলে বলল মনের কথা। মেন ভেন কথার সুক্ষিত-সুযোগ নিয়ে ছল না মেলে, মেয়ের মেয়েকে, পাকার পড়ে, সে নিজে থেকে নিয়ে মেতে চায় মানু খাতুনকে, ঘর-সেংসারের মেন আলা জ্বাল ভুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব খুলে মানু খাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটি ধমকের সুরে বলল, 'মেন তামাসার আর জায়গা পাইলা না তুমি! বয়স কতা বছরের বাইয়া পৌলায় কি আভাব হইয়ে নাকি মেলে যে, তামাসা মইয়ের তুমি আসবা আমার ঘরেরে?'

মোতালেব বলল, 'আভাব হবে কেন মানু বিবি? কতজনকী বাইয়া পোলা আসে পাওন যায়। কিন্তু সত হইলেও, মনের কতা মনের হাঁড়ি?

কথার ভঙ্গিতে একটি মৌতুক মেন করল মানু খাতুন, বলল, 'সাঁইই নাকি। আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা, তুমি হইলা মেলার কলে আঁড়— আর মানুষের কলে খুড়, তোমার সাথে আসলে তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেবকে বিদায় দিলেও, তার কথাগুলি মানু খাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না।

অবশ্যের নিঃসঙ্গ সময়ে মোতালেবের কথাগুলি মনে ফিরফিরে মেলাই তোলপাড় করতে লাগল, মোতালেবের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। মানুষ যখন মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কত-কত করত মোতালেব, তখন থেকেই এ বাড়ীতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই মনে মনে একটি হালকা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো, মোতালেবের ঘরে ছিল বউ, মানু খাতুনের ঘরে ছিল স্বামী, সন্তানাদী একটি; কঠিন আর কাঠখোট্টা, মনের ছিল মানুষের। তাই কড়া-কড়া চাঁছাছোলা ছিল তার কথাবার্তা, শরিতের সময় ঘুড়িতে ঘুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মানু খাতুনের উঠানে আর মানু খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালি গুড়। হাতের সুখে ছিল মানু খাতুনের, তার তৈরী গুড়ের মেন বং পয়লা মেলী ধরে বিক্রী হত বাজারে। বাজারে ঘরে যাওয়ার পর পড়ায় বেশীর ভাগ খেজুরগাছই মেয়ে মোতালেবের হাতে। দু-এক হাঁড়ি রস মোনা-যায় ভরতা করে তাকে খেতে মেয় মোতালেব। কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। পতবার মান-খানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেব। হাঁড়ি ছিল দু'আনা ক'রে পয়সা দেবে হাঁড়ি মেয়ে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেবের, মানু খাতুন গুড় চুরি করে যাচ্ছে, আসা কাটিকে দিয়ে গোপনে খোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, মেলে আসা জিনিষ পাচ্ছে না মোতালেব। ফলে কঠোরতর ভরাডুবির হয়ে সে মনোকষ্ট ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার মনে রসের হাঁড়ি পরিবর্তন প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেব, মানু খাতুনকে নিজের ঘরে নিয়ে মেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাওয়ার আর-ভোগের সুযোগ আগে করেছে দু-একজন, কিন্তু মানু খাতুন তাদের কোনদিন আমোল দেয়নি, মেয়ে-মেয়েমানুষের মতো যায় একটি, মেলী

বাড়ন্তবাড়ি, সবজের ইয়ার্কি দিতে এসেছে, তাদের কথা সেই মেয়েরাও ভয় দেখিয়েছে মাজু, খাদুল, কিন্তু মোক্তারেদের সম্মানে সম্মুখে কিছু বলবের, তাকে যেন ফেলেছাড়ে যাওয়া যায় না, তাকে খাওয়াতেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসছে বারে বারে মনে হচ্ছে। পাড়ার এসব চলবার কথা আগে পাড়ে; না আর সেই, আজ বাপদাদের মুরুব্বিও কেউ নেই, আর মানামানই কথাও নেই কারো মুখে।

মোক্তারেককে আগে আসতে হলো দু-এক সপ্তাহ, তারপর একটি ভদ্রলোকী শাড়ি পরে, এক কেজির কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোক্তারেকের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজু খাদুল।

ফরাসবেরের কোন ঠিকানা নেই, আমি আপনিকের আর আসোয়াসের হয়ে ফরাসে সব। মোমের আঠায় আঙুল জড়িয়ে, মাজু খাদুল মেলে মেলে মনযোগ করে। ঘাটি দিয়ে আগাল মুখ করল উইকেনে, লেপে-পুছে ঝক-ঝকে তকতকে করে তুলল ঘরের মেজে।

কিন্তু ঘর আর বাইরের দিকে তাকাবার সময় নেই মোক্তারেকের, সে আজো খাতা পড়ছে। পাড়ার আরো অনেকের—মোসলের, বাড়ুবেদের খাতার কলাকল্প নিয়েছে মোক্তারেক। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, তাদ করে বিক্রি হয়। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজু খাদুলকে মোক্তারেক উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় হাঁড়ির আলর বসিয়ে তার সেই চালা ঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জ্বাল দেয় মাজু খাদুল। জ্বালানীর জন্যে রাত থেকে খড়ের আঁটি নিয়ে আসে মোক্তারেক, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাকে কি ফুলোয়। মাজু খাদুল এর পর ওর এর বাসন থেকে এনামল থেকে শুকনো পাতা আঁটি আনে ঝুঁড়া করে ছড়ে, পালা করে ডাল, বিকেলে বসে বসে না মিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল আটে জ্বালানীর জন্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, রাতের রব মানুষে ঘেরেছে ঘরে।

মাঝে মাঝে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোক্তারেক, বিক্রি করে আসে চড়া দামে।

বাজারের ঘরে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফেরার পথে যায় গাছ গাছ হাঁড়ি পাড়তে। তারা বাঁশের একেকটি ঘরে ঢোকা ঝুলছে থরে থাকে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ধরার ঢোকা ঝেড়ে মিয়ে ঘর মোক্তারেক। সারা দিনের ঝরনা রস ঢোকাগুলির ঘরে জমে থাকে। ঢোকা ঘরলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাকে বিকেলে এসে। ফেরার পথেও রস নেওয়া যায় দু। জ্বালে মিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে, তামাক মাখবার। ফরাসে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ আনা সের। খুচরো খুচরো ঘরে এতগুলি পাকা টাকা নিয়ে ফিরতে ফিরতে ফিরে ফিরে পড়ে মোক্তারেকের, সোনের শীষেও সর্ষাল মিয়ে ঘাম পড়ে দুইয়ে দুইয়ে। ফুলবানুদের ঘেমন খুকো মেয়ে, মায়ের কোটা ছিক-ছিক করে। পায়ের নিচে খুবো ঘরো ছিকটিক করে ঘাঁড়ন জমা দিলিয়ে। মোক্তারেকের ছিকে থাকিয়ে পাড়া-পড়শীরা অবাক হয়ে যায়।

সেবার পাকের সবচেয়ে মিষ্টি দু হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালী গুড় নিয়ে মোক্তারেক নিয়ে একদিন উপস্থিত হলো চন্দ্রনাথের এসের সেবের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এসেরের সামনে নামিয়ে রাখলো রসের হাঁড়ি, গুড়ের আঁটি, তারপর ফোচের খুঁটের বাঁধা খুলে কয়ে কয়েক পাঁচ-খানা দশ টাকার নোট, বলল, "অর্ধেক আমার দিলাম ফেরেসাব।"

এসের বলল, "আমার কিসের?"

মোক্তারেক বলল, "আপনার ন্যায্যির—"

তারা অবশ্যই নোট নেয়ে নিয়ে এসেছে মোক্তারেক। কোনদিন, কিনারে দুল পরিমাণ কিছু আনি কোনও, কেনে আমলার হাত লাগেনি মজুরী হাতের। নগদ পয়সার টাকা। নোটগুলির ওপর হাতে খুলেছে খুলেছে খুলেছে এসের বলল, "কিন্তু এসব অত টাকা আমায় নিয়ে আমি কি করব মিঞা? চাঁদমে পোনেরোয় বেলা কইরা নিয়ে যাইবেন বেহানের কাবিলায়ে। সরীরের-অবে ঘরে আমল লাইরা আমার।"

এসের বেশ রসকৌতুকি এঁধরে ছিল মোক্তারেককে বলতে, হাতের দু'কৌতা এগিয়ে বলল মোক্তারেকের দিকে; আরিক করে বলল, "আমলের জন্যে তোমার সাঁচাই ছিলিম আছে মেক্তা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইরা, ঘর কইরা।"

ফুলবানুকে একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোক্তারেক। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোক্তারেককে দেখে ঠোঁট কুলোলো ফুলবানু, "বেলবের দেরা হইল মেক্তা? আমি কইলাম পর চাইরা আর দুদি ঘরে নিয়া চুকাইলে আর একজনারে।"

মোক্তারেক জবাব দিল, "না ফুকরে কবি কি?' মানের মাঝে, জনের মাঝে, থাকা হয়ে ডাকে এই কাজ খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-দুনি দেয় কে, প্রসবে বাঁচে কি করে।

ফুলবানু বলল, "বেহেলায়, মানও বাঁচাইল, জনও বাঁচাইল, কিন্তু সে আর একজনের গলে মালাইয়া গেল, তা হাড়বো কেমনে।"

মান এলেও মুখে ফুটে একথা বলল না মোক্তারেক যে, মানুষে চলে গেলে তার গলে সাঁচা আর একজনের গলে ঝুলিয়ে থাকে না। তা যদি থাকত, তা হলে সে গলে তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরোতো। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোক্তারেক ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, "গলের জন্য আবনা কি ফুলবানু।"

মুখে চলনাকে চালাতে আসল ফুলবানু বলল, "সাঁচাই সাকি?" মোক্তারেক বলল, "সাঁচা না' ত কি মিছা? খুইলো সেইবো তখন নতুন মাইনষের নতুন গলে ফুর-ফুর করবে গন্ধ। ইঁদিকা বাজলে ফুলের গলে ফুলের গন্ধে ফুর-ফুর করবে, যেমন সবুজে কইরা থাক আর খুইলেম হাস।"

ফুলবানু, আর একবার ছলনা দিয়ে গেল, "বেহেলের মনষে ছাইবে না এমারে।"

যে কথা সেই কথে মোক্তারেকের, ফুলবানের বেশী সবুজে ঘরবে ছেলে মা ফুলবানুকে।

মাজু খাদুল কিন্তু ছেড়ে কথা, "আই আই, ছি-ছি? মোমার পরেই ছেবার মোকের মোক্তি ছেলা, ছিবের মোকের নয়। এত পরজানি, এত ছল চাতুরি বেজার মনে? পুকের সময় শিশুকের মত লাইপাইয়া, আর পুছে নাই কুথাইল, কাইল ঘরে ফুবে।"

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই, মেক্তারেকের ধৈর্যও নেই।

আজের গাছ মোলে ঘরে উঠল, পর গাছের ডালে ডালে গজাল মারাটে ওকের ছড়ি করি পড়ে।

ফুলবানু আজ সেই মোক্তারেকের ঘরে। নিজের কিনারা-জমলা ঘাটে। তারপর সন্ধ্যে হতে না হতেই এসে আড়ি করে ফুলবানুর। খুইয়া দাও মোমার কলসি-বাসন ধুক-মেক্তালালি। কাছে বস আইসা।"

ফুলবানু হাসে, "সবুর সবের! এ কয় মাস কাটাইলা কি কইরা মেক্তা?"

মোক্তারেক জবাব দেয়, "যেমনের গাছ লইয়া।"

সিঁড়ি বাজু, বেস্টনের ঘরো ঘর প্রায় শূন্য হয়ে আসে ফুলবানুর, একটি নিঃশ্বাস

১৩ই মে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে
মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত

নিবেদনে : আনন্দলোক মুখোপাধ্যায়
১৪ই মে মঙ্গলবার থেকে টিকিট পাবেন

ঘাসের [illegible] (পরিচালনা-নিরঞ্জন মজুমদার)

নতুন আকর্ষণ
আগমিলা
অভিনয়ে : মাস্টার অপুর ফুলমাল
চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিলতা ও গুটার
চাঁদ রবিবার ৪ টায় ও ৪টায়
[illegible]
অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন বেবী-নীলিমা দাস, মুকুল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শতাধিক শিল্পীবৃন্দ, সেটসজ্জা বিশ্বনাথ, আলো গোপী, রূপসজ্জা বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নিবেদন মুকুলদা, পরিচালনা ও সুরে অনুপম মুখোপাধ্যায়।

নিয়ে যেতে বলে, তুমি আমার সেই খাতের কাজটা কিন্তু বাকি। আজির আমার খাতাই সাইজ পড়ে।'

'আজির আমার খাতাই সাইজ-পড়ার।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু আজির আমারও যে খাতার দরকার—তাই তাদের কুলসুম, যেখানে যে খাতা পায় সেই খাতে যার নাম তোলাইয়া চাচাইয়া পড়ে।'

মজু খাতুন হেসে দিয়ে, আঙুল দিয়ে-দিয়ে, মতলেবের পাঞ্জা পড়ে পড়ে গুনে কুলসুমের। হেসেখিলে আজ মাত্র সাত দিন বাকিরে। কিন্তু সিন বাকি [illegible], তার আগে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ আছে 'ছাড়েছে'। পাড়া-পড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সমাদরে মোতালেফ আর কুলসুমকে বরণডালা বানায় আছে, এমন্ই যা সংক্ষিপ্ত বিবাহের সুযোগ আছে, আর, বউ বউ আইয়া পাড়া বইলাই যেন মানুষটা।' যেমনে আছে, বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

মুখের বিরক্তী ভাবে এটা মজু খাতুনের। মনে হয়, সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন আরেক পরে মাতব্বরের বড় ভাই ফুলবানুর নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার বয়স বেশি আছি নয় হয়েছে বার। নদীর ওপারে চালকান্দার নাবিক মেয়ের সঙ্গে মোতালেফ আছে ফাতেমার। এক মজাই নৌকা বায় করিম। আলতাকের আগে ফলোয়ার তার বউ মারা গেছে। আগেকার ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে আজি-দুর্ভাবনায় পড়েছে ফোরা। অবশ্যকারী দুঃখ-দৈন্যের স্বজন নেই আর। সে চরকো পড়ে বিবি নেকে থাকবে, ছেলেমেয়েরা মরা-আজি আবে না কিন্তু। ওই মাত্র, মাতুনের মত একটি আজিক বীভৎসতি কুলসুম বলে বাবা পছন্দ, তার কথা নিতে করতে পারে সে।

মজু খাতুন হিসেব করল, অনেক ভর হবে, তবু।'

ফুলবানু কথন দিল, 'তা আলতেফ কালাই হবে। পছান, এক পছান' মজু খাতুন খুশী হয়ে বড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ এই কালাই ঠাঁই চাই। কম বয়সে তার আশা নেই কিন্তু মোতালেফের।

আবার মজু খাতুন হিসেব করল, আজি না হো সে? [illegible] বয়স আইয়ার মত না হো পাঁচজনার।

একারেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'কম আইয়ে মানে কাম! ওসব কম হেলে ছলে জানে না সে। ঘরকন্নায় মোক্ষ নয়, পাঁচ-কালে বিয়ান-কারবার পাটে-বাজারির কাজ করে, কম বউ আনি ছাড়ু, চলবে ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিজে বলবা না কারো সাহেব?'

মজু খাতুন ঠিক উলটো জবাব দিল, হাসির সঙ্গে 'কিছুমাত্র বয় সম্পর্ক নেই, পাঁচজনের মেজবুজারের মতো-মতোই সে কথা বলা, নিজে বাঁচ করে মজু খাতুন, তার সংসারী বসবে, ছেলের মানুষের মাজু খাতুনের মেয়া ধরে মেয়ে। একারেন বলল, 'তা হলে কথাকতা ওই আজিকের সাথে? সে বেশী বেশী বলতে চায় না।'

মজু খাতুন বলল, বেশী বইয়া কাম কি।'

বেশী বেশী হোলেও না, সম্বন্ধটাকেরের মনে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাবিকের সঙ্গে এক মজাই সৌজন্য 'ঘরে উঁচল মাজু খাতুন। পাকা হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্মরিকে বলল, 'আসল গেল। সেখানির এত আছি আছি নিশান ফেলব, চোখের উপর বাসনমিনা করত দিন রাইত, তার হাতদুনো হো খাওনায়, কি কও কুলসুম?'

কুলসুম হেসে বলল, 'সেখানির মনে তখন দুঃখ হবে না?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর তাবাই না। সেখানি তো ঠুঁইটাই গেল। এখন তোর মেজলেই তো পরী। এখন তাবাই পরীরে।'

'আম, পরীরে আবার কম কিসের তোমার?'

'তার নাই? পাখা মেইলা কখন উধাল দেয় তার ঠিক কি।'

কুলসুম বলল, 'না মেজো, পরীর আর উধাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দমত সব পাইয়া গেছে। এখন আমে মাইনষের পছন্দ আর নজরমা বজায় এই চেষ্টা আমলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'সেটি বন্দিন আছে, নজরও তবদিন থাকবে।'

কিন্তুক্ষণ আগে আলতে-তোয়াজে ভাসল মোতালেফকে বউকে। তোমে মধু খেয়ে আল-বালে ফুলেকুলে, ঘাটে যাওয়ার আগে খুলে যায়, উধাল পাখনা না থাকলে কথা আর তোকে বাদ আর পাতনা ফেলে সেই মধু।

কুলসুম বলে, আজ পাল আজ আজ, তুমি তো বেশী ভাত না পাবেয়। বিকালে বালি কুড়ুর কুড়ুর আমাক চাইবে।'

মোতালেফ বলল, পরান আমি তোমার জেনো। দিন ভাসিয়া পাল খাব। আইজ খাইজ ঠেটি রান্ধুনা।'

কুলসুম ঠোঁট কুঞ্চিয়ে বলে, 'আজ, আমার ঠেটি এখন খুঁজে রান্ধা না যে, পান খাইয়া রান্ধাইতে হবে? আমি পান খাইয়া নেই, তুমিই খাও দিন। আইজ খাওনা কই বাবাক খাইয়া খাইয়া তলনা হইয়া গেছে ঠেটি, পানের রসে রাঙাইয়া দেও?'

মোতালেফ হেসে বলল, 'খুঁজে খাইলেরে ঠেটি তো কুলসুম মেজো পানের রসে পাতা হয় না, তার একারেন পান-তলনা ঠেটিরে রান্ধা।'

নিজের মুখে মেজে নেই মোতালেফের। পরিষ্কারের, খুব্রোজের কিন্তু কিন্তু ভাব থাকা চলে, কিন্তু আলের কৃষ্ণন মনে মেজন থাকি নেই, আজির পরিষ্কার, কলনের পরিষ্কার আর সমাজের জন্য নয়, নিজেদের, মুখলীদের আজিকে কৃষ্ণন থাকে, পাই মিজন, পাই আজি, পাই আন মেজ, মোজ, মেজে। তাতি মেজন থাকিনি থাকে। কথা বন্ধ মেজে, পুরে আলো হয়ে যায় মোতালেফের বাকী, আজির পাই খুবি বেশী ওটে না উধালে, নিজেদের, মুখলীর মজন টিকা দেয়। মেজন আজির আর মুখলেফের বিয়া চরের দুঃখের আলের আর আজিক আন মেজা পাই নৌকা ভরে খালের ঘাটে এসে নামায় মোতালেফ, পাই হাজারে তাতি উধাল মুখলানুরে। কিন্তু মোতালেফ সমাজে তাকে পাছে হাত দিতে মেজ না, আলে কন্ট হবে, পজা পজা হবে পায়?

কুলসুম বলে, হইল তো খাইয়া মেজা, ঘাইলে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া মেজা মন আমি পাই নিতে পারব না, কন্ট হবে মেজেনেরো কথাই যে কও তুমি মেজা?

নিজেদের পাই তো বেশী নয়, পাওয়াটি পাওয়া যায় না। কুলসুমের ইচ্ছা, আমা বাড়ীর আম-মেওয়া পাইও সে ছাড়িয়ে মেজ, মেই হাজারো পাতের পাইখাজিগুলি পাওয়া যাবে যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কন্ট ঘাইবে সে করতে মেবে না।

আশ্বিনের মেজের দিকে আউশ ধান পাকে। আবার নৌকায় পরান আজিয়ে ফিরবে খাইবে যায় মোতালেফ। মেজের পর্যন্ত আলে নেয়ে যান কাজে। আজিবে আজিবে যান ফুলবে থাকে মৌজম। কিন্তু মোজিম, মেজির হাজিম, আজিম—এদের মজন সমানে সমানে আজি চলে না আর, হয়ে বড় 'বাজি'. মোতা-মেজেন, চলে আজি আবার মোতালেফ। একেবারেক পিঠে খাজন মোক মেজে থাকে। কুলসুম ফুলে মেজেছে মেজেছে . আল, মোকাজীর বাড়ীটে আর যা মেজে, হাজ তো ছিল মনে?'

মোতালেফ বলে, 'খান কয়টার হাজ খুই-খাজ দিয়েই ছিল, মোকি মেজেনের হাজ খুইয়া মেজিনের খাকবিনে।'

মেজনে মেজনে মোকে খুব মিজেছিল, সে সব আলোর সমাজে ফুল নাজিয়ে মেজ কুলসুম, আজো পজিমন কুমারের সঙ্গে খান মজন মেজ মোতালেফ, মেজীন পাজ পাঁচ আমের-এক আজ।

কুলসুম বলে, আ, কন্ট একেবারে খাইয়া মেজার না। আর নাজান কথা কও তুমি মেজো। মেজন্ত আমে খাইয়া যা আজি, যা সমাজী খাজনান খুনা নাইয়া আইছি।'

কলম খায়, আরী খায়, কাটে আশ্বিন-আজিক, খুরে খুরে মেজ আসে পাজি। আমের দিন মোতালেফের খরচের দিন। কিন্তু পাইকী এবার মেজ একটু বেশী মেজিতে এসেছে। তা মোক, আমে বেশী পাওয়ার মনোকজ্ঞ নিয়ে পুজিয়ে মেজেছে মোতালেফ। মেজন্ত পাওয়ার সাধ্য তাতি মাইই আমে। একারে আমজাক আমে মোতালেফের, একারে পাইজ আমে মে-ই

হাপিয়া [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

সেরা। এ করেও বাড়ুজ্যেদের বুড়ি-দেড়েক গাছ বেচে গেল।

গাছ কাটার ঘুম নেমে আসে। একটুও বিশ্রাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতা-লেফের, সময় নেই যেমন কুলবানুর সঙ্গে ভালোমানুষি রসিকতা। বার-বেলা শোন দিতে হবে, সাড়া মুহূর্তের ঘুমও জোগাড় করতে হবে, চল দেখে, খুড়ে দেখে। বিকেল নয় বিকেল ঘাটে মোতালেফ, আর বিছানায় পা দিতে না দিতেই ঘুমে ঢেকে আসে চোখ। দু হাতে ঠেলে, দু হাতে জড়িয়ে ধরে কুলবানু, কিন্তু ঘুমকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ ঘেরার নাক থেকে, আর যেন অন্য সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মানুষও শীতে কাঁপে কুলবানু।

মানুষের গায়ের গরম না পেলে, শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল ঘুম আনলেই হয় না, ঘুম জড়ান দেওয়ার জঞ্জালানী চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডাল-পাতা আর খড় ঘরে আনে মোতালেফ।

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাতের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় কুলবানুর, মুখ কাঁদে। দু-এক হাঁড়ি ঘুম জড়ান নিয়েছে সে বাপের বাড়ীতে, কিন্তু এত ঘুম একসঙ্গে সে তোমা দিন দেখে নি, যেমন কালে জড়ান দেয় নি!

মোতালেফ মুচকেস্বরে বলে, 'তেমন তরো মাইয়া বানুষ তুমি, এত মাইয়া হইয়া সেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই পুড় হইছে, এই নি বাইশাখে কেনবে পারনা দিয়া?'

কুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না কেনবে। ভেবে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া বসা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খালসাবের মুখের দিকে চাইয়া থাকি কেনে, খুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

ভোলা তো নয় কুলবানু, অভেজো তো নয় একেবারে।

বলতে বলতে দেখাতে দেখাতে দু-তার দিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই খুড় তৈরারী করিয়ে নিল কুলবানু, বাজারে খুড় এসেছিল অনেক আগে না।

পুরোন খদ্দেররা একবার খুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমন তরো খুড় মাইয়া তোমার, বিদেয় যেন বাড়াইয়া ছাইড়া: আপনার ঠেইটে লাইগা আছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার খুড়ের দিকা এবার ছমন দেখ, ছমন সিকদারের খুড়ের তোমার বেশী।'

খুড়ের ভিতর খুড়ে যায় মোতালেফের, হাতে সর্বাঙ্গে জড়ানের ঘাম। খড়ভরের ঘত ঘামায় স্নান হয়ে যা মোতালেফের খুড়ে। টেনে, সে তো কম খাটছে না; কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্নান হয়ে যা মোতালেফের খুড়ে, তবু কেন মন উঠছে না, তোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, দেখে খুশি হচ্ছে না, খুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ খুড়ের হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম জড়ান দেওয়ার কৌশলটা আরো বার-কয়েক মোতালেফ বলল কুলবানুকে, হাতের ঘাইয়া ঘাইয়া ফোটা মেইকে গ্রাহ্যের সময় হইল কিনা ডালবনে সময় হইল কিনা ঘুম।'

কুলবানু বিজ্ঞ বিয়ান মুখে বলে, 'হ-ঘ, চিনছি! আর বক বক ঘাইয়ো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'

হউক মোতালেফের মনে, পড়ে থেকে যাক, যাকুকের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আর খুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। বাজু, যাকুক এমন করে মুখ ভাষাটা সেয় নি, অন্তর্দাহ জানায় নি মুখের ব্যবহারের জন্যে, সান্ত্বনা শুনেছে, সাবলে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুরে সালাম কোম্পেকে এক বোঝা জঞ্জালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এসে রাখল সেই পাকাটির চালার ঘেরের কাছে, 'কি রকম খুড় হইছেরে আইজ কুলবানু?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এলো না কুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু কুলবানুকে দেখতে পেল না। কি রকম শব্দ আসছে যেন ভিতর থেকে, আলার জন্যে ঘরে গেল নাকি খুড়ে? সারে-সারে মোটা পাটকে জালার ঘর জঞ্জাল হচ্ছে, উপরে করাতে ঘর জঞ্জালার ঘরো। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। না ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটায় ঘর বেশী জঞ্জাল পেরে কি করে যেন ঘরে গেছে একটু। খুড়ের মতো জঞ্জালপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা দিয়ে চিৎকার বেরুল,— 'কই, কোথায় গেলি হারামজাদি?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কুলবানু। ভোলা বেশী ঘুরে যাওয়ার দু দিন ঘরে স্নান করতে পারে নি। শরীরের ঘিন না নাইলে গা ভেজন চুলকে ওঠে, ভাল্লো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা-সাবান ভেবে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। ঘরে এসে পরেছে নীল ডুরের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল কুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ব্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে পড়ল পিঠের ওপর। এক মুহূর্তে জঞ্জালের ভেবে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে খুঁটি ধরে বসল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদি, খুড় পুইড়া গেল, সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আর সাজগোজ লইয়া, পরের ভিতর খুড়ে যাইয়াইয়া আইলে তুমি বিনয়বতী, এই তিনেই খুড় আজাদ হয়, আমার আপনার-বাড়ি, তুমানে যেন যাইয়া গেল তোমার ভিতরে।'

কুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো তুই কইলা, গায়ে হাত দিও না।

'ও, হাতে লাগলে ঘিন লাগে খুড়ির হে আমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ভিজা কাঁথি তুলে নিয়ে ঢাই দিয়ে ঝাড়তে থাকে, পিঠে মোতালেফ সপাসপ ৬ সাতে মাগল কুলবানুর সর্বাঙ্গে ধুলা কাঁথিতে সাবলে তো আর মন মানে না লোকের ভিজ। তাতেই দোষ, কাঁথিতে তো আর দোষ নাই।'

কাঁথি ঝাড়তে ঝাড়তে মোতালেফ। যেমন বেসামুর মেয়েকে টান অনুরাগ। রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেন সেক্রেটারি চারপাশের থেকে। আকাশটায় পাশালো বজলো, ঘন-কালো, মেঘেরও নিন্দা-ঘুম আর নেই।

কুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বাড়ির ভেতর সাথে — এমন দোস্তার ঘাইনষের ঘর করণ না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এলেন ঘরে সেলা মোতালেফ। একটু আশ্বাস নিলেই কুলবানু পেয়ে বসবে, আবার ঢালাও নিতে চাইবে। কিন্তু গুরুমশ্ব ঘরে অমন ঘাট ঘাট জলল-বনল আর ঘর বসলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। খুশিও পরেই আবার ভিজিয়ে হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর কলহ-মীমাংসা নিজে হয়, ঘরে ঘোটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলেও খানিক ঘনেই আবার ঘেঠে আসায় করলো মোতালেফ। দেখে ভয়ে মান ভাঙলো কুলবানুর। পরে দিন ঘের আবার উঠানের পিঠে ঘর জঞ্জাল ভিজে ভিজে বসল কুলবানু। দুপুরের পর বাজার ঘরে খুড়ে নিয়ে গেল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস দুইডা

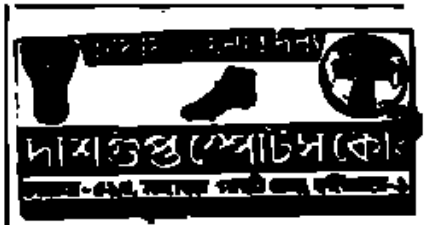

With the Compliments
From
MANDAL & SONS
PUBLISHERS
Calcutta-12
Phone : 34-6310

...ন আইটা দেখি, ফোকলাকে মোজার জন্য আর্জি জানাচ্ছে।'

'...কুলবাবু, বিশ্বাস—জন্মে মাছির ঘি। কিন্তু ফোকলা মুখের ঝুড়ী, ফোকলা দেশ অন্তরের কথা। মনের কথা কেন মুখে ফোকলা না মুখলের মুখে দিয়ে। সে কথায় বাঁচে আলাদা, বাঁচি আলাদা, তা তো আর ফিরছে বাঁচি মোহাম্মদী! ফিরও আসে, ফোরও আসে।

হাতের পুতুলটা বাদ, মনের মতন হার দেখ বয়ে আসে, মুখের আর্জি কানে না মোহাম্মদের, সব হয়ে যা; কিন্তু তা নিয়ে মুখলমুখ সংসার বাড়ী এসে আর তর্ক-বিতর্ক করে না মোহাম্মদ, চুপ করে বসে মুখের হাসাহ টানে। দেখছে আর ভাবছে নব দেখে ফুইয়ে ফুইয়ে মন পড়ে ছাড়ির কথা। ফোরে পড়ে উঠে এল-কলা সব বড় ছাড়ি মাছির আসে মোহাম্মদের, কিন্তু বাস আসলে মন তো মুখে নেই আর, মাছি নেই। মনে এসবেও সমাধান ফিরে যায়, কিন্তু মুখলো পাকাটির মত খাঁ খাঁ করে মন, মুখলের ফোরের মন খাঁ খাঁ করে। দোষও কিনি-ফোনি নেই আসে। মনের ছাড়িরে মনে হল উঠল, ছাদবাড়ী মাটী মনের মতন দোয়াদোয়া করে, মনে হয় না, যেমন যেন খালি খালি

একদিন মুখলে মনে হচ্ছে যেন নবীন পাড়ের মাছির ফোরের সংসার।

'ফোরের ফোরমান!'

'মুখলমান আফোরমান!'

মোহাম্মদের মনে, 'কলো তো, সব মাফোরমানরা আসে তো—?'

মনে, মাছুমের মনাটী মুখে এসেও আসতে পিছুপান না মোহাম্মদ। মাছির একটু ফোরে বলেই, 'এ ফোরা আসেই আসে সব।'

মোহাম্মদ একটু ইতস্তত করে মনে, 'মাফোরমানদের মৈতো সেই মুই-তিন মুখ ছাড়ির বাস না ফোরা। ভালো মুখ।'

মাছির ফোরে বলল, 'মনেই ফো। আপনার মুখ তো ফোনকালেই খারাপ বয় না।'

ছাড়ির মন করে কথাটা মুখে ফোরিয়ে মাছুমিয়ামোহাম্মদের, মা ফোরা, সে ফিনকাল আর নেই।

মনাক হয়ে মাছির এক মুখে তাকিয়ে আছে মোহাম্মদের বিকে, ছাড়ুমন-হয়ে আপাদী। মুখে ফোরে আর নিজের মুখের ফিনা কি ফোরী মনে?

মাছির ফিজ্ঞাসা, ...ফোরা ছাড়িয়ে?

মাছির ফিনো কি ...মের মুখে ফিনাই আপনার সোনাপাকিস্তান ফোরিবে। মনে আছি, মনের মিত্র।'

মাছির মনে হচ্ছে মনে, না না না, এ কি ফোরে, আপনার ফোরের ফিনিস, মাছ না ফিনে মনে মনে আছি।'

মোহাম্মদ মনে, 'আইছা, ফিনে যেয়ে মনে আইছ। আইছা মাছমেন। মাছ না হয় সামনের ছাড়ে ফিনেন।'

মনাকে মনাকে মনাগুলো মেন মুখে আসতে যায় মোহাম্মদের। এমনেও ফিনিস মাছির মনো মনাকে হয় এমন-মনা, মুখের মুখোমনি মনা ফোনো মনাকে হয় মাফোরমে মনে, কিন্তু মনে মনে মনে, মনাগুলি মন ফিনো। পনের ছাড়ি এমন মাফোর মাছ পাছড়-পনে মুখ ফিনিয়ে না মাছ মাছ থেকে, কিন্তু মনাকে না। মাছ মুখের মনাকে মাছমে।

মাফোর মনে মনাকার এক মেন মুখ ফোনো ফিনি মনে ফিনে মনাটী হয় মাছির, মাছ মনাটী দু' মেনের পরনে মুখে মেন মাছ মনে মোহাম্মদের ছাড়ুমের মনে।

মনে, মাছুম মন মুখে মাছুমে মনে ওঠে ফোনে, 'ও-মুখে মা-মাফোরমানদের মাফোমাছিমে চাও পাকছাও, কিন্তু মাছি ও-মুখে মোন না মাছ ফিনে, ফোরে মনের ফিটি না মাছি।'

মনে-মাঠে মন, মাছির মাছ ফোনে না মোহাম্মদের মুখের মনে। মাছু মাছুম ফিনে মনে ফিনেমে মাফিমনে, 'মনেমনে, ওই মাফোমনের মনে মাছি ফেন মাফিক-মাফিক মন, মাছি চাইনে মাফ মনেনো, ওইে ফোমাফোমে মনাকে মাছ মেনের পাবা না।'

মনে মনে মাছু মাছুমকে মাছি ফিনে মনে মাছির। মাফোমনে মনেন মনাকার ফেন, কিন্তু মনেন মাছ মনাকার মনে না ফিনিয়ে।

ফিনিমনের পরে একদিন মোহাম্মদের মুটি ফোন পাছের মনাকের মনো ও মনের মুখ ছাড়ির মন ফিনে মনাটী মাটে ফিনা ফোন মোমনা ছিটে মনা মোহাম্মদ। মাফোমনো মুমনমনাটীর পাশ ফিনে মুমন ফিনে মাফিমনে ফিনেন, 'মাছি মনেন মাছি মোরা?'

মুফো মাছে মাছির ফোরিয়ে এল মন মনে; 'মনো? ও, আপনে? মনেন, মাফো...আপনার মন ফিনা মাইছেন মাফ মোমাফি?'

মোহাম্মদকে মাফমুন মনাল ঘটে মাছির, কিন্তু মনে মনে মাছি মাফিমে মনে ফিনেন মাছ; মাছুমের মনা। মে-মাফুমের নাম মন মুখের পাছে না ফিনি, সেই মাফুমে ফিনে এসে মনমাছে মুফিন মনেমে। মা মাছি, কি ফোমেমফাফিনী ঘটায়।

মা ফোমের মাছির মাই। ফাঁমাফির ফোমের মাছি ফিনি মোহাম্মদকে মেমফে দেখেই মনাকে মনের ফিনের ফোমে ফিন মাছ; মাছুম, মাফমন মোহাম্মদকে মুফিয়ে মুফিয়ে মনাল, 'মাইছে মন।'

মাছির ফিক ফিন মনে মনাকো, 'মাফোমে মাফোমে,—এমনি; মনা মুফোমুমা মনা মন ফিনি। ফোমেমে মাছু...মাফোমনের মাড়ী মাফুমে মাফোমে, মাফমে মাফিমনে মাছি মন মাফি। মুফুমে ফিমাফ মাফোমে মফন মফিমা ফোমের মা মুফোমেমে।'

মাফ, মাছুম মনাল, 'মুফি মোমনা মা ফিনো, মুফুমে ফিমাফ ফিমাফে মাফমে মাফে মাফুমে, মফমাফ ফিমাফে মফমাফিমফে মন। পনের মন, মন মাফমাফিমফে মে মাফিমনে মাফমাফে, এমনিতে কি মাফ-মফমে মাই?'

এমনি মনাকে মুফুমফের মনাফিমনে মা মাফে মাছুম, মাফ মন মনাই মনমে মাফিমনে মোহাম্মদের। কিন্তু মাফমফে, এত মফিমন, এত মুফ মাফাকে মেন মাফমে ফিক মাফাফে মনাফিমনে মা, মনে মনে মুফিমন, এত ফিমনা-মন, এত মাফমাফমে ফিমফমফমফে মফে মেমফাফে মেন এমনি, মাফুমে ফিমে, মনে, মাছুমের মাফি মফমি মনমাফ ফিমফে মেমফে মাফুমে মাফমন মুফে মফমে মাফমফে মাফমফে এমনি, এমনি।

মাফমফে ফিমে মনের মুফিমে মাফি মেমফে মাফিমফে মেমফে মোহাম্মদের মাফিমফে মেমফে মনাল, 'মফমফমফে, মোমফমফে মি এমনি?'

মাফিমফে হাফ মেমফে মুফুমফো হাফ মাফিমফে ফিমা মোহাম্মদের, কিন্তু মফমে মফমফি মুফ মাফিমফে ফিমফে পুফু মনাল মা, মুফুমফো হাফেমি মনে মেমফে মাফিমফে ফিমে মাফিমফে মনাল, 'আমাফ মুফে মা—মোফ কি মাফমে?'

মোহাম্মদের মনাল, 'মা, মাফমফমি মফ, কথা মনাফ মুফে মাফাফ মেমি। মফ মে, মোহাম্মদের মেমফে মাফমফিমফে মফমে মাফমে মাই মফ, মোফিমফে মুফিমে মাফ মাফমে।'

মাফির ফিন্তু, মফমে মাফমফি মাফ, মাছুম মফের ফিমফে মেমে মফমে ফিমে, মফ ফিমেমে ফিমেমে মাফমফে?'

মাফিমফের ফিমে মাফিমফে মাফিমফমফি মফমে ফিমে মোহাম্মদের মনাল, 'মফমফমফে মফমে মা ফিমফে মাফিমফে মফমে মাফমফে মাফমফে মফমে মাফমফে মাফমফে মফমে মাফমফে মাফ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুবোধ অধিকারী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের যে কোন গল্পের মধ্যেই লেখকের সুস্থ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের দুর্বল যে মানুষ তার মনের গহনে সহজে প্রবেশ করা কিন্তু খুব কঠিন কাজ। নরেন্দ্রনাথ সেই দৌলত অর্জনে ব্রতী হয়েছেন। কি করে যে তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন তা জানতে আগ্রহ হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অতিরিক্ত বুদ্ধি-চর্চা লেখককে জটিল এবং রহস্যময় সম্পর্কে উদাসিন করে তোলে। তাই মননশীল চেতনার বুদ্ধির অতিরেকের আড়ালে হৃদয়ের স্বর্ণদুর্লভ সম্পদকে হারিয়ে যায়। এই শ্রেণীর লেখকদের জন্য পাঠকের ছিন্ন সহানুভূতিসহকারে হৃদয়ের সন্ধান আসতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের কাছে ঐ ধরনের জনের কোন আবেদন না থাকায় তার আবেদন বেশী দিন স্থায়ী হয় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির অনুশাসন নেই কিন্তু হৃদয়ের অনুভব স্পর্শ আছে। তাই তাঁর গোপনচারিণীর আবেদন অনুভবের বাস্তবতা থেকে হৃদয়ের কাছে বেশী এবং সেইজন্যেই জনপ্রিয় হিসাবে তাঁর সার্থকতা।

নরেন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত প্রায় তিনশর বেশী গল্প লিখেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার সাথে সর্বসম্মত হয়েছিল। তাঁর কয়েক-খানি গল্পগ্রন্থকে কালানুক্রমিকভাবে সাজালে এরকম দাঁড়ায়—১। অসমাপ্ত (১৩৫৪), ২। ছায়ার বাড়ি (১৩৫২), ৩। উপোষণ (১৩৫৩), ৪। পতাকা (১৩৫৪), ৫। ছড়ি-উপোষণ (১৩৫৬), ৬। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯), ৭। কাউগোলাপ (১৩৬০), ৮। অসমাপ্ত (১৩৬১), ৯। হৃদয়ঘটি (১৩৬১), ১০। মন্দাটের রক্ত (১৩৬২), ১১। হৃদয়ের দেখা (১৩৬৩), ১২। দীপান্বিতা (১৩৬৩) ১৩। অন্তরঙ্গের গল্পো (১৩৬৩), ১৪। এক্সো-এক্সে (১৩৬৩), ১৫। কালো পক্ষ (১৩৬৪), ১৬। নিরালো (১৩৬৫)' ১৭। উপায়ন (১৩৬৫), ১৮। পূর্ণিমা (১৩৬৬), ১৯। অন্তরিক্ষ (১৩৬৬), ২০। [illegible]বাসী (১৩৬৬), ২১। সমাপন (১৩৬৭), ২২। সমাপ্তি (১৩৬৭), ২৩। বহুরূপী (১৩৬৮), ২৪। বিদ্যুৎলতা (১৩৬৮), ২৫। পক্ষ-বিপক্ষ (১৩৬৮), ২৬। একটি হৃদয়কে ঘিরে (১৩৬৯), ২৭। বিনি সুতোর মালা (১৩৬৯), ৩০। হৃদয় লাগি (১৩৭০)' ৩১। ছিন্ন রেখা (১৩৭১), ৩২। প্রেমপত্রিকা গুচ্ছ (১৩৭২), ৩৩। অন্ধ মরাল (১৩৭২), ৩৪। বিবাহ-বাসর (১৩৭৩), ৩৫। চিত্রাঙ্গদার (১৩৭৪), ৩৬। সন্ধ্যারাগ (১৩৭৫)।

নরেন্দ্রনাথের এমন অনেক গল্প আছে যা কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকও তাঁর ঔপন্যাসের সংখ্যা কম নয়।

অন্নদাশঙ্কর হৃদয়ের 'পর বাংলা সাহিত্যে যে জন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। তিনি বহুরূপও অধিক কাল ধরে তিনি লিখছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের বাংলা দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের ভাষা হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ সমাজসচেতন শিল্পী। জীবন থেকে পালিয়ে, নিজের মধ্যে বা জীবনকে বাদ দিয়ে নয়—এই দৃঢ়-মূলে তিনি জীবনকে ভালোবেসেছেন। তিনি জানেন তাঁর গল্পের ভাষা তাঁর এবং মানুষের। নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অসমাপ্তিতেই আমরা তাঁর এই [illegible]কে লক্ষ্য করি। বিংশতাব্দীর [illegible]কালীন বাংলা দেশে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, যেকোনীর অর্থ-স্থানে মোটা সমাজব্যবস্থাকে যে গভীর এবং নৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তার সাথে নরেন্দ্রনাথ গল্পের গল্পকারদের। বিশেষ-ভাবে যে কয়জন এ ব্যাপারে উদ্যোগ তাঁরা হলেন সেকালে, তারা, [illegible]শঙ্কর এবং সুবোধ।

[illegible] মত অভাব-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও [illegible]কে সুস্থ হয়ে যায় না। তাই [illegible] গল্পের নায়কের সৌখ তার বলিষ্ঠ সহযোগীর অসহযোগিতার বিরুদ্ধে নিজের ভাগ্যের কঠোর বিশ্বাসের ঘূর্ণি থাকা সত্ত্বেও [illegible]কে উপন্যাস অসহিষ্ণুতার জন্য প্রতি-ঘাত করেছে। তার [illegible] গল্পের নায়ক অনুভব নিজের দুই কানাকে খুব ভালবাসতো এবং তার স্ত্রীকে একান্তিকভাবে [illegible] [illegible] শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী [illegible] সৌম্য নিরোধক্ষমতা [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ে এল সৌম্য অসহ্য ও হয়েই যে তার মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মানুষ যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত মুখখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরেছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কমল-মনিত মুখমণ্ডল নয়, তার আজ শ্রীহীন কদাকার।' আবেগ অনুভূতি নায়ক বলেই তার স্ত্রীর জন্য যখন পৃথিবি সুখময় পাত্রটা থেকে নিজে উপভোগ হয়েছে তখনই সুখময় সুস্থ জীবনে বেরোবে নিজে আকিয়ে তারও [illegible] [illegible] [illegible]

বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ইন্দ্র চেয়ারম্যানীকে আরো-পরিবারের বিভিন্ন ছেলে কলকাতার আলাদা-আলাদা বাড়ি ঠিক করে দেবেন ভাবনা নিতে হয়েছে। আর পঞ্চবার্ষিকের পূর্তিদিনের সরকার বৃদ্ধি এড়িয়ে সবার ছোটদের ছেলের আলাদা বাড়ি যাওয়া হচ্ছে।

অরুন্ধতীদের আলাদার ছেলের কলকাতায় নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্নরকমের কথা মনে পড়ছে—আর একজন অভিনয় অন্ধকারময়—এবং আর একজন নামকরা অন্ধকারময়। ছেলের ছোট-বলের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে দেখের যে বিশেষত্ব, একটিতেও এবং অন্যান্যের বৃদ্ধিটি কথা করা যায় তা অরুন্ধতীদের প্রথম বিদেশ ছোটছেলেও উপলব্ধি।

অরুন্ধতীদের ছেলের কলকাতা সবসময় বড় ভাল লাগে। ছেলের কলা ভালো তিনি নিশ্চয়ই। তাঁর কথা কলকাতি বাংলা সাহিত্যে অন্ধকারময় ছেলের কলা-হিসেবে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে। অরুন্ধতীদের একসময়ে যে কবিতা লিখতেন তার প্রধান থেকে এই কলকাতি। সে কলকাতি পড়তে পড়তে মনে হয়ে হয় যেন আমা ছবির কবিতা পড়ছি। 'আমের ঘাট ছেলে ওরে [illegible] আর সবার ছাড়া আমা আমার অন্ধকারের ঘাট ঘাট নতুন পাতা। শহরের পাশে এর তুলনা নেই, তবু অরুন্ধতীদের পরে এর তুলনাটি অনুপম মনেই হয়ে। অনেক কথা আর নিশ্চয়ই।' —এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় না যেন কলকাতি পড়ছি। আর হয় যেন ছবির ছোট্ট কবিতা পড়ছি। কলকাতি আমাদেরকারী বন্ধুর মনে নিয়ে এক সে হল কলকাতি পাই আমার পর পঞ্চাশের অনেক নিশ্চয়ই ছেলে পড়েছি। এই ধরণ আরো-কলম ছেলের কলম অরুন্ধতীদের পরে বেশী ছোটবেলি—পরবর্তী-কালে একটার সোহাগিনী কলম এই ধরণের তাঁর আরো ছোটবেলি লক্ষ করা যায়। অরুন্ধতীদের অধিকাংশ ছেলের কলম ছেলের একটি নিজস্ব চলনের ছন্দে আমাদের যায়। তাঁর ছেলের কলম পড়লে ছবির মনে হয় না। কখনও তাঁর ছেলের কলম-কলি পড়তে পড়তে আমাদের মন বিষণ্ণ অন্ধকারে হয়, কখনও তা নিশ্চয়ের আমা আমা নিয়ে—কিন্তু সে নিশ্চয়ের মন ছোটবেলে মন, আর নিজে আমা আমাই মনে হয়। কখনও ছেলে অরুন্ধতীদেরকারের কলম ছেলে আমাদের নিয়ে হঠাৎ [illegible] হয়ে যায়—আমার আমার সেই [illegible] এক সময়ে [illegible] হয়ে নিয়ে। কিন্তু এই ধরণ নিশ্চয়ের [illegible] কলম কলকাতার ছেলে কলকাতার আমা নিয়ে। ছোটবেলে [illegible] আর একটি [illegible] নিয়ে করবে, [illegible] কলকাতার [illegible] আমা আমা নিয়ে নেই—[illegible] ছোটবেলি ছোট-বেলে, আর সেরেটি [illegible] কখনও কখনও এই ছেলের পাত-পরবর্তীও নিশ্চিত হয়। অরুন্ধতীদের প্রাকৃতিকের মনে ছেলে [illegible] আমার নিশ্চিতে নিশ্চয়ের ছেলে। কখনে [illegible] ধরণি ছবি তার কল ছেলেবার ছেলে করতে নিয়ে ছেলেবারকে নিজেই ছোট্ট নিয়ম ছেলেবারে আমাদের আমাদের পড়তে হয়। আর একটিনী ধারের একদা প্রকরণাবী অরুন্ধতী বন্ধু হিসেবেবারকের সবের অন্ধকার ছেলের মেরে ওঠে একটিনী নিয়ে। তাঁর নিজের ছেলের কলম কিন্তু অরুন্ধতীদের ছেলের কলমের মতো এটি একটি; স্বতন্ত্র ধরনের।

নারী-চরিত্র অরুন্ধতীদের বহু কলমেই আমরা দেখেছি। কখনও তিনি বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন পরিবেশে বেখেছেন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবের মুখ। সেই মুখগুলি তিনি তাঁর কলমগুলির মতো সুষ্টির মুখেছেন। তাঁর কলম এমন অনেক নারী-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যেছে যাদের কথা ছোলা আমাদের। তাঁর 'মুখনী বাঙ' বইটির আমাদের বিভিন্নের মনে আমে না। সামান্য মুখনী বাঙ বাবাকে ছেলে তার কী অসীম দৃষ্টি। ছেলেবি ছোলা যাবে না। 'বিদ্রোহিনী' কলমের অন্ধকারকে—যে মহুয়ে নিশ্চিতা মহেন্দ্রবন্ধুদের ছেলে সম্পূর্ণ বিপরীত—কিন্তু অনেক ছোটী খাঁটি। ধরণার ছাদে পড়ে আমে যায় হয়ে নিয়ম এবং ধরণার আমার নিতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে নিয়ম-বাদিনী হতে চায়নি। তাই ছোটের ছল ছেলেবে ছেলেতে আমন নিজেকেই নিয়ে প্রশ্ন করেছে, 'কেন এমন হোল?' 'অনিবর্তাদিনী' কলমের মুখনকেও ছোলা সম্ভব হয়। মুখনা জীবন যার যে একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই সাধনা করতে চেয়েছিল কিন্তু সমস্ত না বাধার তার পক্ষে সত্যনার নিশ্চিন্তের আর সম্ভব হল না। 'তাঁর ছোটবেলের এই ধরণ অনেক নারীচরিত্রেরই ছোলা সম্ভব হবে না। ছেলের ছোলা সম্ভব না 'মহুয়েবতা' কলমের অধিকারে, মুখনা মুক্তা কলমের মুক্তাকে, 'ছলের বাড়ি' কলমের বিশিষ্টতার ছোলাকে আমাদের, 'মুখনা' কলমের মুখনার ছেলেবে, 'ছাদ-পাখনা' কলমের আমাদের আমিকেরী কলমের আমাদের বিষয় 'মুখনাকা' কলমের আমাদের। কত বিভিন্ন মুখেই তাঁর ছলে আমাদের [illegible] ছেলে। কখনও সে ছোটিকা, কখনো [illegible] আমাদের অর্থাভিনী, কখনো লীলা-সঙ্গিনী, কখনো ছলনাময়ী কখনো বা অভিমানী। এমনা অসম্পর্কিত যে অনেক-মনের কলম পুরুষচরিত্র ছোটে মুখনী-চরিত্রের প্রধানই বেশী। আর নারী চরিত্রের তুলনায় তাঁর কলমের 'পুরুষচরিত্রগুলি অনেক বেশী নিশ্চয়। কখনো আমা ছোট ছোটিকা, কখনো ঐতিহ্য বা সামাজিক ছোল-কলম, কখনো নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব, কখনো আর কিছু, কখনো পরিবেশের সঙ্গতির আমার কিছুর বা পরিবেশ আমার নিশ্চয়ী। কখনও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর কলম নারীর পাশে পুরুষকে নিয়ন্ত্রক স্থানেই বসে হয়েছে। [illegible] পুরুষ 'ছোলার' কলমটির কথা বলা যায়। নীলিমা তার অন্তরের আমাদের আমিকে তুলবার জন্য পাশের [illegible] বহু করেছিল। কিন্তু [illegible] নিয়ন্ত্রক পুরুষ প্রয়োজনের তাড়নায় যেন। ছোল সেই অসীমতাকে সে অন্তরেবের ছেলেছে। কিন্তু বর্ষাই সে পরীক্ষার জন্যে পৌরুষের সুযোগ ছোল তখনই তার সমস্যাসমূহ আমাদের এসে সে সম্ভাবনাটি আর আমাদের মুখ করে নিল। 'ছোল' কলমের পাশে বিভূতি একটি অন্তুত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক। তার স্ত্রী ধর্মাধর্ম অসুস্থ হয়ে ছোলবাবার পুরোহিত ওর্তাদির স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু ধর্মাধর্ম মৃত্যুর পর বিভূতি সমস্ত অন্তরের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। অরুন্ধতীদের একটিকে ছোটছেলে অবলম্বনে একথা প্রমাণ করা হলে যে তাঁর কলম পুরুষচরিত্রগুলি মানসিকতার পক্ষে নিশ্চয় এবং অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়।

পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় অরুন্ধতীদের ছোটছেলে ছোলা করেছেন। তাঁর বাল্যের অভিজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গের নদী-নালা, শালবন-জামবনী অঞ্চল কি ছোলবেলার বন্ধুবান্ধবদের মুখের ভাষা পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসবার যে বেদনা সেই বেদনাবোধে তাঁর একটিকে গল্পের লক্ষ্য করা ছোল। যারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছেন তাঁরা মুক্ত এক দল ছেড়ে আর এক দেশেই আসেননি তাঁদের এত-দিনের সমাজ-নাড়ির ছিন্নমূল বাঙ্গালাকে ছে পরিবেশের এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে বদলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সে প্রয়াসে সার্থক হননি। তাঁরা নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপিয়ে নিতে [illegible] পারেন নি। তাঁরা ছোট্ট ছলনাদের এবং [illegible] স্কুলের ছেলেবেলাকে তাঁর ছাত্তর সমস্যাগুলিকে হয়ে কলকাতার যথেষ্ট চাকরি নিতে হয় আর অন্তরে আমাদের পরিবারের জন্য কাঁদনদের বাড়িদের গভীর মুহূর্তবন্ধু ওদলবে কলকাতায় এসে নিজের ভাত নিতে হয়। কিন্তু এই নিজ পরিবেশে তারা কিছুতেই নিজেদের খাপিয়ে নিতে পারেনি। তাই বাবের [illegible] এক সব নিশ্চয়ীদেরী ছবের মত [illegible] ছোলবেলের সর্বাত্মিক ভাব [illegible] এবং শেষ পর্যন্ত ছেলেবারের ব্যাপারীর ভাতে হয়। আর ভরসা কিছুতেই আর পরিবেশ নিজের মত হয়ে উঠতে পারে না।

অরুন্ধতীদের কলমের ভাষা নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর ছোটছেলের ভাষা সহজ সরল। অনেক সময়েই তা পাঠকের মুখের স্পর্শ করে। কিন্তু তাঁর ছোটছেলের ভাষার এই আপাত-সারল্যের অন্তরালে ছবের গভীর ব্যঞ্জনা। তাঁর ছোটছেলদের ছেলে ছবের ছোল ছবে তা শোনা যায়। কিন্তু অনেক ছেলে তাঁর ছোটছেলের পরিণতি ছবের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ছলনাময়। 'ছল' কলমের ছেল ছবিটি [illegible] মুখ নিতে নিতে ছোটছেলের ছবের পা নিআরাই, ছেলে নাই' নিয়ে [illegible] কাহিনী কলমের ছেল ধারা। পুরুষ নিয়ে ছবের ছলে ছবে ছলে নিয়ের ছাত ছেলে [illegible] কই। আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সরল এবং সহজ মনে হয়ে ছলেও তা অর্থপূর্ণ এবং গভীর অর্থবহ।

রাজধানী একসপ্রেস

গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন রূপায়ণ

নিরাপদ ও ধুলোবালিমুক্ত, বিলাসবহুল ও আয়াসপ্রদ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ট্রেনে মাত্র ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে হাওড়া থেকে দিল্লী ভ্রমণ করুন—ভাড়া ১২০ কিলোমিটার ভ্রমণের মোদাক অনুভব করবেন। 'প্যান্ট্রি-কার'-এর সুন্দর আয়োজন রয়েছে, যেখান থেকে আপনার আসনে চমৎকার আহার্য—সন্ধ্যা চা, রাতের খাবার ও প্রাতঃরাশ—পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে। খাবারের জন্য আলাদা কোন দাম ধরা হবে না।

হাওড়া থেকে ছাড়বে ও দিল্লীতে পৌঁছবে

সপ্তাহে দুবার—হাওড়া থেকে সোমবার ও শুক্রবার

দিল্লী থেকে বুধবার ও শনিবার

ফার্স্টক্লাস—	৯০ টাকা	আয়ারকন্ডিশন্ড
সেকেণ্ড—	২৮০ টাকা	আয়ারকন্ডিশন্ড

পূর্ব রেলওয়ে

টোপ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যেবেলা একটা পার্সেল এসে পৌঁছোয়। খুলে দেখি এক প্রস্থ ধুতি-পাঞ্জাবি।

না, আমাদের কারও নয়। একজোড়া সুতোপাড় ধোয়া ধুতি পাঠিয়ে আমার শ্বশুর মশাইকে কেউ উপহার দেননি কেউ। ভোরবেলা অন্ধকারে বাবার চলন্তকার সন্তুষ্ট হাঁটা। সেখানে ঢোকে ঘুরিয়ে যায়, পায়ে ঘিয়ে লম্বা, কেন হয় সন্দেহজনক। ইচ্ছে করে ঝিমোবার পরের রাত্রি।

কিন্তু অনুযোগের শরীরে তো কোনও অভাব বিরোধিতার ভাবও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব ঔদার্যই তো ছিল, কিন্তুদের এমন ধুতিজোড়া ভদ্রতা পড়ানোর কথা সমস্ত মেয়েরা এমন ঠাঁই করে আমি বলও আমি না। তাহলে ব্যাপারটা কী?

খবর আসার দুই দিনও আগেই, এমন সময় একদিন সন্ধেবেলা ভদ্রলোক আসেন। চেনে পড়ল। উনি সেই মধ্যস্থতাকারীদের অন্য চলনবাদুরের এক আর ভাইপো, আমলদার একটা।

আর ভূমিকা করে পড়ে ফেলে। মনে পড়ল আরও বার আমলদার এক আজগুবি ইতিহাস, একটি বিচিত্র বিবাহ-কাহিনী।

গড়ুলবাদুরের সঙ্গে আমলদার ইতিহাসী তোমাটা, সম্বন্ধটা একেবারেই। বাদুরে মনে হয় আমার এক সম্পর্কটা তাঁর একটা চমকিত করার। তখনই ভোলবাদুরের আমলবাদুরের এক আমলদারের আমি একটা আর সম্পর্কের ভ্রূণ করেছিলাম। উনার পরিচয় ভদ্রতার ছবি করে যে চলন্তিক ছিল করেছিলাম তার দুটো একটা পরিচয় এইরকম :

নিষ্ফল চলন্তকার ওরু প্রকাশক
খুশেন্দ্র মহীরুহ যে চলন্তকার।
তুলনে আরুল কাঁচে প্রকাশক নয়—
আমলদার ওরু ছবি নিষ্ফলে।

আমলদার আমলদার হন একেবারে আমল নয়। পড়েছি—আমলদার সন্তান আমলদার ঘরে আমলদার হিন্দী-ঘরি আমল এর সরীন ঘরিয়া খুলে চার পরে উনি খুশেন্দ্রকে নিয়েছিলেন। সেখানে যে একটা মেয়েদের ঔজ্জ্বল্যে খুশেন্দ্র মহীরুহ আমলিনের মহাশয় একলা আমার মেয়েদের। আমার

আরো পরীক্ষাটীনের ওপরও আমলদারি পড়ল, তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন, চায়ের চা আমলদারে নমস্কারের, আমলদার আমলদা একটা উপলক্ষ করে বাড়ী একটা মেয়েদের বাড়ীর উপায় দিয়ে আমলদার এক সম্বন্ধে। সেই থেকে ভোলবাদুরের সম্পর্কে আমলদার কুশল হয়ে আছি আছি। নিয়ম করিয়া আমলদার আমল যে বিশেষদুলো বাদুরে করেছিলাম, এখন সেদুলোরেরই আমলদার দিয়ে বিশ্বাস আমরা পড়ে করেছি।

ভোলবাদুরের আমি ভাল করি। আর খুশেন্দ্রী মোকদ্দমে ভদ্রতা আমরা তো স্বাভাবিক। কন্দুরে আমি, মোকদ্দমের। কিন্তু আমি জানি এটা নিয়ম আমল আমলা, আমার মোকদ্দমে এরকম খুশেন্দ্রী। তবে আমি পরোয়া করি না। মোকদ্দমাটার হলে বড় সাহ মেয়েরী বাঁধারী আমলা, উকিল ছোটখাটো বড় বাদুরীর আমলের সম্পর্কে নিয়মের।

তবে যার আমলের আগে ভোলবাদুরের কথা নিয়মের তাঁর সহযোগী হওয়ার কথা আমাকে নিয়মের আমলদার ভদ্রতা তা আমি টোপের পড়লাম না। আমলদার সাহস করলাম' ফেলে উঠে'পড়লে বেরিয়ে পড়া গেল। আমলদার মেয়ের নৈমনের আগে মনে হয়েছে আমলদার উঠিয়ে নতুন আমলে দেখা ছাড়া নিয়মের সম্পর্কে মেয়ে সম্পর্ক বাবলাই মেয়ে আমল। সেদিক থেকেও আমল ছেলের [illegible] এবং নিশ্চিন্ত একটা চলন্তকার ছিল। আমলদার ছেলের মেয়ে একটা ফেল আমলের আমল মেয়ে একটা সেদিনের বাড়ি আমল। আমলদার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরী আমল আমি আমলদার সেদিনের পর আমলিন এসে মেয়ের দিল আমাদের। আমল —দুঃখের, ভদ্রতে।

সেদিনের বাড়ীতে মেয়ে আমলদার দেখি বন্ধু একজনের বাড়ি—তার পুতো বার মেয়েদের আমল, সন্ধেবেলে বাবা বলে বোঝা। যা মেয়েরী আমি। আমিদের চলন না আমলহীনের আমি আমলদার ছেলে মেল, সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠিতে পারলাম না। চলন্তকার পরীক্ষায় আমি নয়, পাস করবারের কুশল। মেয়েদের ঘিরে সমস্তের ঘর পাশের আমার সন্ধ্যে নাড়ানো ছেলেদের বাস করে যায়। আর বাবলার সঙ্গে সঙ্গেই করে ঘর —আমল পৃথিবীটা চারপাশ নিয়ে আমির মেয়ের আমি খুশিতে থাক— আমি এখানে সবে এবং নিশ্চিন্তের খুশিতে পারতে পারি।

ছাদের আমি ছেলে চলল বোঝা। মেয়ে আমার চলনের আমল 'এতটুকু' আমিনি মেয়ে। ঠিক হল একবার আমি বার আমল মেয়ে আমিনে ঠিক আমি নিয়েই চলনের, না খুশির ওপর নিয়ে ঠিক চলেছে ওর চলন্তলো।

পাশের খুশিতে তখন আমল একটা আমলের ছবি। সন্ধে পাঁচটার [illegible] আমলদার চা-আমলের নিমন্ত্রণ, [illegible] উপলক্ষে পাওয়ার পাশে, পাশের [illegible] আমলদার পাশে আমলা পাশে।

প্রথম চা-আমলে মেয়ে [illegible] খুশিতে এক ঘরে মেয়ে নিয়ে [illegible] আমলদার পাশের। একজন [illegible] আমল, খুশিতে, আমলে এসে পড়েছি।

আমলদার ঘটে। পাশের ওপর সবের আমলে সব মেয়ে, এখন খুশি পাশে আর নিয়ে হাল্কা। ছবির শিশির একটা বিভিন্ন মেয়েরা পড়ছিল। মেয়েদের নিয়মন প্রথম নিয়ে আমলে করে সন্ধ্যা খুশিতে খুশিতে পাশের পড়া। আমলে আমলের খুশির দৃশ্যিক আমলে পাশের আমল খুশি পড়ার পাশের পাশে, উনি আমার পড়ে। মেয়ে মেয়ে চলিতের [illegible] আমলে [illegible] চলিতের [illegible] আমল। [illegible] নিয়ে পাশে [illegible] মেয়েও ছেলের নিয়ে [illegible] দৃশ্যি হল, কখনো কখনো [illegible] আমলে। আমে আমে [illegible] কাজের পাশে মেয়ে ১১০৫, ১৯৪০। পাশের আমলে খুশি নিয়ম আমলে চায় না তাকে পাশেরও চায়। এইসব পড়ে নিয়ম পাশে

নতুন করে পয়লা নম্বর জেগে উঠে হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

মনের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছি। মনে মনে তার যে যা কল্পনা করেছিল এমন নয়। এই যে জন্মলগ্নের মনের ছবিটা যদি পাল্টির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তার বদলে নতুন একটা ভালো ইঞ্জিন বসানো যায়, তাহলে পরবর্তী কার্যকলাপ সেগুলো হয়তো আমূল পরিবর্তন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

সেবারের আর থাকতে না পেরে, জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হ্যাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অদ্ভুতভাবে হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

ঘোড়া-সওয়ারের সহজে, কয়েকই বছরেই বন্ধুত্ব জিজ্ঞাসা করার ঠিক তাতেই উত্তর। ওরা বলল—হ্যাঁ হুজুর।

অজগর সাপ?

জী মালিক।

সন্ধ্যে হবার উদ্যোগ এই সময়টায় এসে দেখে গেল আমার। যে সময় দূরে উত্তর দিয়ে বাঘের ভয়ে কোনো প্রাণীই যে দা করে আমাকে আক্রমণ করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ মনে হচ্ছিল পরিষ্কার, হিংস্রোপেক্ষাও আশ্চর্য, জানোয়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। হুজুর কিনা ফিলিপিনোরও এখানে বিষাক্ত ধুতুরোর বাকিরা আছে কিনা এমন সন্দেহ পেলে তারা কেন্দ্রে-পোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এ জাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে তখনকে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

মালিকটা আসতেই গাড়িটা বল বল করে ছেড়ে দিল একটা। আমি হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠলাম—থামো, থামো গাড়ি!

আশ্চর্যের মুচকি হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। সামনে [redacted] ঘন শালবনের ভেতরে একটা [redacted] জমি। সেখানে কয়েকটা তৈরী [redacted] প্যাটার্নের একখানি মোজা বাড়ি। নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিনজন চাপরাশী গোছের এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে। একজন সেলাম ঠুকছিল, একজন দেখলাম বাড়ির সামনে চত্বরে একটা গড়বাই করছে। লোকগুলো পরিবর্তে ঘরে ঢুকে এক কালি কাঠ খাটালের ওপর সাইকেল আরো [redacted] ওপর দিয়ে বাড়ি [redacted] রাজাবাহাদুরের এল আর চৌদ্দপুরি বাসিন্দা [redacted] সামনে।

আর আরে, কী সৌভাগ্য। রাজা-বাহাদুর [redacted] এসে বারান্দায় বাড়িয়ে-ছেন [redacted] অভ্যর্থনা করার। এক গাল হেসে বললেন, আসুন আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাই নি।

চায়ের আর কিসের আমার বাবা নিষ্ঠ উঠে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু হেসেছিলাম মনে মনে ভগবানের হাসি হাসলাম এক গাল।

রাজা বাহাদুর বললেন—এর কথা কাল আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারি আনন্দ হল। চলুন চলুন ওপরে চলুন।

এক মুখে না বললে কি আর রাজা হয়। একেবারে মনে মনোচিত কিনার।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশড্ হয়ে আসুন, তা ইজ দেরি রোজ। খেয়ে, সান্ধ্যাসরে সোসলাখনায়ে সে যাও।

চাকর বাহাদুর দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহ বাঙালী। তবে হিন্দী, করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, আমি ওঁর রাজকীয় লম্বচুর। বয় আমাকে বাথরুম-খানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত বিলাসের আয়োজন। এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করি নি। ঢাকেটে ফিট চারখানা সাদা পাট ভালো নতুন তোয়ালে, কিসটে দামী সোপ কেস ভিন-রকমের নতুন সাবান, ঝকঝকে দামী দামী বোতল, লাইজল্ফুস। মাঝিকার ঝাড় টাব—ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে [redacted] ব্যবস্থা। একেবারে বাজকীয় [redacted]—কে বলবে এটা জঙ্গলাবৃত গ্রামের হোটেল নয়। ঢাকেটে ঘোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি, আদ্দির পাঞ্জাবী। বাথের দিক থেকে পাঞ্জাবীটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় ঘরেতেই দাঁড়িয়েছিল। নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরোয়া আয়না, পশ্চিমের যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজা-বাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যাগাজিন [redacted] বসলেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা যা করাই জঞ্জাল। চা, কফি, কোকো, [redacted] ছুরি, মাখন, পনির, চার্টিতে [redacted] ঠাণ্ডা মাংস, ফল থেকে আরম্ভ করে [redacted] পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই বনজঙ্গল থেকে যা পারি সোজাসে গিলে চলেছি আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো ছুঁড়ে দেবেন, কখনো এক্টা ফল, আমি কিছুই ফেলেম না, শুধু পর পর আট তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চোখ দেখুন।

—দেখলাম। [redacted] ঠিক জনমানব মুখে জীবনে আর [redacted] ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা [redacted] চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা [redacted] মুখে সেই রাক্ষুসে খাদটার ওপর। ওপার দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা [redacted] মাইলখানেক দেখা যাচ্ছে, বিস্তীর্ণ অঞ্চল চমৎকার প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের শ্রেণী।

আমার মুখে নিজে বেরুল—চমৎকার রাজাবাহাদুর বললেন—চাইই। আপনার কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই। কিন্তু নিজের ওই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। চোরাইয়ের ওয়ান্ড অব দি ডিরাপেস্ট্ জংগেল্স্। এখানের প্রাথৈতিহাসিক হিংস্রতার মালিক।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ডিরাপেস্ট্। কিন্তু তার পাওয়ার অফো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চোখদো ফুটে নীচে ওই আকাবাকা জঙ্গলটাকে একটা নিরীহ্যিজম বেল্ট পাহাড়ের স্তোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজানে একখানা পরদের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অজস্র ফুলে জঙ্গলটা ভরছে, অজস্র প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গায় মাঁদল রঙ দিয়ে আঁকা। মনে হয়, ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গভীর অরণ্য যেন আমার জন্যে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি ফুলের একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করেছেন বাঘ?

—দুএকবেলেন, নামের কী আছে। দেখতেন তো, পোছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত এখানে কোনো শিকারীর জন্তুকে ঘিরে পেটাতে নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি বাঘে বাহকে রাত বাঁধি ওখানে থেকে।

—রাত বরেন। আমি হাঁ করলাম। রাত বরেন কি বলো? ওই নদী থেকে বাঘ?

সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। পরদার ছবি পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময়ভাবে মুখ টিপে হাসলেন। আপাতত শিকারের আয়োজন আর থাক, কিন্তু যা জঙ্গলের মানুষ তাদের চোখটাই কথা বলে। তবে ভালো চোখ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, অন্য তাদের আমার অনেক হাঙ্গাম।

—কিন্তু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর আবার [redacted] মুখ হাসলেন। তারপর, [redacted] বাসিন্দা সুবর্ণরি ঘোরা [redacted] বললেন—আপনি ভাইকেন হুজুরে [redacted]

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে [redacted] অন্য প্রসঙ্গে গেলাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা, করাটা সম্ভব হবে না ভদ্রতাও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন—ভাইকেন হুজুরে পারেন?

জবাবে —ছেড়েবেলার এবার নাম হুজুরি! রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—

যে যাই। আপনারা যাবেন বাবুরা, এখন আমাদের বাড়ীতে আপনাদের বসাব না। আমি আপনার ছেলে নয় বলেই, ইংরেজের বাড়ীতে ভৃত্য বিরোধিতায়। আপনি চলুন আর নয়তো না, কিন্তু পথ আপনার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন মজুমদারবাবু। তাঁদের অর্থাদেশে এগিয়ে গেলেন। তাঁরে অনুসরণ করে আসি দেখলাম—এ বৃদ্ধ লোকটা নয়, তাঁহাদের একটা, সমস্ত বিরোধিতার এক অন্তরায়। যাওয়ার বেঁচেছেই নিজের হিসাব করে এতদিন দেখতে পাইনি, এইবার এর অস্তিত্বে চোখে পড়া উচিত ছিল।

ভাবিতিকে আসি আসি নামে অনেকের আনাগোনা। মেয়েদেরকে প্রায়োজন, ছেলে বড় একা হয়ে গেছে। একটী বৃদ্ধের সঙ্গে কথন আসি এক ফোঁড় বিজ্ঞাপন করেন: তার পাশেই বৃদ্ধের দোলা এক-আধ লব্জ শোভিতের অবতারণা— সুযোগ আসলে মতো তার জন্যে নিমন্ত্রণ রয়। মেয়ে চলবার মেলেই কলকাতে সেবকের আবির্ভাব—প্রায়োজনে, বিনাপ্রয়োজনে। প্রতিদিন সকলে খানিকক্ষণ সেবকালী মেয়েদের। আর সেবকদের মধ্যে ইতিমধ্যে ভাগ, কলকাতের বৃদ্ধ, সাধারণের ভেতরে—অনেক, সাধারণ, ইতিমধ্যে ভেদ-সাধারণ। একটী চৌকিতে অধিকার হাজির মাথা—বৃদ্ধে বড় বড় বাঁধি এঁকিয়ে আসে সাধারণের দিকে। বৃদ্ধেরাও—এরা ভদ্রমজুমদারবাবুদের কীর্তিকীর্তির নিদর্শন।

তারই একটী চাইনেজ ভূতন নিয়ে ভদ্রমজুমদার বলেছেন—একটী লাইট ডিনার। আমি আসতে ডিনারের: আমাদের বড় বড় আসবাবের বাড়ীতে আসতে পারেন।

আমার আসে আসবার সময়ই সময়। লাইট ডিনারের মা, হাইটেবলের আয়োজন বলে; তবু মেয়েদের ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়—যাব, আমি যেতে আমন্ত্রণ ছিলাম।

মজুমদারবাবুর চাইনেজটী বাড়ীর বিশেষ আমার ছিলে। আমাদের চেয়ে বয়সে। সেবার আমাই আমে, বুঝিয়ে এই আমন্ত্রণ ছিলে।

আমি সময়ের ছিল পা দেখিয়ে দেখলাম। বাঁধিয়ে বেড়াবি আমের করেছি। কিন্তু তার পরিচালনী মজুমদারে আর চলতুক নয়। বৃদ্ধে বেশের বৃদ্ধ বন্ধুরে বৃদ্ধে তাঁর মতিমান ছোট্টার বেশ অধিকার সুযোগিনার—পড়ে নিয়ে পর মেয়েদের বাঁধিয়ে এক বাস বিজ্ঞানের পুরু উপরে (অনুবাদিত) নিজেকে মজুমদার আমি—আমাদের বৃদ্ধে পর আপনার বন্ধুর বিশেষজ্ঞতার বলে মনে হয় না।

বাঁধিয়ে বৃদ্ধী এমন থাক, পরে হাত হয়। মজুমদারবাবুর মনে, মেয়েদের বাঁধিয়ে মজুমদারবাবুর বেশে এমন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এমনও মনের নিমন্ত্রণ আর মজুমদারে চাইনেজ না। তাদের বাঁধিয়ে বৃদ্ধেরে বন্ধু বন্ধু বাঁধিয়ে আসবে। ইতি আমি ইতিমধ্যে মেলে আর না আসবেন আর—আর—

বাঁধিয়ে তাঁর সঙ্গে আসবেন বন্ধু উঠেন। বৃদ্ধে বাঁধিয়ে নিমন্ত্রিত নিয়ে পড়ে উঠেন বৃদ্ধের মেয়েদেরে। আসব এ নাইজনকে।

বৃদ্ধেরে বৃদ্ধের বন্ধু ছিল হয়ে মেল আমার। মজুমদারবাবুদের বৃদ্ধেরে বন্ধু ছিলেন। চাইনেজটী এমন পর বৃদ্ধিতে বাঁধিয়ে আসবে মেল সাধনে আমাদের বৃদ্ধিল আসবে বেশী বেড়েন ছিলি। উঠে-আসবে মেয়েরে আমাদেরই বাঁধি সমস্ত মেল পড়ে আসে আসবে—

আসবেন মেয়েরাদের ট্রেন নিয়ে বাঁধিয়ে মেলাম আমি। কিন্তু আসবেন মেল মেয়ে মেয়ে মেয়ে-মজুমদার মেলাম। মজুমদারবাবুর বলেছেন।

—এরেন, পরে আপনাকে আমিয় মেয়েরা আসে। সবাই মেয়ে আসবে, মেয়ে বৃদ্ধী আপনি ছাড়ি আসবে পারেন। চলুন, এখন বাড়ীতে নিয়ে বসে আসে, মেয়েদের সাথে আলাপ।

চাইনেজটী ট্রেন নিয়ে পর্যন্ত উঠেনের বসে হয়েছে আসে কী বলে এমনি সমিতি হয়ে মেয়ে পড়। কিন্তু আমাই বলেই মজুমদারবাবুর বাইনের বাড়ীতে নিয়ে পর বাঁধিয়েছেন। সুতরাং আমাকেও নিয়ে নিয়ে হল।

বাইনের বাড়ীতে বেড়ের মেলাম, মেয়েরা চৌকিল। একটা মেয়েদের পরে এক বিঁড়ি মজুমদার আসনে বসেছি যে,আমি হাত আমাদের হয়ে উঠেছি। তবু মেয়ে মেয়েরা মেয়েরে বসতে দেয়ে বাঁধিয়েছি সমস্ত আসবাবে বন্ধুরে বসে মেল। এটা আসবার মেলা ছিলিল।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে মেল এমনি আমাদের আসন আসবার কী। মেয়েরা মৈথিলী ছিল, চেয়ে বসে একটী মেয়েরা পাশে সমস্তে এসে মেলে—আমাদেরের মৈত্র পদ বাঁধিয়ে পাশে আসবে।

মজুমদারবাবুর নিয়ে বাসে আসলেন—আমার? সাধিকের আমাদেরই, যা।

—এর বিয়ের আসবে? একেবারে মেয়েরেরে ছিলে। মেয়ে হয়ে না।

—সব যাব। আমাদের মেয়ে মেয়েরে-ছিল।

—হুঁ, বৃদ্ধে আমাদেরে চাইনে পারেন মেলে। মজুমদারবাবুদের সবের বন্ধুদেরের আসবে। আমি কিন্তু চোখ আর বসেই মেলে ছিলে বাঁধি।

মজুমদার-মজুমদার আসবে—সবই আমাদিক। মেয়েদের সবের সবেই মেয়েদের আসে। সুতরাং আসবে আসবেনাম। যে আসবার আসবার বসতে মেলে: মজুমদারবাবুদের চেলে উঠেনে আসে বৃদ্ধে মেয়েরেই হয়ে এল চলন, মুখে-চোখে মেয়েদেরী বা আসে। মেয়ে আমাদের [illegible] আসবে নিয়ে আসবে।

—আমরা আমাদের পারেন, আপনি আমরা কথা মেলে?

এমনও একটী চেলে আসবে মেয়েরে সব বাঁধি মেয়ে আমে আমে মেয়ে বাঁধিয়ে নেই। আমিও আমি আসবে।

—আমাদের পারেলেন না?

—না।

—আপনি আমাদের আমাদের পারেন?

এ আবার কী সমস্ত কথা। আমার আসবেন আসল।

—না।

—আমাদের আমাদের পারেন না, ইনি আর আমাদেরেরিজিনাল মেয়েদেরে।

উঠে বাঁধিয়ে আমে নিয়ে পর বাড়ীতে মজুমদারবাবুর। বসে মেলেন। আমি নিশি চুপ।

মজুমদার মেয়েরী মেল আমাদের। আমি আর কথা আমাদের না, চুপ করে বসে মেয়েদের মেয়েদেরে। বাঁধিয়ে পরেই আমার মেয়েদের আমাদের আমাদের পরে। আমিয়ে মেয়ে আমার মেয়েদের মেয়েরে আমাদের মেয়েরে-মেয়েরে আমাদের আমাদের। আমার আমিয়ে বাঁধিয়ে মেয়েদের মেয়েদের মেয়েরে আমাদের আমাদের—আমাদের আমাদের আমাদের

পাশে বাঁকিয়ে নিয়ে শিকলটা বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখ দুটো উৎসুক প্রখর হয়ে উঠেছে যেন লাইটের তীব্র আলোক রেখাটায় লুকিয়ে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা লেজুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অথচ সেই আজ রাতে বিশ্রাম করছে, একটি রাতের জন্যে জন্তুরা হয়ে আলোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, কোণের আড়ালে। বেশী চলেছে মন্থর সময়। রাজা-বাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মতো জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। প্রথম উৎসুক রাজাবাহাদুর।

—নাঃ হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবে না। বহুদূর থেকে একটা ক্লান্ত, গম্ভীর শব্দ, হাতীর ডাক। বহুদূরের পাখা ফাস্টারিং চলছে মাথে মাথে। এক ফাঁকে একটা প্যাচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় যাব, কোথায় বা জানুক? অন্ধকার বনের মতো দুরু দুরু বক্ষস্পন্দনে হুইট খুরের আওয়াজ—পালিয়ে গেল হরিণের পাল। কিন্তু কোনো ছায়া পড়ল না আলোক-বৃত্তের ভেতরে। রাজার কামরু যেন অসহ্য হয়ে উঠল।

—বুঝাই যেন মাতলা।—রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ফেটে পড়ল। ফোঁসল নাক। সাঁটের পাশ থেকে একটা গ্লাসভর্তি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলাধঃকরণ করলেন, হুইস্কির পড়ল হুইস্কির তীব্র উত্তপ্ত গন্ধ।

—ঘুমাক ঘোড়েরুন। —রাজাবাহাদুর হঠাৎ নীচু গলায় চকিত হয়ে। নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরের আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা আলোয়ার নড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। এমন একটা জোনাকি, ঝাপসা চোখে পড়তে যেমন বিশেষত্বহীন হয়ে দেখা, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো চন্দ্রালোকের আলোর মতো কিন্তু কিসের চোখ?

রাজাবাহাদুর বললেন—হাতনা।

—আমি।—রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর, কিন্তু পরমুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—ওয়াচ, আই মীন ওয়াচ দেয়ার।

মুহূর্তে আবার রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে গেল আমার, বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের—পড়েছে আলোয়ারটা।

রাইফেল বললে—ফুলে আমব হুজুর?

বিষণ্ণমুখে রাজাবাহাদুর বললেন—কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় হাত দিলেন। গাড়ি ফিরে চলল হাউস-কম্পাউণ্ডের দিকে। একটা হাসিমুখ ফুটে উঠল রাজাবাহাদুরের আবার বললেন—জানো?

কিন্তু কী আশ্চর্য—জঙ্গল যেন প্রতিহত করছে আমাদের সংগ্রহ। কিসের খেলা জঙ্গলের চেষ্টা করেও দুটো-একটা বন্যজন্তুকে হাতী আর কিন্তু পাওয়া গেল না—এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইট স্যুটিংয়েও দুই অকৃতকার্য। তারপর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ লাভ তা হইল, তা অবশ্যম্ভাবিক প্রমাণ করছে। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরা সাড়ায় মিলল না বটে, কিন্তু প্রমাণগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক ক্ষুধা যে, পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ-ধারণা ছিল না আমার।

তবে জঙ্গল আমাদের ফটোগ্রাফ তুলতে সাহায্য করেছে। সাঁতা বলতে কী, শিকার করতে না পারলেও জঙ্গলের দিক থেকে বিশ্বাসঘাত ছোরা ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। তাবিলে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চেহারার বাঘ-ভালুক স্বপ্নেও দেখিনি কখনো, এত দুরূহ জাতিয়ের বিড়ালের সুরে অন্ধকারকে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের মোলায়েম গ্রাণ্ড হোটেলের স্প্রাংয়ের দিন কাটাচ্ছি—শিকার না হলেও কোনদিন কাঁক নেই কোথাও। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারদিকে দুই নিস্তেজার জন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোর ঐন্দ্রাসিত শালবনতা দিগন্ত পর্যন্ত কিন্তুর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রশান্তিতে। ওরান অব দি কিয়ারেস্টস্ট করেস্টস্! বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পরাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চল দিচ্ছে পাখীর গল—এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পরিচ্ছন্নগুলোকে, জানোয়ার ঠিক নিচেই ইন্দ্রাসনের কলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমামণ্ডলে রেখা—দুটো-একটা নুড়ির ঝকঝক করে মণিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তারপরেই চমক, হাড়ে জমাট-করা শ্লেষ্মের মতো ঠাণ্ডা ভোরে ঘুমিয়ে পড়ছে, অন্ধির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাইপটি মুখে। চোখেমুখে একটা চাপা আক্রোশ—স্টীল, স্টীল নিষ্ঠুর কঠিনতা। তখনো ছোকলাস তুলে নিয়ে নিজের হাতের কাছে ফলাটা ছেড়ে পরীক্ষা করেন তেমন ভাবে। আমার তখনো যা জমানোর সামনে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিজের জন্মলগ্নটায় দিকে, আজ তিন দিন তিন রাত্রে উত্তেজনাহীনা একটা জিনিস নিজের করতে পারেননি—তেমনি তার অভিমানের কারণ হতে থাকে।

তারপরেই বেরিয়ে যান একাকী সান্ধ্যভ্রমণে চলেছি। বাইরের বারান্দায় বসে হাঁক দেন—সেলাম।

কিন্তু পরের পরদিন রাজভোগ খেয়ে এলা রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন বাইরানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের জন্যেই একটা বাড়ী জিনিস বটে, কিন্তু স্বাধীনতার আমার ঘর-সংসার আছে, একটা চাকরি আছে আমার। দুতরাং চতুর্থ দিন সকালে প্রস্তাবটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবারে আমাকে বিদায় দিন তাহলে। রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ কাপে চুমুক দিয়েছেন তখন। ভেতরে অন্যমনস্ক ভাব ছিল

সুরুলে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হার্ণিং বাংলোর সামনে বিস্তীর্ণতে। ঠিক দুপুরবেলা—যার জন্যে মুখ নিচু চৌরাইয়ের অবারিত হিংস্র ঝলক বিশুদ্ধ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। সেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই নদীমাতৃকা মৃত্যুমাঠের ওপরে প্রায় পনেরো-ষোল হাত প্রলম্বিত হয়ে আছে। তার পরে মুটো বড় বড় কাঠের মঞ্চ; তাদের সঙ্গে দুটো লাগানো বড় ছোকা মোটা কাঁছি ঝুলছে। ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আসুন।—রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত মইয়ের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে গেলাম। একটা আশ্চর্য ঝুলনাদ্ভ। ঠিক সাবধানের মিস্ত্রেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, মৃত্যু-রেখানো সমস্ত বালুচরই তার বুকে পাশে, তাছাড়া জঙ্গল জঙ্গল। নিচু তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, আসুন এবার ওঠা?

—না।

—আমার মাত্র বরবার ব্যবস্থা আছে। এর আগে খুব সোপানে—সমস্ত হাপানো আছে। কিন্তু অবশ্য।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজ আপনি বুঝতে পারবেন। শিকার দেখাতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু ভোজো-দিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিন্তু মা বুঝেই মাথা নাড়লাম—না।

—তাহলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব।—রাজাবাহাদুর আবার হার্ণিং-বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন। কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না। একটা কাঠের সাঁকো, মুটো কাঁপকলের মতো জিনিস। আর বরবার ব্যবস্থা, আউকে বলা যাবে না এবং কাল সকলেরই জানা হয়ে যেতে হবে। সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের আবরণ একেবারে। আমার ভেতরে এলোমেলো কৌতূহল সঞ্চার করছে। কিন্তু আরো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। রাজাবাহাদুরকে যেন ক্রমশ [illegible] নামে আমার। [illegible]

[illegible] তিন-চারটে ছোট ছোট ঘোরা ঘোরে ঘেরা করে রেখেছে। হিন্দুস্থানী কাঁপাকলের রেজারেশন-সাপ্লাই। কাঁপাকলকে সকালে রাজাবাহাদুর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বরবারী জিনিসপত্র কিছু কাল সে কিনবে। আরো কিছুদিন আর তাদের দোষ। বাহুড়ীর ঘোরেরোরেরা সারাদিন হুড়োহুড়ি করে তাঁবুগুলোর সামনে। রাজাবাহাদুর যেন অন্তরালে থেকে দেখেন ওদের। ঘোরেরার জানলা থেকে পর্দাগুলো ছুঁটি কিংবা কিছুটা ঝুলে যেন, মিছে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফা-লুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে। আমাও ঘোরেরোরেরা ঝুলোড় করে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বলল—ঝুলুরে, ঘোরার।—রাজা-বাহাদুর পকেট হাতে নিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভিতর। ছড়িয়ে ঝুলোর মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

ঘোর ঘোরেরোরেরা। মুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার আর তাদের মধ্যে ওদের। আরণ্যক জগতের আদি-মিথুনের মতো সহজ আর জটিলতা, প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে বড় হয়ে উঠছে।

সন্ধ্যার দিকার চৌখিলে বসে আমি বললাম, আজ রাতে আর বরবার কথা আমে আপনার।

চোখের ঘোরা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি, আজ সমস্ত দিন খুব বেশি কথা বলেছেন আর ক্রমাগত ঝুলুটে ঠোঁটে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন—বুঝ। আমি সলাজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ভ্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন—সময় হলে ঘোরে পাবেন। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। মুকুলাম আমি বেশীক্ষণ আর তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। টাকুটাকি শুয়ে পড়তে বললাম অতিথি-নারায়ণ গুরুদেবের অনুরোধ নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু আঁত নরম আজিমের বিছানায় ঘুমে ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অজস্র চিন্তা। মাত্র বরা, কাঠের সাঁকো, কাঁপকল, অত্যন্ত সোপানীয়। অতল রহস্য।

বারদশ এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে চোখে আমার ঘুম এল তা আমি নিজেই টের পাই নি।

ঘুমের ওপরে ফাঁকানো একটা ঠোকর আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। প্রথমে কিছু ঠিক আমি না। আকাশে পরিষ্কার নির্মেঘতার আভাস। বাইরে ঘুমু [illegible] কিসের ডাক।

আমার গায়ে কম্বলের মতো টানা একটা হাত পড়েছে বার। সে হাতের স্পর্শ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন—সময় হয়েছে, চলুন। আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম—ঠোঁটে আঙুল দিলেন রাজাবাহাদুর।—কোনো কথা নয়, আসুন।

এই গভীর রাতে এমনি বিচিত্র আয়োজন—সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েই ছিল। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে পা দুটোকে অসাড় করতে লাগল আমার। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হার্ণিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা অদ্ভুত শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝির ডাক—চারদিকে জমাট কুয়াশার মতো পুঞ্জীভূত। গভীর রাতিরে জঙ্গলের মতো জায়গা আঁধিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আরও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা—এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পা-ও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা ঠোকর আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের লণ্ঠনটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই মুখোশটা তুলিল সংকেত।

ঠোকর আলোয় পথ দেখিয়ে রাজা-বাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। সেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। মুখানা ঘোরার পাতা, মুটো তৈরী রাইফেল। মুজন ঘোরারা একটা কাঁপকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর মস্ত ঘোরার হার্ণিং ঠোকর নিচের দিকে ফেলে ধরলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পাথুরেপির মতো কী একটা জিনিস কাঁপকলের দাঁড়ির সঙ্গে ঘোরে ঝুলছে মুকুলাম।

আমি বললাম, ওটা [illegible] রাজাবাহাদুর?

—ঘোরের চোপ।

—কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

—একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন। এবারে স্পষ্ট বরফ দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থই নেই। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার মাথার ভেতরে সব যেন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। একটা মুখোশ মানুষের নির্বাক ইশারার মতো রাজা-বাহাদুরের পাশের ঘোরাচ্ছে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে ঘন কালো অন্ধকারের ওপরে আভা চাঁদ দেখা দিল। তার ঝাপসা শ্যাম আলো এসে পড়ল চারদিকে। মুই নিচের নদীর জলে, তার ঝরনার কাঁপকলের মতো মুক্তিগুলোর ওপরে। আকাশের ঘোর

দেখতে পাচ্ছি—কাঁচকলের-খাঁচার সাদা বাঁদর সাদা পুর্টলিটা বুকে জড়িয়ে নরম বালির ওপরে। এক হাতে ইলেকট্রিক টর্চ নিয়ে রাজাবাহাদুর দাঁড়িয়ে আছেন, আর এক হাতে মাথে মাথে আলো ফেলছেন নিচের পুর্টলিটার। চকিত আলোর ছোঁয়ায় মনে হচ্ছে—পুর্টলিটা যেন জীবন্ত অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি বাঘের ছোপ। কিন্তু কী এ বাঘ—এ কিসের ছোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো ঘরে ঘরে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্ত প্রসারী ছিন্নে অজস্র তারা-তারা জোনাকির দেখাচ্ছে ভয়ানক একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা কলকল করছে, যেন একঘেয়ে আপ-খোলা তেলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। চোখ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আমার; কান পেতে শুনছি ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর আমিষের সুগন্ধে নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে, বেতুকুরে ছায়াগুলি ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে ছুটছে ঘুরে। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেলুম, হঠাৎ ছিপ শুদ্ধ হাত এল আমার। তার পরেই হাঁটুর কাছে বিলটা লম্বা হাইকেল সাড়া দিয়ে উঠল — চারশো ফুট নিচে থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বলের গর্জন। ছেলেবেলা শুনেছি আমি কোনো উঠলাম। টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নড়ি-হুড়কো বালির জমাটার ওপরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ছোকরাকার অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুর্টলির ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, লালের মতো লাল আছড়াচ্ছে অস্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইস্পের বন্ধের মতো অবার্থ গুলি দিয়ে গেছেন তার আমার। এত ওপর থেকে দুনিয়ার মৃত্যু সাধনে আশঙ্কা করতে পারে নি। রাজাবাহাদুর সোল্লাসে বললেন—ফতে।

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, জানোয়ার তুললেন কেমন করে?

—ওই কাঁপিকল দিয়ে। ওই জন্যেই তো ওপরের ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়—এমন সময়—পরিষ্কার শুনতে পেলাম সিংহের ঘোরানি। ক্ষীণ অথচ নিভুল। এ চিনির শব্দ।

চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই। মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু দড় বেরাটিতে। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের ঠোপ আপনার। কী নিয়ে আপনি মাছ ধরছেন?

—চুপ—একটা কালো হাইকেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। চার-পরেই আমার চারদিকে পুর্টলিটা পাক খেতে খেতে হাওয়ায় পড়া একটা সুন্দরবনের মতো খুনো মিলিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর জানটা না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতুম দুজনে।

কাঁপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে দিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু ভয়ঙ্কর খয়াল খেলাল চেপেছিলেন রাজাবাহাদুর, লোককে ঠেকে দেখানোর মতো।

তার আট মাস পরে এই ডুমরোর চাঁই-ছোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চাঁইছোড়া আমি ঘোরাব কোথায়। পায়ে দিয়ে একবার ঠেলে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র দত্ত

আমাদের গল্পোপন্যাসের পাঠক আমাদের তত পাঠকের মত নয়। আমাদের বড় একদল সমালোচনাপ্রবণী পাঠকের সঙ্গে সমালোচকের আলোচনার এবং তাঁর ফল পড়ে কি মনে হয়েছে, এখনো তা-ই আমার ভুলতে পারি। তাঁরা আমাদের ভাল-মন্দের বিচারের ভার নিয়েছেন, তাঁদের যে-কথা বলবার। এখানে আমার আমার একান্ত ব্যক্তিগত সওয়াল।

আমার নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ-কেউ আর আমাকে বিশেষ ডাকে। কখনও কখনো কেউ ডাকে। আমাদের-এ প্রথম কবিতা ছেপেছে। সেদিনের আমি ছিল এক আর মানুষ। সেই ছেলেই আজকের আমা-পর্যন্ত আমার প্রকাশ।

এই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন তিনিদের সঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রথম দর্শনের আমাদের সত্যপ্রকাশ মিত্র, সরলিন আমাদের, সুনীলকুমার ভৌম ইতিহাসে আর এখন প্রকাশের পরপর সেদিনের কালের তারাশঙ্কর, বনফুলদের, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসে ইতিহাসিকদের সমকালদের প্রথম সমান মানসিক সমান-প্রেমের ঐতিহ্যে সেদিন বিশেষ।

কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় তাদের তাঁর পরিচয়দিনের প্রকাশ পরিচয়ী মূল সঙ্গের পরিচয়ে। তিনিদের যে আমে তাদের আমার এই ত্রিবেণী আমাদের—সত্যপ্রকাশ আমাদের—আমার প্রেম পরিচয়। তাদের বিশেষত্ব তাদের বিশেষ। এই আমাদের আমার বিশেষত্ব কবিতা। এই, বিশেষ প্রকাশকালের আমাদের কবিতা-প্রেম আর, এবং একদিনের কবিতার প্রথম, বিশেষ আমার বিশেষত্বে তাদের প্রথম। আমাদের পরিচয়ের পরিচয় তাদের কবিতা-প্রেমের। বিশেষ পরিচয়ের তাদের প্রকাশ-আমাদের বিশেষত্ব প্রথম।

বিশেষী প্রকাশদিনের সঙ্গে আমাদিনের তাদের প্রথম পরিচয়ের—বিশিষ্ট কবি। 'ম' এর আমার প্রথম প্রকাশ। আমাদের আমার তাদের আমাদের বিশেষ। আমার, সঙ্গের সঙ্গেই আমার পরিচয়। আমাদের তাদের বিশেষ-পরিচিত প্রথম। আমাদের প্রথম, পরের ইতিহাস, প্রকাশিত, প্রকাশ-ন। প্রকাশদিনের বিশি প্রকাশদিনের প্রকাশ-প্রেম। কিন্তু পরি প্রেমেরই প্রকাশদিনের তাদের প্রথম নয়—এ-তাদের প্রথম প্রকাশদিনের তাদের প্রকাশ আমার। আমাদের, প্রকাশ-পরিচয়ের তাদের পরের প্রথম-প্রতি প্রথম প্রকাশের সঙ্গের প্রথম তাদের তাদের।

তাদের, প্রকাশের, বিশিষ্ট, প্রকাশী ইতিহাসে কবিতা বিশিষ্টের প্রকৃতির। প্রথম বিশিষ্ট তাদের আমাদের প্রকাশের পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের। প্রকাশের আমার প্রথম বিশিষ্ট। তাদের আমার। তাদের আমার। তাদের আমার। প্রকাশী, প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ। প্রকাশের প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ। প্রকাশের প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ। প্রকাশের

লেখার স্বাক্ষর (যদিও মূলতঃই এই আলোচনার ধারা বাঁধতে পারে) তবে সূত্র ধরলেন স্পষ্ট করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যান্য লেখক যাদের আলোচনা করেছেন, তাদের সঙ্গে ছোট ইত্যাদির সঙ্গে একতারে না ফেলে, ছোটো।

এসব থেকে জীবনের বাসনা, মানুষকে ভালবাসার দীক্ষা শুরুতর হয়েছে গল্প-লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বহু গল্পেই তার প্রমাণ মেলে। বালক বয়স থেকে যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ পর্যন্ত কবিতার ছন্দ-মিল ছেড়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া, তিরিশের অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে মার্ক্স ও মানুষকে ভালবাসার সোপান দীক্ষা গ্রহণ, মুক্তকালীন মানুষের পক্ষে জনযুদ্ধকে অপরিহার্য করে জীবনসত্তার সাধনকে স্বপ্ন—এসব বিষয় আলোচনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনে গল্পে তুলেছে।

নারায়ণবাবুর গল্পে মানুষের মূল্য যে কত বড়, তা তাঁর বাক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জড়িত। তিনি বলেছেন, 'মানুষের হীনতা-দীনতার ও অসুস্থতার ছবি দেখেছি। মানুষের লোকালয়ের পঙ্কিলতাও যে পাইনি তা নয়। কিন্তু এসব থেকে মানুষ সম্পর্কে আমার 'ঘৃণা ও শ্রদ্ধাই বেড়েছে।' আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশকে এত ভালবাসি' বোধহয়ে তাই বাংলাদেশকে ভুলতে পারি না।'

নিজের সম্পর্কে এই দুটি মন্তব্যই তাঁর ছোটগল্পের মূল লক্ষ্যকে স্পষ্ট করবে বলে আমার বিশ্বাস। নারায়ণবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করেছি, তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প—কোনটা লিখতে বেশী ভালবাসেন? তিনি না জোর গলায় বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই ছোটগল্প' উপন্যাস তো মাঝে মাঝে লেখা। ছোটগল্পে জীবন প্রবেশ বেশী ছড়িয়ে পাই। নারায়ণবাবুই চরিত্রের নায়ক ছেন, পরবর্তী দুটি মন্তব্যে লেখকের মধ্যে নারায়ণবাবু ছোটগল্পে অন্তরঙ্গভাবে বিশ্বাসের লেখক। গল্পকার হিসেবে তিনি আঁট-সাঁট লেখক। অল্প বয়সের লেখার মোপাসা, চেখভ তাঁকে কিছু প্রেরণা দিয়েছে। স্নাতকজীবনে রবীন্দ্রনাথ, লোকী, টলস্টয় তাঁকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে আর্ক্যাদবোধ করেছেন লেভেলের গল্পের। গল্পের ভাষা মন, কেটস, কমার্ডিন ব্রাডলি-ফিল্ড তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন একদা। বেশী বয়সে মোঁপাসাঁকে, একসময় তাঁকে বেশ কিছু সময় ধরে রাখেন। তিনি বলেছেন, 'আল আমলে ইতালীয়ান লেখক আলবো মোরাভিয়া, পিরানদেল্লো, জেরোম ওয়ারনার ইত্যাদির গল্প তাঁকে আকর্ষণ করেছে।'

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সচেতন-ভাবে কারোর ধারা প্রভাবিত হননি। নিজের পথে, নিজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি নিয়ে গল্প লিখতে বসেন। লিখতে বসে তিনি তাঁর গল্পে তিনটি দিক ধরে রাখেন। তাঁর মতে জীবনের আঁট ও কত শেষ কথা নয়, জীবনকে ভালবাসাই একমাত্র সত্য।' আর ছোটগল্প, তিনি বাক্তি-গতভাবে মনে করেন, 'আইডিয়ার সার্থকতাই গল্প, চরিত্রবৃত্ত সম্পূর্ণ হোক বা নাই হোক।' সবশেষে তিনি বলেছেন, ভালোবেসেও ছোটগল্পও তাকে না ছুঁতে পারে। প্রসঙ্গ নিজে তিনি ঘাট বলুন, চরিত্র-সৃষ্টিতেই তিনি আঁট সচেতন।

মানুষ জীবন, সমাজ। যে কোন একজন সৎ লেখকের এই তিনটি চেতনা আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে একথাও বিস্মৃত হননি, মানুষকে ভালবাসার স্বপ্নের গল্পে জীবনের বিশ্লেষণে, তবে ঐতিহাসিক সত্যকে আরও জোর করেছেন। সমাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বিমলার (রাত, দিন ও ঘণ্টা এবং অভিজন্মে) থেকে শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণী (ছাড়), গ্রাম-মফস্বল-শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা (বাঁটলে) থেকে পূর্ববঙ্গ (অবাধ), গ্রামগঞ্জ এস্টেটের প্রজাবর্গ (শ্রৌপ), আদিবাসীসমাজ গ্রাম (নক্ষত্রবিহ, ঘুঘোমাস), মফস্বল শহর (বন্দি)—সবই।

ভাষার পরিচ্ছন্নতা তাঁর কাছ থেকে গল্প বলে মফস্বলের কথার মত ঘরোয়াপন আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সুন্দরলাল (বাঁটলে), ইয়াহিয়া কারেশা ও সিদ্দিকদত্ত আর্কাডার (নক্ষত্রবিহ), ঘুঘোমাসের 'ঘুঘোমাস' (ঘুঘোমাস), 'ঘুঘোমাস এস্টেটের' তার শ্রৌপুরী (শ্রৌপ) পরান মণ্ডল (ছাড়), ঘুঘোকিয়ার (অবাধে), আনন্দময় ও মরতো (বন্দি), আফিজদ্দিন মাঝি (অবাধে) ইলামি মোরে-পুলে, ফুল-ভাঁড়িতে ভরানো মানুষগুলির কথা এমনভাবে পুনিকেন্দ্রম তিনি, তারা সবাইই যেন বন্ধুর চেতার আমাদের মনের কোমল কোণটিকে অধিকার করে বসে।

সেই সমস্তকে পাশে নিয়ে মানুষ তার জীবনের বাঁচার কথা বলার চেষ্টা। এ-বাঁচা মূলের যৌনতার বিকৃতি থেকে বাঁচা, শোষণ ঘৃণা থেকে বাঁচা, মানুষের জন্যে মানুষের বাঁচা জীবনকে বাঁচানো এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঁচা, নর-নারীর মূলের সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কের সুস্থতার জন্য বাঁচা। এই জীবনধারা এবং জীবনচেতনা মূলতঃ যুগোত্তর হলেন গল্পলেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলঙ্কবতী

অভিতাভ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারটা পাহাড়টা পশ্চিম-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত গ্রামখানাকে যেন ঝড়ের মতো ঘিরে ধরেছে।

উত্তর-পূর্ব পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় মাইল খানেক দূরে আছে জগদম্বপুর। ঘোর অন্ধকার। সন্ধ্যেবেলা ঘুমোবার আগে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই তখনকার পাহাড়ের গায়ে চোখ আটকে যায়।

এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করতে বাড়ীওলা ঘাবড়ে পড়লেন। অবশ্য আগেই জিজ্ঞাসা করার সেই নিখুঁত ছকে বিয়েছে। আজকে অবশ্য সবই অন্যরকম হবে ভাবিনি সেদিন। তবু এ ব্যাপারে অভ্যেসগুলির হাত আছে। চারদিকে পরিচয়ের ছড়ান। বাড়ওয়ালার ভাগ্নেবাবুটি বাড়ওয়ালাকে ডাকতে নিচের ঘরে গিয়ে ঢোকেছে।

ভদ্রলোকটির বয়স বছর চল্লিশেক। আমার পরিচয়ের পর, সম্ভবত সৌজন্যবশে হাসেন। আমার বিষয়ে একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্তরঙ্গতার এই মানে আমি কোনদিন বুঝে উঠতে পারিনি। সুনেত্রি, ভাবী-স্বামীবিহনে সেইটুকু সময় ভাবী-স্ত্রীটিকে যিনি মানে চন্দ্রবেখা। একদা আমায় লিখেছেন।

এ, জায়গায় একদিন আমার কি ভাল-লাগা, নিজেও জানতাম না। তবুও আন্তরিক শোনে আর ভদ্রতা মানলে নিজেকেও বোঝাতে পারি। বস্তুতঃ সেইদিনই তাঁদের-ভদ্রতা দেখেছিলে পারি। মোট কথা, অবসর-ক্লান্ত কোন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে বসার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। তবু প্রথমেই এঁর কাছে এলাম, কারণ, স্থানীয় অধিবাসী কারো কাছে জায়গাটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া দরকার।

ভদ্রলোক মাথা নুয়ে পড়ে এতবড় বাড়ওয়ালের এমন ছন্নছাড়া ঘর বাড়ওয়ার দিকে এগোতে এগোতে অন্তর্দৃষ্টি অনুভব করছি। পরনের খাকী হাঁটুজল, 'ছটের মুখে লালের মলিনতা যেন বেশি করে চোখে লাগতে লাগল নিজেরই। হাতের খাকী ঝোলার মধ্যে যা আছে তাও এমন বাড়িতে খুব একটা নয়।

পায়ে পায়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির পরে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার এক প্রান্ত ঘেঁষে ঢেলার। একটু ওদিক তাকাতেই রান্না-বান্নার বাঁধ-ছাঁদের দেখতে পাই। বারান্দার ওধার থেকে একজন মহিলার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটল। দই-এক মুহূর্ত। মহিলা সরে গেলেন। একটু পরেই তিনি ঘর থেকে বেরুলেন আবার। এবার মাথায় কাপড় গায়ে মাথায় হাতে একটা ঘন আকাশী রঙের ওড়না আগে-পরে জড়ানো। মুখ, কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত অবগুণ্ঠিত। ধীর শান্ত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন ভেলেবেলে এলেম, অথচ কোথাও একটুকু জড়তা আছে বলে মনে হল না, আমার নিজেরই কিছু বলা উচিত। কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনিই শান্ত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

বললাম। তিনি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে সহজ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। আমার দিক থেকে আর বাক্যস্ফুরণ হল না দেখে বললেন, বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

তেমনি শান্ত পায়ে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা আবার। অন্ধকারে মনে হল, তাঁর গতি-ভঙ্গিটুকু। মুখ, বুকটুকু দেখেছিলাম ঠিকই ঘোমটা ছিল। ঘোমটা যদি নিয়েও থাকে, যৌবনটা প্রায় অটুট আছে। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলাম। যেন আমি ভদ্রলোককে ডাকতে এসে মনে হল। মহিলার শান্ত ধীর ভঙ্গিটুকু মোম ঘরি মনে হাত ফেলে বসবে। কিন্তু এসব অভ্যাসিতার ওপর এত ঘোঁক আছে জেনে কি ভদ্রতা বাড়বে নেবে। অন্ধকারে বাড়ওয়ালের

তিনি একখানা হাত তুলে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমার নিজের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। এতবড় বাড়িটাতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী থাকি। আপনি যে ক-দিন এখানে থাকবেন। আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন।

কি বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিনি একজন ভৃত্যকে আমার বিছানা বাঁধতে বলে দিতে। অনেকক্ষণ পরে সেই মহিলাটিই এলেন আবার। লাঠির ওপর তেমনি ঝুঁকে আছি। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম। তিনিও সস্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন জানালেন। আমি ফিরে বসতে তিনিও আসন নিলেন। মাঝের চতুর্বেদী আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। এবারে অবশ্য হিন্দিতে।... বাঙালী লেখক, আমাদের ছেলেমেয়ের নন্দ, —এই ছেলেমেয়ের চিঠি—কলকাতা থেকে আসতে যোগাযোগ এসেছেন। এখানে হোটেলের খোঁজ করছিলেন, আমি ওঁকে এখানেই থাকতে অনুরোধ করেছি।

মহিলা জবাব দিলেন, আমরা চেষ্টা করব ওঁর কোন অসুবিধে যাতে না হয়, যা আতিথ্যে ত্রুটি না ঘটে।

চতুর্বেদী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আমি একটুনি ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিস্ময় চেপে করছিলাম। মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রুক্ষ প্রতিক্রিয়া—তাকে বলে পারসনালিটি আছে বটে। কিন্তু ওঁর ওপরে ঠান্ডা আবহাওয়াও প্রায় প্রশ্নাতীতের। তাছাড়া, বাঁধা রীতিমত সম্ভ্রমই বলে মনে হয় ওঁরা ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই রকম একজন মহিলা আপনার সামনে বসে, অথচ তাঁর দুটি চোখ, নাক, ঠোঁট এবং চিবুকের একটুখানি অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না. সেটাই বা কেমন লাগে? তার পরেও চেষ্টা করলে তাঁর ঐ আপাতঅন্তরাল ভেদানো বলেই যেন আপনাকে চোখ মারবে।

কিন্তু ঠিক কিনা জানিনে, আমার এও মনে হল, মহিলাটিকে তাঁর স্বামীও রীতিমত সমীহ করেন। আমার পরিচয় দেওয়া, অথবা আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দেবার সময়েও তাঁর মুখে একটি বেশ স্নিগ্ধ ভাব লক্ষ্য করেছি। মিনিট চতুর্বেদী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে তিনি সহাস্য গলায় বললেন, বি আর স্মার্ট. স্মার্টী চায় করলেন; মা এই ঠান্ডার আর চায় করা কাজ নেই, সহ্য হবে না। আমি ফিটফাট থাকি, পানিতেই সহ্য করে না। তার ওপর আপনি লেখক শুনেছি, আর সহজে ছাড়ি? আপনাদের রবি ঠাকুরের কবিতা যোকফার অনেক আমি বাংলা শিখেছিলাম, জানেন?

জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। এমন শুনলে তার মা ভালো লাগে। বললাম, রবি ঠাকুরের কবিতা সব বুঝতে পারেন?

কই আর পারি। বাংলা লেখার জন্যে আমি অনেক টাকা পাচ্ছি অর্ডার, কিন্তু অনুবাদটাতে তো আর পরসা দিয়ে নেওয়া যায় না। আপনাকে ঘরে-বসে এখানে সোটা-কতক লেখা শুনতে হবে।

খুব বিশ্বাস হল না। এতক্ষণ বাংলা তিনি বলেন, তিনি বাংলা লেখা জানা যোকফা অনেই আমার ধারণা।

প্রাতরাশ এলো। তারপর খাওয়ার ঘর দেখিয়ে নেওয়া হল আমাকে। সাজানো-গোছানো সুবিশাল ঘর, কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু-আমি কলাদী হবেন পর্দা সর্বত্র পাশ্চাত্য। সৌজন্য অটুল। তারপর বিশ্রাম। অল্প-স্বল্প হলেও অচেনাদের সঙ্গে কেন অকারণতা আসে নেই। চতুর্বেদী সেই ধরনের মানুষ বিনি সহজে সকল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন।

মন্দ সুবিধে তাঁর গাড়ি আছে। সন্ধ্যের বিকালে আমাকে নিজেই তিনি আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুবেন বলেছেন। এখানে পাহাড়ে বেড়াবার আকর্ষণটাই সব থেকে বড়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে শুধু এক একটা রাস্তার মত উঠে গেছে। ঘরে ঘরে বিশাল পর্দার। সেখানে ছবি-টবির ব্যবস্থা হলে, সিনেমা করা চলে, কিন্তু সেগুলির ধারে এসে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে।

গৃহস্বামী সেবকের মত আমার আরাম-পরাক্রম এবং সন্তোষই দেখছেন, যেন খুশীও। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ঘরে আলোচনার ফলে আলোচনার এবং প্রসঙ্গে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেললেন। বললাম, আপনাকে কবিতা শোনাব কি, আপনার কাছে অনেক বাঙালী আমার কিন্তু হয়ে যিনি পারে।

তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন, তোমার অসুবিধে দেখছি ভালো, এবারে আমার মুখে ছন্দ করলে। সহকাল থেকে উনি আমাকে তুমি বলছেন—তাঁরও সেটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। তাঁর পরিবর্তে বিকেলে সিগারেট ওড়ানো একটা পাহাড়ের ওপর শুয়েছে বসে আছি। বললাম, মাননীয়া, এবারে তো আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক বাধো ভাবছি।

কেন, আর ভালো লাগছে না?

এর পরেও যার ভালো লাগবে না, সে নিঃসন্দেহে অমানুষ। তেতে মন সরে না।

তাহলে আর একটা দিন থেকে যাও না। বেড়াতে এসেছ বলল, একটিন মাসেই তো। আর ইচ্ছে দেখাই হবে না।

কেন, আপনি কি অন্যত্র চলে যাচ্ছেন?

তিনি কয়েক জবাব দিলেন, সেই রকম।

এই একটা দিনে আমার মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এক হাজিন্দ্রিয় মধ্যেও মাঝেমাঝে এক এক সময় একটা অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ছে যেন। চোখের ওপর যেমন ভেসে ওঠে, আরেকটা সেই ছন্দ মনে হয় ভুল তাকে। আমাদের অন্তরালবর্তিতার মধ্যেও আরেকটা মাঝখানে আছে।

এ কদিনের মধ্যে বিদেশ চতুর্বেদীর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক হয়েছে। আমাদের ছেলে তাঁর ঘরেরও আড়াল পাই মাঝে। আর, সমস্ত বিদেশযাত্রার মধ্যে এই দুপোরার আমার ছাড়া ভদ্রলোকটিও প্রায় সারাক্ষণই আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। সেজন্যে নিজেই মোটি বিস্তর বোধ করতাম। অস্বস্তিটা হয়ত বা অনেকখানি হয়েছে আমার ওপর। কিন্তু সব নিশ্চিন্তে যে অন্তর্দ্বন্দ্বটির কথা বলছি নিজের কাছেই সেটা স্পষ্ট নয় খুব।

চতুর্বেদী বললেন, এখানকার একটি-আধটি, তাদেরও উপদ্রব আছে বলে লোক-চলাচল কম।

এমন শান্ত স্তব্ধ জায়গায় এরকম সংবাদ কার ভালো লাগে। বললাম, তাহলে তো এখানকার মত এসেই হত?

চতুর্বেদী হাসলেন।—তাতেও হবে। তাতিও খুব কম জানার নই। আর তবু দু-জন আছি, তাছাই তো একটি এসে বসি এখানে। অত ভয় যেও না, এখানকার মধ্যে এসো।

কেন, পড়ে শোনাতে পারি?

পড়ে শোনাতে পারো, টেনে শোনাও দিতে পারি। হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসলাম আমিও।—সরীসৃপকুল এ অঞ্চলেও যা দেখেছিলাম, টেনে শোনার আমাইটুকু ধরে যা বললেও অত্যুক্তি পাশের বোধ হয়।

তিনি জবাব দিলেন, এ অঞ্চলের এ সরীসৃপটা বিদেশ চতুর্বেদীর হাতবদল, এটা পিছনে আমার চেষ্টা নেই কিছু।

সন্ধ্যপথে হাসাদুটি দিয়ে অন্যের নিজস্ব দেখলাম এবার। বললাম, একটা সুবিধে আছে, নিচে এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে পড়লে ট্রাফ বেরুবে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গেই হাড়-গুঁড়িয়ে আর মাথা খুলি ছোঁড়ার হয়ে সব শেষ।

চতুর্বেদী আস্তে আস্তে বললেন, সে রকম দৃশ্য এখানকার লোকে একবার দেখেছে—।

অবাক বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ঠিক এই জায়গায় একজন মস্ত আর্টিস্টকে ওরকম ভাবেই পাহাড়ের অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

মনে মনে শিউরে উঠলাম। আমার বিস্ফারিত চোখে চোখ রেখে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।—আত্মা, পরে একসময় বলবেন সবটা।

এখনই বলবে না?

না, এখন আমার ভালো লাগছে না।

আকাশের দুটিল ছেড়ে চোখ। আর্টিস্টের ব্যাপারটা তিনিও আর উত্থাপন করলেন না,

অধিক ভুলে গেলাম। আমার আগের দিন ট্রেনিংয়ে দুজন মহিলা এঁদের কথাই বলছিলেন। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃতবয়সী জন।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পাড়ি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রতিটিদের ঘর ঘোরা। সবচেয়ে আমার ঘুরে ঘুরে পুরীর ঘুরেছে। ওঁদের আর্টিস্টের ঘুরানী মনে পড়ে— ঠাকুর। আচ্ছা, সেই কথাটা তো শোনা হল না মহিলাটির?

সাইন ইনের টেবিলে তিন মাসকতক আগে চোখে নিরীক্ষণ, কলকাতা থেকে। পরে আমার দিকে ফিরে হাসি মুখে জানলেন, কলম পাচ্ছে হবে। ফিরে তো অবশ্যই যাবেন, কিন্তু কোথায় ছেলেকে আলো-ছেলেকে রাখবেন?

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু অপ্রস্তুত ভাবটা গোপন করে বললাম, এখনো—।

সে কি হে।

সেখানে আসার ব্যবস্থাই আমাদের হোল।

কলম আমার হাসলেন তিনি। তারপর মুখের হাসি মিলিয়ে গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, আমার স্ত্রীটিকে কেমন লাগল?

আচ্ছা বিপদ। আমার কথার মধ্যে কোন ফাঁক দিয়ে আসবেন। ছেলেই জানাব ছিলাম, তাঁকে আর লাগবার কোথায়? আপনজনকে তো চাই।

মৃদু হাসতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, ইনি আর এ ছেলের মা। একটু থেমে, আমাকে কিছু আগে মনেই বললেন, একদিন ছিল আমার, যখন আমাদের ছেলেরা ইচ্ছে করে পরস্পরের মুখ দেখতেও চাইত না।

সে কী। আপনাদের ছেলেরা তো জোড়ার হয়ে শুধে ছেলেন।

সকলের হলে ছেড়ে। আমা সময়ে ছেলে আমা ভাগে কলকাতা আছে। কিন্তু না। আমাদের দিকে তাকিয়ে এ নিয়ম আর নেই, থাকা উচিতও নয়।

কিন্তু আপনার আছেই তো এ নিয়ম মানলেন একজন।

তিনি অন্যমনস্কের মত ছেলে ঘোরালেন আমার দিকে। মনে হল এই বিশ্বস্তি-ভিন্ন কলকাতা ছোট ছেলে একটা ব্যবস্থার জন্য ভাবছেন।

একটু পরে বললেন, আর্টিস্টের কলম শুনেছে না? আসে।

কলম শুনতে হলে আমার ছেলে হয়ে ছোলার হয়েছিল না। তিনি আমাকে আশ্বাস করলেন, এসেই যা।

অনুমোদন করলাম। তবে আর ছেলে দিন বাইনি। এমিকটা দেখবার একটা আগ্রহ ছিলেন মধ্যে। একটা ঘরটা খুলে দিতে প্রস্তুত এক ছেলের মতো এসে পড়লাম। মেয়েদের পাশে পাশে প্রবেশ আমাদের ভৌগোলিকদের। মাঝারী-মূর্তি সব। দুজনা মাত্রে যৌবন-অনুপস্থিত মাঝারী-মূর্তি। কারো মেয়ে এতটুকু আবরণ নেই।

মাঝবয়সী বললেন, ভালো করে দেখো, চলবে কি...। কিন্তু তবু লজ্জা পাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা পাচ্ছি। এরই মধ্যে একটি মাত্রী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তার দিকে চাদরখানা বিছিয়ে আলোচনা চৌদ্দমতো। তাদের কাছেই গেলাম ভৌগোলি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা সবাই কি এখানের মেয়ে?

সবাই।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেবা চলতে এসে বসতে দাঁড়ালাম। মাঝবয়সী মহিলার মেয়েদের ভৌগোলিটি হিসাবে করে বললেন, দেখো।

এবার নিশ্চলক চোখে সমস্ত অভিনিবেশ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মুখে মুখে মাত্রী-পুরুষ, কিন্তু যতক্ষণ চোখে থাকলেও একটুকু প্রাণের স্পর্শ করবে না। সমস্ত সত্তা দৃষ্টিতে চক্ষুষ্মতি। লজ্জা-ভয় প্রাণি বিলাসিত প্রথম মাত্রী আর প্রথম পুরুষের। পুরুষটির হাতে ক্যামেরুকের ফল। চোখে মুখে বিশেষ এবং সংসারের অভিজ্ঞতার ছন্দ। তার মন ক্যামেরুর মধ্যে—যাতে ভয় করে মাত্রির ওপর ঝুলে মুখের নিচে চোখে আসে। প্রথম মাত্রী। মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার অভিলিপি প্রতীক্ষা।

আর নির্মিতে দেখতে পারলাম। তবু দেখে আর চোখে না। ওই মাত্রিমূর্তিটি কি আমি দেখেছি? না কি সকল পুরুষেরই মনের ভেতর এরকম একটি মূর্তি বিরাজ করছে, যাকে দেখলে মনে হয় মূর্তি তিনি?

মাঝবয়সী বললেন, এই ছবিখানা দেখবার জন্যেই তোমাদের এখানে এনেছি। আচ্ছা, এবার এসো।

তাঁকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে এলাম। মেয়েদের সঙ্গে আর আগ্রহ দৃষ্টি-পুরুষের দিকে তাকাতেও ভয় সরলে না। মাঝবয়সী আবার আমার-মেয়েদের শ্রদ্ধার ছেড়ে দিয়ে সাইন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে যে সাহিত্যটি বার করলেন তিনি, পুরুষের পুরুষের আবার সবল কাল ভুল হয়ে গেল।

আর পাঁচিল বছর আগে। অন্তরঙ্গতার হাসিমুখে মাত্রী প্রশ্নটি দাঁড়া মেয়ে উঠেছিল বার-বার, 'তিনি একজনের ডেপুটি পুলিস-সুপারের স্ত্রী কল্পনা দেবী। মেয়েদের লেখাপড়া লেখানোটা যখন একেবারে ভালো করে চালু হয়নি, তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন। অনেক ভাষা, অনেক সংস্কার, অনেক দুর্বাই সমস্ত অন্তরঙ্গতায় উদ্ভাসিত হয়েছেন।

মাঝবয়সী ঘরের মেয়ে, মাঝারি ঘরের বউ। ঘরের কোন আচার, তার চেয়েও বেশি ঘুমের। অনেক কিছুই নয়ত ছিল তাঁর পক্ষে। মেয়েদের নিয়েই একটা ক্লাস করে-ছিলেন প্রথম। কিন্তু তার আমাদের-কালের ছেলেদের আবাসোনা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে সমস্তকে অবাক করে দিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলেরাও ইচ্ছে করলে এসে যোগ দিতে পারে। তাঁর অনুমতি মাত্রী পর্যন্ত প্রথম প্রথম একটু ঘুরে সহজ-ভাবে নিতে পারেনি। অনেক দেরী হয়ে করেনি, ছেলে বলেছেন, দেখাই যা সব ঘুরাতলে আর কিনা। মোট কথা, অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েদের সহজ মেলামেশার তখন একটা রোমান্টিক হাওয়া বইছে।

সেই সময়ে এই মিলনীতিকে অবিশ্বাস করলেন তাঁরা, অথবা নিজেরা ঘুরে ঘোরতে না। নির্জন পাহাড়ে বেড়ানোটা তখন খুব বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ডেপুটি পুলিস-সুপারের বাঁধের সাথী, স্বয়ং পুলিস-সুপারও ঘটনার অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তাঁদের আর ভয়টা কিসের? একদিন যে পাহাড়ীটিতে মাঝবয়সী এবং আমি গিয়ে বসেছিলাম, পাঁচিশ বছর আগে সকলকে সেখানে অভিযানে এসে তাঁরা দেখেন, কোর্টে সেই নির্জন পাহাড়টির আকাশের দিকে চেয়ে একা শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর ক্যামেরা। এঁরা যেমন অবাক, লোকটিও তেমনি মাত্রী-পুরুষের 'বাহিনীটি' দেখে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একাই তার করলেন এঁদের সকলকে, অমন সরল কিন্তুদের দৃষ্টি বড় একটা দেখা যায়নি। অল্প-বেলা দুটি ভাসর চোখ, শিশিরস্নাত ঘুম, ঝাঁকড়া চুলে প্রায় ঢাকা সরলতা, সমস্ত অসংকোচিত ছেলেমানুষি। মুখের মধ্যে খোঁয়া ছেড়া ছিল।

পুলিসসুপারই প্রথম ছেলে শুরু করলেন, তুমি কে?

আমি? আমি ভূমার—লোকে ভূমার।

এখানে কি করা?

আকাশ দেখছি।

মেয়েরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন। ছোকরা কাশেন, যি বলেন ঐতাদি ছেলে দেখার পর তাঁকে বলা হল, এক্ষুণি একা এখানে এসে যে আকাশ দেখা হচ্ছে, ভাকাতের খপ্পরে পড়লে?

তিনি চিন্তিত মুখে উপদেশ প্রদান করলেন, তাহলেরাতো তাহলে বেড় এখানে হয়...।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষেরাও হেসে ফেললেন এবার। কিরাত পথে সন্ধী একজন বাড়ল। তার আগে লোকে ভূমার অনেক-গুলো ছবি তুললেন সকলের।

এই ছবি তোলার ছোট কথা সেটা পরে ভয়ন খোকা গেল। কিন্তু ছোকরা মৃদু মেয়েদের ছবি তোলার প্রতিটি। ছ-মাস এ মেয়ে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সকলেরই। মেয়েরা প্রথম প্রথম ছবি তুলতে

দিতে হবেনা বা একটু-আধটু আপত্তি করবেন। কিন্তু তাদের মেয়েটি হাল ছেড়ে দিলেন একদিন। —মাও মাগো, এই বলছি, যেমন করে পারি যতদিন পারি ছবি তোলো। এমনও সম্পাদকদের আর বাধা থাকল না। যেমন করে পারি এবং যতদিন পারি ছবি তুলেও কিন্তু পারি হয়েও না ফুরায়। বললেন, তোমরা মেয়েরা যেটা সহজ সেটা নিয়ে মাতো না, সবসময়ই চোখে মুখে কৃত্রিমতা। মেয়েরা হাসবে, কিন্তু ভালও লাগবে তাতে।

তারপর একদিন দেখা গেল · মেয়েরা ফুলার ফুব মেতেছেন। মেয়েরা চিন্তিত হলেন। এবার সত্যই কোনো জবাবদে তাঁকে যতদ করে দিল কিনা কে জানে? অমলা দেবী উৎফুল্ল চিত্তে স্বামীকে ছবিটি দিতে পাঠালেন, কোনো বিশেষ ঘটনা কিনা অনুসন্ধান করতে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। তখনই খবর জানা গেল, আসলে উনি চিত্র-বিদ্যুৎ। কিন্তু তাঁর বিদ্যুৎচর্চার বিষয়বস্তু শুনে অনেক আগের অনুভবতার কথা সবাই স্তব্ধ। বিদ্যুৎর চতুর্দিকে মেয়েদের কোমরে-ঘুলি ঝড়ানো, তাদেই থেকে ঝুলি ঝুল হয়ে এক একটা নগ্ন মুণ্ডের আবির্ভাব ঘটছে। ফোটোর থেকে শুধু মুখ এবং ঘাড়িয়ার-উটু তুলে নিয়েছেন, বাকিটা কল্পনা। পুরুষ-দের অনেকেই জোর করে পার্টিতে এসে ঢুকেছেন, নিজের চোখে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে ছাড়বেন।

মেয়েরা একেবারে ক্ষেপা। এমন সর্বনাশ অথচ এই পরতলায়। পুরুষদের ঘরে আগুন জ্বালেন। বড় বড় অভিভাবক ঘরের মেয়েরা সংশ্লিষ্ট ও ছেলে আইন আদালত না করে নিজেরাই তাঁর বিচারের পরামর্শ করলেন। সমাজাধি বিচার। প্রবাসী বা আন্তর্জাতিকের হানি ঘটলে এদেশের লোক ওদেশে অপমান ভয়নে ঘরে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। নিঃশব্দে তাকে নির্মম বিদায় দেওয়াটাই সমীচীন হল।

স্বামীর মুখ থেকে অমলা দেবী শুনলেন সব। সকলের অজ্ঞাতে তিনি সটুডিওতে এলেন। সাক্ষাৎ হল সোজন ফুলারের সঙ্গে দেখলেন তাঁর শিল্পচর্চা। ফুলার ফুলাস মুখে আছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিরীক্ষণ করে।

'এভাবে ফটিকটা বানাচ্ছে কেমন? ফুলার বললেন, ফটিক ছেড়ে পারে অনেকদিন, কিন্তু ফাটলো হল না, এই দুঃখ।

কি ফাজ?

যে ভাবের মধ্যে থাকলে মেয়েরা ফোজ থাকতে পারতাম, সে রকম একখানা ছবি।

অমলা দেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ফুলার বললেন, দুটি মেয়ে-পুরুষের মূর্তি আঁকব ভেবেছিলাম, বাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি। নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু ফোজ দেখ, তোমাদের মুখে আমি অবিকল পেয়েছি। অথচ মুখ প্রতিকৃতি কি বিশ্রী নগ্ন।

অমলা দেবী আরও অনেক জিজ্ঞাসা করলেন, নারীমূর্তি পেলে না, কিন্তু ফোজ পুরুষমূর্তি পেলে?

তোমাদের ফোজ থাকলে সে মূর্তি পেলেও পেতে।

কিন্তু সত্যিই ফোজ মনে হল অমলা দেবীর। সেখেছেন। শুধু ফোজ আছে নি। আর ফোজ আছেন, আর দেখছেন। বীভ-পাপ দুই ফোজ মেলে শুধু দেখছেনই।

এরপরে ফোজা নিয়ে কি হল তেমন জানা গেল না। এমন কি অমলা দেবীও আর না। ফোজ গেল সমস্ত দুটি সৈনিক-পুরুষে অর্ধ ফেকে ফুলারের মূর্তিও পাঠানো হয়েছে। পুলিস-সুপার ছিলেন অমলা দেবীর একেবারে শুধুমুখ—বাবস্থাটা তাঁরই। কিন্তু ফোজটি পুলিস-সুপার অর্থাৎ অমলা দেবীর স্বামীর ফাছেও ছিনি আসে ঠেকাতে পারলেন না। শুধু বললেন, লোকটা এক ধরনের রোগগ্রস্ত, কি হবে রাগ ফরে?

ফোজ অমা সকলেরও উত্তেজনা ফমে এলো। শেষ পর্যন্ত বিদায়রন্ত হলেই ধরে নিলেন তাঁরা। শুধু ভয়লাভাই আর ছিলেন না এলেই হল। সবাই আর ছিলতে এলেও না শোনার ফুলার। পুলিস-সুপার গাছটা তুলে নিলেন।

কিন্তু অমলা দেবীর মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এলো। তাঁর স্বামী এবং সহকর্মীদের ফাছেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। অকারণে যেন বিমর্ষ হয়ে আসছেন। নির্ধারিত সময়ে আসেন না, নির্ধারিত অতিথেও থাকেন না।

ছ মাস পরের কথা। সোজন ফুলারও সবাই ভুলেছে। হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হল, অন্তঃপুরে অন্য কারও ছবির এনলার্জমেন্টে ফোজ হয়েছে সোজন ফুলারের একখানা ছবি, সে ছবির আদি ফুলনা নেই। বেলী-বিদুষী শিল্প-পৃষ্ঠপোষকমহলে বহু হাজার টাকা দাম দিতে চাইলেন ছবিখানার, কিন্তু শিল্পী সেটা বিক্রী করতে অসম্মত।

এখানে আবার একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সেটা আরো বাড়ল ছবিখানা এখানে ফিরে আসার পর। দলে দলে লোক আসতে লাগলো দেখতে। ফোজ, মানব এবং ফোজ মানবী-মূর্তি। নগ্ন, কিন্তু অপরূপ। এই ফোজ-মানবীকে এখানকার লোক, ফেলে। তবু অতিকৃত বলে, দুঃখ হল। ছাপতে পারল না। সেদিন যেন সবাই নতুন করে উপলব্ধি করল, ফেন বাস্তবটা মেয়েদের ফোজা ফোজার জন্যে এতখানি বস্তুতা প্রদান করছে। মনে মনে ভাবল, পরম শিল্পীর অপমানসম্ভাবের তুলনা নাই।

দুঃখ হলেন না, অতিকৃত হলেন না শুধু একজন। তিনি অমলা দেবীর স্বামী। ফোজটি পুলিস-সুপার। শুধু তিনি জানলেন, শুধু তিনি জানলেন, ফোজো ফোজা-ফোজ থেকে মুখোমুখি হয়েছি এই নারী-মূর্তি।

এই পর্যন্ত বলে মাতব চক্রবর্তী থামলেন। আমি নিঃশব্দের মত বসে আছি, আমার মুখের দিকেতাকিয়ে কৌতুহল, আমার কি মনে হল ফোজটি পুলিস-সুপার?

ফোজটি পুলিস সুপার নিশ্চয়ই একদিন কাঁচপোকার মত চোখে নিয়ে এসেছে সেই পাখাদের ওপর দেখবার তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। দেখার ফুলি-আমি নিয়ে বসে ছিলাম সেদিন। ফিল্পনী সব ফোজন করলেন না?

তারপর? মুখোমিস্থলে প্রশ্ন করি।

তারপর নির্মলি পদ্মর মত তিনি শুধু হাতে তাঁর শুধো ফুলে নিজেরি অমলা কবিতের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

বসে আছি।...বসেই আছি।

মাতবজী একেবারে উঠে গেলেন। বাইরের আলো একসময় আমার হয়ে আসতে লাগল। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আমিও উঠলাম। ভিজিটর্সবুকের সব ফোলার মধ্যে দুটিয়ে প্রস্থান করলাম।

মাতবজী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, যাবে?

হ্যাঁ।

চলো, ফোজনে ফুলে নিয়ে আসি।

তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দ্বিধাজড়িতস্বরে বললাম, বিদেশে চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না?

এক মুহূর্ত ফোজ আমার মুখে দৃষ্টি ঘোরালেন, একটু ভয় ফোজেন, দেখা করে এসো, আমি গাড়িটা নিয়ে যাই।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিদেশীদের দুজন গাড়িতে বসিয়ে আনলাম। পরে পরে পায়ে ফাছে নিয়ে দাঁড়ালাম। চুপচাপ বসেছিলেন বিদেশে চক্রবর্তী। আমার দেখে সচকিত আনন্দে ফোজে একগাল হেসে নিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলেন না। ওটা হয়েই থাকে। আমি কিন্তু একটা আরাম পাচ্ছি নিজে সচিব মুক্তিতে। পরিচয়টা বড়ো বাধ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তের সহজ নয়। তাছাড়া বাইরের আলোটা আরও কমছে, নিঃশব্দে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এলাম।

মাতবজী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে এসে আমাই জিজ্ঞাসা করলাম, একটা অনুরোধ মাতবজী, এই ছবিখানা যাবার আগে আর একবার দেখাবেন?

মাতবজী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, বললেন, না, তোমার সময় হয়ে গেছে, ওঠো—।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুজন সিংহ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ভরসাস্থলের অন্যতম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আজ জন্মদিন।

আশুতোষ চল্লিশ দশকের লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর আজ বড়-মাপের প্রায় পঞ্চাশ। লেখা শুরু করেন একটু দেরি বয়সে। সম্ভবত তিরিশ বছর বয়স যেবেই কলম ধরেন। তখন বলপাহাড়ে অধ্যাপিকা। এই হিসেবে একটি কলম ধরেছেন সমকালীন প্রায় সকলের সঙ্গে সমবয়সী তাঁকে আমরা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন লেখক হিসেবে ধরতে পারি।

নিয়মিত কলম ধরার আগে লেখকের সঙ্গে নিজেকে লক্ষ্য করা যায় প্রথম দিকের গল্প-গুলি লেখেই। তাঁর কলম আজ ভালোভাবে ধরে গেছে। কলমধরা গল্পগুলি লেখকের উত্তরসূরিদের লেখা। লেখক তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রাজস্থানের অন্তর্গত অরাবলির পাহাড় এবং পাহাড়ী আদিবাসী দেখতে এসেছেন। সেখানে গিয়ে চন্দ্রবেদীর অধিষ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মুখোমুখি বসে তাঁকে ছেড়ে আসা আত্মজনের সঙ্গে দিলেন চন্দ্রবেদীকে একটি আত্মজনের সঙ্গে লেখকের কাছে। অধিকাংশ মেয়ে—যাকে বলে পাহাড়ীয়া মেয়ে তাই। কিন্তু তাঁর ও-রকম টানা আয়তো চোখ আত্মজনের। প্রথম আত্মজনের লেখা, আশাতোষের (আমার চন্দ্রবেদী মনে-মনে)—লেখক মুখোমুখি বসে আছেন, একমাত্র অনুযোগের সাক্ষীরূপ হয়ে। এখানে লেখক মনে মনে পরিচালক নিয়ন্ত্রক। আসল ছিলেন চন্দ্রবেদী।

আত্মজনের মেয়ে হলে বাঙালির ঘরে-মুখের মতন চন্দ্রবেদী একটি কলম লেখালেন লেখককে। তাঁর মনের মেয়ে একটা আসনও মনের এসে বসেছেন। লেখকের লেখালেখির সঙ্গে মুখোমুখি যৌথ-সহযোগিনী সব বাড়ী-বৃদ্ধি। নিজের এক-ছোড়া রৈলাদিত্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মুখোমুখী। তিনি লেখা মনে বাড়ী-পড়েছে। লেখকের মনে হল এই সন্ধ্যাদিদি তাঁর মেয়েরও তিনি লেখেছেন। কিন্তু সঠিক মনে করতে পারলেন না।

মনের চন্দ্রবেদী যে কলম লেখালেন লেখককে তার নাম একজন শিল্পী। এর লেখক দুজন। পাঁচল দশক আমের ঘটনা। আত্মজনের লেখাটি পুলিশ-সুপারের স্ত্রী আমা লেখা আত্মীয় সঙ্গে বিয়ের করে এসেছেন। একমাত্র তাঁর সমবয়সি শিল্পী লোকের দুজন আত্মজনের লেখে লেখেন। মাঝি লেখা তাঁর লেখি। বিয়ের করে লেখেছেন, ছুটি। এরপর তিনি দুর দিলেন বিশ্রামদিনের জন্যে। আত্মজন চলে গেল তিনি আসলে একজন শিল্পি-শিল্পী। তাঁর শিল্পকর্মে বিষয়বস্তু নতুন স্পষ্ট আত্মজিত। তুলি আর রঙে এক একটি নগ্ন মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। মন লেখে খুব খারাপ। শিল্পীর অভিব্যক্তিকে লেখে আমার লেখা মনের সাধারণ কাজের। আত্মজন মনুষ্যত্ব মান-লেখা যায়। আমার লেখার মনের পরিবর্তন লেখা দিল। লেখক তুলনায় লেখে তার তুলনাটি আলোচিত। কিন্তু এই লেখার মেয়ে আত্মজনের মনের এমনিতেই-মনুষ্য মনে হয়েছে শিল্পীর একজন মনের। মনে-মনে মেয়ে মনে হলেও না একজন। তিনি আমার লেখার আত্মীয়। তিনি একটি শিল্পীকে পাহাড়ের মনে লেখে নিজের-আমি মনের লেখে দিলেন।

বিয়ের আগে লেখক নিজের চন্দ্র-বেদীকে লেখতে এসে লেখে প্রথমে উঠলেন। পাহাড়ীয়া মনে মন নিয়ে লেখে এক মনুষ্যে সময় মন।

সংলেখনে এই হলে আশাকরণীয় কাহিনী। প্রোফেসরের আলোচনায় নিজের নিজের কলম সম্পর্কে নিজে মনে হয়েছেন। মহিলা লেখক এই কলমে চলে, লেখনের মতন আত্মজনের, কাহিনিকার যা আমাদের ইতাদি ইত্যাদি—সব মনেও নিজে মনে হয় না, নিজেই লেখার যায় না। আশাকরণীয় সাদা একমনে লেখ মুখোমুখি এসে পড়েন একটি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আত্মজন আমার চন্দ্রবেদী লেখককে তার কলম লেখালেন। নিজের চন্দ্রবেদী কে? সব সময় তিনি আশাকরণীয় লেখাকে ছেড়ে রাখতেন লেখে? কেন তাঁর ভালোবাসে মনের নিজের লেখা করা লেখ? বইয়ে বইয়ে পাঠকের কাছে মনুষ্যের উপস্থাপন হবে। আশাকরণীয় লেখক সমালোচনা সব নিজে মনে নিয়ে চান না। মনে পড়ে পাঠক আমরা। ইলিয়ানোরিয়া ভোলেনসের চালকলম। আলোচিত আশাকরণীয় সে কারণে উৎসাহদাতা। আমার আশাকরণীয় আমাদের লেখাকে ভালোই লেখে হয় না। মনে, লেখে লেখ পর্যন্ত ফুরোয় আমে পড়া যায়। ভালো আমে না।' আশুতোষবাবুর মুখে নিজের ভোলেনসেই উপন্যাস লেখেনি-মুখি লেখা মনে যায়।

এ পর্যন্ত আমাকে ভোলেনস নিয়েছেন লেখক। তাঁর আশাকরণীয় পড়ার লেখে। লেখার আমি মনের নিজেরই লেখালেন হয়েছে। লেখা লেখেনিয়ে মুখোমুখি আশাকরণীয় পর্যন্ত। আশাকরণীয় ঐতিহাসিক আধিকারিক লেখে লেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে চন্দ্রবেদী লেখকদেরই আশাকরণীয় মনের আশাকরণীয় উপন্যাসিক মন, আমার পাঠক এই-রকম মন লেখা পড়তে চান, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ভোলেনস আমরা নিজে হইয়ে।

সাপ্তাহিক পত্রিকার চাহিদার জন্যে আজ ছোটগল্প একরকম টিকে আছে। হয়ত তাই সত্যি। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এর ব্যতিক্রম। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প সমান আকর্ষণীয় পাঠক ও প্রকাশকের কাছে। কারণ কী?

গল্পকারদের লেখক আছেন। প্রথম শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা খুব কম। তাঁরা লেখকের লেখক। তাঁদের পাঠকসংখ্যা সীমিত। ওপরের কারণ বা কারণগুলি সম্পর্কে আমার কিছু বলা যায় এ মুহূর্তে। আমাদের জিজ্ঞাস্য: রবীন্দ্রনাথ কী লেখকদের লেখক ছিলেন? তাঁর পাঠকসংখ্যা কী আজও সীমিত নয়?

বিভূতি ধরনের লেখকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এঁদের জনপ্রিয় লেখক বলা হয়। শিক্ষিত সাধারণ পাঠক যেমন এঁদের পৃষ্ঠপোষক—তেমনি সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষও এঁদের রচনা পাঠে আনন্দ পান। সাধারণদের লেখকদের মধ্যে ফেলতে গেলে মৈত্রেয় দেবকে সমারসেট মমের উল্লেখ সবচাইতে প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিভূতীয় স্তরের লেখক।

ছোটগল্প কী এবং কেন—এ নিয়ে পণ্ডিতি আলোচনার শেষ এখনো হয়নি। লেখকের ছোটগল্প আলোচনা প্রসঙ্গে আমার উদ্দেশ্য এ কারণে প্রয়োজন যে, তাঁদের উদ্দেশ্যেই গল্প সম্পর্কে আমার ধারণা এক এবং অভিন্ন। তাঁদের মত লেখকও গল্পে সুনির্দিষ্ট আরম্ভ, ক্রমাগতে আস্থা এবং আন্তিম চমকে বিশ্বাস করেন। গল্পের শেষে এক ধরনের চমক লক্ষ্য করা যায়। পাঠক গল্প শেষ করে হঠাৎ থমকে যান। বিহ্বল হয়ে ওঠেন। তাঁদের অনেক অনেক বিহ্বলতা কেটে যায়। চমক কেটে যায়। তাঁরা খুব সন্তর্পণে অপেক্ষা করেন অনেকক্ষণ ধরে। এক সময় হয়ত ভুলে যান সবকিছু। আবার জীবনের বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত জ্বলে ওঠে কোন দৃশ্য, মনে পড়ে একটি সন্ধ্যের দীর্ঘশ্বাস এবং অন্ধকার ঘরে ঘুমে আধোপাশে পাশের বাড়ীতলার শঙ্খ শুনতে পান।

এ ধরনের কেন কিন্তু ছোটগল্প আজ লেখকের। কিন্তু সাধারণের মত অনেকেই গল্পের আলোচনা করা সম্ভব। এবং তা করা দরকার। লেখকের ছোটগল্প কী কী বৈশিষ্ট্য, আজ একুশের গল্পসংকলনের মাধ্যমেই সে সব পরিষ্কার হবে।

আধারণীর ছোটগল্প যে গল্পের বিষয়-বস্তু হয়ে পারে—লেখক তা স্বীকার করেন। জীবনের কিছুই এমন নেওয়া হয় না। যার ঘেরন স্বীকৃতা আছে তাই তিনি আমাদের শোনাবেন। কোনরকম পূর্বনির্দেশ নিয়ে লেখা করতে সার্থক হয় তা কিন্তু নিয়ম। অর্থাৎ আধুনিক ছোটগল্প হবে বলে আমরা আমাদের সমস্ত ধারণা বিসর্জন—এইরকম গল্প হবে হবে কিন্তু তাকে আধুনিকতা বলবে না—এ জাতীয় উদ্দেশ্য থাকা থেকে সৌভাগ্যক্রমে আশুতোষবাবু মুক্ত। তিনি গল্পের মূলে কবিতার মিলন ঘটাতে চান নি, গল্পকে দিয়ে আমূল দর্শন প্রচার করিয়ে নিতে চেয়েছেন। গল্প থেকে কবিতাকে বাদ দিতে চান নি। গল্পের ভিতর আমূল দর্শনের পরিচয় তিনি দেব

নেই। পাড়ার বুড়োদের চায় পাইবার মত-পর খেতে দিতে হয়। জমা-কাপড় যেমন তেমনি, ছেলে মেয়ে ছোলা—কারুর কাজ নেই। নতুন-নতুন উপায় বেরোচ্ছে—আমাদের আর্টের পথেরও পাচ্ছে। এদিকে সব সময় আমাদেরও একটা ভয় হয়েছিল। মাঝে একজনের পথের পাঁচালীর ছবিগুলি দেখে ফেলে। অবশ্যি পয়সা কথা। যারা সংস্কারমুক্ত পরিবেশ একটা গল্প নিয়ে বেরুবার মধ্যে মধ্যে হাসাহাসি। কী ব্যাপার? চলচ্চিত্রী জানতে পারল না। অবশেষে সব মিটে-মাটে। মুক্তি পাওয়ার পর ছবি গল্প। সেখানে একটি মেয়েকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে। সাঁতারই কী এত দিনে তাকিয়ে থাকতে না অবশেষে পর তারা প্রযোজনার সহযোগিতায় পাঁচালীর ঐতিহাসিক সত্য করে?

অবশেষ শেষ অধ্যায়টি এখানে। বিভাগের চলচ্চিত্রী মুক্তি। অমৃতের মুখে হাসি। অনেকে অনেকের নিজে নিজে হয়ে মুখে হেসে হাত সাজায়।

নিরঞ্জন বিজয়ের কাজ, মানা করেছে নাকি?

স্ত্রীর মানা-বারণ যেন আছে।

হুঁ। অমৃতদা আপনাও ছেলের কাজ উঠে এসে চলচ্চিত্রী।

কিন্তু স্ত্রীর এই মানা-বারণটা যে খুব মন, নিরঞ্জনের খেয়াল ছিল না। সাহসে কাজ, কি কাজ, পয়সা কাজটা?

অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে অমৃতের মনে যেন ঘোরে পড়ল চলচ্চিত্রী। চোখ থেকে হাত নামিয়ে সে বলিয়ে উঠল, কাজ থেকে তুমি আলোটা চোখেতে একটু?

মুহূর্তচিত্তে দিয়ে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি অমৃতদা নিভিয়ে দিল।"

এরপর আলা কথা বলা যায় পাঠকের আর আপনার প্রয়োজন হবে না। চলচ্চিত্রীর এবং দিক্ষণে আমাদের অর্থ তিনি বুঝেছেন। যদি না বুঝতে পারেন তবে লেখক নাচার। ফরাসি পরিচালক অপরাজিতের আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা মাটি হয়ে গেল। সেখানে শেষ হয়েছে কাল লেখক থেকে পরিচয় নতুন করে কথা শুরু করতে পারেন। ছিলো কারুর মেন কী—চলচ্চিত্রীর আপনাকে লেখার, তার মুখের মতের চলচ্চিত্রটি বা কী ছিল।

চলচ্চিত্রের কলাকৌশলে মেন আর যে তিনি বৈজ্ঞানিকমনী। আমরা কাল নিয়েছেন তিনি। চলচ্চিত্রটি কাল পাই, নিয়ে-ছেন তিনি। কিন্তু যা ছিলাকাজের পুর্ণাঙ্গদৃষ্টি। অমৃতের চোখ অসাধারণ, পরিচালকের কাজের ঐতিহাসিক মনোভাব, সমাধিস্থানের কাজ আমরা "সমাধান—চোখে এদের সমাধ-দৃষ্টির প্রমাণ কাজ করেছেন, কলাও এদের প্রতি প্রথম সৌভাগ্য করেছেন, কিন্তু কলাকৌশল কাজ করেন নি।

বিভূতি লেখকের আর একটি বিখ্যাত কাজ। এই গল্পে একজন লেখকের নিজের কাজের জন্যলাভে আত্মোপলব্ধির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সমস্যার বিস্তারে একজন প্রবীণ সুখী ব্যক্তিকে দুর্বিহীন করে তোলে, অসামাজিকতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে—তার এক মেয়েবাবাকে আলোচ্য এই গল্প।

মূল সমস্যাটি কলাটি হচ্ছে এই। একটি প্রতিষ্ঠিত্বান সোনামণী, যিনি আকাশ-কাজ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, অনেক কলাবীর ছবির কাজের নিয়ে খোঁজেন—তিনি মেয়ের বিয়ের কাজার কাজার পিছিয়ে বসে। সমস্যার অন্ধকারে নির্দেশ গ্রামে গাঁইয়ে তিনি পড়ে জ্যোতিষীর নিশ্চয়তের কথা ভিন্ন বলেন। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন অর্থ-নিতিক একজনের কথা বিশ্বাসেই মন থেকে ঘুলতে পারছেন না। এদিকে মেয়ের বিয়ে বিশ্লেষকের সুবর্ণদিন এক এঁজিনীয়ারের সঙ্গে ঠিক হয়েছে। এবার [illegible] বাধা দিতে পারেন নি। কিন্তু মেয়েটি [illegible] বিশ্বাসী আছে। ফলে অকলাইবেরা [illegible] নিকটতম আত্মীয়স্বজনের অকল্যাণকারী। অনেক তর্ক অবশেষে তিনি সোনামণী জ্যোতিষীর সঙ্গে। কিন্তু মেয়ে লাভ হয়নি। সেই জ্যোতিষীও আজ আর নেই। বিয়ের দিন সবার সঙ্গে তিনিও সোনামণী পালন করলেন। হাসপাতাল একাকারে। টাকা পয়সার ভার দিলেন ছোট-ভাই-এর কাছে। তারপর বিয়েকার্ডির বাসভবনে অবশ্য এক সময় তিনি যোগদিতে চলেন। কনে মুখের বাসে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সজলে চোখ দেন। অনেক সন্ধানের পর তাঁর স্থান পাওয়া মেল ফোনগাইনের বাড়ে। প্রসন্ন মনে মুখে। চিরানন্দার মুছিয়ে।

গল্পের শেষ মুক্তি লাইন। "সামা নিশ্বাসেন, তাঁর মেয়ে-জামাই এবার দীর্ঘায়ু হবে, সে সম্বন্ধে আর তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।"

'সোনামণী' গল্পের নায়ক অমৃতবাবু ইলিয়াসের সোনাগাছির চাকুরে। তাঁর চাকরীর মেয়াদ শেষ হতে মাত্র মুমাস বাকী। প্রায় হাজার টাকার মত মাইনে পান তিনি। অবসর গ্রহণের পর কিভাবে পাঁচটি মেয়েমেয়ের পড়াশুনো বিয়ে ইত্যাদি দেবেন, বিষয়টি তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা। অমৃত-বাবু অবশ্য কোনরকমে ব্যবস্থা করতে পারেন না। তাই তাঁকে জামাই এক জোড়া ইলিশ মাছ বাড়িয়ে অবশেষে তিনি অবসর গ্রহণ করে [illegible] বিজনেসের করেন। অমৃত-বাবুর বিশ্বাসিনীবিলাসনা, মোট চৌষট্টি হাজার [illegible] ইলিয়াসের, প্রাভিডেন্ট, প্রতি-[illegible] ইত্যাদি মিলিয়ে) নিয়ে অবসর জীবনের পর মেয়েদের নিয়ে বাঁচবেন কি-ভাবে। এমনিধারা ভাবিনা থেকে তাঁকে বিরাট বিয়ের মিছিল দেখলেন। বন্ধুরা সবাই আসেন নিমন্ত্রণ, তাকে ঘরে বড় আসনে বসে। তাঁকার ভাবি গল্প, তাঁর মেয়েদেরের জন্য, সমাজের অন্য সব-মুখের জন্যবাদ' মনে থাকে হয়—অমৃত-বাবুর কাজ কথা প্রসঙ্গে জানান যে, তাঁর মেয়ের বিয়েতে সে এমন আসবার যোগাযোগ দেখতে পারে। অমৃতবাবু আমাদের মনে অনেক টাকার দরকার। গল্প আছি প্রসঙ্গের ব্যাপারে আমাদের তাঁর কাছে যেমন টাকা আছে—সাড়া জীবনের সঞ্চয়—আটশো টাকা। অমৃতবাবু মুখে স্তম্ভিত। আমাদের মধ্যে এক বোমের আঘাত আমাদের তিনি। নিজেকে আবার হালকা আমাদ ভাবে। আছি কিনলেন একজোড়া ইলিশের আমাদের মত মেয়েকে জোড়া ইলিশ নিয়ে।

লেখক পাতার পর পাতা মুড়ে অমৃত-বাবুর বিশেষ মানসিকতাকে ফুলে ধরেছেন অতি নিপুণভাবে। কথা বাহুল্য যেমনটি চিন্তা-প্রধান গল্প। অমৃতবিক্ষ মেয়েদেরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই গল্পে প্রতিফলিত। আমের একমুখিত্ব, নিশিষ্ট মহল ও গল্পের শেষে বিস্ফোরক। সংলাপও এ-গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের বিশেষ মানসি-কতাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ঘটনার অনবদ্য বা নাটকীয় আর নজর করা যায়। কিন্তু নিছক আকস্মিকতা গল্প তিনি লেখেন নি। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প "বিষয়বস্তু বা বক্তব্য উপজীব্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, তাদের আচার-ব্যবহার পুরুষ-পুরুষোত্তম—লেখক অভিজ্ঞতার এদের চেনেন, সে পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। লেখকের বিষয় গল্প আছে বাংলাদেশের গ্রামীণের [illegible] রচিত। বিশ্লেষণের পটভূমিকায় "সুবিধা—আন্দাজানের পটভূমিকায় "আশা বা মেয়ের-পুরুষের পটভূমিকায় "শান্তির জন্য। পটভূমি বদলের ফলে গল্পের বিষয় বদলে এসেছে। একেবারে নগরকেন্দ্রিক (কোলকাতা) সাহিত্য-চর্চা পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের বিরক্তিরও জন্মিয়েছে। ফলে নতুন স্থানের আমার মধ্যে তাঁরা উৎসুক।

প্রথম দিকে মেয়াদবোধ গল্প রচনায় লেখকের প্রবণতা দেখা গেলেও অবশ্যে আপনে তাঁর ঝোঁক বার মনোবিশ্লেষণ প্রধান দিকে। দ্বন্দ্ব, দেশ-বিভাগ বা সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে মানুষের সমস্যাকের মূল্যবোধ বিপর্যস্ত—লেখকের ছোটগল্পে সে প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু মেয়াও লেখার মন তিনি। এঁকুরে মনমি বিশ্লেষণ—সবই এসেছে তাঁর গল্পে একটু আয়াসের ভাবে। বিশেষ সাড়ে চারশোর পটভূমি গল্পের বিশ্লেষণীয় নায়ক মহাদেব সমবয়সের টাকার হিসেব কষতে কষতে হার্টফেল করে মৃত্যু কী প্রতীকী নয়? এটি পাশবেদের গল্প। গল্পটি পড়তে পড়তে সাত্রাঁর অস্তিত্ববাদ নাইকের কথা মনে হয়েছে। মেয়াদেও মেয়া যায় অবসরপ্রাপ্ত হাজিরে চার বিভিন্ন প্রতিবেশের একজনকে যার থেকে আকিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে।

ছেঁড়াতমসুক

সমরেশ বসু

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে চৌকিটা দেখিয়ে দেওয়া একজনের বিদ্যুৎবেগে অত নির্বিকার-ভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, 'ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।'

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। রাজপথ, গহনের সমস্ত-অলিগলি, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে যাওয়ার কথা। হয়ও অনেকটা তাই। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকজন আনাগোনা করছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ঝিলটা একটু বেশী। অর্থাৎ, দোকান-পাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত ও আছেই। তার পর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে চলেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকান-পাট কমে এসেছে।

আকাশে তুষারগুঁড়ি, তারাগুলি যেন ঘোমের মত নিষ্প্রভ। ঘুলো ওর মেঝার ঘোটা পরনের উলেন-মাফলার মাথির মত একটা অস্বাভাবিকতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি-আবাস' বাড়িটা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তায় কুকুরেরা আর মানুষের পায়ের আনাগোনার সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের জানালার, রাস্তার উপরে, দেখেছে নিমু ছাদ, পোকা খাওয়া জড়ি-বসানো আর চুল-বাঁধা খসা পরনের অনেক ঘরে সংবাদটা এল। পরনের জানিয়েছে তখন জন-জমাট আসর। চায়ের কাপ-পেয়ালা-ডাঁড়, নমস্কার পানই জড় হয়েছে টেবিলের ওপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত। সন্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ার ধর্মঘটে হাস করেছে।

মালিক নৃপেন পরে চেয়ার ছাড়িয়ে বসে আছে কাউন্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনায় আছে। এখন আসা আসে, তারা প্রতিবেশীদের, প্রায় সব সময়েরই। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেল-করা, ছেড়ে পড়া, কিংবা পড়তে-না-পারাদের কিন্তুই বৈচিত্র্য। ঘরনা পরনারা, ধুতি, প্যান্ট, ছেঁড়া জামা, উলকো-খুসকো চুল আর পুরোপুরি ছেড়ে-না-পারার মুখের ঘুমিয়ে চলনটা লেপাটে বসল। অবশ্য এদের মধ্যে এদের দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভদ্রলোকী ছাওয়া মুখে সমবেশের যে না দেখা যায়, তা নয়। তবে সেটা অবিশ্বাস্য। বাস্তবিক, অনুমান করলো যায়। অনেকে, ফরিউনিস্ট, সি-এস-পি, আর-এস-পি, অনুমান-অনেক রিভোলিউশনারি। খুন-জখম মারামারি, ছেলে-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা বিদেশীয় এই সমাজের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মার সাহিত্য পর্যন্ত। ফ্রেঞ্চকাট উপন্যাস ও আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাতিও যে নেই, তা নয়। মাঝে মধ্যে দু'একটি বেঁচিয়ে পড়েছে দুই দুজনের মধ্যে। হয়তো মারিও, তবু পুরোপুরির আগমন যেন দিয়েছে অবেলায়। আর একটি মধ্যে আবার আসাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আসা যখন [illegible]। মেয়েদের ফরাসি পরিচ্ছদ [illegible] দুটি ছোট ছোট 'কল লেডিজ'-এর পদার্পণেও আসর জমেছে। মারিও সেরকম নেই এমনও।

নমেন কাজের মালিক অর্থাৎ [illegible] পরিচয় হয়ে গিয়েছে। বাস্তবসত্তীর ঘ্রাণ ঘরটার সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ার একটি নরম-নুরুনরে-ভরা ভেজাছায়ার মত দেখাচ্ছিল সবাইকে। সামান্য কলরব ভরা, হাসি-ও ঘাম-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিরা-নৈর্ব্যক্তিক পুরনো খবর খবর মত, ছেলে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, 'সেই, অনেকি-পরনের কাছে, ভাইরাস' পরনের হাত বাড়ুলেরা ছেলে আমাদের ছেলেরা বিল্লু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।'

মুহূর্তটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। হারমোনিয়ম বন্ধ-পরনের জল ছিটানোর মত আরও নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা ছোটখাটো গোলমাল শোনা গেল, 'কীভাবে?'

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, 'আজ বিকেলেও ত দেখেছি।'

আর একজন, 'হ্যাঁ, এখানেই ত দেখেছি সন্ধের সময়।'

তবে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন। চৌকিপরিচ্ছদের শেষটা আরও বলল সব। বিজলীই ঢুকে এক সঙ্গে সমস্তমুখে আলোয় হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, আজ আমরা সবাই ছিলাম। কিন্তু কীভাবে মারা গেল? কোথায় আছে?'

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, 'মিনি সায়করার উত্তর-দক্ষিণের বাড়ি, নর্থ ডেভিসের আছে, রেল-লাইনের ওপরে।'

'রেল-লাইনে?'

'হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক আমার সামনে থেকে—'

'পুইলাইনের নিশ্চয়? মাইলে সেখানে ট্রেন যেন যে যায়!'

অবশ্যকে সেই বিজলীর ঘোষিয়ে দিয়েছে। তারপরেও পরনের সবাই কিন্তু হাল ঘণ্টা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, 'আশ্চর্য! কিন্তু, ভোলা যায় না আজকাল।'

নমেন খুব ঘরে গলায় বলল, 'সত্যি। আর এই রেল-লাইনটা যেন ক্রমে বাড়ছে।'

কেউ কেউ উঠল। বলল, 'যাই, দেখে আসি।'

সেই বিজলীর দুইতে দুইতে অন্ধকার রেল-লাইন দিয়ে নর্থ ডেভিসের কাছে এসে দেখেছে। রাস্তাটার রাস্তার আলো আসে না। ডেভিসের আলো এসে পড়েছে পুরোপুরি একটি মানুষের ওপর। দুটি ডিসেম্বর ডিমিটিনে রেল কর্মচারী নিয়ে এসেছে ডেভিসের কুলি। কি আর দি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের ঝাঁ-লাইটের আলো। কিন্তু সেসবের দিকে দিয়ে তাদের কোর্ট লাইনের একটা অংশ।

এরা বিজলীর দিকে চোখে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়েই একটা সঙ্গে চোখাচোখি করল বিজলীরা। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উৎকণ্ঠিত চিন-ছোড়া চোখ। বিজলীই যেন পরনে-পরনে জিজ্ঞেস করল, এটা কি?

হ্যাঁ। কিন্তুই। চোখ ফিরিয়ে আনার সেখান থাকে বিজলীরা। ঠিক তাদের সামনে থেকে মাথাটা কেটে নিয়েছে। অনুমান হচ্ছে মেয়েটা পুরোপুরি এগিয়ে পড়ে আছে লাইনের ওপর। কিন্তু মাথাসুদ্ধ শরীরটার পরিণামের উপর। মাথাটা লাইনের ওপর, পাড়ি-অনুমান মেয়েটি লাইনের মাঝের পাথর আর কাঁকরের উপরে। যেন প্রায় ঘুমে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল-লাইনের ঠিকাদারি আপিসে কিন্তু তখন ঠিক ঠিক সময়ে বিজলীর ফেরে থাকা সম্ভব হয়নি। হাঁ-হুতাশ ফেলে, অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে আসতে পেরেছে। কন্ট্রাক্টর তার ঠিকাদি অপেক্ষা করছে এখনও। আর এদিকে বাড়ির কাজ ফেলে মজুরী-মেয়ে কয়লাপাড়া পাড়ির আসলো। ঠিক দুপুরে উনুন ধিরে ঠিকা যাচ্ছে। ফেরাও যেন এখনই অনিবার্য হয়নি। যেমন বাঁ পায়ের ফেকে পাড়িটা একটু বেশী উঁচু গিয়েছে, তেমনি ডে-কাজ উঠে আর মনুষ্যের। হাতের নানা কাঁচের চুড়িগুলির অনেকগুলি যেন নেই আর যাদের ফয়েছে। বাকীগুলি সবই আস্ত আছে। ফেরাও তার মেয়ে নেই। যেমন মাথার কাছে খানেরী ফোলা কাটা পাড়িটা দেখিয়ে নানা প্রাইমের দুপুরে উনুন ধরিয়ে এনেছে একদিন তখ। 'পাতিয়েছে' উনুনে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যে পুড়িয়ে যেন খানী হয়ে গিয়েছে।

আরোও আর সব ঠিক আছে। যেন, মাথার সামনে আধাটা ঘুরে নিয়ে, একটুনি মিষ্টি এক খিলখিলে হেসে-হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে, চমকে যেন সবাইকে। সে হাসিতে এই মুহূর্তে সবাই যেমন যে যেমন ছিল একবার চমকেছে।

কিন্তু, হাঁ কিন্তুই। কারুর কাছ আছেনার কুসুম ছিল। সে আশ্চিনীর কথা কানে হাসতে উঠে পারছে ইচ্ছে ছিল। যাকে সহজেনার মনে করে সেই তিনজনের ঠোঁস মেলাজেরীর মেলা। অনেক হয়েছে, কিন্তু প্রেম আছেনার আর্তাকে বজের প্রতিবে ও সরবে। কিন্তু যাকে অনেকের অনেকটা পড়ে কিংবা পড়তে পড়তে পড়ে সরে-পড়া-রাখা বুর্ধিনীর ছেলের সঙ্গে হাসাই একবার সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নিশ্চিন্তের মত। সন্ধেবেলাকারেই অনেক উনুন ধরে ধরে, মেয়ে ছেলে-এসে সহজের আর ছড়োড় বসাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই ছেলেমানুষী মেয়েটা।

সকলে কাজের এই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটী ছোরা ছেলে, যাদের সঙ্গে বিজুকে দেখা যেত সব-সময়। যাদের কিন্তু অনেকেই চোখের দৃষ্টিই যেন পলায় পাঁড় মেরার মতের মত আজও উদ্দীপ্ত, এমনী আছেনার মত আজও কিন্তু ও প্রেম নিয়ে যেন একটুনি চোখাচোখি হয় কিংবা মতের চোরারা ছুটিয়ে যেতে পড়বে।

কিন্তু বিজলী তা। সে আজ কিছেলেও আগের তিনজনের সঙ্গে সকলে কাজেতে ছিল। যার আজও, হাসিতে, এমন কি মান ও অভিমানের মতো, একজনও এই মাঝী-পড়ার ছোরাও দেখা আসুনি।

কেন?

কিন্তুর মনের আর একটি মানুষ [illegible] ছুটি-টুটি নেওয়া যেন। তাছাড়ের চোখ [illegible] কাজ-টাজিওয়ালা। সোজ এসেছে।'

কিন্তুর মনের আর একটি মানুষ আজও কিন্তুকে কিনে নানী পড়া যেন খানের মেয়েদের মত। [illegible] যায় না। মেয়ে-মানুষগুলি কিন্তুকে কিনে নিয়েছে। কিন্তুকে কিনে নিয়েছে। কিন্তুর লোকগুলি অসলটী।

আছেনা আর মেয়ে তিনজন পরস্পর একটুখানি চেয়ে। কে? কার মেয়ে? ও! সেই মেয়ে! কী হয়েছিল?

বুঝে যায়। বুঝেছিল একটা কিছু বিশ্রী। হয়ে, জানাই ছিল।

বিজলীর মায়ের মধ্যেও দেখা গেল কি আর কিছু হয়েছিল পরে। কিন্তুর দিকে এঁর চোখ নেই। ও অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন যেমন-কথা মেয়ে। খুশী আছেনার, হয়ে যেন একটা অসহায়তার ভাব। বিজলীর নাম কিংবা নাম নেওয়ার আগে কিন্তুর আরও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

সারেখো জিজ্ঞেস করল, 'কত হাজার হয়েছিল আপনার মেয়ের?'

'পঞ্চাশ।'

'বিয়ে হেলানি তেল?'

সারেখোর মাথাই ঘুরল। আছেনার বলছেন, 'সম্পত্তি ছিল না।'

'হুঁ। কী হল যে, সাত বাঁধ।'

একটি সেলাই অসুখ ছিল, খানি নিয়ে আসবার আসছে সময়।'

'হুঁ।' সারেখো আবার [illegible] 'আর' ইজার থেকে পড়া ছেড়ে [illegible] তেল আপনার মেয়ে?'

'য [illegible] খাকী পড়েছিল, তাই?'

'উঁ [illegible] বলেছেন, তেল চিঠিপত্রই মেয়ে যায়নি?'

'না।'

'হাঁ-হা। মেয়েরে মানাই, ছেলে-ছোকরা যাবেন না, পরে খুশীবিলে পড়ে যাবেন।'

আছেনার তেল ধরা-পড়া ছেলের [illegible] আপাদিকে তাকিয়ে রইলেন।

সারেখোর উঁচু'লাইটা এখনও অনেকে উঠল পরে বিজলীর ওপর।

পাশ দেঁষে দিয়ে যাওয়ার লোকেরা এল। ওরা তিনজনে এগিয়ে তেল আছেনার কাছে। ওরের তিনজোড়া উৎসাহ তেমে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুঁড়ির মত চলতাবিরে উঠল নিজেদের। আছেনার কাছে আগে জানতে চায়, কী হয়েছিল। তেল ধরেছে বিজলী।

আছেনার তেমনি আনমনাভাবে তাকা-তেন। কয়েকের প্রশ্ন ছুঁপ ছুঁপ, এই যে লক্ষ্য আর মরেন এসেছ। ও, প্রভাতও এসেছ?'

হাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আছেনার কী জানতে, সেইটি বলুন। আর আগে চায় আমরা, হাঁ আমরা বিজু; যে হাসতে হাসতে এসেছিল সকলে আগে থেকে, সে যেন কথা আছিয়ে বিয়েছে তেমের তলে।

আছেনার [illegible] তেমের দিকে আকিয়ে [illegible] এতক্ষণে দেখা তেল, [illegible] তেল দুটি সাঁই-আগের [illegible] লাল হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার [illegible] চোখাচোখি হয়েছে। আছেনার, 'বিজু আসিনে। বিজুর তেমের বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিন্তুই জান না?'

সকলে মাথেন আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝেন ওরা, আছেনার সত্যি কিন্তু জানেন না। তবে? তবে তে বলবে? কে জানে?

কিন্তুরের দৃষ্টি ফিরে পড়ল বিজলীর উপর। ওরা তিনজনে পরস্পরের হাত তেপে ধরল। তেল মাথেন কিন্তুকে যেন্তিয়ে যাবে তেমেও। তেমন, বিজলীর শাসনী মুখ-খানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে অভাবাবেগে। আর বিজলী একা তেমে আছে ঠিক আগের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই তেল ফিসফিস করা আটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি-জু! বি-জু!

আছেনারের লাল কাপড়ে ঘেরে মাথেন ঘুরিয়ে ফিল। পারেখো আকল, 'আসুন আছেনার।'

কিন্তু আসলেন হল। একদল তেমে-আসা মাঝির মত তেলা কি-আর-টি পুলিশ আফিসের দিকে সাদের দিকে দিকে।

ওরা তিনজনে অনেক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আছেনার আরও খানিকটা উনুন দিকে দিয়ে, আশিনাকাজের অনেক লোকের দিকে আর অন্যদিকে তেল-পুলোর উপরে দিয়ে উঠল। তেলি-এর উপর আর দিয়ে, মুখে দাঁড়াল। অনেক তেমেনের সাঁপিল লাইন অনেক এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূরে-দূরান্তর।

উনুন থেকে দেখা যাচ্ছে, সোনে আছেনারের মোঁয়া ধান ধরে তেলেছে।

ওদের তিনজনেরও একটা অনেক কিন্তু ধান করে তেলেছিল। সব ছেলেবেলার আরও আর দিয়ে তেল একটি লক্ষণ তেলেন না।

তেমেন মরেন আর দিয়ে দিয়ে তাকল, বিজু,—বিজুটা.....'

আর কিন্তু বলতে পারল না। তেমের মনে পড়ল, তেমেনের মত আছেনারও কিন্তু তেমের তিনখিল করে তেলেছিল বিজেলে।

তিনজনেই চুপ করে রইল। তিনটির চিবকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিন-জনের মুখেই তেল আছতে লাগল। তিন-জনেই আকাশ ফোর্ড লাইনের তেই আছনারের। কিন্তুই তেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর দুরত একজন মানুষ তেখা যাচ্ছে। দুরত একজনে তেয়াল এসে চাইতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পরে তেকে তেয়ে, গভীর রাতে তেই খিলখিল হাসিটা দুরত তেল-লাইনের তেয়ালের মেয়ে উঠবে: তেমনা, কিন্তুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই ফাটা গিয়েছে।

ওরা তিনজনে একা তে-তেমন তেয়ে পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে তেখলে আছেন কিন্তু সন্দেহ করত; তেন তিনটি বড়লক্ষ্মী তেমে সমবয়সী বসলাব আছেন। ওদের বয়সা যে'রূপ ভূমা-সম্পদ, উনুনে-ধুয়োনে ভূল, সংসারিক ওদের আসন তেয়ে ভূমিল প্রশ্ন ও ভটিল চর্চাবিদেরও একটা বাসনা বসলাব আছে।

বাঁশিয়ের অসমসাহসের মত গায়ের বসলাব ও আছেনে তেল ওরা অনের অসকারে বাকতে কিন্তুর কিন্তুর মতুন আকাঙ্ক্ষা। মনে পড়ছে। আজ সকাল কিন্তু এল কিংবেলে, ওরা বলল, 'কিন্তু, ভূমি তেই।' কিন্তু বলল, 'এমন তেখে তেই ঘরে ঘরে আর আসাই হয়ে না।' ওরা বলল, তেমন?'

কিন্তু হেসে বলল, 'না রে, আমার মুটি ছে-কা হবে না। তোদের তিনজনের সঙ্গে জুটলেই আমার চিরকাল চলবে?' বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওরকম কিন্তু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হ্যাঁ। সেই বিজুর প্রায়ই হত। তবে, জোরও রাগ থাকলে কিংবা এমন গুরুতর কিছু ঘটলে অবশ্যে, আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।' এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা আগে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে সেই [illegible]কে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হল? ওরা তিনজনে [illegible] সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের [illegible]। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। ফুটে-ফুটে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, 'কেন বিজু?'

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইল রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্তগঙ্গা বওয়ালেও সোহার লাইনটা কিন্তু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পরনের জিনসগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই জিনসগুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জি ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল অঙ্কের কেন, মেনিমোহন প্লান আর ঘোষে স্যারের অঙ্কগুলি। যখন কিন্তু [illegible] আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রভা। ক্লাসের স্ফূর্তি করত ওরা কিন্তুকে ঘিরেই, বেয়ারাদের হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিন্সিপালের ঘরে। যদিও রাজেন্দ্রাণীর মত লম্বা ছেলেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। সে হাসিটা তখন ছোঁয়াই বিজুর [illegible] সন্দেহ ঘনিয়ে এসেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলা-কলী ছেলেই ওদের বিদ্রোহ ধারা ঘুরিয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ধার-কীর্তনের মেখানটায় থাকে। ঠিক ছিল নিশ্চিন্ত আরাম আর আর একটু ভালবাসা, ওরা তিনেই আসল মেয়েগুলিই ছিল [illegible]। জীবনে [illegible]র মেশাটা ছিল [illegible] মুখে মোহর [illegible] টেনে নিয়ে [illegible] হবে। [illegible] প্রাণের ছেলে [illegible] ঘুরিয়ে [illegible] মুখের [illegible] পড়েছে, নিজেরাই মনে নেই। মনে নেই, [illegible] প্রাণনে এসে [illegible] ওরা তিনজন কদ, চেয়ে ছিলো। কেননা আর অন্যান্যদের মোহার করে ওরা সবচেয়ে [illegible] হয়ে গিয়েছে, সে কথা কেউ জানে না।

[illegible] এক [illegible] ছেলে একটির ওরা [illegible] [illegible] [illegible]

দৃষ্টি। ঠোঁটটা মিলেছে, দু-হাত পড়লেই পড়েছে।

কিন্তু দেখা গেল, বিজলীর ঠোঁটটা যেন হঠাৎ বিশ্রী হাসি, আর সেই ওদের বিজলীকে, বিজলীকে খুব অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত দুরন্ত মনুষ্যের দুর্বিনীতরূপ আবিষ্কারে ঠোঁটটা করে উঠেছিল যেন একটু।

কিন্তু সেকেন্ড একটু, যেন আবার বলেছিল, "ভেবে দেখে ভালোমতো যেমন করে নেওয়া যায় কাজে।"

সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়ে ওদের চোখের ঠোঁটটা একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সহজের জন্মকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিজলীর চোখে আবার সেই অবজ্ঞা-ভরা হাসি ফুটে উঠেছিল।

বলেছিল, "হুজুগের জন্যে? তার দরকার হবে না। দেখবে খুশিই হবে ওরা সবাই, ও মুহূর্তে। কিন্তু—"

বিজলীর চোখে ভাসা অবাক হয়ে উঠেছিল ইঙ্গিত। একটু থেমে বলেছিল, "আমাদের ওই বিশ্রিটার আসাটাকে আপনারা আর বাড়াবেন না। হেসেই খতম-টেতম, ওখানেই থেকে দুর্বিনীত ভিড়া লোকেও পাঁচজন করে নিয়ে যাও।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলীটাদের কাছ থেকে অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেই ওদের চোখে ফিরে বিজলীর দুরন্ত। সেই-দিনই সন্ধ্যে করে ফেরে লোটা শহরে ফিরছে তখন ভাদ হয়ে উঠেছিল, তিন বুধবারের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যায় দেখা যাই।

ওরাও সে-কাহিনীও পড়েনো হয়ে গিয়েছে। এই তিন মাসে, এই তিনজনের সঙ্গে বিজলী তিনদিন ঘুরেছে। তবে ওরা আবার ফেরে 'ভুলি' হয়ে গিয়েছে। তবে ওদের চেয়ারজনের এক সর্বনাশের অবশ্য ঘটি হয়ে গিয়েছে, বিজলীরও যোগাযোগ মনে নেই। সেদে বিজলীর চোখ-ভেলা মেয়ে-ফাটুর অবাধিত থেকে আসবার উৎসাহিত হয়েছে আর আসেনি বলি গিয়েছে। ঘুরেছে গিয়েছে ছাড়েনি, কিন্তু হয়েছে থাকও। সেই পরের গায়ে আরেক ভালো করেছে। আসও করেছে।

আসও বছরে এক বছরের কিন্তু, যিনি সন্ধ্যেবেলার আসমানটার কাছে এসেছিল। কেন?

জোলাসের উপর থেকে বিজলী ঘাটিলক্ষ্য হেসেছে পর ওরা আবার ফিরে ডাকল ফোর্ড লাইনের সেই আসমানটার। আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথমদিন বিজলীকে যে আসা দিয়ে ছিল, আর সেই জন্যেই এই ফোর্ড লাইনের উপরে থেকে-থেকে ওরা ওরা পেয়ে গিয়েছে। উপরটাকে যেন ঘিরেই সে ফেরে ঘুরছে। মনে মনে বিশ্রী ফেরেওরা, ঠিকমতো করে সেই জন্যের সন্ধানে ফিরবে।

কিন্তু, আর ওদেরকে চাইবে, যেন কিন্তু যিনি সন্ধ্যেবেলার আসমানটার কাছে এসেছিল? কিন্তু ওদের ঘনশ্যামটার সেই বিশ্রিটার আসমানটার থেকে আসল আরেকটার, ওরা আর থেকে পারেনি, দুরন্ত পরে কিন্তু ওদের অনেক আসমানে ফেরে ঘুরেছে, ওরা খারাপি!

কিন্তু কিন্তু যেন সর্ব ভোঁদড়ের জল-আসমানে, লাইনের উপরে এসে ফেরেছে? কেন কিন্তু?

জবাব পাওয়া যাবে না। ওদলকের নির্দিষ্ট-ফেরা লাইনটায় যেন ফিরে থাকবে না। যেমন আসুরের ফুল লাইনের ভালে, দু-দুটো উঁচু সিমন্তরেখার এই লাল আলোটা জ্বলবে। এই বিশ্রিরে আলো অন্ধকারে একদা এই আলোর ছোঁয়া যেন খুঁজি ফেরে ফেরে নিয়ে ফেরেছে ফোর্ড লাইনের দুরে। এই ওদের ফেরেটা ফিরেছিল ঘরে দল-দল করবে একটি [redacted] ফেরের মত।

কিন্তু ওরে পরিবি[redacted] একটা প্রশ্ন ফোরল হল। সকলে[redacted] এক একবার দু-দল করে উঠল। ফিরেদের [redacted] থেকে সংবাদ এল, বিজলী খরচ ফিরে ছিল।

আর ওরা তিনজন অবেল-প্রভাত-ঘনশ্যাম পাশের আসেনটি, 'অল ফেরেটস' পাশেরটির বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রশ্নটিই ঘুরে ঘুরপাক করছে। ফিরে কুটিল সন্ধ্যেবে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে জানছে। ওদের ছোটো জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুলোখুলি করবার উপায়ান্তর করছে ফেরে করতে। কে? কে অকারণে বিজলীকে এই অন্ধকারের ফোরা চাপিয়ে ফেরেছে?

খুলে ফেরে হবে, ফেরেনা, যারা তিন-জন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের পরিচয় আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট করেই এই দুর্বিনীত ভয়ঙ্করকে সে নিয়েই আসর করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনজনেরই কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব আনন্দ সে ভাগ ফেরেছিল এই তিনজনেরই কাছে, বন্ধুদের মতো। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মতো। তাদের তিন-জনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে ফেরেরা ঘরোয়াদের সমস্ত আসর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মতো, কিন্তু, তার তিন-বন্ধুদেরও ভালোও বিশ্বেষিত হয়ে করে ফুলে। রাখবার ফেরেরা সময় অবশ্য। ওদের তিন-জনের পাশবিকতাকে ভিন্নরূপ আভিমানীর নির্দিষ্টের হয়ে ফুটেছিল সে ফেরের মধ্য। আজই ফুরোবে নিয়ে যে ওকে খুন করেছে [redacted] ফেরে হবে। বন্ধুদের হাতে নিজেকে তুলে করে ফেরে ফেরার জন্যেও ছিল ফাসেরই হাতে। তাদেই ফেরে নিজেরা সেই ফেরেরে। ফেরে করেরেই হবে।

সেই ফেরে করবার জন্যেই, তিনজনে তারা আটের দুর্বিনীতের মতো ঘুরপাক ফিরে হয়ে ফেরে আছে। ফেরও ফিরে ফেরে ফেরও চোখ সরানো না। ফেরে ফেরেরেই বিজলী ও নিজের।

আইনের পাশের ফাসের ঘুরপাকি চলেছে ফোরফের ফরেই। ফেরানে ফাঁকিয়ে ফেরবার উপায় ফেরে, এই একটি ফাসের ফলায়, একটি ঘরোবিরে,- ফেরেরে ফেরেরে ফেরাফির উত্তেজনা ফেরেই বাড়ছে।

কৃটিল সন্ধ্যেবে, ফেরো ফুফেরেরে হিসিয়ে উঠল, "আমি নয়, প্রভাত নয়, ফেরেন/ফের, তবে কে? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ফিল তার আসল হাড়?"

ফেরে ফোরেরা ফেরেও আগে, ফেরেটের ঘরে ফাঁস ফাঁকিয়ে ফেরেন ফরে উঠল, "আমিও চাই জানতে চাই। সে যে-ই হক, আমি তাকে খুন হতে ফিলে পিশাচের মত মারতে চাই।"

প্রভাত ফখন ফরেফের হয়ে ওঠে, তখন তার সবকটা ফাফিরা ফেরেরে। প্রভাত ফরে থেকে এর সেই বিশ্রাম ফোরেরে-টোন ভালোবাসা যায় করে, খুলে ফাফরা ঠোঁটের উপর। ফাফিরে দুর্বিনীত ভাবিনা যায় ফেরে ফেরেরেরেরায় ফেন খুব বেশী চমকে করছে। সে দুর্বিনী বিজলীর সামনে ফতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। ফলেছে, 'ফরবিন ফলেছি ফোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু চক্ষে ফেখতে পারিনে। ফেখে যাও।'

বলে নিজের হাতে ফন্ধ করে ফেখে দিয়েছে। আজ ফন্ধ ফরবার কেউ নেই।

সে ফলল ফাতে ফাত দিয়ে, "তাকে ফখন আমি পাব, সে ফতক্ষণ ফন্ধুই হক, তার মুখটা আমি উপড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ মুখ কথা। ঢোলের?

দুর্বিনীত ভাবিনা যার ওদের তিনজনের মুখেই ফেন, ফিরে হয়ে জলছে লাগল। ফেন হুজুগ-উৎসবের আগে, ফন্ধপ্রস্তুত জন্তুটাকে ফিরে ফলেছে ওরা ফৌইফের মত।

আগে ওরা যখন ও মুখার ফখন ফোন আসনে মুগ্ধ হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত, শান্ত না হলে কিন্তু ফেফেরে, কিন্তু ফেফেরেও।

আজ কিন্তু ফেই। আজ ওরা সেই মুর্তি করেছে।

প্রভাত দুর্বি ফের করেছে, ফেমন ওর সেই কালো কিশোর শরীরটার ফেশীতে ফেশীতে ফরছে, ফন্ধরের প্রভাত ফড় ফড় ফোঁফ দুর্বিতে ফেলা ফরেছে। সে-ফোঁফ চোখলে কিন্তু হাসতে হাসতে আঙুলের আগুন ফেরেছে। আলোয়, ওরে, এই ফখন, ফেখে ফরেছে ফেখ।' ফরেলের ফেশীফিন্ন শরীর বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে ফেমনিভাবে নির্দয় দুর্বিনীত হয়ে উঠতে পারে নি।

ওরা প্রতিটি নিজের পালা উঠেই ফেখেছে, দু-ফরে, পরস্পরের প্রতিটি ফিলের ফরছে। প্রতিটি দিন, কে ফরে ফেমন ফরে ফেরেছিল। ফরফানি ফেশী ফাঁসও হয়ে ফেরেছিল কিন্তুর। ফেমনে দিন কে ফতক্ষণ একলা ছিল কিন্তুর সঙ্গে, কিন্তু ফরকে ফরে একটু ফেশী ফেরে করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফড় দুর্বিফেরেছিল হয়ত, কিন্তু তখন কিন্তু ছিল। ফেমনকে ফড় সে ফোন ফরকেই ফেখতে ফম হয়ে যেত নি। একে ফেলে ছুটি পরস্পর-ফরকের পরে নি ফিরে আসতে। আজ ওদের সেই ঘরে হতাশায়, অবিশ্বাস ও

সন্দেহে ছিল। সেই সন্দেহ-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতিদিনের উনিশ-বিশ ফেলে ছেলে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিন্দুর লিপিস্যাক্সরার আরবাসানের ঘরে ঢোকার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলেছিল তিনজনে, সেটাও ভাবছে ওরা? ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচানোর জন্যে, মৃণালকান্তও বিন্দু বলে দি বিন্দু?

এক সময়ে নিজেদেরই মিলনাসন ছেড়ে উঠে ওরা পাশ্চাত্যের দিকে তাকায়। তারপর ট্রেঁচিলের উপর ছুরিটার দিকে, যেখানে অনেক দিন বসেছে বিন্দু, আর বিন্দুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর বিশ্বাস ওদের মাঝে নাই। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা বোঝাপড়ায় আসা করবে। শুধু বিন্দুর প্রতিদিনের স্মৃতি ওদের মাঝে আনমনা করে তুলছে।

সন্দর হঠাৎ ডাকে, 'প্রভাত!'

প্রভাত সস্নেহ করে আগে থেকেই মুখ তুলে জবাব দেয়, 'কী?'

নরেশ দুজনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে। সন্দর বলে, 'বন্ধু পাঠক তার বুদ্ধি দিয়ে কে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে?'

প্রভাত ভ্রু কুঁচকে বলে, 'তাতে কী?'

'বন্ধু পাঠক ভেবে বিন্দুই খুন করাতে চেয়েছিল সন্দরিয়ে ভেবে। তাকে নগদ দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, বন্ধু পাঠক সন্ধ্যা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুদ্ধিটার গলাটা টিপে মেরে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর কিছুই নয়। এমনকি বন্ধু পাঠক ধরা পড়িয়ে দিতে চাইলেও তাকে ধরবার কোন উপায় থাকত না।'

প্রভাত হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'কিন্তু তাতে কী হল?'

সন্দর যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, 'তুই তা করিস নি। বিন্দু তোকে বারণ করেছিল বলে।'

সন্দরের গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ শুশোপ চমকে ওঠে। দুজনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা হাপিয়ে একটা নির্বাক-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিন্দুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিন্দু প্রভাতকে যেতে দেয় নি বন্ধু পাঠকের দিকে খুন করতে, খুন করার দুরাহ সাহসিকতার সুখ ওদের অনুভূতিকে বন্ধুদের বিষায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিন্দু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, কেয়ার পাসের জন্য সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের দিনমান হুমার আওয়াজও দিয়েছে ছুটে আর ফিরে এসে হতাশায় ও অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন একটাই সত্য ও সান্ত্বনার ছলনা খেলা করত। সকলের কারোরই একটি নিয়োগপত্র ওরা পাচ্ছে না, অন্নাহারের দিন ও মৃত্যুকে আসছে না।

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা সময়ের জীবনের মত ভয়াবহ অন্ধকার পথ পরস্পরের থেকে নিয়েছিল, কেননা তারা দেখেছিল, এদের ওইটাই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিন্দুর আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আলোয় দাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গদুটির।

সেই সময় যে যে ছিল, ওদের ভাগ্যবিধাতার মুখে ঠিক তখনই মত উপেক্ষের হাসি, তখন থেকে ওরা দু পয়সার বাদাম, চায় পয়সার মুড়ি, দু গেলাস চা, বিন্দুর সঙ্গে বসে করে খেয়েছে। অন্নাহারের মধ্যেও সন্দর্ভ লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত সোজার মত বড়বড়ে গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বিন্দু বারণ করেছিল। বলেছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিন্দু চাইবে, তাই আমারও বন্ধু ভেবে হয়েছিল টাকার লোভে। বিন্দু বারণ করেছিল। বিন্দু তোকেও বারণ করেছিল সন্দর। বন্ধু পাঠকের তোকে পাঁচশ টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপরাজিত পার্টির লিডার হেলার ঘটনের নামে, একটা মেয়েমানুষকে ভাঁড়িয়ে বিয়ে করার জন্যে। ঘটক মানহানির মামলা হলে টাকা দেবার ছুতি ছিল বন্ধু পাঠকের। কিন্তু তুই রাজি নি, বিন্দু বারণ করেছিল।' ভেন প্রভাতের মত সুরহীন গলায় বলতেই থাকে প্রভাত, 'বিন্দু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। জয়ন্তর তালুকদার তোকে মাসে তিনশ টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্মকাণ্ডগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে, দলের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিস নি। বিন্দু তোকে বারণ করেছিল।'

বিন্দু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা ওদের খুশিয়ার করে আবর্তিত হতে থাকে। বিন্দু তাদের ভেঙে যাবে বিশ্বাসে ভাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গদুটির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অন্নাহারীর সাধারণ পথেই এসে ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত চোখে ও হাসে, ভেঙে ও আসাতে।

আর শুধু উদাসী বিন্দু, তাদের তিনজনের ভিতে ভিতে-গড়া সুড়ঙ্গদুটির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চালতে পারে নি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাজিতার মত ঝলেছে, মুখর আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরল, মরার সময় ভুল হচ্ছে, তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাবনার বিন্দু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিন্দুকে ঘিরে ছিল সেই পথটিকে ওরা খুশি করতে বিশ্বেষিল। বিন্দু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, খুশি শুধু নীল, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিন্দুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সমুদ্রের লাইটহাউসের হাতের বিদ্যুতে ফেরাতে পারিক হতে।

তাই, ব্রাহ্মেন্দ্রাণীর শোকবিন্দুর চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে ঘনঘন করে আগুন জ্বালাবারই তাপ ফেরেছে তারা। মুখুমালীর নির্বাকের ফিলফিল হাসির কলকাতায় এ বিশ্ব-সংসার ফেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই দেখেনি। পশ্চাৎও ফেলেছিল বিন্দু। অনেক মিথ্যা-অন্ধ-ভয়-দুর্বলতাগুলি জীবনে সেই হাসিটাই ওদের অনেক নির্ভরের নিশান হয়েছিল।

সেই হাসিটা মিলিয়েছে কে?

তারা, যারা ছিল বিন্দুর জীবনের সব অস্তিত্ব-সত্যির খবর? অসহায় আর অপরাজিত ভয়ঙ্করের হাতে বাঁচুজোকে সপরিবারে, তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে হাতে বাঁচুজো তার ভাইপোকে মেরের কলঙ্কের মাত্রা নত করেছিলেন, সেই সত্যের মত কলঙ্কের গুপ্ত কথা কী, তা ও শুধু তারা তিনজন আর বিন্দুই জানত। তারা তাদের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের সেই সুরোল মিয়ে কে খেলেছে বিন্দুকে?

ভিনজোড়া চোখের ঘৃণিল সন্দেহ, ঘৃণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশ্বাস সন্দেহেও, ওদের চোখের আড়ালে আর তেমন করে ঘৃণিটার তীক্ষ্ণধার চক্ চক্ করছে না। অবসাদক্লান্ত মনে শুধু একটা যাতনার ওদের কেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিন্দু ওদের কোথায় ছেড়ে যাবার করেছিল, আসলে বেখেছিল বেঁচে করে। সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ঘৃণি যাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।

পলের কলকের ঘরে কিন্তু ফিরে এসেছে। ফিরেই চুপচাপ হয়ে যায়ে সামনের বসটা। জন্তার দাড়ি-মোছার সরঞ্জাম অনেছে।

নরেশ হঠাৎ যেন ঘাইকর্ণ করে উঠল। ঘুরিটা হাতে নিয়ে সে মুখ তোলা গলায় বলল, 'আমি বলব, একটা কথা বলব।'

সন্দর আর প্রভাত দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে, বলল, 'একদিন, সেদিন তোরা দুজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিন্দু। বিন্দু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানি নে। বিন্দুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম, সেই যেন প্রথম জানলাম, বিন্দুটা মুখুল আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন, আমি পাগলের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম বিন্দুকে। বিন্দু যেন একমাত্র ফোটন উঠে স্থির হয়ে গেল।'

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দুজনেই স্থির-তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল, 'জড়িয়ে ধরে আমি বাহবায়ু তাকতে লাগলাম, 'বিন্দু, বিন্দু। বিন্দুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিন্দু দু হাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ?' আমার চোখে যুক্তি ফুটল বুঝি। ফিরে তাকালাম যার দিকে। দেখলাম, মুখে

তার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যে আমার হাতখানা ধরে ছিল, তখনি আমার কেমন হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিন্দু বলল, নরেন, বাবা কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি বিয়ে বসি করি, তাকে ডাকব, বল? তুমি তা চাইবে, তুমি বিয়ে পার। পঙ্কজ আর [illegible]। আমি কী জানব? তুমি কি বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমি দু হাতে মুখ ঢেকে ছুটলাম। বললাম, ক্ষমা কর বিন্দু, ক্ষমা কর।' বিন্দু আবার দু হাত ওর মেয়েলি এলো চুলে বিলি দেল। আমও বলছে ওরা আমায়। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেন। তুমি, আমি, প্রভাত, পঙ্কজ কেউ-ই আমরা কিছু হয়ে বেঁচে থাকব নাকি? তাই কোনদিনই আর আমরা এসব ভাবব না।'

নরেন নিঃশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, 'এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিন্দুর কাছে, তোদের কাছে। এই—এই—।'

বলতে বলতে তালিয়ে গেল নরেনের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর পঙ্কজ তখন নিশি-পাওয়া লোকের মত মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন আঙ্গিকে একইভাবে ওরাও করেছে বিন্দুর কাছে।

একইভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিন্দুকে এক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়তলায় দু হাতে টেনে এনেছিল কাছে। একইভাবে বিন্দুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় হাতি ঢেলে দিয়েছিল তার। কিন্তু প্রায় মনে হয়েছিল বিন্দুর ঠোঁট যেন পদ্মের ঠোঁট। ঠান্ডা, অনুভূতিহীন জল মত। পরক্ষণেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মত মনে হয়েছিল, বিন্দুকে চির-দিনের জন্য হারাবে সে। কিন্তু বিন্দুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁট কেন অঙ্গুল থেকে ছেলে-আসা লোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দুজনের কথায় আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, ছেলের জন্মকথা শুনবার পর পঙ্কজ বিন্দুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, যে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে পলাশ ভরে গেছিল পুরোপুরি। কিন্তু শুধু অপলক চোখে তাকিয়েছিল ছেলেমানুষের দিকে। একইভাবে সে পঙ্কজকে শান্ত করে-ছিল। একই কথা বলেছিল, সে মৈথিলী হলে একই প্রশ্ন তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিন্দুর জীবনে অমর হয়ে থাক।

বিন্দু বন্ধুকে রক্ষা করেছিল। ওদের আকাশের তার বন্ধুদের দুর্যোগ ঘনাল প্রহরী বিন্দু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বনাশের দায় আর কেউ ভোগ করেছিল নাকি? ভোগ করে কোথায় যাবে? বিন্দুরই কাছে ত? যে-বিন্দু তাদেরই সঙ্গে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, আগলে রেখেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। টাল টাল করে গড়ানো কাকের বাসার মধ্যে সঙ্গে ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রাস্তা রোদের আর কুয়াশার আবছা। শীতার্ত পথটা নারকের মত জনহীন আর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালকে ওরা কিন্তুই না জেনে, ফিরে-যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারবে না। বিন্দুর যে কলঙ্কের সহর বিন্দার দিয়ে গেছেন, সেই একই বিন্দার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিন্দুর বাবার চোখের সামনেও এই জিন্দিটিই হয়ত ভেসে উঠবে। চিরকলঙ্কী তাদেরই জন্য থেকে যাবে।

উত্তর দিকেই চলল ওরা। নিশি-সাকরার আবছায়ার ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন যে মনে করে পথ হয়ে চলে [illegible]। থেকে গিয়ে লোকটা যেন চেয়ে রইল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহূর্তে। কুয়াশার অস্পষ্ট রেখা যেন চৌকাঠের উপরো-দুজনের চুল। বড় বড় উদাস চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিক চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

কে? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা। জানেন না?

মনে হয়েই ওদের ভিজেজাড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের দুজনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে যেন ওদের মতো আর সে মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল দুজনের দিকে। ছুটে গিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্তে আর সময় না দিয়ে, টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

যেন ফিরে পেল তিনজনে দুজনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু দুজনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিন্তু জানে তখন, ফলকে। ভোরাক সন্দেহ।

তখন রাগাচ্ছে। এই শীতে ওরা একটি মাত্র পাতলা জামার ভোরার খোলা। পাল্টাটা ভুরো হাড়িয়ে নেবে গিয়েছে, ঘুমের [illegible], যেন খুলে পড়বে একটানে। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ঘুলো কাদা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। এরা নয়, যেন ওরা অন্যের উদাস অস্বাভাবিক চাহনি।

মেয়েটি ভাঙা গলায় ভয়ে বলল, 'কী কী চাও তোমরা? বিন্দু, বিন্দুর খবর?' বিন্দু, বিন্দু! এই নামটা ওরা আর মুখে মেয়ে আর শুনতে চায় না। বাঁচতে চাঁদ চেপে ওরা তাকিয়ে রইল তিনজনের দিকে। বলিও চোখে ওদের কিন্তার ভাষা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে মুঠিটা চক চক করছে। যেন সময় বুঝেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল তারা, 'বিন্দুর খবর চাও তোমরা? বিন্দুর?' বলতে বলতে ওর উদাস চোখ দুটোতে হঠাৎ জল দেখা দেল। আর দু হাতে মাটিতে বসল প্রভাতের হাত। প্রায় রুদ্ধ গলায় সুরে বলল, 'তবে মার তবে আমাকে মার।'

ওরা তিনজনেই যেন বাদুল বিন্দুর একটা ওঙ্কার [illegible] থেকে মরে গেল।

তারের গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ডুবতে ডুবতে লাগল। রুদ্ধ অভিমানে গলায় বলল, ছাড়, আমি, আমি সেই। আমাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি, তাকে তিন মাস আগে সাতশ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে ফেরে-ছিল। নইলে তার বাপকে, তার ভাই-বোনকে বাড়িওয়ালা এক রাতে বাইরে আর করে দিত। দু বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সাড়ে। সে সব আমি তার সেবার ছায়ার মত [illegible] ছায়ার মত।'

ওরা তিনজনেই যেন ওর গলাটে [illegible] তারকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। তারের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, মার, প্রভাত, পঙ্কজ, নরেন, মার আমাকে। আমি সেই, বিন্দু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, আর কাছে শুয়ে তাকে ভরে রাখতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিসম্পাত দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোকটার মত ছিড়ে খেয়েছে, অনেক দিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে পেয়েছে মরার মত অবোধে। মার মার আমাকে।'

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলৎশক্তি-রহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুভিক্ষা করছে।

মৃত্যুভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে। কিন্তু এখনও যেন সেই বিন্দুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা থেকে পাপ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, তারকে খুন করার সিদ্ধান্তটাকে বিন্দুই যেন দু হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাপ-আন্দোলন চিত্রটার ভিতরটায় এখনও ঘুলটা ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরছে।

সহসা তারের গলায় স্বর হোটা আর স্পষ্ট শোনাল, আমাকে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত আটটা থেকে [illegible] ওটা বাড়িয়ার আয়োজন চেষ্টা করেছি। বুঝেছি, সে যেন থাকলে আজীবন তার পিছে-পিছেই ঘুরতাম।' আবার ওর চোখে সেই উদাস ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। পাল্টা ছেড়ে দেবার, টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের অন্ধকার গলিটার দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের মড়বার ক্ষমতা ছিল না। মুহূর্ত তখন যেন রেল-লাইনে মরছেই গেল। যায়। ওরা যেতাতে যাবে না। অথচ, ওদের বুকের মধ্যে তখন ঠেলে পড়ার একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিন্দুই তখন কিস কিস করে যেন বলছে, যেন, যেন বিন্দু রয়েছে?

সমরেশ বসু

কল্যাণ সেন

সেই পনেরো বছর বয়সে, হাফ-প্যান্ট আর পাঞ্জাবা পরার দিনগুলোয়, কত নিষ্পাপ ছিলাম। মুখে কোনো দাগ পড়ে নি তখন। তখন আকাশ ছিল কত খোলা-মেলা, দিনগুলো কী উজলা, আর রাত-গুলো কী আদরে কিছুর আর অপূর্ণ নিয়ে আসতো আমার জন্য। জীবন তখন আমার কাছে, যেন মুখরোচক ভালবাসা আর বিশ্বাসেরই অন্য নাম।

সেই বোকা বোকা, ভীরু নিষ্পাপ জীবনের চারপাশে চারদিকার ঝোঁকা ঘিরে ঝোঁকা ছিল. তখন কতবার বিভূতিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি 'বেললাইন' দেখতে গিয়েছি, কতদিন আলো নিভে এলে সোনাডাঙা মাঠের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছের আড়ালে দেখেছি অলৌকিক সূর্যাস্ত। কলিকাতা ছেলেদের ছেলের পুরে-পুরে সেই 'বিলাতফেরতার গল্প' পড়তে পড়তে আমার চারপাশের, তখন কলিকাতের বিকেল শেষ হয়ে যেতো। তখন ছো আমি জানতাম বোধাও দুঃখ নেই, বোধাও দুঃখ নেই, বিষাদ নেই বোধাও এ জীবনে।

কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা। জন্মের মুখে তখন কী সুন্দর আলো।

কিন্তু কী যেন ঘটে গেল একদিন। আমার গায়ে আলো ফেলে একটা পুরুষ ছায়া চলে গেল. লেখার ভয় কাঁপায় হাতখানা। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আমি পুরে আমি মনের মধ্যে। না, আমি অন্ধকারের ভয়ে পুনরিয়ায় না, বাড়ি ফিরতে হবে, কিন্তু কে যেন টানছে আমাকে অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে। কে যেন আমার ভয়কে ভেঙ্গে ভাঙ্গে ভয় হলো।

সমস্ত দুপুর পড়েছিলাম 'আমেরিকার জীবিকার' তারপর 'প্রাগৈতিহাসিক'। ভালো বুঝতে পারি নি, চোখ জ্বালা করছিল। একটু একটু করে একটি নিষ্পাপ বিশ্বাসের মুখের রেখা পালটে যাচ্ছিল, ছেলেমানুষের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাকুকে খুন করেছিলাম—সব সাঁচা? জীবন এইরকম নাকি রে?...কেউ উত্তর দেয় নি।

মাস্টারের মা মাথায় হাত দিয়ে বলেছে—কী রে, তোর মুখ-চোখ ওরকম লাগছে কেন? জ্বর হয়েছে নাকি? কিন্তু আমি কী বলবো? বুকের ভেতর যেন কথা পাখিরে উঠে আসছিল কিন্তু একটা; ঘর মাথা জানি না আমি। আমার বিশ্বাস, আমার সপ্তা আমূলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কে যেন ঘুরে ফেলেছে আমাকে মাঠে। অন্ধকারে। চেতনের প্রান্তিক, বন্ধুর, চাষী, শ্মশানের বিশ্বাসি, বেলার জীবনের জটিল খোলস-বাঁধার মতো। সেই থেকে আমি জানলাম পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ কুকুর।

কিন্তু তখনো আমি পড়ি নি আর এক-জনের লেখা। সমরেশ বসুর গল্প।

বন্ধু একদিন ছুটতে ছুটতে এলো আমার কাছে। হাতে একটা পত্রিকার 'শারদীয়া সংখ্যা'। বললো, পড়েছিস এই গল্পটা? সমরেশ। ভাবা যায় না। আমি 'মেয়ের ইতিহাস' পড়ছিলাম, বললাম কী গল্প? পড়ে যাব — দেখলাম গল্পের নাম 'বিষকন্যা', লেখক সমরেশ বসু। আমি ছেলেবেলার একদিন চাকুক খেয়েছিলাম, আর একদা ভাঙা চোখে আর মনে বসন গল্প বানাবার চেষ্টা করি, আর যোগমনে গল্প পড়াই পত্রিকায় ছাপিয়ে, মেয়েদের মুখে নিয়ে ছোট গল্প; তখন আর একবার আমার অন্তর্গত গল্পের ভেতর পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, জীবন নামক জটিল ব্যাপারটি, সব ভূমিকম্পের মতো ভেঙে উঠলো। ইচ্ছে হলো কোথাও বসে কারো জন্য, কোথাকে নিজের জন্যই, কাঁদি, জীবনের পাপপুণ্য পরিষ্কার করে প্রার্থনা করি আর রেখ না আঁধারে.....

তখন থেকে সমরেশ বসুকে খুঁজে খুঁজে পড়া আমার অভ্যাস হয়ে উঠলো। পর পর পড়ে ফেললাম অনেক গল্প। 'আমার', 'জোয়ার-ভাটা', 'পাঞ্চালিকা', 'অবলার ঘরে'। এক স্তরীপ থেকে আর স্তরীপ আমি আবিষ্কার করে চললাম। চমৎকৃত। ভাবতাম, কী করে লেখা যায় এরকম গল্প? যা পড়লে এক শ্বাসরুদ্ধকর, অথচ কষ্টটা কেন, বোঝানো যায় না, বুকে জমা হয়?

কবু বললো — জানিস সমরেশ বসুর জীবনটাও এক মানুষ গল্পের মতো।
—কী রকম?

—শুনেছি কয়লাখনিতে কাজ করেছেন, কারখানায় কাজ করেছেন। ভারিবুদের মধ্যে থেকেছেন ধানবাদে সেই নোংরা জীবনে। সক্রিয় রাজনীতি করেছেন, এছাড়া কী জানুষের বেঁচে থাকার জন্য তিনি জেলও খেটেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনেক মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন, সমরেশ বসু আমাকে এই বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সঙ্গে জানুষের যোগাযোগটা আর মনুষ্যত্বের মহান আদর্শের কথা শিখিয়েছেন। একজন আমাদের চোখ তৈরী করেছেন, অন্যজন মন।

আর জীবনের এই ব্যাপক অভিজ্ঞতা-র থেকে যিনি গল্প আহরণ করেছেন। জীবন সম্পর্কে যেসব প্রশ্নোত্তর নিয়ে তাঁর

বিশ্বাস নেই। মেসডাসের মৃত্যু দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি আর তার ফলে ডিয়ন্থলে মানুষের যে মুক্তাভাস আর বন্ধনা, সমরেশ বসু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষগুলোর সন্ধানের পরিচয় দিয়ে গেছেন। মানুষের চোখের আড়ালে, মুখের আড়ালে, ব্যবহারের অন্তরালে জীবনের মূলের জন্য মানুষের জীবনব্যাপী সন্ধান। শুধু পেটের জন্যই স্বাধীন হয়েছেন সমস্ত অন্ধকারে স্ত্রীর মুখে না হেসে রাস্তার পুতুল-শিকারের চেষ্টা, অথবা জীবিকার জন্য কী সুন্দর মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে যাওয়া দুলাল আলীর।

জীবনকে সমরেশ বসু কী ভাবে দেখেছেন, অথবা দেখতে চেয়েছেন? দুইয়ে-দুইয়ে-চারে হিসাবের সূত্রীর জীবন নয়। তাঁর কাছে জীবন খন্দার মোয়া-তাঁতীর তাঁতে তাঁতে নানারঙের আশুনে সুতোয় বোনে; কী নিয়তি জীবিকানির্ভরতার জ্বালায় তাদের একসঙ্গে আঘাত করে, হত্যা করতে চায়, কিন্তু এই দুঃখের ভেতরেই তারা মুখ হয়ে ওঠে, দুঃখের রঙ ধুয়ে দেয় সন্তানের মনে। মানুষের বিশ্বাস আর ভালবাসাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এখানে। অন্ধকার বস্তির অন্ধ-জীবন, যেখানে খোঁয়া আর পাপের নিলজ্জতা দুর্গন্ধ ছড়ায়, নোংরা নর্দমা, জীর্ণ ঘেঁড়াল, কদাকার, ভাসিয়ক্ষ চোখের মতো জোনাকি-দুনি অন্ধকারগুলোর আলো, রাস্তার ডিবকার আর হোটেলগুলোর আলোয় খুপরির ভেতর থেকে হারমোনিয়ম আর গানের টুকরো আওয়াজ—সমরেশ বসু সেই জীবনের গভীরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস আর মমতা নিয়ে। জীবনকে তাঁকি দিয়ে কোনো 'সব পেয়েছির দেশ' তিনি খুঁজে মরেন নি। তবু এই দুঃখ, দুঃখ জটিল বাস্তবতার মধ্যে মানুষের সমস্ত গ্লানি, সত্রাস, হতাশা, পাপপুণ্য বোধ অথচ অমরণীয় লড়াইয়ের শক্তিকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। তাইতো এই দেখার চোখ কখনো কখনো ফ্রেমান্টিক হয়ে পড়েছে, কখনো ছিন্ন পেয়ে মহা-ভিক্ষির আবেগ, অথবা একটা বক্তব্যের প্রচারভার; তবু অন্ধকার থেকে মানুষের আলোর ফেরার, তার উত্তরণের প্রাণপণ প্রয়াসটুকুকে তিনি উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। আজ তিনিও বিশ্বাস করেন হয়তো মানুষকে ধ্বংস করে ফেলা যায়; তবু অপরাজেয় সংগ্রামী মানুষের পরাজয় কখনো ঘটে না। তাই দেখা যায় তাঁর গল্পের দুপো কাটা আর খেয়ে ফেরে বাঁটা পরা রাস্তার মধুকে দুকুরের মতো সেই নরেশ দুন্দু, আবার যখন মুছে আলো-ঝাঁধারে, আকাশের নীচে ফিরে আসে, বন্দীর ভিন্ন জলধারার স্পর্শে মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি মুছে তুলে নিতে চায়, তখন তার মনে হয়—'আর কুলের মত। এই জীবন কুলের মত। কৃষ্ণ কুৎসিত কীটের গর্ত থেকে বেরিয়ে এই কথাগুলি তার মনে পড়ে। তার চোখে বন্দী, বেলীর গন্ধ। 'আর এই না সেই মাটি! না, আমার এত আনন্দে বড় কষ্ট হচ্ছে।...' এ পৃথিবীতে তেমনি কান্না গান গেয়ে যায়?' সমরেশ বসু এখানে পৃথিবীর হাসি দেখেছেন আর নরম ঘাস-গজানো মাটিতে জলের স্পর্শ জীবনকে পবিত্র করে তুলেছেন।

সমাজের সঙ্গে মানুষের বিবর্তন, তার মানসিক-সমস্যা যার যার তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। বাঙলা দেশের এক চরম দুর্দিনকালে কেটেছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে আবেগ-মথিত সময়। দুঃখ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, মানসোত্তীর্ণ উদ্বাস্তুজীবনের বিভীষিকা জীবন আর ভাবনার অনেকখানি। গঠন আর কল্পনা সুনীতি আর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব কী অসহ্য মানুষের মুখ, তখন এইদিকে মজবুত ইসলামের মতো অমরকায়া লেখার ধারণা থেকে 'মাটা মুখে আসে—তাই বলতে চেয়েছেন, যখন অন্ধকারে, দুঃখেরাত্র পৃথিবীর দুর্ভাগ্যহীনতায় অন্ধকারে এই চতুর্দশ অধিবেশনের দিকে যখন চলেছি, তখন আর কোনো পবিত্র আত্মর নেই তার জন্য, যখন বেঁচে থাকার এই তীব্র বোধ থেকে আত্মহত্যা মনে হয় প্রার্থিত' তখন এই দুঃস্বপ্নবিদ্ধ পাপিষ্ঠ মানুষের পতন আর বেদনাকেও তিনি খুঁজতে চেয়েছেন। সমরেশ বসুও ভাবতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কান্নাই এক এক সময় বিদ্রোহের রূপ পেয়েছে, বিদ্রূপে জ্বলে উঠেছে। সমরেশ বসুর গল্প তাই এই সময়ের দলিল। মানবিকতাই তাঁর বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের ঘন্দ্বসংঘাতের প্রধান উপজীব্য।

পাশের বাড়ীর মেয়ে

লীলা মজুমদার

কাল এখানের বাড়িতে পাশের বাড়ির গিন্নি এসেছিলেন। আমি রান্না চাপাচ্ছি, মেজাজটা খুব ভাল নেই, ঠাকুরের শরীরটা বেশির ভাল যাচ্ছে না। নিজেই রান্না করছি। বলা বাহুল্য সন্ধেবেলা বন্ধুবান্ধবের যোগ হয়ে আসবে কিছুটা ইতস্তত এমন সময়ে পাশের বাড়ির গিন্নি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন।

মাছগুলো ফ্রেঞ্চে দিয়ে ফিরে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, মুখখানি ফেন ফেকাসে হাঁড়ি, তাঁরও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। অবাক হলাম— "ও কি, আবার কি হল?"

রান্নাঘরের উনুন ঘরে পড়ে বললেন— "গিন্নি, মনটা খুব খারাপ।"

বললাম, "সে কি! ভগিনীপতি ভাল আছেন, ছেলে পাস করেছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আপনি-আমি কিনেছেন, মন ভরেছে হয়ে গেছে বলুন।"

বিষন্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"না, হাসির কথা নয়, ছেলেমেয়ে জামাইবাড়ি গিয়ে কি হবে? জানেন বন্ধুর ছেলেকে নাকি সাংঘাতিক কথা শুনে এসেছি?"

মাছে জল একটু, তেল ছেলে, তার উপর কুচি কুচি বেগুনপাতা আর পটুল আলু কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে বললাম,

"আ, তাই নাকি? ছুপোল আবার কি বলে?"

বললেন, "ছি, ছি, ঘরিবে আমার সব লজ্জা ভেঙে গেছে! আপনি জানেন যে পৃথিবীটা গোল কিনা ঘোরে। এখন আমাদের ভিলাইতে রাত বারটার সময় যখন ঘুমুতে যাব, তখন এদেশে সন্ধে ছটা, বুঝলি, বুঝলি বিজয়া, তখন এ সময়ে কি হবে?"

হাতা নাড়া করে ফেলে বললেন, "আমাদের পুজোর পরিবারের কি অবস্থা হবে ভেবে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

মহাবীর ভাঁবিয়ে ভেবে নিলাম—"কি আপদ! এই ছেলে এত কথা শেখায়? আপনি আসেন না এখানে ফোন দিয়ে সব পরিষ্কার উনুনের ওপর করা হবে?"

আহা বেচারুলের গিন্নি। সত্যি এরও পাশ করার কথা পড়িয়ে? বাই এ-বেলার বাসন-মাজার জোগাড় করি যে, সারাদিন ছেলে আর কিছু আর উনুনে পুড়িনি!

এমনি ধারা ঘোলা ছাড়ি হয়। হয়তো রাতে একটা খবি নিয়ে নির্বিবাদে একটু বসেছি, বন্ধুরা কেউ বিদেশে এসে পড়লেন, তাঁর চুপচাপ টাকা বাসবোটি এদিকে। আদর করে বসাই, কথা শেষে বাকি আবার কি নতুন চিন্তা এল। বললেন—

"গিন্নি, বড়দার ওপর তখনো আপনার ঘৃণা ওরে যায়?"

বললাম—তা আর যায় না! ওরের সম্বন্ধেই যায়। তাঁদের বাড়ির ছোটদের ছেলে অন্ধে ফেল করলে, মেসো সেটা শুনে এলে, বসে এসে হুঁহাস থাকলে, দুঃখে ভাত তাকতে পেলে, তার সঙ্গে বিটিরিটি করলে, শত্রুতা করি, এই সব কথাতে বলছেই আমার সংস্কারের ওপর একটু একটু ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে।"

গিন্নি বললেন,—তা, গিন্নি আমি এরকম ঘৃণার কথা বলছি না। আপনার কি কখনও মনে হয় না যে বাঁদর, লম্ফলাফ, ঘুমুনো, রামকৃষ্ণ পরমহংস, এরা কি সবাই আমার পূর্বপুরুষ কেউ হনিমাটাকে যখন আগে করতে পারছেন না, তখন আর বেশি ভেবে লাভ নেই? বোধিধর্ম তাকালেন খালি পায়ের খড়মখান, ঠিক জোড়া নির্খুঁত দুর্গে; লোহকরা চারিদিকে আনন্দে ভিজন করছে আর তবুও লোকরা কথা পারছে?"

আমি চমকে উঠে বললাম—এই যে। পাশের বাসবোটি করছে ঘরে পড়ে গেল, আমার ছোট আর আমার আমার কাঁচি নিয়ে ফিরে ফেলে দেয় নি, বর এবার ওকে ফেলে উঠেই পড়ি।

অন্তর্যামিনী আমে যেন হয় খবে সবের মুখে টেক্কা ফেলেন, নইলে চিন্তা করবার এত শক্তি পেলেন কোথা? একদিন এসে বললেন—

"গিন্নি, একটা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। এই যে কারো ছেলে হল, ফেল পিসিমার নাতনী হল, অমনি কেমন খুকুমণি ছেলে হল, ভাসুরের বৌ—এই যে হচ্ছে কতজন, এই এতজনের লোক ফেল ফেল, তার কারো কাছে কেউ তো আসবার যোগ নয়? তাহলে কি করে চলবে? পাঁচটা ভাসুরে আর বড় জোর একটা ভাসুর, এমনিতেই পুজোর ভাসুরে, কিন্তু পাওয়া যায় না, তাহলে ফেল সম্পত্তি এদের কিসিবে কেউ আর ফেলে দেবে?"

আমি বললাম—কি মুশকিল! আপনার যে ভাবনার আর অন্ত নেই। এই বিষয়ে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা অনেকই গবেষণা করে ফেলেছেন, আপনি কিন্তু চিন্তা করবেন না, দেখবেন এই আমরা এমনি ফেলে-ফেলেরা হয় জলে ডুবে, নয় ফেলা পড়ে, নয় গাড়ী চাপা পড়ে, নিজের জন্ম নিজের হবেই মারা যাবে। তাছাড়া শরীরের দেখবেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই এইটুকু ভবিষ্যৎ এতগুলি প্রাণ বজায় হবে, সবাই ফেলে পরে সুখে থাকবে।"

"তাই বলুন।" নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান।

পরদিন সকালে আবার এসে উপস্থিত। "গিন্নি, কাল যে আমার, ভাসুরের ছেলেদের পরীক্ষাগুলি মারা যাবার ভাবনাটা বললেন, কথাটা ঠিকই। বোধ হয় কলকে সহরের মতো আরোগ্যিকার লোকরা খুব বড় না করে, বাড়ী চাপা পড়ে অবশ্য তার ছেলে ফেল দেখি। আমাদের ফেলের ফোলিয়ে তো আরও বাড়াবাড়ি। তাদেরি আমরা কলকাতে জানিয়ে দেব ফিনা, এরা আবার ছেলেমেয়ের সামনে কি সব ভাবনা ফিলে ভাববে বলছিল, তাহলে বলে ভাবে আর পরদিন বলে ফেলে?"

ভাবনা হয়ে বললাম, "না, না; আমরা আর কাউকে না, যে আমে হয়তো আমরা কারুর ছেলেরাই ফেল করবে, আমরা সবাই মরে যাব, কিছুই তো বলা যায় না।"

ফোরও কমলে ভাবিয়ে উনুন গরি।

আরেক দিন আমি একটু আগে চাইতে ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম, সেদিন ফিরে বাড়ীর যা অবস্থা সে আর তখনে বর্ণনা করা যায় না। ছিন্নিভিন্ন এদিকে ওদিকে ফেলানো, চারদিকে ছেলো ফুল ফাল, খুকুমণি নিজস্ব ফোলো গায়ে চিন্তা এসেছে। ফিন ভদার হাতে ফিরে ফেলানো হাসি হাসি মুখে করে আমাদের ডেকে ফেলে বসালেন। ফুল্ল ভালো। আমাকে দেখেই ছুটে এসে গায়ে পড়ে বললেন—

"গিন্নি, গিন্নি, গিন্নি; চলিটি পড়ের ফুলো দিন। আজ আমার মনটা যে কি খুশি সে আর কি বলব।"

জিজ্ঞেস করলাম—কেন বলুন তো? আমি আমার ফোনও আমার ফাইল দিনিস খুঁজে পাচ্ছি না, বলে, তবে ভাল খারাপ পড়ে এসেছি।" খুব হেসে আমাকে আইস দিনিস দিলেন, ফিরে বললেন—না, গিন্নি, এখনি বাজের না, ফলে একটু; ফিনিয়েফিয়ে করে বলি। আজ বড় আনন্দের দিন।"

কি আর করি, হাতে ফেলে, আমার ফিল না, মনে ফেলেছিলাম ফৈফেছিলাম ফেলায়। বললেন—

"আপনে, ছেলে ফেলে পৃথিবীর সব মানুষ মরে করে ফেলার উপায় কিন্তু করে ফেলেছি। এত সহজ উপায়টা যে এতোদিন কারো ফেল মনে হয়নি তাই ভাবি।"

অবাক হয়ে বললাম তাই নাকি! সহজটা শিখিয়ে ফিন তা শুনে।"

ফেলাবার ফিছু নেই, পৃথিবীতে কেউ যদি ফিয়ে না মরে, সবাই যদি অমরনী হয়ে যায়, তাহলেই তো মারা ফুরে ফেল। ফেলের ফেলেই থাকবে না, তাদে ফুলে যে?

পারে যে? হাসপাতাল, মিশি, ডাক্তারের দুটি ছেলে আছে। এই দেখুন, সাঁতা সাঁতা আমার মনের ভাবটা কেমন বাড়ীটাকে চিঠি লিখেছি, এ চিঠি কেউ পেলে, কখনই মনের ভেতর মিলন ভেবের ছিত্র দেখতে না, এমনি করে একটি একটি করে, সুখের সম্ভাবনা দূর করতে হয়। হাঁ, হাঁ, ওকি মৈত্রেয়ী-হিতৈষী ফিরছ কেন? ফিরুন ফের।

ভদ্রলোকের সঙ্গিনী সঙ্গেও আলাপ আরম্ভ আমাদের, মিশি ছেলেটাকে হাসিখুসি মানুষটি, চোখে একটা বুদ্ধিদীপ্তির ছাপ। একটিকে বললেন—দেখুন, আমার মিশির ছবির একটার চিন্তা, কিন্তু আমার ঐ একটিমাত্র চিন্তা, মিশির চিন্তাগুলো যাতে আরও পরিণত না হয়, এই এক চিন্তা। জানেন, কাল আমাদের একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেছে।

ভদ্রলোক—আমরা চিন্তাটি করলে আর কম চিন্তাই করে, চিন্তাতে আমাদের বড় একটা এসে যায় না। আর সত্যি আমাদের ছেলে, পৃথিবীতে কারই বা এসে যায়। যদি দেখ, তবে এর ভালো লোক এর সব আগে আমরা চিন্তা করে থাকব পরের। দুর্ঘটনাটার এ বর্ণনা দেন? মিশি বড়জন সত্যি চিন্তা করেই ফেলে দেন. আমার একটুও ধৈর্য নাই, কিন্তু মনে মনে বড় ঠিক চিন্তা-গুলোকে কাছে সাজাবে চেষ্টা করেন. তখন আমার বাড়ীওলার সঙ্গে উপস্থিত হয়ে পড়ি।

"ডাক্তারবাবু, কাল বেলায় একটা মজার চক্কর এসেছে. কলকাতা থেকে দুল হাঁটা, খাড়া একটা লাঠি হাতে পরনে আর লম্বা দোড়ি পরে, ছোট দুটো বাচ্চার পরন ছেলে বসাচ্ছে। সব সময় চারিদিকে চাইছে। দেখেই আমার মাথায় সন্দেহ হল। মিশিকে

"ওকে তোমার দেখেছ? ও যদি পরের ছেলে না হয় তো কি বলেছি। মিশি আমার হতে পারলেন— তোমরা তো। ওর বলে কি ছেলে চেন? ছেলে বিয়ে, লাগিয়ে দিয়ে, খেলা করে, খোল চোখকে কখনো কখনো কষ্ট দেয়ে? চাকরি দেখ না তো কি! ও ছেলেরা কি আমার ছুটি করে থাকে? আমরা ও লাগাম ধরে ছেলে খেলেছি, তবু ওর সম্বন্ধে কখনো কি? ছেলের বাবেরো-আমরা বৌ-এর কাছ থেকে আমার নেমনা। তাই ওকে ছেলে নিয়ে এসেছি। এ বিষয় আমি অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তুকরেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তুমি যদি আপিস যাও আর পড়না ফেলবার জন্য, তাই তুমি চিন্তা করবার সময় পাও না, নইলে ওকে আমি চিন্তাই করতে। আজ রাত্রে তোমার মেয়ের বোরখা, চাকরটি আর ফাইফেলটাকে চৌদ্দটি ছেলে, খবরা খবর নেবে। দেখো, কিন্তু হবে না। কাল ওর একটা অনুভোগ আসবে। কাল ছেলেটি এ কিন্তু।"

ভদ্রলোক—আমার তোমার বোরখা, চাকরটি, ফাইফেলটাকে এ সময়ের যোগ্য নয়। তোমার তোমার ভাবটি নিয়েই পরীক্ষা ছেলে, আর কিন্তু নিয়ে নয়।"

ভাই-চিন্তা ভদ্রলোক ছেলে পরিচয়। আর কি কিন্তু ঠিক, ঠাট্টা তোমরাও ছোট ছোট নাক ডাকা। "ও বলব মনের, আমারি ছুটি করতে চিন্তা করছিল। দুল করে আকা ছেলে পড়ে আছি। আর পা টিপে টিপে বাড়ীতে ঘরে ঢুকেছেন, যেই আমি পরিচয় পড়েছে-ছেন, আমিও পালিয়ে উঠে, হাতে আপনি করে, চোঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোক কোলাহল করেছি। তারপর ছেলের ছেলে আমার ছেলে।"

একটি মেয়ে, একটা পান মুখে পরের ভদ্রলোক আসল ছেলে বললেন—পিতামহ চিন্তাশীলতার আমরা ছড়াবার করে ফেললাম হল। উনি আমাদের আমার স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দেবেন। আমরা আর সংসারের ভালোর ঠিক করেছি। এখন উনি, চিন্তা করবার বিষয় দেবেন—এর—ওরা—সবারে আর একটা বাঁধর একটা ছেলে আমাদের বাঁধ ছেলে এত মিনিটে ভিন ঘণ্টে ঘণ্টে, পরের মিনিটে ছেড় ঘণ্টে পিছনে পড়ে।

আচ্ছা তবে আসি।"

ছোট গল্প

আর্ট আসল আবশ্যই নির্দিষ্ট লক্ষণ। সেখানে কোন শেষ কাহিনীর স্থান নাই। পরিচ্ছেদের পর ছোট গল্পের বাঁধন চলক পরিবেশের সহায়কারী সমাধানটির জন্যে পরিবর্তে পরিপূর্ণতা পায়।

—শচীন্দ্রনাথ সেন।

●

ছোটগল্পের ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আয়তনের নয়, আসলেও প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন কম, সেজন্য ইহার আর্টও সরল। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ আঁকিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার আসল পরিবেশের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আয়তন ও উপন্যাসের উপরের মধ্যেই বিশেষ কোন নির্দেশিত সূত্রের সন্ধিবেশ থাকে না। উপন্যাসের মত বাঁধা ধরার ইহার আসল হইবার আশার নাই. সাহ-পরিচয় বাঁধা পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। আসলের পরিচয় বা চরিত্র বিশ্লেষণ ইহা যে আসল সম্বন্ধে আঁকা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহাদিগকে সূচনাতেই অঙ্কিত হইতে হইবে। ঔপন্যাসিক আয়তনগত বিস্তারের অবকাশের ইহার পক্ষে একান্তভাবে নিষিদ্ধ। আসলের যে অংশে ইহার অবিচ্ছেদ্যভাবে হইবে তাহাকে ঘিরে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই। পাঠকের মনে যেন তাহাকে সমাপ্ত সমাধানের একটি রেশ চিরন্তন রাখিয়া যাইতে চলিয়া হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরূহতর।

—শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়

●

উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উপন্যাসে প্রতি একটি আয়তনে, যেন ঘুরে ঘুরে ও ঘুরের ঘুরে। উপন্যাসের আয়তনের তাহাকে সে ছোট গল্প হয় না। ছোট আসলের পরিবর্ত ঘোরাফিরে আসলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য যে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের মধ্যে আর ঘুরে ফিরে ঘরে, পরিচয় করে, আলাপ করে, প্রেমে পড়ে। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের খোলাটা খুলে একটুখানি দেখার আর বলে, আসলেই দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার প্রধানত সময়ের ধারণের আসলের, আসলের অনুকূল করে খোলসের আসলের ছোটগল্প

ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরূহতর।

—শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়

●

ছোট গল্পের আসল কত ছোট বা কত বড় হইবে পরে তাহা নির্ভর করে ঐ জাতি-এর উপরে, খুব ছোট হইলে এ জাতির আসলের আসে না তখন তাহা ছোট গল্প না হইয়া ছুটকি গল্প হইয়া পড়ে। আবার খুব বড় হইলে ঐ বাঁধনি ঢিলে হইয়া যায়।

আমি যাহাকে ছুটকি গল্প বলিয়াছি তাহা ছোট গল্প নয়। এইজন্য যে, তাহাতে জীবনের গভীর ছোতের আসল-আসল বোধ নাই, যেজন্যই আসলও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমাজ-বিশেষের নিত্যনৈমিত্তিক আসল, মানুষের চরিত্র বা আচরণের মধ্যে যেখানে যে সত্যের সন্ধান মিলিয়াছে লিপিবদ্ধ করা—তাহা কতু কতু আসলের যে জাতিরূপের উপন্যাস আছে, তাহাই যেখানে নাটি উপন্যাস কোথাও আসল বা কোথাও একটি, সেখানে আমাদের উপরোক্ত বাঁধন ঢিলাই ছুটকি গল্পের আসল।

—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লীলা মজুমদার

সুনীল গুহ

বন্ধুটি তার সাম্প্রতিক একটি মাসিক অনাস্বাদিত কাহিনী পাঠকদের কাছে বলবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসেছিলুম আমরা। মাঝখানে একটি টেবিল। তাতে সামান্য কিছু সাময়িকপত্রের ভিড়। আমি বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে একটি সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটি অক্ষরের দু এক লাইন পড়ে ফেললুম। দু এক লাইন পড়ার পরে আরও কয়েক লাইন পড়ে নিতে হল। কী আশ্চর্য, কথাটি অন্যমনস্ক ভাবে কয়েক মুহূর্তের দিকে থাকিয়ে ছিল। এবার চোখদুটো লাইনের পর লাইনে ছেড়ে রাখলাম। আর আমার বন্ধুটি ঠিক আগের মতই তার কাহিনীটি শুনে যাচ্ছিল। সম্ভবত আমি তার কথার দু একবার 'হুঁ' 'হাঁ' ও শুনে থাকব। তবে সেটা নেহাতই অনাগ্রহভাবে, কথাটা তখন আমাকে দুত টেনে নিয়ে চলেছে।

বন্ধুটি ভাবে, কাহিনী শুনে চলেছে, আমি চলেছি কথাটি পড়তে পড়তে। আসল কথা আমি বন্ধুটির কথা শুনছিলুম না। কিন্তু সম্ভবের আশ্চর্যের আসল যেটি, সেটি হল, একটি সাদা আসল পড়া এবং বন্ধুর গল্প বলা শেষ হলে, বিস্ময় আমি হঠাৎ বলে উঠলুম,—চমৎকার!

বন্ধুটি আমার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। বললে,—কী বলছ হে, তুমি একে চমৎকার বলছ?

তার কথায় আমার সম্বিত ফিরে এলো। বন্ধু বান্ধবের আমি দুঃখের সময়ে ও দুঃখের একটুকু হয়ে থেকেছি। আপসোসটুকু হল আমার অন্যমনস্কতার জন্যে বন্ধুটির দিকে তাকাতে পারছিলুম না।

ও আমার অপ্রস্তুতটা সামাল দিতে উপলক্ষ করে বলল,—তুমি তোমার এই আই-ডেন্টিটি নিয়েই বড় বিব্রতবোধ।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললুম,—আসলে গল্পটা নিয়ে ফেল করেই, কিন্তু মনে কিছু নাই।

যাই হোক, বন্ধুটি আমাকের সংকোচের তার কাহিনীটি আমাকে বলে দুঃখিত হল। আর আমি যে কথাটি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম সে কথাটির সার পাচ্ছি," লেখিকার নাম লীলা মজুমদার।

আমার এই লেখিকার লেখা সেই প্রথম পড়া নয়। কিন্তু কথাটি লেখিকার আগেকার লেখা আমার পড়া হয়নি। আর আশ্চর্য যে, আমার একটি ভালো গল্প আমার দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গিয়েছিল। আফসোস হচ্ছিল।

এ কথা হলফ করে বলা যায় যে, আমাদের ছোট-ছোটদীদের আসরে লীলা মজুমদার অপরিচিতা। কেননা আমাদের ছোট-ছোটদীরা কৈশোরেই তাঁর লেখা নিংড়ে পড়েছেন। তাই তাঁর আমার পড়ে কৈশোরে কেমন অভিভূত হয়েছি, কেমন রোমাঞ্চিত। আসল কথা কবিতার সেই প্রথমদিনে মোহিত হোক আর কবিতা পড়ার কোন প্রথম প্রেমাভিসারি-মনোভাব কেনেই তাঁর আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। তারপর থেকে তাঁর বিচিত্র রসসৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এবং পাঠকের চেয়েকৃত হয়েছি। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়েকেনে আমাদের মনে কোন সংশয় হচ্ছে। বাকান পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা পড়েছি, এখনও পড়ি। সাহিত্যের সংসারে তাঁর ঐশ্বর্যশালিতা দেখে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত।

যেমন সাংবাদিকের অবেষণীতে প্রফুল্ল চক্রবর্তী আর ছোটো বন্ধুদের আন্তরিকতাকে পাঠক পুরুষিকে না হয়ে পারছেন না। কী দায়িত্বপূর্ণ ভিন্নে কবিতা কীভাবে আত্ম-নিয়োগ করে সেটা এই গল্পে আমরা দেখে আমরা দুশিয়ারের সঙ্গে তিনি কথা কয়েছেন। আর গল্প বৈরী করতে তিনি কলমে আঁচড়িত্ত করার প্রয়োজন করেন না। তাঁর লেখার এই বৈশিষ্ট্যটুকু উপভোগ করার মতো হাতে। একদা একদো নন্দন নামক এক বাড়িকে খুশুর মন করার জন্য প্রফুল্ল চক্রবর্তী নির্বোধিত হয়েছিলেন, আর এই একদো একদো নন্দন পিতার মহাদুঃখের সময় গুপ্তচরবৃত্তি করে পরিবারী স্থিরতে হয়ে উঠেছিল। সেই বাড়ি নাকি সরকারের নানান দপ্তর বাইরে সরকারও তাকে দেখতে এবং সমাজে হাসা-সন্দর করে তুলছে। তাই প্রিচক্রবর্তী ছেলে-মেয়েদের উপর তার নাসব কমলেন একদো একদোকে ধরে দিতে। তার ছেলে নন্দন উপরে ছিল সেনার সাংবাদিক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কাজ করত গোয়েন্দার। এই গোয়েন্দা সাংবাদিক কীভাবে একদো একদোকে আবিষ্কার করেছিল, সেটি যেমন কৌতূহলকর, তেমনি মজার স্বাদে পরিপূর্ণ। ঠিক এই আকর্ষণেই তাঁর গল্প পাঠককে সহজে আকৃষ্ট করে।

যে সময়ে ছোটো গল্পটি পড়েছি, সে সময়ে গল্প পড়ে সহজ আনন্দ আহরণের বয়সটা আমার ছিল, অভ্যাসটা আমার ছিল না বিচার বিশ্লেষণের গভীরে যাওয়ার। যদিও সময় অনুসারে সেটা স্বাভাবিক। তবু সেই বন্ধুত্বে তাঁহাদের ঘরে বন্ধুর বয়স থেকে সবে ফিরে আসা গল্পটির প্রতি যে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলুম এবং বন্ধুটির কাছে বিনয় সম্ভার পড়ে ফিরেছিলুম সেটা মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ত এবং অনেকদিন পরে আবার মনোনয়নের খাতায় সেই গল্পটি পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে। এই দ্বিতীয়বার পড়ার পরে নিজের সাধ্যমত এই স্যার ও রস নিয়ে কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। দ্বিতীয়বারেও সেই আগের মতই আনন্দজনকভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। এই প্রসঙ্গে আমার বলে রাখা ভালো যে, তাঁর কোন শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। তাঁর গল্পের এই ধারার সব গল্পের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছি। যদিও একজন পাঠক হিসেবে লীলা মজুমদারের ছোটগল্পের যে আলোচনা করছি, তারও সমালোচনা হতে পারে, তবু এ কথা স্পষ্ট করে বলা বোধ হয় বাংলা ছোটগল্পের আসরে এই সুপরিচিতা লেখিকা তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য-আবেদন জন্য পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন পাবার সক্ষম হবেন। ছোট গল্প যে পরম-রস আর চৌদ্দপোয়ার কথা বলতে এসে এক রহস্যের আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। সেই থেকে সেরেনবন্ধুর মনে এক ভয়ের সঞ্চার। অথচ সে ভয় এক রহস্যময়ীর রহস্যঘেরা হলে গল্প এক সুন্দর পরিণতি লাভ করে।

আরো একটি বিচিত্র গল্পের নাম 'ভোম্বল'। শ্রীমতী মজুমদারের স্বাভাবিক লেখনীর জোরে গল্পটি যেমন রসাল হয়ে উঠেছে, তেমন নায়কের পরিণতিতে মনটা মুহ্যমানে আক্রান্ত হয়। এই বৈশিষ্ট্য প্রায় লীলা মজুমদারের অনেক গল্পেই দেখেছি। সমালোচনাপ্রসঙ্গে, এই গল্পটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার বিরত রইলাম।

আরেকটি ভিন্নস্বাদের গল্পের নাম 'সন্দেশ'। এই গল্পটি পাঠকের সামনে অবতারণার ভাষায় সুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে তিনি পাঠককে নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সন্দেশের মূল রস আস্বাদন করালেন। যাতে পাঠক অতিরিক্ত না হয়ে পড়েন। তারপর লেখনীর অনেক সূত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে অবশেষে যখন তিনি সন্দেশের মেজমাসিমাকে খুঁজলেন,—পৃথিবীতে মরে গিয়ে স্বর্গে এসে হাঁস হল, এই হাঁসদুটি ধরে নিয়ে কোথায় যাবে? তখন পাঠক তাঁকে অত্যন্ত সহজে আসে আসতে না দিয়ে পারবেন না।

পরিশেষে এই লেখিকা সম্বন্ধে আরো বেশি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা গল্পগুলি আরো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে কিশোরদের জন্য লিখিত গল্পগুলি যদি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়, তবে লীলা মজুমদারের গল্প নিশ্চয় একটি বিশিষ্ট আসন পাবে। যে আবেগে রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছেন, 'তাঁর লেখা পড়ে মনে হচ্ছে যেন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের লেখা পড়ছি।'

তাঁর লেখা পড়তে পড়তে আমারও অনেক সময় মনে হয় যেখানে যেন এমন স্বাদের গল্প আরো পড়েছি। কারের লেখায় যেন এমন বিচিত্র স্বাদ উপভোগ করেছি, কিন্তু পারি না ঠিক বলতে। তাই রাজশেখর বসুর মত স্পষ্ট করে বলতে পারি না কিছু। তবু আমার বলব, লীলা মজুমদারের গল্প ভিন্ন স্বাদের।

ছোটগল্প : বিচিত্র চিন্তা

প্রমথ চৌধুরী

...সেকেলে ও একেলে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ঔপন্যাস পাঠক হিসেবে—ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। এই সূত্রে আমার এই জ্ঞান জন্মেছে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে ছোটগল্পের আদি জন্মভূমি। এবং সেকালে এ-দেশে গল্প জন্মেছে ঢের—যদিও সে-সব গল্প সকলে জন্মে বিকেলে মরেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গল্প অমর। ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের পরিবর্তন ইভলিউশনের কোঠায় ফেলা যায় না; কারণ, ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস হচ্ছে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস নয়,—স্থূলে যুগে উদ্ভাস পতনের ইতিহাস।

আমরা আজও বেঁচে আছি এবং এর নামক-বিসিসিটি আমাদের মেয়ে আছে। আর, মানুষে যাকে সাহিত্য বলে—তা এই অনেকই সৃষ্টিশীলতার লীলা। আমার বিশ্বাস যে, এ-যুগে এই সাহিত্যিক মনের স্পষ্ট প্রথম বাঙলাদেশেই পরিচয় করে দেওয়া যায়।

ছোটগল্প যখন সাহিত্যের একটি সম্পদ ও প্রধান অঙ্গ—তখন বাঙালি যে তা ছুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

...ছোটগল্প কথাটার একটা অর্থ আছে, এবং আমার বিশ্বাস, এ অর্থ নভেল চৌধুরার আর্টও চাইতেও কঠিন। এ জাতীয় গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাজিয়ে করে নিতে হয়, পরে তাদের ছুঁতে করতে হয়। নভেলের মত এতে নমনা কথা বলবার অবসর নেই।

তবে এ আর্ট কেউ আটকেও রেখাতে পারে না। নিজের কল্পনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা লেখক স্বয়ংই আবিষ্কার করেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেমন বিচিত্র, তার আর্টও তেমনি বিচিত্র।

ছোটগল্প গানও হতে পারে, ছবিও হতে পারে, এবং কথা বাহুল্য যে গান গাইবার আর্ট ও ছবি আঁকার আর্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরন্তু সম্বন্ধে প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। উপরন্তু মাত্রেই ছুঁচকথা—এ-শব্দের সাধারণ অর্থে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ। মানুষের সেই আদি অকৃত্রিমতার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আদিম-আকাঙ্ক্ষা, আদি-বেদনা, ক্ষুধা-পিপাসা, আসক্তির সঙ্গে মানুষের সাহিত্য বাস্তব-বোধকে কল্পনার সৃষ্টি দিয়েছে।

মুখে আওড়ানো ও ইন্দ্রজালের সে গল্প নানা জটিল বিভিন্নধারায় বাঁকে বাঁকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে পেরে অনেক-খানি মোহমুক্ত যে রূপে পেয়েছে আজ এখন বহুরে বিশেষ এদেশে তার আসল প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু মনের কথা কথায় প্রকাশ পাবার আগেও গল্প আর নিজের ভূমিকায় সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইউরোপে আজকালকার গল্পের ধারা থেকে ধরিয়েছে। মোটামুটি সেদেশের আমাদের এখনো কিছু কিছু।

যা, ছোটদের ও গল্প-বাঁধা গল্প তা বলবই না, কোনো গল্পই যা বলতে হবে কেন?

জটিলতা ছোটদের কাছে ছিল সাধারণ ব্যক্তির জন্য। সে ছকের বাঁধুনির মধ্যে-বাস ছোটরা সমস্ত সৃষ্টিকুল খুঁজে পাবেই। একলা ছাড়া, একলা মজাদা, কতলো খোরাক, একলো ছিল কি ছোটো কি বড়দেরও বিরোধ প্রয়োজন। নিয়মকানুনের পেঁচিয়ে তুলের দরকার নয়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছক ছাড়া কিছু নয়। ধরনগুলো কি কম বিশেষের চাল ছোটদের জন্যকরা, যার যা ছোক যা ভালো সেও তাই। আমরা দুনিয়া আর জীবনকে ছোটদের কোন ছকেই মেলাতে পারিনি বলে মন নিয়ে, কোন ধাঁচেই পাইনি এমন ছবি যা ধরে থাকতে পারি নিশ্চিন্ত হবে। সুতরাং ছোটরা আজ গল্প বলে বোঝো সে আমাদের জন্যে বেঁধে না—এই হল এ যুগের গল্পলেখকের বিদ্রোহীদের বক্তব্য।

সে বক্তব্য সম্পূর্ণ সৃষ্টি না সৃষ্টি, তবে করতে পারি যে কি গল্প তাহলে ছোটরা বলতে চাও?

যে গল্প ছোটদের আদৌ মনে না—খুব সহজও নেই, শেষও নেই।

জবাবে বলা যায়, সহজ ও সাদা বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না। তবে তাকে এক জায়গায় থামতে হয় একটা ইঙ্গিতের বিন্দু বলা যেতে পারে একটা চিত্রলেখার জন্য, যে চিত্রলিক কাঁপিয়ে ঐটুকু

ছোকরা হবো অথবা জীবনরহস্যের চাবি-কাঠির যেন আভাস দেয়।

এ অভাব দেখার সঙ্গেই কিন্তু পাল্টা উপায়টাও অনুমান করতে পারি।

এই জীবনরহস্য আর ইন্দ্রিয়চমৎকার, এসব ঘোঁয়াটে ধান্দা আমাদের জন্যে নয়। জীবন যদি রহস্যই হয় তো তার কুণ্ডিকা মোচনও মেয়েদের নয়। আমাদের গল্পের লক্ষ্য কি শেষ না-থাকা খুব মোলায়েম কোন ইন্দ্রিয়চমৎকার দিয়ে নিরন্ধ্রিত হবার ধার ধারে না।

এবার হয়ত বলা চলে, তবুও খোলা-খুলি মন খুলে ও শেষ করলেও যতটুকু কথাকে কালিতে ফুটিয়ে তুলি তার একটা সংলগ্নতা ও থাকবে, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উপলব্ধির বাহন না হয়েও যে সংলগ্নতা সমস্ত প্রকরণটিকে একটি সার্থকতার মূল্যে ধরে রাখে।

একটি বিশ্লেষিতরূপে তারপর বোঝবার চেষ্টা করি—সামনের এই চলমান ঘটনাটা নিয়েও গল্প সুরু করতে পারা যায় নিশ্চয়। কয়েদী ঘণ্টাটা পরে আজ চৌবিলের নানা গাঙ্গায় ওপর। চৌকিদারদের জানো খোলা ঘণ্টাঘরে ওপরের জানার দিকে একটি ছায়া বিঁধিয়ে দিয়েছে। অনেকটা অবধি। একটা কি আরো লোক চৌবিলের ঢাকনার সেই ছায়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে যোজাই যায় না এমন ধীরগতিতে চলেছে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রার। এই গল্প চলার মাঝে সুরু করে যেখানেই শেষ করি না কেন, সুরু ও শেষ যত সূক্ষ্ম বা ক্ষীণ সম্বন্ধই হোক, জড়িত না হলেও গল্প করতে বসাই বা কেন? বোঝাতে চাই যেমনই, একটা না একটা কিছু ছবি আসেই। সে ছবি বাস্তবের প্রতিফলন হবারও কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটি ক্রমের মধ্যে যতদূর যে কোন অর্থহীন উচ্ছ্বাসকেও বাঁধি, তখন তাঁর ক্রম একটা গতিবেগের মধ্যে নামী করে, সে বিন্যাস কিন্তুপ্রকৃত সমাধানের সমন্বয়বোধের মত আমাদের মনে ইন্দ্রিয়চমৎকৃতি কি মানসিক আবেগে অনুরণনের সৃষ্টি হলেও।

এই পর্যন্ত বলেই মনে হয়, এ যুগের বিজ্ঞানের কাছে যা হাস্যাস্পদ, সেই বুদ্ধিই অজান্তে তোমা দিয়ে ফেলেছি। ওদেশের সমাজের ফেলেছেন বিদ্রোহীদের কাছে ছবির ক্রম একটা অর্থহীন কুসংস্কার, সঙ্গীতের সমন্বয়বোধের বিন্যাসের অজ্ঞান সন্ধানক। গল্পের কি কবিতার সংগঠনটা একটা চালিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (ইমপ্রেসন)-এর একটি সংক্ষিপ্ত কথাকাহিনী যার একটিমাত্র ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংহতির দ্বারা নিয়ে গল্পরস লাভ করে।

ছোটগল্প উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—যা ইতোপূর্বে অন্যত্র এই রূপে বিদ্যমান ছিল না। এ মতেরও নয়, রোমান্সও নয়। এ কবিতারও মত ঐকতানাবাদী—অথচ কল্পনাসমৃদ্ধ নয়, জীবনানির্ভর। আবার সেই জীবনের সমগ্রিকৃতিরও প্রতিশ্রুতিও এতে নেই—এতে বক্তব্যের স্বাধীনতা। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই স্বাভাবিক।

উনিশ শতকই ছোটগল্পের জন্মলগ্ন কেন—এ প্রশ্নের উত্তর এত সরল নয়। তবু একটা জিনিস সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, মানুষের ইতিহাসিকতার আর পেছনের বিরুদ্ধ রোমান্টিকতার মূলে নিরোধ জীবনসন্ধানী জনসাধারণের নিজস্ব বোধাচিত চেতনার দিকে—সামাজিক পরিণতির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উদ্যত করে তুলে ধরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার মধ্য ও শেষকাল (ছোটগল্পের পূর্ণ আবির্ভাব যুগ) পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীর বলপ্রাপ্তির যুগ। ফ্রান্স এবং রাশিয়ার এই বলপ্রাপ্তি সবচেয়ে ভরাবহ। স্তাঁদাল-মেরিমে-ফ্লবেয়ার প্রমুখ লেখকেরা বিরাগালিজমের পথে—সমাজ-সমালোচনার যতখানিই অগ্রসর হোন—মধ্যশ্রেণীর বাংলার প্রাণ তাঁদের অন্তরের মমতা ছিল, তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন—ফ্রান্সেই ইয়োরোপের মূর্ছিলাভ। সিডানের রণক্ষেত্রে বিসমার্কের জয়ে মেরিমের মৃত্যু ঘটল—সমরাস্ত্রের পরে জোলার আর এগোতে পারলেন না। মোপাসাঁ এলেন, চূড়ান্ত প্লানির মধ্যে—আধুনিক ছোটগল্প হল বলপ্রাপ্তির ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত ছোটমুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা জোলারও সমস্তরের অন্তে পেরেছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু মুমাত্তার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছোট গল্পে—আলগা আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল মৌলিক বারান্দার বক্তব্যগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার আবেগে নগ্ন-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্তে দিতে থাকেন। গী-দা মোপাসাও তাই দিয়েছেন। এমিল জোলা বলপ্রাপ্তিকের বলিষ্ঠতার বিশ্বাস করে উপন্যাসের পথে অবশ্য কিছু এগোতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনি নয়রালিজমের পথের প্রতিনিধি গেছেন।

মহৎ শিল্পী হয়েও মুপাসাঁ নিজের বুদ্ধির যুগেই তুচ্ছ, জোলারও সমধর্মী—তাই 'কাদা' এত সফল' কিংবা 'আর্থিম সরোজের মত তাল উপন্যাস লিখেছেন। তলস্তয়ের গভীর প্রতিভা ধরল, তাঁর আশাবাদ—নব অনুভূতির প্রত্যয় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখার যোগ্যতা দিয়েছে। চেখভও আশাবাদী—কিন্তু সে আশা যে কী বলপ্রাপ্তির—তাঁর ছয় নম্বর ওয়ার্ডেই সে পরিচয় রয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত ছোটগল্পই চেখভের প্রধান অবলম্বন।

আমেরিকার ছোটগল্পও এমনি বলপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে সুরু হয়েছে। হেমিংয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কোনো বিপ্লবে সংঘাত নেই বটে, কিন্তু আজ লেখকের বাহ্যিক বেদনা ও ব্যর্থতার স্বীকৃতি। নিরলস উপেক্ষিত নায়কনায়িকা যখন সেই বেদনাতেই ভালো-বাসার মধ্যে 'সিউরিটান উচ্চারণকে' আসবে নিয়েছেন—তখনি একমাত্র আমাদের সো চেখভের তাঁর জানালার পাশে বাড়িকাকের উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করালিয়ারির মধ্যে জেগে আছে। হয় সামাজিক সংকট—আর বাহ্যিক সংকট—উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ বন্ধনা বিলাসল। ছোটগল্প কলমসুলোই এই সময় প্রথম অনুপ্রাণিত হয়েছে।

উনিশ শতকের দেবতাস—যা বিশেষ করে ছোটগল্পের কাল, তা প্রধানত রিয়ালিজম এবং নাচারালিজমের উদ্ভাস ঢেরলো অনুপ্রাণিত। ইংলাণ্ডের ব্রনটি ও আর জার্মানীর হাউপ্টমেয়ানের নাটক, ফ্রান্সের এমিল জোলার উপন্যাসে আর চার্লস বোদ্‌লেয়ারের কবিতায়, বুদ্ধিবেদনার নিম্নে বাস্তবতা ও অতিবাস্তবতার উন্মেলতা। জীবন-জিজ্ঞাসু, সহানুভূতি এবং নিষ্ঠুর ছোটগল্প তাই একালেই এত বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, যুক্তি-চেতনার সঙ্গে, সমাজচেতনার সঙ্গে কোনো মতেই যখন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না—তখন প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকের সঙ্গে বিশ্বাসীর সংঘাত—তখন রোমান্টিক কবি নাইটিঙেলের পাখা আজন্ম করে 'স্লেজ-এণ্ড বিউটিফুল'-এর অভিসারে মডোবাহিক হতে পারেন, দুঃখের ভোরাগলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন হৃদয়াবেগের ডাকায়; কিন্তু বাস্তবিকতির সংগোত্র গল্প-লেখক যেন হীরামন পাখি। সে-পাখি আহতজনক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—রক্ত-কর্দমের মধ্যে তাকে ছটফট করতে হয়। কখনো তার নির্বাসিত চোখে স্বপ্নময় অকালের ছায়া ঘনায়, আবার কখনো বা মুহূর্তকালীন হতে-গতিতে সে সমাজ ও জীবনের বাহিরে অস্তিত্বপাত জানিয়ে যায়। তাই ছোটগল্পের ছিন্নর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নভঙ্গিমার কথা বললেও উনিশ শতকে তা মূলত সুখবাদী। চেখভের মত জীবন-রসিক লেখকের গল্পের দীর্ঘস্থায়িত্ব খেলাই তার পরিচয়। তার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা—চারদিকের ব্যর্থতায় প্রতি তার অর্ত অনুকূল-নির্বেদন। প্রবন্ধ দুঃখবাদ হয়েও তা সর্বত্র পরাজয়বাদ নয়। দুঃখের মধ্যেও কারো চোখে আশার আলো—তিনি চেখভ; কারো বিশ্বাস—প্রকৃতির অফুরান সৌন্দর্যে 'এখনো অনেক রয়েছে বাকী'—তিনি আনাতোল ফ্রেন্স; কেউ বা মানুষের চিন্তা-চেষ্টা-স্বপ্নকে এক অন্ধ শক্তির অট্টহাস্যে বালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখেন—তিনি নায়কনায়িকের হুকার্ন; কারো চোখে অনুভূতি ক্লিষ্টতায়—তিনি মোপাসাঁ।

জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতোই ছোটগল্পের আবির্ভাব। তারপর তা অবশ্য বিশেষ একটি শিল্পরূপকে পরিণত হল। এখন তার মধ্যে সবই এল। প্রেম এল, স্বপ্ন এল, আনন্দ এল, কান্না এল, হাসি এল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আঁতাতে ছোটগল্প লেখকেরা যেন সর্বদাই মতো জিজ্ঞাসা জানা করে অন্তঃপীড়ায় অনুভবেন—এই-রাবাটি যে কোনদিকে—তার সন্ধান তারা এখনো পাচ্ছেন না।

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে জন্মলগ্নের দাবি৩ পরবর্তীকালের অবশ্য মানে। ছোটগল্প বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে যে তাঁর প্রারম্ভকালেই উপস্থিত করবে—এমন কোনো শর্ত৩ নেই। একটি বিশেষ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়া মানবাত্মার আমাদের শিল্পের মধ্যে রেখা দিতে পারে; কখনো তা অভিব্যক্তরূপে আসবে, কখনো রেখা রেখে বক্রভঙ্গির পরোক্ষতার আবরণে, কখনো বা নিজেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন করে রাখবে। ছোটগল্পের মূলে, বুদ্ধদেবের সন্ধান করতে হলে তাই অতি-পরিচয়ের উপর নির্ভর করলে চলবে না। অন্যান্যদের কাছে যেমন আমার ভাবানুভূতির চিহ্নিতে চিহ্নিত অনুভূতি সুক্ষ্মদৃষ্টিকে একদা করে একটি অন্তরতার সন্ধান করতে হয়, তেমনি বুদ্ধদেবকেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যের এবং বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে সন্ধান করে নেওয়া যাবে। ছোটগল্পের মেলাযাত্রাকে গরুর, ঘোড়া, খাদ্য ও খাদ্যের আবিনাটে এবং কৃষ্ণকলিকের চিত্রণে যাঁর গল্প বাঙ্ময় খণ্ড খণ্ডভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে; তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এদের প্রত্যেক ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা আবশ্যক।

[illegible] যেন বুদ্ধদেবের প্রতিভিন্না আর [illegible] সঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবের [illegible] ভিন্নতর। তাই সবের ও [illegible] ছোটগল্প একেবারে [illegible] ও [illegible] এই বাস্তবিকের [illegible]। [illegible] তাঁর [illegible] গল্পের মধ্যে কখনো অন্তর্নিহিত, কখনো অন্তরতমার ছায়া-সঞ্চারণ। [illegible] অনেকগুলি গল্পের [illegible] গল্পের মহাবিহিতে [illegible] মানবিক অবস্থার সঙ্গে [illegible] করতে হবে। [illegible] সঙ্গে তার উপর [illegible] মধ্যেই অন্তর্ধানের কথা [illegible]। [illegible] গল্পের ছোট-গল্পের মূলে বিজ্ঞানের [illegible] আছে। [illegible] ভিতর দিয়ে তিনি পরিণতিতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে হবে। অতিমানব, পরমাণু এবং [illegible]: দুটোতে হবে বাস্তব সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক, বাস্তব সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে।

আমার লক্ষণীয়, ছোটগল্পের ধারণা আদৌ অবিচ্ছেদ্য, উপন্যাস তেমন অনুচ্ছিন্ন। [illegible] অতি—যাহে নাস্তি—অন্যত্র যেমন আছে তা-ও ভালো এদের যে কোনোটি [illegible] কোন উপন্যাসের সমান। শ্রেষ্ঠগল্পগুলি [illegible] ছোটগল্প ধ্রুপদী। [illegible] পরবর্তী যেমন গল্প অনাবশ্যক। তাই তার [illegible] মধ্যেও [illegible] বলবত্তরের [illegible]—ঐতিহ্যের সোনাটার আবির্ভাব। তাই পরবর্তী বয়সে পৌঁছিয়ে—একটা লাগসিক নিয়মে ঘুরেছে, তবুই 'দি স্কাইলার্ক' [illegible] ট্রুকলেন হেডে।

এ সেল অধিক কারণ। অন্য কারণও ছোটগল্পের পথ খুলে দিয়েছিল।

আমেরিকার সংবাদপত্র ছোটগল্পকে অনুকূল করেছে। সংবাদিকতার প্রয়োজনেই শেষকর্মী গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল ইংলণ্ডের ডাইলাব-লেপ্রচেরন-গ্রন্থকারে। ইথনি, পো এবং হেমের মেয়র বিখ্যাত ম্যাগাজিনিস্ট, জেনারেল-ম্যাগাজিনের মুখ্য আসর পাঠকা, মোপাসাঁ তাঁর ডিনারের উপর গল্প পাঠিকার প্রয়োজনেই প্রধানত লিখেছেন; চেখভকে ছাত্রাবী পত্রের বক্স চিত্রণে-হাসির নকশা দিয়ে পাঠকার পত্রার হাত বজায় করে হয়েছে—তারপর লিখতে হয়েছে গল্প। সাধিকল পাঠকের—একটি মাত্র ভাব—একটি সমগ্রের সৃষ্টি করে পাঠককে সমগ্র ফিরে দেয়া—এই মূলে ব্যবসায়িক প্রয়োজন৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোটগল্প সৃষ্টিতে অনেকে মূল্য করল। গল্পের বাজে সাহিত্যে আধুনিক মনের প্রবক্ত অনীলুনাথকে৩ মনে পড়তে পারে, তিনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন সাময়িক হিতোপদীর তাগিদেই। ঊনবিংশ শতকের সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের বিচ্ছু ভেদক পরিবেশনের চেষ্টা আধুনিক ছোটগল্পের দ্বিতীয় কথা ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের মুখোমুখি ছোট-গল্পের আবির্ভাবে জন্ম নিল এবং সংক্ষেপ তার আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করল।

রথীন্দ্রনাথ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীকে ছোটগল্পের স্বর্ণ-যুগ বলা হয়েছে। এই শতাব্দী শুধু ছোট-গল্পের স্বর্ণযুগই নয়, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ছোটগল্পের উৎসভূমিও। মধ্যযুগের রোমান্স, রূপকথা থেকে কথা-সাহিত্যের এই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যেন আধুনিক উপন্যাসের৩ উৎসব হল, সে কথা৩ বিলক্ষ। আধুনিক উপন্যাসের৩ উৎসব হয়েছে অবশ্য এক শতাব্দী আগে। ইংরেজী উপন্যাসের উৎসব সাহিত্যিক কথা বলতে গিয়ে সমালোচকেরা 'রিকনসন ক্রুসোর' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এর আগে আখ্যানী থাকলেও উপন্যাস ছিল না। উপন্যাস সৃষ্টির জন্য বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। মধ্যযুগের রোমান্সের মধ্যে জীবন-বিচিত্রা কল্পনাবৃত্তির প্রাধান্য ছিল। উপন্যাসে যে জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তা অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ।

হেকো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং ইংরেজী কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবানুগ জীবন-চিত্রণের চেষ্টা করেছেন, তার সঙ্গে পূর্ব-বর্তী কথা-সাহিত্যিকদের জীবন-চিত্রণের পার্থক্য আছে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের পাঠক সাধারণের মধ্যেও [illegible] পাঠসুখ লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই সার্বজনীন লাইব্রেরী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সাধারণের বৃদ্ধি হয়। চাঁদা খুব বেশি ছিল না—বছরে আধ গিনি থেকে এক গিনি ছিল চাঁদার হার। এই অল্পমূল্যে পাঠাগারে সবরকম বই-ই থাকত—কিন্তু উপন্যাসই ছিল এই প্রধান আকর্ষণ। উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই পাঠাগার-গুলির গুরিয়ে আর ছিল না। বাস্তিস্থাবন্ধের অনুরাগের সঙ্গে উপন্যাসের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। বাস্তি-স্বাতন্ত্র্য বাহক বহু আলোচিত বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধে।

উপন্যাসের উৎসবের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পের উৎসবের একটি গভীর সম্বন্ধ আছে। মূল ও রীতির দিক থেকে স্বতন্ত্র হলেও কতকগুলি বিষয়ে উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের মিল আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে যেমন খাঁটি উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না, তেমনি উপ-ন্যাসের জন্ম না হলে বোধহয় আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম সম্ভব হত না। যে-সমাজে উপন্যাস জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সমাজেরই একটি বিশেষ অবস্থায় ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজী ছোটগল্পের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের পাঠক সাধারণের রুচি পরি-বর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই শতাব্দীর অর্ধেক সময়ে ছিল অলঙ্কারের বাহুল্যের উপন্যাসের কলেবর সঙ্কুচিত হয়ে এক খণ্ডাংশে পরিণত হয়েছে। রুচি পরিবর্তনের এই সংক্ষিপ্তিকরণে সিটেনসনের অনুকূল অনুমান করেছে।

ছোটগল্পের অল্পতা ও সমৃদ্ধির মূলে সাময়িক পত্রিকার দান যোগাহর সর্বাধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে সাময়িক পত্রিকার প্রসার ঘটেছে। সাময়িক পত্রিকার বাহিনে ও পাঠক সাধারণের চাহিদার ফলে এই শতাব্দীতে আধুনিক ছোটগল্পের মূলে জন্ম হয়নি, বিচিত্রমুখী সমৃদ্ধি ঘটেছে। মোপাসাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই ফরাসী ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল। এই মূলের ফরাসী ছোটগল্পের উৎকর্ষের মূলে সাময়িক পত্রিকার দান অনেকখানি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কথা-সাহিত্যের যে সুন্দর রূপ দেখা গিয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা সাধারণত্বের প্রয়োজন ও পাঠক সাধা-রণের রুচির তাগিদে ছোটগল্পের রূপ পরি-গ্রহ করল। আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এডগার আলেন পো নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন 'এসেনশিয়ালি এ [illegible]'। সাংকিপ্তিতা, তীক্ষ্ণতা ও একমুখতার দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে থাকার জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই সংক্ষিপ্ত রচনায় পক্ষপাতী ছিলেন।

হেনরি হেমসের অভিজ্ঞান অনুযায়ী সাময়িক পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল। তাঁর প্রথম গল্প মিডউইকের 'ফী-উইন-টাল' রাত্রিস্থিতে প্রকাশিত হয়, এডগার তিনি আটলান্টিক রাত্রিস্থিতে গল্প প্রকাশ করেন। ইত্যাবসরে তিনি নর্থ আমেরিকান [illegible]

এই জন্য অনেকগুলি সাপ্তাহিকপত্র বের হয়েছিল। তার মধ্যে 'সোনালি-কাগজ' নামে একটি পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন একজন প্রবীণ নাটকের ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। তাঁর এই বয়সের গল্প ও সমালোচনা লেখার ভূরিভূরি প্রেরণা দেয়। কলকাতা শহরটিকে একটা সম্পূর্ণ করার পর থেকে জীবনের শেষ সাহিত্যিক বছর তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন। সম্পাদক পত্রে তাঁর এই বিচিত্র ছদ্মনামগুলিকে অনুকূল করেছিল। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ে হাস্যরসাত্মক গল্প ও লেখকদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। তিনিও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহিত্যিক একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

জর্জটাউনের ছোটগল্পের একটির সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাঁর এক্সেলেন্সিদের ছোটগল্পটি তিনটি পর্বে প্রকাশ করা হয়। প্রথম পর্বটিতে তাঁর বাল্য ও কিশোর-জীবন বর্ণনা—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর কথা বিবৃত করেছিলেন। ১২১৮ সাল থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরকে সাধারণ বলে ধরা হয়। এই সময় তিনি তাঁহাদের গল্প লিখেছিলেন। ১৩০৫ থেকে ১৩১৮ সালের প্রায় সমস্ত গল্পগুলি 'আজকাল' ও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলিই এঁদের গল্পের ধরন হয়ে উঠেছিল। ১৩২১ সাল থেকে ১৩২৪ সাল পর্যন্ত তিনি কয়টি গল্প লিখেছিলেন—সবগুলিই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। এই-একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যে একজন হলে তাঁর ছোটগল্পের জন্মদাতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটগল্প রচনার মূলে সাপ্তাহিক পত্রিকার দাবীকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য অবশ্য বিষয়ের মধ্যে আধুনিক-জীবনের দ্রুততা ও অস্থিরতা-ভরা ছোটগল্পের প্রতি একটি আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। এক্সলেন্সের গল্প-রচনা সম্বন্ধে জীবন বীতিমতো ছোট-করা উপন্যাস পড়ার অনুকূল নয়। অর্থাভাবের তাঁর অসম্ভবী ছিল প্রকাশের মূলে বলেছিলেন। অসম্ভবী, যিনি উপন্যাস পড়তে চান, তাঁহাকে খুঁজতে হইবে যে, জীবনের কোন্ ইতিহাসে' আধুনিক অর্থচঞ্চল নাগরিক জীবনের পক্ষে দীর্ঘ উপন্যাস পাঠকের সম্পর্কে এরূপ প্রয়োজন হতে পারে। ছোটগল্প জীবনের দ্রুত তালের সঙ্গেই চলে ফিরতে চলেছে—সংক্ষিপ্ত অবকাশের সময়ে হয়ে উঠেছে ছোটগল্প। দীর্ঘ উপন্যাস পড়ার অবকাশ কোথায়? ইউরোপ কোন্ খুঁজতেছেন, ইংরাজের ব্যস্তিক ব্যস্তের অবসরের অবকাশের মধ্যেও ছোটগল্প পড়তে পারে। জীবন-চলন্ত উপন্যাসের চেয়ে মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার অবসরমুহূর্তে ছোটগল্প পড়ার বেশি আগ্রহ অনুভব করে।

পাঠকদের এই মানসিক বিভিন্নতার এ যুগের ছোটগল্প ও সাময়িকপত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কথা আগেই বলা হয়েছে। সাময়িকপত্রও লেখকদের ও সাহিত্যরসিকদের নতুন পথের সন্ধিক্ষণ করেছে। বাঙলা সাময়িকপত্রের সম্বন্ধে পরিবেশনা করা এখন বৈচিত্র্য পাঠ্য বেশন করা হয়। রবিবারের সংখ্যাগুলি খুলিলে সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যও পাঠ্য বেশন করা হয়। মূল সাময়িকপত্রের সঙ্গে ক্রোড়পত্র যুক্ত করা হয়—তাহাতে দুটি গল্প সেখানো থাকে। এইভাবে সমৃদ্ধ ছোটগল্প পরিবেশন করবার ভার নিয়েছে আধুনিক কালের ছোটগল্পের অনুপ্রাণ আবহাওয়া রচিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছে। প্রথম ভারতীয় আখ্যায়িকা ও ছোটগল্পের ধারা এই শতাব্দীতে অনেকটা সীমাবদ্ধ লেখনে শেষের প্রকরণটির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই শতাব্দীরই।

ভূদেব চৌধুরী

মানুষের জন্ম কেবল জন্মলাভ কিন্তুরের আকর্ষ নয়, তার ছোটো জীবন পরম্পর-বিরোধী প্রবলতার অভিঘাতে ক্ষণার ভাঙিল। এই বিচ্ছিন্ন-ভঙ্গিমার কিন্তুর ও বৈচিত্র্য মানুষের পরিচালন চেতনার অতলে কেবলই গভীর-বাস্প ছায়া ফেলেছে। ফলে, মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনা ও চিন্তা, কিন্তু ও আবেগের অবধি নেই। জীবিকের বহু-সাপিলতার বিচিত্র সেই মূলটির অন্বেষণ পথিক খুঁজে ফিরেছে উপন্যাস-ভাষা। এ-পথে কেবল মনের অনুভব নয়, ইতিহাসের জ্ঞান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিশ্বসংস্থিতির যৌক্তিকতা শিল্পীর হাতে জীবন-রচনার নিত্য-নব ইতিহাস তুলে দিয়েছে। তাঁর শরীরে করেছে প্রসার। অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষ, প্রজ্ঞা ও জীব-বিজ্ঞানের ঐক্যতি, সেই সঙ্গে বিশ্লেষণবাদের অন্ধ উপন্যাস-শিল্পীর সামনে জীবনের এক সীমাহীন বিস্তৃত তুলে ধরেছে। অনাবিষ্কারের আদিম জৈব চেতনে অনন্তকালের নিরন্তর যোগাযোগ পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের প্রসার। ব্যক্তি-মানুষের জীবনের এই অনন্ত সম্ভাবনার চেতনাপটে গভীর করিয়ে আধুনিক-জীবন সমস্যের উপন্যাস-শিল্পী বিচিত্র বিচিত্র তার আঙ্গিকতার রহিমেছেন। ঔপন্যাসিক-শিল্পীর জীবন-দৃষ্টি তাই অনন্ত-ব্যাপ্ত, বহুবর্ণাঢ্য। ছোটগল্পের শিল্পী সেই অপার-বিস্তৃত সৃষ্টিতে সাধ্যেরচিত্রে একটি কিন্তুরে একান্ত-কেন্দ্রিত করেছেন। জীবন-চিত্রে অনুভবসাধী কলাকৌশলে এক মুহূর্তের গভীরতায় ধরে রাখতে পারেন তিনি। ছোটগল্পের শিল্প-গভীর কিন্তুর অন্য কিন্তুরে ঘুরে যায়।

একটি জীবনের অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিক্রমা করে সমগ্র জীবনের, দৃষ্টি রচনা করে উপন্যাস। তার আয়তে সমস্ত জীবনের মূলকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে, দ্রিশ্বিত,—সীমাবদ্ধিক ছবে ছোটগল্প। সকল সার্থক গল্পের মধ্যেই উপন্যাস ও ছোটগল্পের বন্ধুত্বের, জীবন-মূলকে চূর্ণবিচূর্ণ করে থাকে নিয়ে নিজ শিল্প-রূপের মুকুরে। উপন্যাসের জীবন যেন পূর্ণিমা-চাঁদে জোয়ারের সমুদ্রে বিশ্বিত জীবন-রূপ যেখানে সেই মুকুর-ধর্মে ধরে ফুলেফেঁপে আসতে পারে,—জীবনে আনন্দের সৃষ্টি করে। ছোটগল্পের মুকে ঢেউ-এর মুখী ঠাঁদ'র জ্যোৎস্নার হয়েলাহিত হয়ে উঠেছে প্রতি মুহূর্তে,—নীল ঢেউ-এর চূড়ায় মুক্তার শুভ্র ফেনার শুভ্র, কলোলাসের মাঝায় যেন মুক্ত স্পন্দমান রবি। মুহূর্তে আয়ত সমুদ্রের ঢেউ-এর শীর্ষে শুধু চাঁদের আলো ফোটে ফুটে ওঠে; সাদা ফেনার মুকুরে সেই শুধু আলোর একটি প্রানুষের একটি মুখ প্রতিফলিত হয়ে, হারায় ঢেউ-এর মাঝায় চকিতে হেলে ওঠে। কিন্তু, সেই মুহূর্তের জন্য। তারপর ঘোর গর্জনে ঢেউগুলি একে অন্যের সঙ্গে আঘাতে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে যায়। শুভ্র-ফেনকতা কালো জলের মুহূর্তি-তলে আত্মগোপন করে বাঁচে। আরো পরে, অকূল সমুদ্রের আলোকচক্রে অনুকূল পাঁচিল ঘুরে আবার চলে শুভ্র-ফেনার জীবন-মুকুর রচনার প্রাণান্ত প্রয়াস। ঔপন্যাসিকের জীবন-বিস্তৃত জীবনের উদ্ভাস-কক্ষে মুখোমুখি পূর্ণ-বিশ্বিত ঔপন্যাসিকের শিল্পমুকুর উপন্যাস।

আর, ছোটগল্প, পূর্ণ চাঁদের আলোয় জোয়ার জীবন-শিল্পী নিজের অনুকূলের মুখকে যেন বিশ্বিত করে দেখেছে পক্ষ-পাঁচির ফাটিক জলে। পূর্ণিমা নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতার অতলে চলার ধুলি না ছড়িয়ে ঘাটের পরে এসে বসে সাধনার, বিস্তৃতস্থ-চিত্তে নিজস্ব জীবনের মুখটি ফটিক জল স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ—নিজের সামনে নিজের অন্তর মুখ প্রতিবিম্বের পানে অতল তলে ডুবে আছে মুখ চাঁদ-মুকুর। জীবনের পরবর্তন ঘুমিয়ে থাকে, চলন্ত মৌমাছিরাও আর গুঞ্জনে ভরে না। বাহির-অন্তরে নীরব নিথর স্তব্ধ একটা ভাবে যাঁর, চলন্ত, ঢেউ-এর ভাঁজে তাঁজে তখনো জীবন-বিশ্বটি পূর্ণচন্দ্রের উদ্ভাসলতায় ঝেলুল হাসে আর কাঁপে। পরে জীবনে কাঁপন আসার সম্ভাবনা—সম্পূর্ণ অবশ্য মুকুর-মাধুরিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের উদ্ভাস তাতে ধরেছে, ধরেছে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সম্ভোগের ক্লান্তি-বিধি স্পর্শ। কিন্তু, শিল্পীর নিজস্ব অনুভবের নিবিড় অতলতায় সমগ্র জীবনের, বৈচিত্র্য, সব কিছুর মূল বিন্দুতে সমাহৃত হয়ে। নিস্তব্ধ অন্তর জীবনের সেই ডুবে-থাকা মুহূর্তটিকে ছোটগল্পকার তুলে ধরেন তাঁর নিজস্ব-মুকুরে। জীবন চেতনে মুহূর্তগুলি, কিন্তু বিশ্বরূপ, সমগ্র, কিন্তু ক্ষণিক, পূর্ণ হয়েও খণ্ডিত।

অগ্রহ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ইন্দুভূষণ সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আকর স্ট্রীট লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও ৫৮৫নং ১১।১, আকর স্ট্রীট লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

MANUFACTURERS :

Trade Mark : RLF

Sree Rajalakshmi Foundry

GANAPATHY COIMBATORE-6

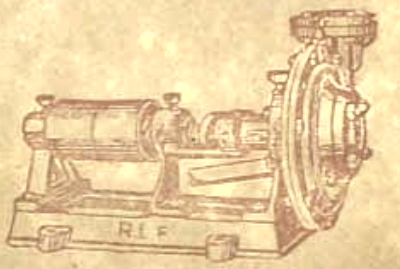

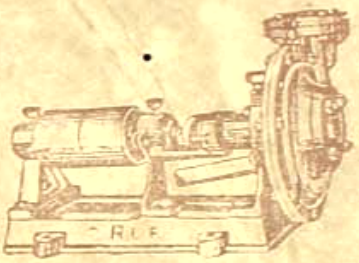

(Manufacture of Centrifugal Pump, Motor & Diesel Engine)

DIESEL ENGINE-3 B.H.P. to 10 B.H.P. ELECTRIC MOTOR - 1/4 H.P. Single phase to 20 H.P. 3 phase. CENTRIFUGAL PUMP from 2" × 2" to 5" × 6".

Guaranteed for two years' for all manufacturing defects.

Factory No. 1
Ganapathy P.O.
Coimbatore-6 (Madras State)

Phone Nos.
Factory : 31196
Show room : 30786
Residence : 30124

Factory No. 2
20, Abdul Sahib Street,
Saidapet, Nungambakkam,
Madras 34
Phone No. 444339

Sales Branches
40, Thambu Chetty Street, Madras.
Phone No. 25734

Dharamtala Street,
Muzaffarpur (Bihar).
Phone No. 2865

SALES BRANCHES

40, Thambu Chetty Street
MADRAS-1
Phones : 25734, 444339

139 Dharamtala Street
Calcutta-13
Phone : 24-1462

JAWAHARLAL MARG
MUZAFFARPUR (BIHAR)
Phone : 2865, 3204

SOLE SELLING AGENT
FOR
ESTERN ZONE & NEPAL

M/S Lucky Electricals Works

139 DHARAMTALLA STREET
CALCUTTA-13.

DISTRIBUTOR FOR BIHAR :—

M/S Electromechs

NEW DAK BUNGLOW ROAD
PATNA-1

CABLES : SERVICE DIAL OFFICE-24535, RES : 25903

Regd. No. C-4352
Gram: AMRITA, Calcutta-1
AMRITA
Friday, 9th May, 1969
Phone: 55-5231 (14 lines)

15 MAY 1969

ভিন্ন রুচির লোকঃ

কোথাও কাঁচা
ঝাটা মসলা
চলে

কোথাও চলে
বাটা মসলা

আরো
দেবো
ঠাকুমা ?

কোথাও
অতিরিক্ত

ডাইলে
কয় গন্ডা লঙ্কা দিছ ?

কোথাও
বা
সামঞ্জস্য

ছালন কো
পক্কায় কে
পক্কায় কে-মুস্ত,
ইত্তি মসালা !

কিন্তু সবার রুচিকেই পরিতৃপ্ত করে !

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ, ২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭, মিল—কাশীপুর কর্তৃক প্রচারিত।